ভারতের
বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস

শ্রীসুপ্রকাশ রায়

ভারতী বুক স্টল
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, ভারতী বুক স্টলের পক্ষে শ্রীহৃষীকেশ
বারিক কর্তৃক প্রকাশিত ও ২০৯, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬,
'লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রেস হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ পান কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীব্রজবিহারী বর্ম্মণ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

"Freedom's battle, once begun,
Bequeath'd from bleeding sire to son,
Though vanquished oft, is ever won,..."

ভূমিকা

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে আট বৎসর আগে। কিন্তু তাহার পশ্চাতে আছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই। দেশের সকলের মন তখনও পরাধীনতার বেদনায় কাতর হয় নাই। সকলের শির তখনও দাসত্বের লজ্জায় নত হয় নাই, সকলের চিত্ত সেই অপরিসীম গ্লানি অনুভব করে নাই। অল্প যে কয়েকজন বিদেশী-শাসনের অপমান সহ্য করিতে পারে নাই, তাহারা তরবারি হস্তে ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। কিন্তু সেই অসম যুদ্ধে তাহারা জয়লাভ করিতে পারে নাই। পরাজয়ের অগৌরব লইয়া তাহারা পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে, তাই দেশের ইতিহাসও তাহাদিগকে যোগ্য সম্মান দিতে পারে নাই। ইংরাজের দৃষ্টিতে তাহারা বিদ্রোহী, তাহারা দস্যু, দেশের বিজ্ঞজনেরাও তাহাদিগকে নির্বোধ মনে করিয়া তুচ্ছ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের সেই বিফল উদ্যম একেবারে নিষ্ফল হয় নাই। অদৃশ্য হাওয়ায় ভাসিতে ভাসিতে সেই ব্যর্থ বিদ্রোহের বীজ কখন মাটির অন্ধকার কোলে আশ্রয় পাইয়াছিল, আলো ও উত্তাপের অভাবে তাহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ হয় নাই, স্নেহ-সিঞ্চনের কার্পণ্যে তাহা শীর্ণ হইয়া যায় নাই। তাহা মরুভূমির উদ্ভিদের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে অনুকূল সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। ১৮৫৭ সালের নিদাঘের এক উত্তপ্ত অপরাহ্ণে সেই বীজ সহসা অঙ্কুরিত হইল। উন্মত্ত সিপাহীরা শোণিতের স্রোতে বিদেশী শাসনের কলঙ্ক ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু এবারও বুদ্ধিমানের সাবধানী চিত্ত অশিক্ষিত সিপাহীদিগের আহ্বানে সাড়া দিল না। বিদেশী শাসকেরা পাঞ্জাবীদিগকে দিল্লী লুণ্ঠনের লোভ দেখাইয়া ভুলাইল—হিন্দুকে উত্তেজিত করিল মুসলমানের বিরুদ্ধে, মুসলমানের মনে জাগাইয়া দিল হিন্দুর বিরুদ্ধে সন্দেহ। নেতৃহীন, ঐক্যহীন, অশিক্ষিত সিপাহীর দল প্রাণের বিনিময়েও দেশের স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিতে পারিল না। দিল্লীর

বাদশাহীর স্বপ্ন চিরদিনের জন্য ভাঙ্গিয়া গেল, পেশবাইর পুনরুজ্জীবনের আশা চিরতরে তিরোহিত হইল।

তাহার পর আসিল শান্তি। কোম্পানীর রাজত্বের অবসানে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করিলেন। দেশে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার হইল। শিক্ষিত লোকেরা পড়িল আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস, বায়রনের কাব্য, ম্যাটসিনির রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের প্রতিধ্বনি তাহাদের কানে পৌছিল। কিন্তু গুরুর বাক্যে শিষ্যের অনাস্থা হইবার কথা নহে। ইংরাজ গুরুরা আশ্বাস দিয়াছিলেন, ভারতের মঙ্গলের জন্যই তাঁহারা সাত সমুদ্র তের নদীর পারে স্বেচ্ছায় নির্বাসনের দুঃখ স্বীকার করিয়াছেন। ভারতবাসীরা যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলেই তাঁহারা আনন্দের সহিত বিদায় গ্রহণ করিবেন। সুতরাং ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় রাজনীতির চর্চায় মনোনিবেশ করিল, আপনাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা কর্তৃপক্ষের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে সভা-সমিতি স্থাপন করিল। ১৮৮৩ সালে এই নূতন মনোবৃত্তির ফলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস স্থাপিত হইল। কিন্তু বিদেশী শাসকবৃন্দ এই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত আন্দোলনকারীর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না, তাহাদিগকে দেশের কোটি কোটি মৌন সাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলেন না, বরঞ্চ নূতন নূতন আইন করিয়া তাহাদিগের নির্যাতনের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

ইহার ফলেই বিপ্লবী আন্দোলনের সৃষ্টি। আইনসঙ্গত প্রথায় বৎসরের পর বৎসর কংগ্রেসের সভায় 'রেজলিউসন' পাশ করিয়া যখন ফল হইল না, বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া যখন অন্যায়ের প্রতিকার হইল না, তখন ভারতবর্ষের নবজাগ্রত যুবশক্তি ইংরাজের প্রতিশ্রুতিতে আর আস্থা রাখিতে পারিল না। তাহারা দেখিল ইংরাজ বিনা যুদ্ধে স্বজাতি স্বগোত্র আমেরিকার ঔপনিবেশিকদিগের স্বাধীনতার দাবীও স্বীকার করে নাই, প্রতিবেশী আইরিশদিগকে কঠিন হস্তে নির্যাতন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বিনা রক্তপাতে তাহারা ভারতবর্ষের দাবীও স্বীকার করিবে না। কিন্তু নিরস্ত্র

জাতির সশস্ত্র যুদ্ধে জয়ের আশা কোথায়? লাঠি লইয়া কামানের সম্মুখে অগ্রসর হওয়া ত বাতুলতা মাত্র। যেমন করিয়া হউক অস্ত্র সংগ্রহ করিতে হইবে। আধুনিক রণনীতি আয়ত্ত করিতে হইবে। সম্মুখ যুদ্ধে না হউক, গুপ্তহত্যা দ্বারা বিদেশী শাসকদিগকে সন্ত্রস্ত করিতে হইবে। যেমন করিয়াছিল ইটালীর স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বীর সন্তানের দল, যেমন করিয়াছিল রাশিয়ার নিহিলিস্টেরা। অস্ত্রহীন জাতির পক্ষে সশস্ত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে যে আদর্শ, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন, তাহা এই মুষ্টিমেয় বিপ্লববাদীদিগের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

বঙ্গ-বিভাগের পূর্বেই গোপনে গোপনে বিপ্লবের ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। বঙ্গ-বিভাগের ফলে দেশে যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল বিপ্লবী নায়কেরা তাহার সুযোগ লইতে অবহেলা করেন নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ইংরাজের শত্রুশক্তির সহায়তাও তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছাতন্ত্রের সর্বপ্রধান সহায় দেশীয় সৈন্যদলকেও তাঁহারা সিপাহী বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে তাঁহারা বিদেশী রাজশক্তির উচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। সে কৃতিত্ব আপাতঃদৃষ্টিতে গান্ধীজির। বিপ্লবের কঠিন ব্রত গ্রহণ করিবার সাহস ও শক্তি সকলের ছিল না। বিপ্লবের আহ্বান দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের নিকট পৌঁছায় নাই। কৃষক ও শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের লোকেরা সে বিপ্লবী-দিগকে শৌর্য ও সাহসের জন্য শ্রদ্ধা করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের কঠিন ব্রতের উদ্দেশ্য তাহারা বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু গান্ধীজির আদর্শ বুঝিতে তাহাদের কষ্ট হয় নাই। চম্পারণের কৃষক আন্দোলনে, লবণের আইন অমান্য আন্দোলনে তাই ভারতের মৌন জনবল (ইংরাজের mute millions) উদাসীন থাকে নাই। বিপ্লবীরাও অনেকে নীতি হিসাবে গান্ধীজির আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

তথাপি মনে হয় বুড়িবালামের যুদ্ধ না হইলে, চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত না হইলে, সুভাষচন্দ্র পরিচালিত জাতীয় সেনাদল ভারতের পূর্বোত্তর

সীমান্তে উপস্থিত না হইলে কেবল অহিংস আন্দোলনের ফলে ইংরাজ ভারত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হইত কিনা সন্দেহ। বিপ্লবীরা বুকের রক্ত দিয়া ক্ষেত্র তৈয়ার করিয়া না রাখিলে কি গান্ধীবাদ ফলপ্রসূ হইত? এ প্রশ্নের উত্তর ভবিষ্যতের ইতিহাসকার দিবেন। এই প্রশ্নের আলোচনা করিবার উপযুক্ত সময় এখনও আসে নাই। কিন্তু একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না যে, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বাঙ্গালার বিপ্লবী বীরেরা এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুপ্রকাশ রায় এই ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। যাঁহারা যশের আকাঙ্ক্ষা, খ্যাতির ইচ্ছা সর্বথা বর্জন করিয়া দেশের সেবায় সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ইতিহাস সঙ্কলন করা বড় কঠিন। কারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে আপনাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়াই ছিল তাঁহাদের ব্রত। বাহ্য আচরণে তাঁহারা স্বদেশপ্রীতিও গোপন রাখিতে সচেষ্ট থাকিতেন, স্বদেশী আন্দোলনের যুগেও কোন কোন বিপ্লবী কেবল মন্ত্র গুপ্তির উদ্দেশ্যেই বিলাতী কাপড় পরিতেন। তাঁহাদের এই গুপ্ত সাধনা জাতির অমূল্য সম্পদ্। তাহার ইতিহাস ভুলিলে জাতির অকল্যাণ হইবে। সুতরাং রামায়ণ-মহাভারতের মত ভারতের বিপ্লবী বীরগণের কীর্তিগাথাও যেন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে প্রত্যহ পঠিত হয়। বাঙ্গালী লেখক উনবিংশ শতাব্দীর শেষে রাজপুতানায় ও মহারাষ্ট্রে আদর্শ বীরের সন্ধান করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে যে মহাবীরেরা হৃদয়-শোণিতে মাতৃপূজার বোধন করিয়াছিলেন, তাঁহারা কোন দেশের কোন যুগের কোন বীরের তুলনায় ছোট নহেন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন

MEMBER *of the Central Committee, and*
PRESIDENT *of the West Bengal State Committee*
For
HISTORY OF THE FREEDOM MOVEMENT OF INDIA

লেখকের কথা

পঁয়ত্রিশ বৎসরের সুদীর্ঘ বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। মত ও পথ ভিন্ন হইলেও ভারতের বিপ্লববাদ ভারতের জাতীয় আন্দোলনেরই সৃষ্টি। গোড়ার দিকের ও পরবর্তী সময়ের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনের জন্যই এক সময়ে বিপ্লববাদের জন্ম হইয়াছিল। ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে আপসহীন সংগ্রামের পথ এবং পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্মত্যাগের আদর্শ তুলিয়া ধরাই ছিল সেই ঐতিহাসিক কর্তব্য। সেই কর্তব্য সম্পাদন করিয়াই বিপ্লববাদ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, বিপ্লববাদ ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে আরও বহুদিক হইতে প্রভাবান্বিত করিতে এবং শক্তিশালী করিয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছিল। বিপ্লববাদ যেমন জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়াছিল, সেইরূপ বিভিন্ন স্তরে ইহা নিজেও জাতীয় আন্দোলন হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়াছিল। এইভাবে ইহা জাতীয় আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য ও বিশিষ্ট অংশে পরিণত হইয়াছে। তাই আজ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের যে ইতিহাস নূতন করিয়া রচিত হইতেছে তাহাতে বিপ্লববাদ যোগ্য স্থান দাবি করে।

দুঃখের বিষয়, ভারতের পঁয়ত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার চেষ্টা সামান্যই হইয়াছে। বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে কয়েকখানি ইতিহাস রচিত হইয়াছে তাহার প্রায় সবগুলিই কেবল স্থানীয় সংগ্রামের ইতিহাস। সেইগুলির মধ্যেও হেমচন্দ্র কানুনগো প্রণীত 'বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা', শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল রচিত 'বন্দী জীবন' (দুই খণ্ড) এবং নলিনীকিশোর গুহ রচিত 'বাংলায় বিপ্লববাদ'—এই তিনখানি গ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকই ইতিহাস হিসাবে গ্রহণযোগ্য নহে। এই অভাব পূরণের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় সমগ্র ভারতের বৈপ্লবিক

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করিয়াছি। বৈপ্লবিক ঐতিহ্য, যে ঐতিহাসিক অবস্থায় এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে ভারতের বিপ্লববাদের জন্ম অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছিল সেই অবস্থা ও কারণসমূহ, বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর, জাতীয় আন্দোলনের সহিত ইহার সম্পর্ক, ইহার অবসানের রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণসমূহ এবং ইহার ঐতিহাসিক স্থান নির্দেশ ও রাজনৈতিক-সামাজিক মূল্য নিরূপণের চেষ্টা এই গ্রন্থে করা হইয়াছে। বৈপ্লবিক সংগ্রাম জাতীয় আন্দোলনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য ও বিশিষ্ট অংশ বলিয়া ইহাতে বিভিন্ন স্তরের বৈপ্লবিক সংগ্রামের পটভূমিকা হিসাবে জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন সমসাময়িক স্তর এবং পরিশেষে ভারতব্যাপী "আগস্ট-সংগ্রাম"-এর বিবরণসহ জাতীয় আন্দোলনের শেষ স্তরের আলোচনা করা হইয়াছে।

তথ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। আমি নিজে এক সময়ে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সহিত যুক্ত ছিলাম বলিয়া এই সম্বন্ধে কিছু তথ্য আমার জানা ছিল। বন্দীশিবিরে থাকাকালে কয়েকজন বিশিষ্ট বিপ্লবী নায়কের সহিত আমার আলোচনা করিবারও সুযোগ ঘটিয়াছিল। তারপর এই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য লইয়া বহু দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও সরকারী রিপোর্ট সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে তথ্য সংগ্রহ করি। এই সকল পুস্তক-পুস্তিকা ও রিপোর্টের তালিকা গ্রন্থের শেষে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিপ্লবী নায়কদের অনেকের এবং অনেকগুলি পুস্তকের তথ্য ও মত পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হইয়াছে। অনেকগুলি পুস্তক কোন না কোন বৈপ্লবিক দলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য রচিত বলিয়া ঐগুলির মধ্যে পক্ষপাতিত্ব-দোষ দেখা যায়। এমন কি, বিপ্লবী নায়কদের কেহ কেহ নিজেদের রচিত পুস্তকের তথ্য সমূহও পরে অস্বীকার করিয়াছেন এবং ভিন্নরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন। সরকারী রিপোর্ট সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ঐগুলি অসম্পূর্ণ ও কদর্থযুক্ত বটে, কিন্তু সকল দলের প্রতি সমান মনোভাব সম্পন্ন বলিয়া উহাতে কোন দলকে বড় ও কোন দলকে ছোট করিবার চেষ্টা নাই। এইজন্য আমি কোন বিশেষ গ্রন্থ বা সরকারী রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া সংগৃহীত তথ্যসমূহ যথাসম্ভব যাচাই করিয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছি।

কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে অসম্পূর্ণতা-দোষ ও বহু ভ্রম-প্রমাদ থাকা অসম্ভব নহে। ইহার কারণ, প্রথমতঃ, বৈপ্লবিক সংগ্রাম সম্পূর্ণ গোপনভাবে চলিত বলিয়া ইহার বহু তথ্য নেতৃবৃন্দের কয়েকজন ব্যতীত অন্য কেহ কখনও জানিতে পারে নাই, এইজন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইতে বাধ্য ; দ্বিতীয়তঃ, গোপনতার জন্য ইহার তথ্যাবলী কখনও লিখিত আকারে রাখা হইত না এবং পরে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে তাহা স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া ও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া রচিত বলিয়া উহাদের অনেকগুলিতে যথেষ্ট ভুল এমন কি বিকৃতিও রহিয়াছে। কাজেই এই সকল পুস্তকের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত সকল ইতিহাসেই যথেষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও ভ্রম-প্রমাদ থাকিতে পারে। কোন সহৃদয় পাঠক কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখাইলে পরবর্তী সংস্করণে তাহা সংশোধন করা হইবে।

প্রথম বৈপ্লবিক যুগের অন্যতম নায়ক শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, এবং পরবর্তী বৈপ্লবিক যুগের বিশিষ্ট কর্মী শ্রীব্রজহিরী বর্মণ, শ্রীসুরেশচন্দ্র দাসগুপ্ত, শ্রীপ্রসাদ উপাধ্যায়, শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীত্রৈলক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট হইতে বহু মূল্যবান পরামর্শ ও সাহায্য না পাইলে এই গ্রন্থ রচনা কখনই সম্ভব হইত না।

কলিকাতা
১২ই এপ্রিল, ১৯৪৯

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ড

চতুর্থ খণ্ড

দ্বিতীয় অধ্যায় : বঙ্গদেশে তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯২৮—১৯৩৪)

এযুগের বৈশিষ্ট্য : (১) হতাশা ও আর্থিক সংকটের পরিণতি (২) সাংগঠনিক পরিবর্তন (৩) বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারী (৪) সমাজবাদী ভাবধারা (৫) 'রিভোল্ট' বা 'এড্ভান্স' দল—নূতন বৈপ্লবিক সংগঠন—'রিভোল্ট গ্রুপের' সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা—মেছুয়াবাজার-ষড়যন্ত্র। ১৯৩০ খৃস্টাব্দ : চট্টগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম : বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন—অভ্যুত্থানের আয়োজন—অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন—"অস্থায়ী স্বাধীন সরকার"—পশ্চাৎ অপসরণ—জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ—গেরিলা-যুদ্ধের সিদ্ধান্ত—কালারপোলের যুদ্ধ—চন্দননগরের সংঘর্ষ—বৈপ্লবিক আলোড়ন—যুগান্তর সমিতির পরিকল্পনা—টেগার্ট হত্যার চেষ্টা—ডালহৌসি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র-মামলা—লোম্যান হত্যা—রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ : কর্ণেল সিমসন হত্যা—ব্যর্থ ষড়যন্ত্র—রাজনৈতিক ডাকাতি—গুপ্তহত্যা ও হত্যার চেষ্টা—দমননীতি। ১৯৩১ খৃস্টাব্দ : ডাকাতি ও লুণ্ঠন—পেডি হত্যা—গালিক হত্যা—ডিনামাইট-ষড়যন্ত্র—ক্যাসেল হত্যার চেষ্টা—আশানুল্লা হত্যা—ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণো হত্যার চেষ্টা—ভিলিয়ার্স হত্যার চেষ্টা—ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্স্ হত্যা—অন্যান্য হত্যা ও হত্যার চেষ্টা। ১৯৩২ খৃস্টাব্দ : রাজনৈতিক ডাকাতি ও লুণ্ঠন—গুপ্তহত্যা—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচার—ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা—ধলঘাটের যুদ্ধ—ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা—পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হত্যা—য়ুরোপীয়ান ইনস্টিটিউট আক্রমণ—গভর্ণর হত্যার চেষ্টা—অন্যান্য হত্যার চেষ্টা। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দ : রাজনৈতিক ডাকাতি ও লুণ্ঠন—গৈরালার যুদ্ধ, সূর্য সেনের গ্রেপ্তার—চন্দননগরে সশস্ত্র সংঘর্ষ—গহিরার সংঘর্ষ—কলিকাতায় সশস্ত্র সংঘর্ষ—ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা—অস্ত্রাগার আবিষ্কার—দেওভোগের সংঘর্ষ—সশস্ত্র স্টেশন ডাকাতি—দমননীতি ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ : ইংরেজ-সাহেবদের উপর আক্রমণ

একাদশ

পঞ্চম খণ্ড

প্রথম খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকা

ভারতীয় শিল্পের বিকাশ

ভারতের ইতিহাসের যুগান্তকারী সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের সূচনা হয়। সেই আন্দোলন হইতেই জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম। ইহা ইংরেজ-শাসনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের নবজাত ধনিক-শ্রেণী ও উন্নত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসেরই অনিবার্য পরিণতি। ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহার ভিতর হইতেই এই দুই শ্রেণীর জন্ম। কিন্তু জন্মের পর হইতেই বিদেশী ইংরেজ-রাজের কায়েমী স্বার্থের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া উঠে। তাই এই দুই শ্রেণীর ইতিহাস ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

ইংরেজদের 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ভারতের পশ্চিম উপকূলে ঘাঁটি করিয়া এদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য জাঁকাইয়া তোলে এবং সেই ব্যবসায়-বাণিজ্যের মধ্য দিয়া 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'র দেশীয় গোমস্তারা বিভিন্ন দেশের সহিত নিজেদের স্বাধীন ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে থাকে। প্রথমে তাহারা কাঁচা তুলা ও আফিম-রপ্তানির ব্যবসায় শুরু করে। এই ব্যবসায়ীরা পশ্চিম উপকূলের অধিবাসী পার্শী সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথমে ইহারা ছিল য়ুরোপীয় বণিকদের স্থানীয় গোমস্তা, তাহাদের কাজ ছিল, "তাহাদের (য়ুরোপীয় ব্যবসায়ীদের) পণ্য এদেশের বাজারে বিক্রয় ও তাহাদের জন্য এদেশের পণ্য সংগ্রহ করা।" এইভাবে পার্শী

সম্প্রদায়ের বহু লোক য়ুরোপীয় বণিকদের গোমস্তা হিসাবে কাজ করিয়া এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের নিজস্ব স্বাধীন ব্যবসায়ের মধ্য দিয়া বিপুল ধন-সম্পদ সঞ্চয় করে।(১) "এই সময়ে চীনের সহিত বাণিজ্য ছিল সর্বাপেক্ষা বেশী লাভজনক, আর আফিমের ব্যবসায়ই ছিল প্রধান ব্যবসায়। পার্শীরাই প্রথম চীনের সহিত বাণিজ্য শুরু করে।"(২)

'আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ' শুরু হইবামাত্র ভারতীয়দের এই ব্যবসায় দ্রুত বাড়িয়া যাইতে থাকে। আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকগণ আমেরিকা হইতে তূলা আমদানি করিত। 'গৃহ-যুদ্ধে'র সময় আমেরিকার তূলা-রপ্তানি প্রায় বন্ধ হইয়া যায় এবং তাহার ফলে তূলার অভাবে বৃটিশ বস্ত্রশিল্প প্রায় অচল হইয়া পড়ে। আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধ শুরু হইবামাত্র "বোম্বাইয়ের বুদ্ধিমান ব্যবসায়ীরা আমেরিকার আকাশের এই দাগটির (আমেরিকার গৃহ-যুদ্ধের সম্ভাবনার) তাৎপর্য নির্ভুলভাবেই বুঝিতে পারে, কাজেই তাহারা উল্লসিত হইয়া উঠে। তাহারা এই ভাবিয়া ভবিষ্যতের একটি উজ্জ্বল চিত্র কল্পনা করে যে, শীঘ্রই যুদ্ধ বাধিতে পারে এবং তাহার ফলে ভারতীয় তূলার জন্য ল্যাঙ্কাশায়ারের চাহিদা হইবে বিপুল ও অফুরন্ত।"(৩) সত্যই এই গৃহ-যুদ্ধের ফলে তূলার জন্য ইংলণ্ডকে বাধ্য হইয়া বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীদের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ভারতীয় তূলার রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। "ইংলণ্ডের লিভারপুল বন্দরে তূলা-রপ্তানি হইতে যে মোটা মুনাফা আয় হইল তাহার সর্বাপেক্ষা বেশী অংশ গেল বোম্বাইয়ের তূলা-ব্যবসায়ীদের ভাগে।" ডি. ই. ওয়াচা তাঁহার গ্রন্থে হিসাব দিয়াছেন যে, বোম্বাইয়ের তূলা-ব্যবসায়ীদের মোট মুনাফা হইয়াছিল একান্ন কোটি টাকা।(৪)

(১) S. Upadhyay : "Growth of Industries in India," P.45+46.
(২) D E. Wacha : "A Financial Chapter in the History of Bombay," P. 3
(৩) D. E, Wacha : "A Financial Chapter in the History of Bombay", P. 28+29.
(৪) S. Upadhyay : "Growth of Industries in India," P. 46+47.

১৮৫৬ খৃস্টাব্দে সি. এন. দাভার নামে এক ব্যক্তি বোম্বাইশহরে একটি সূতাকল স্থাপন করেন। ইহাই প্রথম ভারতীয় তুলাশিল্প। গোড়ার দিকে ভারতীয় তুলাশিল্পের প্রসারের গতি ছিল খুবই মন্থর। ১৮৬৬ খৃস্টাব্দে সূতা-কলের সংখ্যা ছিল মাত্র তের। কিন্তু ইহার পর হইতে এই শিল্প দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলে। ইতিমধ্যেই বোম্বাইয়ের ব্যবসায়ীরা যে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে তাহাদ্বারা এবার তাহারা বোম্বাইপ্রদেশে নূতন নূতন কল স্থাপন করিতে শুরু করে।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে সূতা-কলের সংখ্যা দাঁড়ায় একান্নটি। এই কলগুলির অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাইশহর-অঞ্চলে, বাকী অর্ধেক স্থাপিত হয় বোম্বাইপ্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে। "এখন হইতে বোম্বাই-প্রদেশকে দেখিতে হইবে শিল্পের দেশ হিসাবে, আর বোম্বাইদ্বীপকে (বোম্বাই-শহরকে) দেখিতে হইবে ঐ শিল্পের উন্নততর বিকাশের ক্ষেত্র হিসাবে।"(১) বোম্বাইশহরের বাহিরে সূতাশিল্পের অন্যান্য কেন্দ্র হইল আমেদাবাদ, শোলাপুর, কানপুর, মাদ্রাজ ও কলিকাতা। বোম্বাইপ্রদেশের বাহিরে বৃহত্তম কাপড়ের কল ১৮৭৪ খৃস্টাব্দে নাগপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই হইল নাগপুরের বিখ্যাত 'এম্প্রেস মিলস'। ইহার মালিক হইলেন জে. এন. টাটা। বোম্বাইপ্রদেশেই সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হইবার কারণ এই যে, ইহার পক্ষে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বোম্বাইপ্রদেশের সুবিধা ছিল অনেক বেশী; কারণ গোড়ার দিকে কলগুলিতে কেবল সূতাই প্রস্তুত হইত এবং এই সূতার অধিকাংশ চীনের তাঁতশিল্পের জন্য বোম্বাই হইতে জাহাজযোগে চীনে প্রেরিত হইত। তখন এই সুবিধা ভারতের অন্য কোন শহরের ছিল না।

১৮৯৪ খৃস্টাব্দে এই সকল কলের সংখ্যা বাড়িয়া হয় একশত সাতাশটি এবং মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল এগার কোটি একষট্টি লক্ষ টাকা। এই সকল কলের মোট শ্রমিকসংখ্যা ছিল এক লক্ষ ষোল হাজার। এই সময়ের মধ্যে এই শিল্পের প্রসার খুব দ্রুত না হইলেও ইহার গতি কোন সময়েই ব্যাহত হয় নাই, আর

(১) Gazetteer of Bombay City and Island—Vol 1, P—490.

ইতিমধ্যে কোন বড় রকমের শিল্প-সংকটও দেখা দেয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যে একটা ঘটনার ফলে এই শিল্প একটা নূতন মোড় ঘুরিতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে এই সূতাশিল্প ক্রমবিকাশের আর একধাপ অগ্রসর হয়।

এতদিন প্রাচ্যের অন্যতম জাগরণশীল দেশ জাপান ভারতীয় কলে প্রস্তুত সূতা ক্রয় করিয়া নিজ দেশে বস্ত্র উৎপাদন করিত। "এবার জাপান নিজেই সূতা প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার ফলে ভারতের সূতা-রপ্তানি বিশেষভাবে হ্রাস পায়। জাপান এবার ভারতীয় সূতার বদলে ভারতীয় তূলা ক্রয় করিতে শুরু করে। সুতরাং 'বোম্বাইয়ের কলের মালিকেরাও সূতার উৎপাদন বন্ধ করিয়া অন্য কিছুর দিকে মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়। তাহার ফলে সূতা-রপ্তানি বাধাপ্রাপ্ত হইলেও এই শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হইল না'।"(১) অর্থাৎ সূতা-কলগুলি এবার তাহাদের নিজেদের প্রস্তুত সূতা দ্বারা কাপড় তৈরী করিতে শুরু করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে কলের সংখ্যা বাড়িয়া হয় একশত ছাপান্নটি। আর ইহাদের মোট মূলধনের পরিমাণ বাড়িয়া হয় চৌদ্দ কোটি উনিশ লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সময়ে বোম্বাইপ্রদেশে ভয়ংকর প্লেগ রোগ ব্যাপকভাবে দেখা দেওয়ার ফলে শ্রমিকেরা শহর ছাড়িয়া গ্রামাঞ্চলে পলায়ন করে। ইহার ফলে ভারতের বস্ত্রশিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ইহার ফলেই আবার গ্রামাঞ্চলের তাঁতশিল্প শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে প্লেগের প্রাদুর্ভাব দূরীভূত হইলে শ্রমিকগণ আবার শহরে ফিরিয়া আসে এবং বোম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প আবার দ্রুত প্রসার লাভ করিতে থাকে। ১৯০৬ খৃস্টাব্দেই কলের সংখ্যা বাড়িয়া হয় দুই শত চারিটি আর উহার মোট মূলধনের পরিমাণ হয় সতের কোটি উনিশ লক্ষ টাকা।

কিন্তু ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের অপেক্ষাকৃত সস্তা বস্ত্র ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলিতে থাকে। তাহার ফলে অপেক্ষাকৃত বেশী দামের ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়। (ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের মালিকদের সহিত ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মালিকদের যে স্বার্থের সংঘাত অনেক পূর্বেই শুরু

(১) S. Upadhyay: "Growth of Industries in India,' P. 49—50.

হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ আরও ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। এই স্বার্থের সংঘাত ক্রমশঃ রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। এই সংগ্রামই ভারতে জাতীয়তাবোধের বিকাশের অন্যতম প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে 'বঙ্গভঙ্গ' উপলক্ষে যে বিরাট স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়, বিলাতী পণ্য, বিশেষ করিয়া বিলাতী বস্ত্র-বর্জন (বয়কট) তাহাতে প্রধান স্থান গ্রহণ করে। কংগ্রেস দ্বারা প্রবর্তিত এই বয়কট-আন্দোলন ভারতীয় শিল্পের প্রসারের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়।) এই আন্দোলনের মধ্যেই নূতন নূতন কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাঁতশিল্পও বাড়িয়া উঠে।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প স্বদেশী আন্দোলনের নিকট বিশেষভবে ঋণী। এমন কি সরকারী বিবরণীতেও এই কথা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে যে, "সম্প্রতি ভারতের বিভিন্ন অংশে যে 'স্বদেশী আন্দোলন' দেখা দিয়াছে তাহা স্থানীয় শিল্পের বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।"(১)

বৃটিশ মালিকগোষ্ঠীর বিরোধিতা

ভারতবর্ষে যে সকল শিল্প গড়িয়া উঠে তাহার মধ্যে একমাত্র বস্ত্রশিল্পই ছিল ভারতীয় মালিকদের অধিকারে। এই শিল্প এবং ভারতীয় মালিকশ্রেণীর জন্ম ও ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ডের প্রবল প্রতাপান্বিত বস্ত্রশিল্পপতিদের মধ্যে এক ভয়ংকর আতংক দেখা দেয়। প্রথম হইতেই ভারতীয় শিল্পের প্রসার রোধ করিবার জন্য তাহারা চীৎকার শুরু করে এবং ইহার অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য তাহারা ভারত-সরকারকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। তাহাদের চাপে (ভারত-সরকার দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর চড়াহারে কর বসাইয়া দেশীয় শিল্পের প্রসারে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।) ১৮৫২ খৃস্টাব্দেই ইংলণ্ডের পশমী, তুলাজাত ও রেশমী বস্ত্র, সূতা ও বিভিন্ন ধাতুদ্রব্যের আমদানি-শুল্ক যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস করিয়া ভারতের বাজার দখল করিবার জন্য ইংরেজ-বণিকদের সুবিধা করিয়া দেওয়া

(১) Gazetteer of Bombay City and Island," P. 490.

হয়। অন্যদিকে যাহাতে ভারতের কাঁচা মাল সহজেই ইংলণ্ডে প্রেরণ করা যায় তাহার জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থা করা হয়। ইহার ফলে একদিকে বৃটিশ পণ্য ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে এবং তাহার ফলে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, অপর দিকে ভারতের কাঁচা মাল সস্তায় লাভ করিয়া বৃটিশ শিল্প দ্রুত বাড়িয়া উঠে।(১) এই উদ্দেশ্যেই ভারতের ইংরেজ-সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতি গ্রহণ করে। এই অবাধ বাণিজ্যের নীতির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া ইংরেজ-অর্থনীতিবিদ বুকানন সাহেব বলেন :

"অবাধ বাণিজ্যই ছিল ভারত-সরকারের সুপরিকল্পিত নীতি, এই নীতি দ্বারা বৃটিশ ব্যবসায় ও শিল্পের জন্য ভারতের বাজার সুরক্ষিত করা হইয়াছিল। ভারতীয় শুল্কের ইতিহাসে ম্যাঞ্চেস্টারের মালিকগোষ্ঠীর প্রভাব গভীর দাগ কাটিয়া রাখিয়াছে। ইংলণ্ডের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাঙ্ক-মালিক ও জাহাজ-ব্যবসায়ীদের স্বার্থে ভারতীয় বাজার সংরক্ষিত করিবার জন্যই তাহারা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে।"(২) ভারত-সরকারের মুদ্রানীতি এবং সমগ্র আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যেও এই উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারত-সরকার অবাধ বাণিজ্যের নীতিই অনুসরণ করিয়া চলে। এই অবাধ বাণিজ্য-নীতির ফলে বৃটিশ পণ্য অবাধে ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে, আর ভারতের নবজাত শিল্পের পণ্য সস্তা দামের বৃটিশ পণ্যের সহিত প্রতিযোগিতায় দাঁড়াইতে না পারিয়া বাজার হারায়। ইহার ফলে ভারতের নবজাত শিল্প বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এবং উহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। উক্ত সময়ে বিদেশী পণ্যের আমদানির উপর সাধারণভাবে শতকরা দশ টাকা হারে শুল্ক বসান ছিল, কিন্তু বৃটিশ পণ্যকে এই শুল্কের বাধা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য ইহার উপর নামমাত্র শুল্ক বসান হয়। ভারতবর্ষের বিশাল বাজার হইতে ভারতের ও অন্যান্য দেশের পণ্য হটাইয়া দিয়া ইহাকে

(১) Reginald Reynolds : "White Shahibs in India," P. 109—110.

(২) D. H. Buchanan : 'The Development of Capitalist Enterprise in India', P. 464—65.

বৃটিশ পণ্যের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করাই ছিল এই নীতির একমাত্র উদ্দেশ্য।

১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী-বিদ্রোহ দমনের খরচ মিটাইতে গিয়া যখন ভারত-সরকারের বাজেটে বিরাট ঘাটতি দেখা দেয় তখন ভারত-সরকার বৃটিশ পণ্যের আমদানির উপরেও সামান্য শুল্ক বসাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ করিয়া, অর্থাৎ শুল্ক রদ করাইবার জন্য ম্যাঞ্চেস্টারের মালিকগোষ্ঠী ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ করে তাহার নিকট ভারত-সরকার মাথা নত করিতে বাধ্য হয় এবং ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠীকে শান্ত করিবার জন্য ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসারের পক্ষে অপরিহার্য লম্বা আঁশযুক্ত তুলার আমদানির উপর শতকরা পাঁচ টাকা হারে শুল্ক বসায়। ভারতবর্ষে লম্বা আঁশ-যুক্ত তুলা জন্মে না বলিয়া ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হইত। ইহার আমদানিতে বাধা দেওয়ার অর্থ হইল ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করা। কিন্তু ইহাতেও ম্যাঞ্চেস্টারের ধনিকগোষ্ঠী শান্ত হইল না, তাহারা আরও জোর আন্দোলন চালাইতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে তৎকালীন বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক্ ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১৮৭৮ খৃস্টাব্দে কয়েকটি বৃটিশ পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক তুলিয়া লওয়া হয়, এবং ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ভারত-সরকার মদ ও লবণ ব্যতীত ইংলণ্ডের বস্ত্র ও অন্যান্য সকল পণ্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক সম্পূর্ণ তুলিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেও বৃটিশ মালিকগোষ্ঠী সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভারতীয় শিল্পের প্রসার বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর চড়াহারে উৎপাদন-কর বসাইবার জন্য প্রবলভাবে চাপ দিতে থাকে। ইহার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, ভারত-সরকার সকল দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের উপর বসান উৎপাদন-কর শতকরা সাড়ে তিন টাকা হইতে বাড়াইয়া পাঁচ টাকায় পরিণত করে।(১

(১) S. Upadhyay: "Growth of Industries in India," P. 52-53.

এই বর্ধিত করভার ও বৃটিশ পণ্যের অবাধ আমদানি একত্রে মিলিয়া ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। মাদ্রাজে ও সমগ্র দাক্ষিণাত্যে এই করভার কিভাবে ভারতীয় শিল্পের শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল তাহার একটি নগ্নচিত্র জনৈক ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেটের সাক্ষ্য হইতেই পাওয়া যায়:

"এই করভার চাষী ব্যতীত সকলের উপরেই চাপান হইয়াছিল।...... এমনকি যে বৃদ্ধা বাজারে গিয়া রাস্তার এক কোণে বসিয়া শাক-সব্জি বিক্রয় করে তাহার উপরেও কর বসান হইয়াছে।......কিন্তু কোন ইংরেজ-ব্যবসায়ীর উপর কোন কর বসান হয় নাই। যদি কোন লোক বছরে কয়েকটা টাকাও আয় করে তবে তাহাকেও কর দিতে হয়, কিন্তু তাহার পাশের বাড়ীর যে ইংরেজ-বণিক শত শত টাকা আয় করে তাহাকে কোন কর দিতে হয় না।"(১)

এইভাবে "ভারতের নবজাত শিল্পের উপর কর বসান, রেলপথ ও অন্যান্য যানবাহন শিল্পে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের একচেটিয়া প্রভুত্ব রক্ষা করা এবং সাধারণভাবে ভারতীয় ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক বিকাশে বাধা দেওয়ার নীতি গ্রহণ করিয়া ইংরেজ-রাজ দেশীয় মালিকদের রাজনৈতিক সংগ্রামের পথ বাছিয়া লইতে বাধ্য করে।"(২)

১৮৮০ খৃস্টাব্দের মধ্যেই একটা বিপুল পরিমাণ ভারতীয় মূলধন গড়িয়া উঠে এবং সেই মূলধন প্রধানতঃ তুলা ও পাট শিল্প, আন্তঃ-প্রাদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে লগ্নি করিয়া ভারতীয় মালিকগণ ভারতের অর্থনীতি-ক্ষেত্রে ইংরেজ-ধনিকশ্রেণীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেয়। তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর দ্বারা ভারতীয় জনবল ও ধন-সম্পদ শোষণে বাধাদান। কারণ ইহা ব্যতীত ভারতীয় মালিকদের আত্মরক্ষা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার অন্য কোন পথ ছিল না।

(১) Evidence of I.W.B. Dykes, House of Commons Fourth Report.
(২) Joan Beauchamp: "British Imperialism in India", P. 164.

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী

ইংরেজ বণিক-রাজের ভারত-শোষণের প্রধান উপায় ছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য। তাহারা একদিকে ক্রমবর্ধমান হারে ভারতের কাঁচা মাল ইংলণ্ডে পাঠাইতে থাকে, অপর দিকে ইংলণ্ডের উন্নত কল-কারখানায় তৈরী পণ্য দিয়া ভারতের বাজার ছাইয়া ফেলে। ইংরেজ বণিক-রাজের এই 'ব্যবসায়'-এর মধ্য দিয়া ভারতের সমাজে দেখা দেয় একটি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী। কেরানী-কর্মচারী, ছাত্র প্রভৃতিরা সেই মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এতদিন ইংরেজেরা খাস ইংলণ্ড হইতেই কেরানী-কর্মচারী আমদানি করিয়া তাহাদের ব্যবসায়ের প্রয়োজন মিটাইত। কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশঃ বাড়িয়া বিপুল আকার ধারণ করিবার ফলে এত বেশী কেরানী-কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দেয় যে, ইংলণ্ড হইতে ইহাদের আমদানি করা অসম্ভব হইয়া উঠে। কাজেই তাহারা এবার এদেশের লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া যথেষ্ট সংখ্যক কেরানী-কর্মচারী তৈরী করিবার ব্যবস্থা করে। শাসকগণ এই উদ্দেশ্যে এদেশে ইংলণ্ডের ধরনে উন্নত আধুনিক শিক্ষার প্রচলন করিতে শুরু করে। ভারতবর্ষে এই ধরনের আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রথম প্রচলন হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। তখন হইতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে বহু স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী-প্রধান বাংলাদেশেই এই শিক্ষার প্রসার হয় সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বাংলাদেশে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়।

শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সংকট

"যে নীতি দ্বারা 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি' ভারতের জনসাধারণের মধ্য হইতে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে শিক্ষিত একটি বিশিষ্ট শ্রেণী গঠনের প্রয়াস পাইয়াছিল, ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক উৎপত্তি ও তাহাদের বিক্ষোভ সেই নীতিরই অনিবার্য পরিণতি। শাসন-বিভাগের যে সকল পদ

ইংরেজদের পক্ষে যথেষ্ট সম্মানজনক বা অর্থকরী নয়, সেই পদগুলি পূর্ণ করাই ছিল এই বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটিকে গড়িয়া তোলার পিছনের উদ্দেশ্য। চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রয়োজনাতিরিক্ত 'বাবু' (কেরানী) সরবরাহের ব্যবস্থা দ্বারা সরকার কেরানীদের শ্রমের খরচ (বেতনের হার) সকল সময়ে নিম্নমুখী করিয়া রাখিয়াছিল।"(১)

ইংরেজ-রাজের সর্বব্যাপী শোষণ গভীরতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে স্বল্প বেতনের কেরানীদের দুর্দশাও ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতে থাকে। ইহার উপর প্রতিবৎসর শত শত ছাত্র স্কুল-কলেজ হইতে বাহির হইয়া শিক্ষিত বেকারের দল ভারী করিয়া তোলে। ক্রমশঃ শিক্ষিত যুবকের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পায় যে, তাহাদের সকলের চাকুরি লাভের সম্ভাবনা লোপ পায়, সুতরাং বেকারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়িয়া চলে। কারণ, "শাসন-বিভাগের লাভজনক উচ্চপদগুলি ইংলণ্ড হইতে আমদানি-করা ইংরেজদের একচেটিয়া হইয়া রহিয়াছে, আর অন্য চাকুরির দরজাও তাহাদের নিকট বন্ধ। তাহাদের বড় একটা অংশ গেল আইন পড়িতে, কিন্তু শীঘ্রই যুবক-উকিলের সংখ্যা মোট মামলা-মকদ্দমার সংখ্যা ছাড়াইয়া যায় এবং বেকার উকিলে আদালত পূর্ণ হইয়া উঠে।...... অন্য যে সকল চাকুরির দরজা তাহাদের নিকট খোলা ছিল তাহা হইল বিলাতী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মালগুদাম ও সরকারী অফিসের চাকুরি আর কেরানীগিরি। কিন্তু এখানেও কেরানীর চাহিদা অপেক্ষা সরবরাহ অনেক বেশী এবং বেতনের হার অবিশ্বাস্য রকমে নীচু। সুতরাং দীর্ঘকাল ধরিয়া বহু অর্থব্যয়ে শিক্ষা শেষ করিবার পর ভারতীয় ছাত্রগণকে অনিবার্য বেকারীর মুখোমুখী দাঁড়াইতে হয়, না হয় তাহারা কোন অফিসে জীবিকার মান অপেক্ষাও কম বেতনে চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। ইহাই যেন তাহাদের বিধিলিপি।"(২)

(১) Reginald Reynolds : "White Shahibs in India,' P. 113.

(২) Lester Hutchinson : "Empire of the Nabobs", P. 189.

ভারতবর্ষে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, বহু স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইলেও সেই-গুলির শিক্ষকের পদও ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া যায় এবং প্রয়োজনের তুলনায়, শিক্ষকের সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। ইহা ব্যতীত ভারতীয় শিক্ষকদের বেতনের হার ছিল সর্বাপেক্ষা নীচু। তাহার ফলে শিক্ষকদের মধ্যেও চরম আর্থিক দুর্দশা দেখা দেয়। শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্র ভেরিনি লোভেট-এর কথায় "সাধারণ স্তরের স্কুল-শিক্ষকদের সংখ্যা অত্যধিক, তাহাদের বেতন খুবই কম। বাঁচিবার শেষ উপায় হিসাবেই তাহারা এই চাকুরি গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিক্ষোভের অন্ত নাই।"(১)

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে এই বেকার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দুর্দশা চরম আকার ধারণ করে। ইংলণ্ডের আর্থিক সংকট হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইংরেজদের ভারত-শোষণ আরও উগ্র হইয়া উঠে। শাসকগোষ্ঠী তাহাদের আর্থিক সংকটের সকল বোঝা ভারতীয় জনগণের উপর চাপাইয়া দিয়া তাহাদের জীবনধারণের সকল ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে একটা ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ সারা ভারতের উপর স্থায়ী হইয়া বসে। কেবলমাত্র ১৮৭৭ খৃস্টাব্দের দুর্ভিক্ষেই পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ ভারতবাসী প্রাণ দেয় এবং তখন হইতে দুর্ভিক্ষই ভারতের সাধারণ অবস্থায় পরিণত হয়। কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর সম্মুখে ধ্বংসের ছবি ফুটিয়া উঠে।

কৃষকের মতই শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর এই চরম আর্থিক দুর্দশা তাহাদের মধ্যেও একটা ব্যাপক বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্দশা চরম জাতীয়তাবাদের মধ্যে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিতে শুরু করে। তাহারা শীঘ্রই স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, বিদেশী ইংরেজ-শাসনই তাহাদের দুঃখ-দুর্দশা ও জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ। এই বিদেশী শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত করিয়া তোলে। ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের, স্কুল-কলেজগুলি হইয়া উঠে সেই বিদ্রোহের

(১) Vereney Lovett : "History of the Indian National Movement," P. 232.

কেন্দ্রস্থল, আর সেই স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ এক নূতন বৈপ্লবিক মন্ত্রের প্রচারকরূপে কাজ করিতে থাকে। চরম অর্থনৈতিক দুর্দশাই যে সেই বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রধান উৎস তাহা শাসকগোষ্ঠীর মুখপাত্রগণও স্বীকার করিয়াছেন। ঝানু আমলাতান্ত্রিক ভেরিনি লোভেটের কথায়:

"ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, বাংলাদেশের স্কুল-কলেজগুলিতে বৈপ্লবিক ভাবধারা এত ছড়াইয়া পড়িবার আংশিক কারণ হইল এই সকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সামান্য বেতন। ভয়াবহ দারিদ্র ও জ্বালাময়ী ভাষায় লিখিত সাহিত্য দ্বারাই ইহাদের মনোভাব গড়িয়া উঠে। অনেক সময় তাহারা আবার সাংবাদিকতা-বৃত্তি গ্রহণ করে এবং তাহার মারফত তাহাদের এই ভাবধারা প্রচার করিয়া সামান্য জীবিকা উপার্জন করে।" (১)

জাতীয় চেতনার উন্মেষ

এইভাবে ভারতের ইতিহাসের যুগান্তকারী সিপাহী-বিদ্রোহের পর একদিকে বিজয়-গর্বে উন্মত্ত হইয়া ইংরেজ-শাসকগণ ভারতের উপর উৎপীড়ন ও শোষণের বন্যা বহাইয়া দিতে থাকে এবং অপর দিকে ভারতীয় সমাজের সকল দিকে একটা আলোড়ন শুরু হয়। সেই আলোড়নের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এক নূতন ভারতবর্ষের, জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ এক নূতন জাতির জন্ম শুরু হয়।

সিপাহী-বিদ্রোহের মধ্য দিয়া পুরাতন সামন্তশ্রেণীর ইংরেজ-বিরোধিতার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ হইতে চিরপুরাতন ধর্ম ও সংস্কারের বাধাও বিলুপ্ত হইতে থাকে, তাহার পরিবর্তে নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণী, তাহারা সঙ্গে লইয়া আসে বিদেশী শাসকের সর্বগ্রাসী শোষণ হইতে আত্মরক্ষা ও জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এক নূতন চেতনা, একটা নূতন ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি। বিভিন্ন দিক

(১) Vereney Lovett: History of the Indian National Movement. P. 233.

হইতে একটা সংগ্রামের আহ্বান ভারতের আকাশ কাঁপাইয়া তোলে। "গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম নূতন করিয়া শুরু হয়; শহরে আত্মপ্রতিষ্ঠাকামী ভারতীয় ধনতন্ত্র উহার শিল্প-বিকাশের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করিবার সংকল্প লইয়া অগ্রসর হয়; নবজাত শিল্পসমূহের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী বাহির হইয়া শহরের সহিত গ্রামাঞ্চলের সংযোগ সাধন করে এবং ইংরেজি ও সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতর অর্থনৈতিক বিক্ষোভ উগ্র হইয়া উঠে।"(১)

জাতীয়তাবাদের নিম্নোক্ত তিনটি প্রধান উপাদান ইতিমধ্যেই ভারতের সমাজের মধ্যে তৈরী হইয়া গিয়াছে: (১) বিপুল অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রতিনিধি হিসাবে ও ভারতের নিজস্ব শিল্প-বিকাশের ঘোরতর বিরোধী রূপে একটা স্বেচ্ছাচারী ও উৎপীড়ক বিদেশী সরকার; (২) ভারতের ক্রমবর্ধমান মালিকশ্রেণী; এবং (৩) উন্নত ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত ও অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ বিক্ষুব্ধ ভারতীয় বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়। এই তিনটি উপাদান লইয়াই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ভিত্তি গড়িয়া উঠে। উৎপীড়নকারী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয় বিদ্রোহের অগ্রদূতরূপে বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়।

বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়ের বিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশরূপে দেখা দেয় কয়েকখানি নূতন সংবাদ-পত্র। এই সংবাদ-পত্রগুলি তীব্র ভাষায় তীক্ষ্ণ সমালোচনার কষাঘাতে ভারতের ইংরেজ-সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তাহাদের সমালোচনা ইংরেজ-রাজের উৎপীড়ন ও শোষণের বর্বররূপ উদ্ঘাটিত করিয়া জনগণের চোখ খুলিয়া দিতে থাকে। শিক্ষিত সমাজের মধ্যে জাতীয়তার উন্মেষ শুরু হয়।

ইংরেজ-রাজ এই আক্রমণ এবং জাতীয়তাবাদের বাহনস্বরূপ এই সংবাদ-পত্র গুলিকে বেশী দিন বরদাস্ত করিতে পারে নাই। এই সকল সংবাদ-পত্রের কণ্ঠরোধ করিবার উদ্দেশ্যে ইংরেজ-রাজ ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে "দেশীয় প্রেস-আইন"

(১) L. Hutchinson: "Empire of the Nabobs" P. 183.

নামে একটি দমনমূলক আইন পাশ করে। ইহাতে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলির স্বাধীনতা বহুলাংশে খর্ব করা হয়। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলিতে ইংরেজরাজের উপর আক্রমণ সমানভাবেই চলিতে থাকে। এই সময়ে বাংলাদেশে "অমৃতবাজার পত্রিকা", "দি বেঙ্গলী", "হিন্দু প্যাট্রিয়ট"; মাদ্রাজে "হিন্দু"; বোম্বাইয়ে "মারাঠা" ও "কেশরী প্রভৃতি ইংরেজি সংবাদ-পত্রগুলি নির্ভীকভাবে ইংরেজ-রাজের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া দিতে থাকে

এই সকল সংবাদ-পত্রের প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দ্রুত বাড়িয়া চলে এবং এই সংবাদ-পত্রগুলির উদ্যোগেই ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংগঠন গড়িয়া উঠিতে শুরু করে। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশের "দি বেঙ্গলী" নামক ইংরেজি সংবাদ-পত্রের সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল "শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মতের প্রতিনিধিত্ব করা এবং সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা।" এই সংগঠনটি সর্বপ্রথম সরকারী কার্যে ভারতীয়দের সমান অধিকারের দাবি লইয়া ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করে এবং ইহার প্রতিনিধি হিসাবে লালমোহন ঘোষকে ভারতের অনুকূলে ইংলণ্ডের জনমত গঠনের জন্য প্রেরণ করে।

বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উদ্যোগে জাতীয় সংগঠন সৃষ্টির প্রথম প্রচেষ্টা শুরু হয় ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দ হইতে। ঐ বৎসর দেশের সকল শ্রেণীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং মঙ্গল বিধানের উদ্দেশ্য" লইয়া "বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। ১৮৫১ খৃস্টাব্দে এই সংগঠন "বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" নামক আর একটি প্রতিষ্ঠানের সহিত মিশিয়া যায়।(১) এই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটি পর বৎসর ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের নিকট "জাতীয় দাবি" হিসাবে নিম্নলিখিত দাবিগুলি পেশ করে: করভার হ্রাস, শিল্প-বিকাশে সরকারী সাহায্য, শিক্ষার প্রসার, শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের

(১) Ambika Charan Mazumder : "Indian National Evolution", P. 5-6.

ব্যবস্থা, জন-স্বার্থের প্রতিনিধিস্বরূপ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত আইন-সভা, ইত্যাদি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ, লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র, নির্ভীক সাংবাদিক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের মুখপাত্র। ঠিক এই সময়েই বোম্বাইপ্রদেশেও জগন্নাথ শঙ্কর শেঠ, ভি. এন. মাণ্ডলিক, দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতির নেতৃত্বে "বম্বে এসোসিয়েশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গির সংকীর্ণতার জন্য এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। ইহার পরেই বাংলাদেশে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রতিষ্ঠাতা স্বনাম-ধন্য শিশির কুমার ঘোষের উদ্যোগে "বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ", বোম্বাই প্রদেশের মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ের উদ্যোগে পুণাশহরে 'সার্বজনিক সভা' এবং মাদ্রাজে 'নেটিভ এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। মাদ্রাজের এই সংগঠনটি ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে 'মহাজন সভা'র সহিত মিশিয়া যায়। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোনটিই শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইতে না পারিলেও দেশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার পক্ষে এই গুলির দান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রতিষ্ঠান-গুলিই ছিল পরবর্তী কালের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত।

তখন এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজ-রাজের উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জাতীয় জাগরণের সঠিক পথের সন্ধান লাভের জন্য অন্ধকারে ঘুরিতেছিল। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ব্যাপক জাতীয় প্রতিরোধের প্রয়োজন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছিল। এই প্রয়োজনীয়তাবোধই তাহাদের সাংগঠনিক প্রচেষ্টাকে আরও বাড়াইয়া তোলে। বিদেশী ইংরেজ-রাজের উৎপীড়ন ও শোষণ প্রতিদিন বীভৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া দেশের মধ্যে যে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি করে তাহার ফলেই এক সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

১৮৭৭ খৃস্টাব্দে সারা ভারতে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে পঞ্চাশ হইতে ষাট লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়। কিন্তু এই দুর্ভিক্ষের মধ্যেই মহারাণী ভিক্টোরিয়ার "ভারত-সম্রাজ্ঞী" খেতাব গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে কোটি

কোটি টাকা ব্যয়ে এক দরবার বসে। শুধু তাহাই নহে, এই সময়েই ইংরেজ-সাম্রাজ্যবাদীরা তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্য ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে কাবুল আক্রমণ করে। তাহারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপজাতীয় অধিবাসীদের দমনের জন্য সামরিক অভিযান চালাইতে গিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করে এবং ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পের মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে ইংলণ্ডের তূলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে আমদানি-শুল্ক হ্রাস করিয়া ভারতের নূতন বস্ত্র-শিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন করিয়া তোলে। এই সকল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে দেশীয় সংবাদ-পত্রগুলির তীব্র প্রতিবাদ স্তব্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ইংরেজ-রাজ "দেশীয় সংবাদ-পত্র আইন" পাশ করে। এই সকল মিলাইয়া "এক দিকে একটা পতনোন্মুখ মিথ্যা বাজেটের উপর প্রতিষ্ঠিত বেপরোয়া আমলাতান্ত্রিক সরকার ধ্বংসোন্মুখ হইয়া উঠে, এবং অপর দিকে দেশের বিপুল জনসমষ্টি একটা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়িতে থাকে।"(১) ১৮৮৩ খৃস্টাব্দের 'ইলবার্ট-বিল' উপলক্ষ করিয়া এই গণ-বিক্ষোভ দেশব্যাপী একটা বিরাট আন্দোলনের রূপ নেয়। ইংরেজদের ঔদ্ধত্য ও উৎপীড়ন ভারতবাসীর মনে জাতীয় অপমানবোধ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদের ধূমায়িত বিক্ষোভকে দাবাগ্নিতে পরিণত করে।

জাতীয় অপমান

ইংরেজেরা ভারতবর্ষে শাসকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিবার পর হইতেই "কালো চামড়া"র ভারতবাসীদের প্রতি তাহাদের ঘৃণামিশ্রিত আচরণ ও উৎপীড়ন দিন দিন বেপরোয়া হইয়া উঠে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে পরাজিত ভারতবাসীর উপর বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর এই উৎপীড়ন ও বর্বর-সুলভ আচরণ অবাধে চলিতে থাকে। কেবল ব্যক্তিগতভাবে ইংরেজ-কর্মচারীরাই নহে, এমন কি ভারত-সরকারও ভারবাসীদের প্রতি জাতীয় অপমানকর

(১) A. C. Mazumder: "Evolution of Indian National Congress" P. 28—29.

রীতি-নীতি প্রচলন করিতে ইতস্তত করে নাই। ১৮৬৮ খৃস্টাব্দে ভারত-সরকার এই ধরনের এক নূতন নীতি চালু করে। এই নীতি অনুসারে দেশীয় ভদ্র-লোকেরা চটি প্রভৃতি ভারতীয় ধরনের পাদুকা পরিয়া কোন সরকারী দরবার বা উৎসবে যোগদান করিতে পারিতেন না, সরকারী দরবার ও উৎসবে যোগদান করিতে হইলে তাহাদিগকে বুট প্রভৃতি য়ুরোপীয় ধরনের জুতা পরিতে হইত। ভারত-সরকারের এই অপমানকর আচরণ পরবর্তীকালে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

ভারতবাসীদের প্রতি ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ও চা-বাগানের মালিকদের আর একটি বর্বর-সুলভ নিষ্ঠুর আচরণে ভারতবাসীদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। ইংরেজ-সাহেবদের নিকট ভারতীয় শ্রমিক ও সামান্য বেতনের কর্মচারী-দের জীবনের কোন মূল্যই ছিল না, তাহাদের জীবন ছিল ইংরেজ-সাহেবদের খেলার সামগ্রী। ভারতবাসীদের "বাধ্য" ও "সভ্য" করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তাহারা কথায় কথায় গুলি করিয়া ও সবুট পদাঘাতে দেশীয় শ্রমিক ও অল্প বেতনের কর্মচারীদের হত্যা করিতে অভ্যস্ত ছিল। ইহা ছিল অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর একটি দৈনন্দিন ও "তুচ্ছ" ঘটনা। এই সকল হত্যাকারী সাহেবদের বিচার করিবার অধিকার ছিল একমাত্র ইংরেজ-বিচারকদের। তাহাদের বিচারে এই হত্যাকারীরা সামান্য অর্থদণ্ড দিয়াই অব্যাহতি লাভ করিত। ১৮৭৬ খৃস্টাব্দে আগ্রাজিলায় ফুলার নামে এক ইংরেজ-সাহেব একটা তুচ্ছ কারণে তাহার সহিসকে পেটের উপর সবুট পদাঘাত করিয়া হত্যা করে। আগ্রার ইংরেজ-ম্যাজিস্ট্রেট ফুলার সাহেবকে মাত্র ত্রিশ টাকা অর্থদণ্ড করেন এবং গভর্ণর-জেনারেল এই প্রকার আচরণের প্রতি কেবলমাত্র "ঘৃণা" প্রকাশ করিয়াই কর্তব্য শেষ করেন। কিন্তু ভারতবাসীরা এই বর্বর আচরণ নীরবে সহ্য করিল না। ফুলার সাহেবের ঘটনা উপলক্ষ করিয়া সারা ভারতে এক বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশের জাগরণোন্মুখ যুবশক্তি ইংরেজ-সাহেবদের এই ঔদ্ধত্য ও নৃশংসতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। পরবর্তীকালে সন্ত্রাসবাদীদের হস্তে সাহেব হত্যার জন্য জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ-কর্মচারী ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া

বলিয়াছিলেন, "সন্ত্রাসবাদীরা জীবনের কোন মূল্যই দেয় না।"(১) কিন্তু ইংরেজ-সাহেবদের নিষ্ঠুরতা ও অহনীয় ঔদ্ধত্যই যে ভারতের যুবসম্প্রদায়কে নিষ্ঠুর করিয়া তুলিয়াছিল তাহা এই ইংরেজ-লেখকগণ একেবারেই ভুলিয়া যান।

"ইলবার্ট-বিল"

ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষ জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিজয়ী ও বিজিতদের মধ্যে বৈষম্য ও বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর বিশেষ অধিকার নানাভাবে জাহির করে। এই বৈষম্য ও বিশেষ অধিকারসূচক আইনসমূহের মধ্যে একটি ছিল কেবলমাত্র শ্বেতাংগ-বিচারকদের দ্বারা শ্বেতাংগ-অপরাধীদের বিচারের ব্যবস্থা। এই আইন অনুসারে, শ্বেতাংগ-অপরাধীদের অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহাদের বিচারের ক্ষমতা কোন দেশীয় বিচারকের ছিল না। জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে একটা তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। এই বৈষম্যমূলক আইনের ফলে এমন কি শাসন-কার্যেও বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হইতে থাকে। শাসন-কার্যের এই অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে এবং দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ শান্ত করিবার চেষ্টা হিসাবে ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে শাসকগণ একটি আইনের খসড়া তৈরী করেন। তৎকালীন বড়লাট লর্ড রিপণের আইন-সচীব স্যার সি. পি. ইলবার্ট-এর নামানুসারে এই আইনের খসড়াটি "ইলবার্ট-বিল" নামে খ্যাত।

এই আইনের খসড়াটি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিরুদ্ধে ভারতের শ্বেতাংগ-মহল হইতে তীব্র বিরোধিতা দেখা দেয়, ইহার বিরুদ্ধে সকল শ্বেতাংগ-সাহেব দলবদ্ধ হইয়া এক প্রবল আন্দোলন শুরু করে। "(বিচার ঘটিত) অসংগতি দূর করিবার সামান্য চেষ্টাস্বরূপ এই আইনের খসড়াটির বিরুদ্ধে ভারতের সকল শ্বেতাংগ-সাহেবের তীব্র আক্রমণ শুরু হয়, দেখিতে না দেখিতে একটা 'য়ুরোপীয় আত্মরক্ষা সমিতি' গঠিত হয় এবং বিজয়ী শ্বেতাংগদের বিশেষ

(১) V. Lovett: "A History of the Indian National Movement", P—257

অধিকার অব্যাহত রাখিবার ও কৃষ্ণাংগ-বিচারকদের বিচার হইতে শ্বেতাংগ-অপরাধীদের রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে দেড় লক্ষ টাকার একটি তহবিল গড়িয়া উঠে। শ্বেতাংগ-আন্দোলনকারীরা যাহা খুশী প্রচার করিতে থাকে; বড়লাট লর্ড রিপন ও তাহার আইন-সচীব স্যার সি. পি. ইলবার্ট এবং সাধারণ ভাবে সকল ভারতীয় বিচারকদের বিরুদ্ধে অবিশ্বাস্য ভাষায় জঘন্যতম কুৎসা বর্ষিত হইতে থাকে। তাহারা এমনকি ইহাও প্রচার করে যে, যদি ভারতীয় বিচারক-দের হাতে এই ধরণের সুযোগ দেওয়া হয় তবে তাঁহারা তাঁহাদের বিচার-ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া শ্বেতাংগ-মহিলাদের দ্বারা তাহাদের হারেম (অন্তঃপুর) ভরিয়া ফেলিবেন।"(১)

"কলিকাতার একদল শ্বেতাংগ স্থির করে যে, সরকার যদি তাহাদের প্রস্তাবিত আইন পাশ করে তবে তাহারা বড়লাটের বাড়ীর পাহারাদার সিপাহীদের পরাজিত করিয়া বড়লাটকে (লর্ড রিপনকে) চাঁদপাল ঘাট হইতে স্টিমারে চাপাইয়া উত্তমাশা অন্তরীপের পথে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিবে। এই ষড়যন্ত্রের কথা (বাংলার) লেফ্টনান্ট-গভর্ণরের অজ্ঞাত ছিল না।"(২)

"ইলবার্ট-বিল"-য়ের বিরুদ্ধে সারা ভারতের শ্বেতাংগগোষ্ঠী ভারত-সরকারের বিরুদ্ধে মারমুখী হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের আন্দোলনে ভারত-সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। কিন্তু ভারতীয়দের দিক হইতে এই বিলের স্বপক্ষে কোন জোর প্রচার ও আন্দোলন হইল না। ইংরেজ-রাজের বিচার-সংক্রান্ত এই বৈষম্য ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট বিক্ষোভ সৃষ্টি করিলেও সেই বিক্ষোভ এত দিন কোন সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে নাই। ইহার পূর্বে সুরেন্দ্র-নাথ বন্দোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে গঠিত "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" এতদিন ভারতীয়দের বিভিন্ন অধিকারের কথা বলিলেও এই সংগঠন এপর্যন্ত এই ধরণের কোন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয় নাই। এইবার "ইলবার্ট-বিল" উপলক্ষে শ্বেতাংগদের বিরোধিতা ও উহার ভয়ংকর রূপ

(১) L. Hutchinson : "Empire of the Nabobs,' P. 183—84.
(২) C. E. Buckland : "Bengal under Lieut. Governors", Vol. 11, P. [illegible]

দেখিয়া "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন"এর নেতৃবৃন্দ ভয় পাইয়া যায়। শক্তিশালী শ্বেতাংগগোষ্ঠীর বাধার বিরুদ্ধে ও বিলের স্বপক্ষে তাঁহারা কোন কার্যকরী আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইলেন না। তাঁহাদের এই অক্ষমতা দেশের জাগ্রত যুবশক্তির নিকট "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন"-এর দুর্বলতা ও ভীরুতা স্পষ্ট করিয়া তোলে। ইহার ফলে ভারত-সরকার শেষ পর্যন্ত শ্বেতাংগগোষ্ঠীর তীব্র বিরোধিতার নিকট মাথা নত করিয়া বিলটি তুলিয়া লয়।

"ইলবার্ট-বিল"এর পরাজয়ের ফলে ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন জাতীয় অপমানের গ্লানিতে ভরিয়া যায়। বিজয়ী শাসক-জাতি বলিয়া শ্বেতাংগদের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য তাহাদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠে। 'ইলবার্ট-বিল'এর পরাজয়কে তাহারা চরম জাতীয় অপমান বলিয়া গ্রহণ করে। সরকারী ইংরেজ-ঐতিহাসিক বাক্‌ল্যাণ্ডও তাঁহার গ্রন্থে দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন: "ইলবার্ট-বিল'এর শিক্ষা কোন ভারতবাসীই কোন দিন ভোলে নাই।"(১) তাহারা ইহাও উপলব্ধি করে যে, ভারতবাসীরা যতদিন নিজেদের শক্তিদ্বারা তাহাদের দাবি আদায় করিতে না পারিবে, তাহারা যতদিন শাসকদের সদাশয়তার উপর নির্ভর করিবে, ততদিন তাহাদের পরাধীনতার গ্লানি ও দুঃখদুর্দশার অবসান তো দূরের কথা, বরং তাহা প্রতিদিন বাড়িয়াই চলিবে। এই জাতীয় অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাদের মধ্যে এক দুর্জয় বিদ্রোহী মনোভাব দ্রুত গড়িয়া উঠিতে থাকে।

কংগ্রেসের জন্ম

দেশব্যাপী একটা বিরাট সংগ্রামের মধ্য হইতেই কংগ্রেসের জন্ম হয়। কংগ্রেসের জন্মের পূর্ব হইতেই দেশের প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে একটা বিরাট সংগ্রামের আলোড়ন দেখা দেয়। ভারতের সর্বত্র কৃষক-জনগণের মধ্যে একটা ব্যাপক সংগ্রামের লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এতদিন তাহাদের সংগ্রাম চলিয়াছে বিচ্ছিন্ন ও সংগঠনহীনভাবে। এবার তাহারা সংঘবদ্ধতার হাতিয়ার

(১) C. E. Buckland 'Bengal under Lieut. Covernors' Vol. II, P. 789

লইয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার আয়োজন করে। ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে বাংলার লেফ্‌টানান্ট-গভর্ণর বড়লাটের নিকট প্রেরিত এক রিপোর্টে লিখিয়া পাঠান :

"পূর্ববঙ্গের বহু অঞ্চলে রায়তদের মধ্যে লীগ ও য়ুনিয়ন গঠনের মনোভাব দেখা যাইতেছে। এই সকল সংঘের উদ্দেশ্য বহু রকমের হইতে পারে। এই উপায়ে তাহারা যদি কিছুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারে তাহা হইলে সকল সময়েই একটা আশংকা থাকিবে যে, হয়ত চাষীরা পরে খাজনা বন্ধের জন্যও সংঘবদ্ধ হইবে, আর তাহা হইলে জমিদারগণও জোর করিয়া খাজনা আদায় করিতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থায় এই উদ্দেশ্য লইয়া সংগঠন সৃষ্টির পরিণাম ভয়াবহ হইবে। এই অবস্থা উদ্ভবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে আমাদের বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে।"(১)

তখন ইহা কেবল বাংলাদেশেরই অবস্থা নহে, সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক-জনগণের মধ্যেই এই নূতন সংগ্রামী মনোভাব দেখা দেয়। তখন মালাবার উপকূলের মোপলা-চাষীরা বারবার বিদ্রোহ করিয়া শাসকগোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছে; বোম্বাইপ্রদেশের মারাঠা-চাষীরা এক ব্যাপক সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছে; দাক্ষিণাত্যের চাষীরা এক বিরাট বিদ্রোহের দ্বারা "মহাজনী-আইনী" পাশ করিতে শাসকদের বাধ্য করিয়াছে; উত্তর-বঙ্গের চাষীদের বিদ্রোহের ফলস্বরূপ ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে "বেঙ্গল টেনান্সি অ্যাক্ট" পাশ হইয়াছে এবং অযোধ্যা ও পাঞ্জাবপ্রদেশেও কৃষক-সংগ্রামের ফলে শাসকগণ পুরাতন কৃষি-আইনের সংস্কার সাধনের উদ্যোগ করিতেছে।

ঠিক এই সময়ে ভারতের নবজাত শিল্পের মধ্য হইতে শ্রমিকশ্রেণী এক নূতন সংগ্রামী শক্তিরূপে দেখা দেয়। ১৮৭৭ খৃস্টাব্দে নাগপুরের শিল্প-কেন্দ্রে ভারতের প্রথম শ্রমিক-ধর্মঘট হয়। ১৮৮২ হইতে ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে বোম্বাই ও মাদ্রাজে কতগুলি বড় বড় ধর্মঘট করিয়া শ্রমিকরা তাহাদের দাবি আদায়

(১) C. E. Buckland : "Bengal under Lieut. Governors," Vol. 1, P. 544.

করিতে সক্ষম হয়। ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা ও চেতনার সঞ্চার হয়। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে বোম্বাইশহরে "মিলহ্যাণ্ডস্ এসোসিয়েশন" নামে ভারতের শ্রমিকশ্রেণীর প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের, বিশেষ করিয়া ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্পের মালিক-গোষ্ঠীর স্বার্থে ভারত-সরকারের দ্বারা ক্রমাগতভাবে ভারতের নবজাত বস্ত্রশিল্পের বিকাশে বাধা দানের ফলে দেশীয় মালিকদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব তীব্র হইয়া উঠে। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের তূলাজাত দ্রব্যের উপর হইতে সকল প্রকার আমদানি-শুল্ক তুলিয়া দেওয়ার ফলে ইংলণ্ডের বস্ত্রের প্রতিযোগিতার মুখে দেশীয় বস্ত্রশিল্পের অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই এবার মালিকদের পক্ষে বৃটিশবিরোধী সংগ্রাম অপরিহার্য হইয়া দাঁড়ায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর্থিক দুর্দশা ও জাতীয় অপমানের গ্লানি তাহাদেরও সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য করে।

"ইহা প্রতিদিনই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, ভারতের পরাধীন অবস্থা ভারতবাসীর মনে শুধু একটা গভীর ক্ষতই সৃষ্টি করে নাই, ইহা ভারতীয় মালিকদের পকেটও স্পর্শ করিতেছে। আত্মমর্যাদা এবং আত্মস্বার্থ সমানভাবেই ক্ষুণ্ণ হইতেছে। স্বভাবতই মালিকদের নেতৃত্বে......একটা জাতীয় আন্দোলন এবার দেখা দিতে পারে। সুতরাং ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের জন্ম ছিল একটা স্বাভাবিক ঘটনা।"(১)

"ইলবার্ট-বিল"-এর ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন"-এর ব্যর্থতাও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ এই বিলের ব্যর্থতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন লৌহশলাকার মত বিদ্ধ করিতে থাকে। ইহার ফলে আরও শক্তিশালী একটা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং "ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন" অপেক্ষা শক্তিশালী একটা প্রকৃত জাতীয় সংগঠনের আবশ্যকতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। ইহারই ফলস্বরূপ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কতিপয়

(১) Hirendranath Mukherjee: "India Struggles for Freedom," P. 64.

নেতার উদ্যোগে কলিকাতায় একটা জাতীয় সম্মেলন আহূত হয়। বাংলাদেশ যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হইতে বহু প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন আনন্দ মোহন বসু। তিনি এই সম্মেলনকে "জাতীয় পার্লামেণ্টের প্রথম স্তর" বলিয়া অভিহিত করেন। তিন দিবস অধিবেশনের পর বহু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং একটি জাতীয় তহবিলের আবেদন জানান হয়। সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে পরবর্তী অধিবেশন পর বৎসর কলিকাতায় আহ্বান করা স্থির হয়। কিন্তু পর বৎসর, অর্থাৎ ১৮৮৩ খৃস্টাব্দে, কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হয় তাহার জন্য সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত থাকিলেও শিক্ষিত সম্প্রদায় এই প্রদর্শনী হইতে একটা সর্ব-ভারতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে। ১৮৮৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সতের জন জননায়ক মাদ্রাজ-শহরে মিলিত হন। তাঁহারা ভারতব্যাপী একটা শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন ও একটা নূতন জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।(১)

ভারতব্যাপী বিরাট জাতীয় জাগরণ ও সেই জাগরণের অনিবার্য পরিণতি-স্বরূপ জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রচেষ্টা শাসকগণের সতর্ক দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাহারা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন যে, এই জাগরণ হইতে কালক্রমে ভারতব্যাপী এক বিরাট আন্দোলনের ঝড় উঠিবে, আর সেই ঝড়ের মুখে ইংরেজ-শাসন হয়ত ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। ঠিক এই সময়ে এক ইংরেজ ভদ্রলোক ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই ব্যক্তিই হইলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জনক" বলিয়া কথিত অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম।

হিউম প্রথমে ছিলেন একজন সিভিলিয়ান। তিনি ছিলেন ১৮৭০ খৃস্টাব্দে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-বিভাগের সেক্রেটারী, তারপর ছিলেন ১৮৭১ হইতে ১৮৭৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারত-সরকারের রাজস্ব এবং কৃষি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য

(১) Ambika Charan Mazumder: "Indian National Evolution", P. 31-33, 40-45.

বিভাগের প্রধান কর্তা, অর্থাৎ ভারতের ইংরেজ-শাসনের কর্ণধারগণের অন্যতম। ১৮৮২ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি সিমলা শহরে বাস করিতেছিলেন। তিনিই এবার ভারতের জাগরণোন্মুখ জাতীয় আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিয়া পরিচালিত করিবার ভার গ্রহণ করেন।

কর্মরত অবস্থাতেই তিনি লক্ষ্য করেন যে, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যমণিস্বরূপ ভারত-সাম্রাজ্যের আকাশে এক ভয়ংকর ঝড় উঠিতেছে, ভারতের ইংরেজ-শাসনের উপর এক প্রচণ্ড আঘাত আসন্ন। "লর্ড লিটনের 'ভাইসরয়' হিসাবে ভারত-শাসনের শেষ দিকে, অর্থাৎ ১৮৭৮-৭৯ খৃস্টাব্দেই, হিউম সাহেব নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছিলেন যে, দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভে বাধা দেওয়ার জন্য অবিলম্বে একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। তিনি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীদের নিকট হইতে সতর্কতামূলক সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্দশা ও বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধ মনোভাব হেতু সরকার ও ভারতের ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের পক্ষে এক ভয়ংকর বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে।"(১)

১৮৮২ খৃস্টাব্দে অবসর গ্রহণের সময় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশের এই আসন্ন ঘনঘটা লক্ষ্য করিয়া হিউম সাহেব সরকারের নিকট যে স্মারক-লিপি পেশ করেন তাহাতে তিনি ভারতের বৈপ্লবিক অবস্থার এক বিভীষিকাময় চিত্র অঙ্কিত করিয়া ভারত-সরকারকে সতর্ক করিয়া দেন। এই স্মারক-লিপিটি স্যার উলিয়ম ওয়েডারবার্ণ (২) কর্তৃক রচিত হিউমের জীবনীতে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

এই স্মারক-লিপিতে হিউম সাহেব বলেন: বহু পুলিশ-রিপোর্ট হইতে স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয় যে, "এই দরিদ্র জনসাধারণ (শ্রমিক, কৃষক ও নিম্ন-

(১) Sir William Wedderburn: "Alan Octavian Hume, Father of Indian National Congress", P. 50.

(২) স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ ইনি দুইবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন। ইনি প্রথমবার হন ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে বোম্বাই-কংগ্রেসের সভাপতি, দ্বিতীয়বার হন ১৯১০ খৃস্টাব্দে এলাহাবাদ-কংগ্রেসের সভাপতি।

ধ্যশ্রেণীর লোক) দেশের বর্তমান অবস্থার ফলে একটা হতাশার মনোভাবে গাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইয়াছে যে, তাহাদের নাহারে মৃত্যু অনিবার্য এবং মরিবার পূর্বে **কিছু একটা** করিবার জন্য তাহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কিছু একটা করিবার জন্যই তাহারা প্রস্তুত হইতেছে, দল বাঁধিতেছে, আর এই 'কিছু একটা'র অর্থ হইল হিংসামূলক কার্যকলাপ। বহু পুলিশ-বিবরণীতে পুরাতন তরবারী, বল্লম ও গাঁদাবন্দুক লুকাইয়া রাখিবার কথা উল্লেখ আছে। যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই এই সকল হাতিয়ার পাওয়া যাইবে। ইহা কেহ ভাবে নাই যে, ইহার ফলে প্রথম স্তরে আমাদের সরকারের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিবে, অথবা বিদ্রোহ বলিতে যাহা বুঝায় সেই ধরনের কিছু ঘটিবে। অনুমান করা হইয়াছিল যে, আকস্মিক-ভাবে চারিদিকে ইতস্তত হিংসামূলক অপরাধ, দোষী ব্যক্তিদের হত্যা, ব্যাঙ্ক-ডাকাতি, বাজার-লুট প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। 'দেশের নীচু স্তরের অর্ধাহারী শ্রেণীসমূহ যে অবস্থায় রহিয়াছে তাহাতে ইহাই অনুমান করা হইয়াছিল যে, প্রথম কয়েকটি অপরাধমূলক কাজ এই ধরনের শত শত অপরাধমূলক কাজের সংকেত জানাইবে এবং সেইগুলিই একটা ব্যাপক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করিয়া কর্তৃপক্ষ ও সম্ভ্রান্তশ্রেণীসমূহকে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিবে। ইহাও অনুমান করা হইয়াছিল যে, পাতার উপর অসংখ্য জলবিন্দুর মত দেশের সর্বত্র গড়িয়া-ওঠা ছোট ছোট দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া বড় বড় দলে পরিণত হইবে; দেশের সকল দুষ্ট প্রকৃতির লোক একত্র হইবে, এবং ছোট ছোট গুণ্ডাদলগুলি একত্র হইবার পর…সরকারের প্রতি গভীর অসন্তোষের ফলে মরিয়া হইয়া সকলে ঐ সকল দলে যোগদান করিবে, তাহারা বিভিন্ন স্থানে নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া খণ্ড খণ্ড হাঙ্গামাগুলিকে একত্র করিবে এবং উহাকে একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের আকারে পরিচালিত করিবে।"(১)

এই জাতীয় বিপ্লবের "ভয়ংকর বিপদ" হইতে ভারতবর্ষকে বাঁচাইবার জন্যই অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম সরকারের সম্মতি লইয়া ভারতের তৎকালীন

(১) Sir William Wedderburn: "Alan Octavian Hume," P. 80-81.

প্রতিনিধি অধিবেশনে যোগদান করেন। এই প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন কলিকাতার বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ. সি. ব্যাণার্জি। হিউম সাহেব নিজেই নিজেকে কংগ্রেসের সম্পাদক নিযুক্ত করিয়া কার্য পরিচালনা করেন। এই অধিবেশনের প্রতিনিধিদের বেশীর ভাগ ছিল ব্রাহ্ম সমাজ ও আর্য সমাজের লোক। তাঁহারা শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর সম্পর্কে অনুসৃত সরকারী নীতির সমালোচনা করিলেও কোন ক্রমেই ইংরেজ-বিরোধী, এমনকি সরকার-বিরোধী মনোভাবের প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কংগ্রেস সম্পর্কে যাহাতে শাসকদের মনে কোন প্রকারের ভুল ধারণার সৃষ্টি না হইতে পারে তাঁহার জন্য সভাপতির চেষ্টার অন্ত ছিলনা। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার ভাষণে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া বলেন: "আমাদের প্রিয় লর্ড রিপণের স্মরণীয় শাসনকালে জাতীয় ঐক্যের যে মনোভাব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার পূর্ণ বিকাশ ও সংহতি সাধনই" (১) কংগ্রেসের একমাত্র উদ্দেশ্য। অধিবেশনের প্রতিনিধিদের "একমাত্র জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, ব্যাপক ভিত্তিতে সরকার গঠিত হইবে এবং তাহাতে ভারতের জনগণ উপযুক্ত ও যুক্তিসঙ্গত অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে,"(২) অর্থাৎ ভারত-সরকারের আইন-সভায় দেশের কয়েকজন নির্বাচিত সদস্য গ্রহণের অনুরোধই ছিল প্রধান জাতীয় দাবি। সংক্ষেপে, ১৮৮৫ খৃস্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যে মূল কথাটি ঘোষণা করা হয় তাহা এই: "ইংরেজ-রাজের প্রতি অবিচল আনুগত্যই হইবে এই প্রতিষ্ঠানের মূল কথা।"(৩)

ইংরেজ-রাজের প্রতি কংগ্রেস অনুগত থাকিবে—এই মনে করিয়া ভারত-সরকার প্রথমে এই প্রতিষ্ঠানটিকে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ দেয়। শাসকগণ মনে করিয়াছিলেন যে, হিউম ও ভারতের "সম্ভ্রান্তবংশীয়" নেতৃবৃন্দ বর্তমান থাকিতে ইহা ইংরেজ ও সরকার-বিরোধী হইবে না। বড়লাট লর্ড ডাফরিণ পূর্বেই

(১) Ambika Ch. Mazumder: "Indian National Evolution', P. 271.
(২) R. P. Dutt. India To-day, P. 268.
(৩) Ambika Ch. Mazumder: Indian National Evolution, P. 274.

ইহাকে "আশীর্বাদ" জানাইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তিনি চাহিয়াছিলেন "চরমপন্থী" বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে "নরমপন্থী"দের লইয়া একটা দুর্গরূপে কংগ্রেসকে গড়িয়া তুলিতে। এই উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বুঝিয়া ইংরেজ-সরকার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। প্রকৃতপক্ষে তখনই তাহাদের আশঙ্কার কোন কারণ ছিল না। বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বোম্বাইয়ের গোপাল কৃষ্ণ গোখেল ও ফিরোজশা মেটা, মাদ্রাজের সুব্রহ্মণ্য আয়ার ও দাদা ভাই নৌরজি প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের রাজনৈতিক মতামত ছিল ইংলণ্ডের শাসক-গোষ্ঠী উদারনৈতিক দলেরই অনুরূপ। তাঁহারা "চরমপন্থা" ও বৃটিশ বিরোধিতার পথ প্রাণপণে পরিহার করিয়াই চলিয়াছিলেন। ইংরেজ-রাজের সহৃদয়তার উপর নির্ভর করিয়া আবেদন-নিবেদনের মারফত কিছু রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করাই ছিল তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সেই সময়ের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ও মনোভাব যাহাই হউক না কেন, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কংগ্রেসকেই নিজস্ব জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলিয়া বরণ করিয়া লয়। প্রথম অধিবেশন হইতে দেশবাসীর নিকট যে ক্ষীণ আহ্বান ধ্বনিত হইয়াছিল তাহাই দেশের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারী, উকিল প্রভৃতি শিক্ষিত-শ্রেণীর মধ্যে এক বিপুল সাড়া জাগাইয়া তোলে, সেই আহ্বানকেই তাহারা জাতীয় আহ্বান বলিয়া গ্রহণ করে। প্রত্যেকটি কংগ্রেস-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা এমনভাবে বাড়িয়া যায় যে, নেতৃবৃন্দ ভয় পাইয়া প্রতিনিধি-সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। ১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাই-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল মাত্র বাহাত্তর জন, ১৮৮৬ খৃস্টাব্দে কলিকাতা-অধিবেশনে প্রতিনিধি-সংখ্যা বাড়িয়া হয় চারিশত চৌত্রিশ, ১৮৮৭ খৃস্টাব্দে মাদ্রাজ-অধিবেশনে তাহাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়শত সাত। চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশন হয় এলাহাবাদ ও বোম্বাইনগরীতে, আর এই দুই অধিবেশনের প্রতিনিধি-সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১২৪৮ ও ১৮৮৯ জন।

বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ—এই তিনটি অধিবেশনে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য স্থির হইবার পর ১৮৮৮ খৃস্টাব্দ হইতে এই উদ্দেশ্য সারা ভারতে ও ইংলণ্ডে

প্রচারের ব্যবস্থা হয়। কংগ্রেসের পক্ষে প্রচারের জন্য ইংলণ্ডেও একটি কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয়। এক সময়ে এই কমিটিতে বৃটিশ পার্লামেণ্টের দুই শত সদস্য যোগদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে আয়ার্লণ্ডে 'হোমরুল'-য়ের দাবি লইয়া আন্দোলন চলিতেছিল। পার্লামেণ্টের আইরিশ সদস্যগণ ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিতে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। ভারতেও প্রত্যেক প্রদেশ এবং জিলায় জিলায় কংগ্রেস-কমিটি গঠিত হয় এবং সেই সকল প্রাদেশিক ও জিলা-কমিটি নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইতে থাকে। এই ভাবে "উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয়" প্রতিনিধিদের গণ্ডীর মধ্যে কংগ্রেসকে আবদ্ধ রাখিবার সকল প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেস শীঘ্রই একটি সর্ব-ভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

জাতীয়তাবাদী যুবশক্তি

শাসকগোষ্ঠী ও নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসকে যতই একটা আপস-আলোচনার ক্ষেত্র হিসাবে একটা ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা করুন না কেন, এই প্রতিষ্ঠানে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীরা ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় যোগদান করিতে থাকে, আর্থিক দুর্দশার ফলে বিক্ষুব্ধ ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বুদ্ধিজীবীদের যোগদানের ফলে কংগ্রেসের মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন ঘটিতে শুরু করে। ইহারা কংগ্রেসের মধ্যে লইয়া আসে একটা দৃঢ় সংগ্রামী মনোভাব, ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের এক দুর্জয় দাবি। ইহার ফলে কংগ্রেসের মধ্যে এক মৌলিক পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে।

কংগ্রেসের প্রথম দিকের আপসমূলক মনোভাবের মধ্যে তৎকালীন ভারতীয় মালিকদের আপসমূলক মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। ভারতের নূতন মালিক-গণ তখন তাহাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য আপস-আলোচনার মারফত শিল্প-বিকাশের পথ বাধামুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তখন পর্যন্ত ইংরেজ-রাজের সহৃদয়তায় তাহাদের বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাই প্রত্যক্ষ

সংগ্রামের পরিবর্তে আপস-আলোচনাই হইল তাঁহাদের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ। মালিকদের এই মনোভাবই কংগ্রেসের গোড়ার দিকের গৃহীত প্রস্তাব ও মূল দাবি গঠনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

কিন্তু তখনকার অবস্থায় এই মনোভাবের জন্য মালিকদিগকে ও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া অভিহিত করিলে ভুল হইবে। ভারতের তৎকালীন অবস্থায় তাঁহাদের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে কংগ্রেসের সৃষ্টির তাৎপর্য অসাধারণ। তাঁহাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রয়াস যতই সামান্য হউক না কেন, সেই প্রয়াসের বৈপ্লবিক তাৎপর্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তাঁহারাই ছিলেন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের স্রষ্টা এবং তাঁহাদের উদ্যোগেই ভারতে প্রথম জাতীয় আন্দোলন শুরু হইয়াছিল। এই দিক হইতে সেই সময়ে তাঁহাদের ভূমিকা ছিল প্রগতিশীল। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টাই পরবর্তীকালে জাতীয় চেতনার উন্মেষ, জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় অগ্রগতির পথ খুলিয়া দেয়।

"ইহা ধারণা করিলে ভুল হইবে যে,……গোড়ার দিকের কংগ্রেস-নেতারা ছিলেন বিদেশী শাসনের প্রতিক্রিয়াশীল ও জাতীয়তা-বিরোধী আজ্ঞাবহ মাত্র। বরং তাঁহারা ছিলেন সেই সময়ের ভারতীয় সমাজের সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল শক্তি। ততদিন পর্যন্ত নবজাত শ্রমিকশ্রেণী নিজেকে জাহির করিতে অথবা সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই এবং কোটি কোটি কৃষক ছিল মূক দর্শক মাত্র, তখন মালিকশ্রেণীই ছিল ভারতবর্ষে সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও কার্যতঃ বিপ্লবী শক্তি। তাঁহারা সমাজ-সংস্কার, জ্ঞানের বিকাশ ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং ভারতীয় সমাজের পশ্চাৎপদ অবস্থা ও যাহা কিছু অগ্রগতি-বিরোধী তাহার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেন। শিল্প ও যন্ত্রের বিকাশের জন্যও তাঁহারা দাবি তোলেন।"(১)

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মোহ ও শাসকদের সহৃদয়তায় তাঁহাদের বিশ্বাস কাটিয়া যাইতে বেশী বিলম্ব হইল না। কংগ্রেসকে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হইতে এবং ইহার মধ্য হইতে সংগ্রামের ধ্বনি

(১) R. P. Dutt: 'India To-day,' P. 267.

উঠিতে দেখিয়া শাসকগোষ্ঠীর মনোভাবও দ্রুত বদলাইয়া যায়। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডের ধনিকশ্রেণী ও ভারতের মালিকদের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তীব্রতর হইয়া উঠিতে থাকে এবং "সেই সংঘাত ভারত-সরকার ও জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কের মধ্যেও প্রতিফলিত হইতে শুরু করে।"(১) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ স্পষ্টভাবেই কংগ্রেসের প্রগতিশীল ভূমিকা এবং ইহার সহিত সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের অনিবার্য সংঘর্ষের তাৎপর্য বুঝিতে পারে। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতি গোড়ার দিকের (সরকারী) সমর্থন সন্দেহ ও বিরোধে রূপান্তরিত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যেই 'ভাইসরয়' লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসকে "অতি ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু"র প্রতিনিধি বলিয়া তাচ্ছিল্যসূচক উক্তি করিতে শুরু করেন।"(২) সরকারী কর্মচারীদের এমনকি দর্শক হিসাবেও কংগ্রেস-অধিবেশনে যোগদান করা দণ্ডনীয় অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

ইহার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে নূতন করিয়া আলোড়ন শুরু হয়। বেকারী, স্বল্প বেতন ও সাধারণ আর্থিক দুর্দশার চাপে শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণীর জীবনে নূতন সংকট ঘনাইয়া আসে, এই আর্থিক সংকট হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় হিসাবে তাহারা নূতন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ধ্বনি তুলিতে থাকে। তাহাদের সেই সংগ্রামের ধ্বনি কংগ্রেসের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হয়। কিন্তু কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্ব তখনও সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে প্রস্তুত নয়, আপসের পথকেই তাঁহারা দাবি আদায়ের একমাত্র পথ বলিয়া আঁকড়াইয়া থাকেন। তখন ভারতের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া আইন-সভা গঠনই ছিল তাঁহাদের প্রধান দাবি।

এই দাবি লইয়া একদিকে ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইংলণ্ডের কংগ্রেস-কমিটিও এই দাবির সমর্থনে প্রচার চালাইতে থাকে। ১৮৯০ খৃস্টাব্দে পার্লামেণ্টের জনৈক সদস্যের মারফত এই দাবির উপর একটা বিল পেশ করা হয়। ইংলণ্ডের সরকারী দল সেই বিলের পরিবর্তে তাহাদের

(১) Hutchinson : "Empire of the Nabobs," P. 186.
(২) R. P. Dutt : 'India To-day, P. 267.

নিজস্ব একটি বিল পাশ করিয়া লয়। সেই বিলটিই ১৮৯২ খৃস্টাব্দে "ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাকট" নামে ভারতবর্ষে চালু করা হয়। এই নূতন আইনে প্রকৃতপক্ষে শাসন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন হইল না, বরং এতদিন শাসনকার্যে ভারতবাসীর অংশ গ্রহণের দাবি লইয়া কংগ্রেস যে আন্দোলন চালাইতেছিল তাহার প্রতি এই নূতন আইনের দ্বারা অবজ্ঞা প্রদর্শনই করা হয়। ভারতের জাতীয় জাগরণকে বিভ্রান্ত করাইছিল এই নূতন আইনের উদ্দেশ্য।

এই নূতন আইন কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে গভীর হতাশয় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহারা এবার বুঝিতে পারেন যে, ইংরেজ-শাসকগণ ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নহে, বরং তাহার বিরোধী। কিন্তু শাসকগণের নিকট হইতে কিছু পাওয়া যাইবে না বুঝিয়াও তাঁহারা কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণের কথা চিন্তা করিতে পারিলেন না। বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পরিবর্তে এই আইনে বড়লাটের কাউন্সিলে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার না দেওয়ার জন্য মামুলীভাবে দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাঁহারা "সম্প্রতি গৃহীত 'ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট'কে অনুগত মনোভাব দ্বারা" মানিয়া লইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রস্তাব পাশ করেন।

এই নূতন আইন কংগ্রেসের পক্ষে এক শোচনীয় পরাজয় এবং উহার আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের পক্ষে এক ভীষণ আঘাত বহন করিয়া আনে। তাঁহাদের আপসপন্থার উপর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ আস্থা হারাইয়া ফেলে। এই আইনের ফলে তাহাদের নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধ আহত ও তাহাদের অর্থনৈতিক জীবন অন্ধকারময় হইয়া উঠে। কিন্তু যুবসম্প্রদায় এত সহজে পরাজয় স্বীকার করিতে প্রস্তুত নয়, তাহারা কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দকে অগ্রাহ্য করিয়া সাম্রাজ্যবাদের এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মপন্থা ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে এক কঠিন প্রতিজ্ঞা লইয়া অগ্রসর হয়। এই পথে অগ্রসর হইবার জন্য এমন পরিচালকের প্রয়োজন যাঁহার সাম্রাজ্য-বাদের সহৃদয়তায় কোন বিশ্বাস নাই, সংগ্রাম যতই কঠোর হউক তাহা পরিচালনা করিতে কোন ভয় নাই। পুনার বাল গঙ্গাধর তিলক এই যুব-

সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে এবং তাহাদের এক নূতন সংগ্রামের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তুলিতে আগাইয়া আসেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী যুবসম্প্রদায় মহারাষ্ট্র নেতা তিলকের আহ্বানে নূতন সংগ্রামের প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠে। তিলক তাহাদের সামনে তুলিয়া ধরেন বিদেশী ইংরেজ-শাসনের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও সেই শাসনের উচ্ছেদের জন্য এক কঠোর সংগ্রামের আদর্শ। নিজের জীবনে তিনি এই আদর্শকে মূর্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। "তাঁহার নিকট ইংরেজরা ছিল চির শত্রু এবং প্রথম হইতেই তিনি তাঁহার অনুচরদের মধ্যে যুদ্ধের মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।"(১) তিলকের এই আদর্শই সারা ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়া উঠে। তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাংলার যুবসম্প্রদায়ের নেতৃগ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন লালা লাজপৎ রায়। এই ভাবে এক আপস-বিরোধী চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইতে থাকে।

(১) Thomson and Garrat: 'Rise & Fulfilment of British Rule in India, P. 546.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি

১। মহারাষ্ট্রীয় আদর্শ

স্বেচ্ছাচারী বিদেশী শাসন, অর্থনৈতিক দুর্দশা, জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসনীতি—এই চারিটি কারণের একত্র সমাবেশের ফলেই ভারতের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়। শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের "অর্থনৈতিক বিক্ষোভ চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের মধ্যে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। তাহারা বিদেশী শাসনকেই তাহাদের দারিদ্র ও অধঃপতনের একমাত্র কারণ বলিয়া বুঝিতে পারে। বিদেশী শাসনের প্রতি তাহাদের তীব্র ঘৃণা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা তুচ্ছ পুরস্কার (বেতন) লাভের ফলস্বরূপ হতাশা তাহাদের হিন্দুযুগের পুনরুজ্জীবনের সমর্থক করিয়া তোলে এবং তাহাদের, আর্যসমাজ ও ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিতে অনুপ্রাণিত করে।......তাহারা মনে করিত যে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাকে অগ্রাহ্য করিয়া হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্ব প্রচারের দ্বারা তাহাদের অধঃপতনের কারণস্বরূপ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তাহারা প্রতিশোধ লইতেছে। বর্তমান অবস্থা হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় তাহারা হিন্দুর অতীত গৌরবের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রেরণা লাভের উপায় হিসাবে হিন্দুর প্রত্যেকটি ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ঐতিহ্য লইয়া গর্ব করিতে থাকে।"(১)

অন্যদিকে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের দুর্বল ও আপসমূলক নীতি আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত ও হিন্দুধর্মের গভীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ যুবসম্প্রদায়কে প্রভাবান্বিত করিতে ব্যর্থ হয়। ইংরেজ-রাজের নূতন 'ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট'এর নিকট কংগ্রেস-নেতাদের আত্মসমর্পণের ফলে নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ যুবসম্প্রদায়ের সকল বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভরসা হারাইয়া ফেলে। ঠিক এই অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের

(১) L. Hutchinson: 'Empire of the Nabobs', P. 189.

চরমপন্থী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের আপস-বিরোধী জাতীয়তাবাদ তাহাদের প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে মহারাষ্ট্রপ্রদেশে এক ব্যাপক কৃষক-বিদ্রোহ হয়। ইংরেজ শাসনের অবাধ শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মারাঠী কৃষকের বিদ্রোহ সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের এই অঞ্চলের সমগ্র জনসাধারণকে মাতাইয়া তোলে, সারা মহারাষ্ট্রপ্রদেশের উপর দিয়া একটা প্রবল ইংরেজ-বিরোধী বিক্ষোভের ঝড় বহিয়া যায়। মহারাষ্ট্রের যুবসম্প্রদায় সেই কৃষক-বিদ্রোহে যোগদান না করিলেও সেই বিদ্রোহের প্রভাব তাহাদের মধ্যেও একটা বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তোলে। সেই বিদ্রোহী মনোভাবের প্রতীকরূপে তিলক মহারাষ্ট্রের বিক্ষুব্ধ যুবসম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্রের এই চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মহারাষ্ট্রের চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়। তিলক ও তাঁহার ভাবধারায় অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দ সকলেই ছিলেন এই চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় তাহাদের পুরাতন ঐতিহ্য হইতেও ইংরেজ-বিরোধিতা ও বিদ্রোহের প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। মহারাষ্ট্রের খ্যাতনামা মনীষী ও রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু রাণাডে এবং গোখেলও ছিলেন এই চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এই তেজস্বী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের অবদান চিরস্মরণীয়।

চিৎপাবন ব্রাহ্মণসম্প্রদায় ছিল মারাঠীদের জীবনাদর্শ ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। তাহাদের পূর্ব-পুরুষ নানা ফরনবীশ ও পেশোয়াদের নিকট হইতেই ইংরেজ-আক্রমণকারীরা মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা কাড়িয়া লইয়াছিল। চিৎপাবণ-ব্রাহ্মণেরা তাহাদের পূর্ব-পুরুষের রাষ্ট্রীয় গৌরব ও বিদেশী ইংরেজদের হাতে তাহাদের লাঞ্ছনা কোনদিন ভুলিয়া যায় নাই। মহারাষ্ট্রের পরাধীনতার গ্লানি তাহাদের মনে চিরদিন সজাগ থাকিয়া এই বিদেশীদের কবল হইতে মহারাষ্ট্র ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণা যোগাইয়াছিল। এই প্রেরণাই শিবাজীর কর্মাদর্শের মধ্য দিয়া এবং ইংরেজ-রাজের সংস্কৃতি, ধর্ম ও সভ্যতার

বিরুদ্ধে হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন হিসাবে হিন্দু-ধর্মের রক্ষকারী দেবতা গণপতির আদর্শের মধ্য দিয়া সক্রিয় রূপ গ্রহণ করে। তিলকের নেতৃত্বে চরমপন্থী চিৎপাবণ ব্রাহ্মণ-যুবসম্প্রদায় এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করে।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর হইতেই তিলক কংগ্রেস-আন্দোলনে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী বিরোধী দল গড়িয়া তোলেন। তাঁহার মত প্রচার ও মহারাষ্ট্র যুব সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া তাহাদের জাতীয় সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বোম্বাইপ্রদেশের পুণা শহরে 'কেশরী' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। তিলকের পত্রিকার প্রধান কাজ হইল ইংরেজ-রাজ, আপসপন্থী কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও বিধর্মীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালনা করা। এই সময় বৃটিশ-সমর্থক স্যার সৈয়দ আহম্মদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া শিক্ষিত মুসলমানগণ কংগ্রেসের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়া যায়। ইহার ফলে মুসলমানগণও 'কেশরী' পত্রিকার আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। (ইহা ব্যতীত ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্মের পুনরুজ্জীবনের উপায় হিসাবে বেদ ও ভাগবৎ গীতার ধর্মীয় মতবাদ ও আদর্শ জোরের সহিত প্রচার করা হইতে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই 'কেশরী' পত্রিকা বোম্বাইপ্রদেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং তাহারা তিলককেই যোগ্যতম নেতা বলিয়া গ্রহণ করে। মারাঠী যুবকদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে তিনি বোম্বাইপ্রদেশে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় দেবতা গণপতির (গণেশের) উৎসব ও মহারাষ্ট্রের জাতীয় বীর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসবের প্রচলন করেন।) প্রতি বৎসর এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়া ইংরেজ-বিরোধী প্রচার-কার্য চলিতে থাকে। এই দুই উৎসবের শোভাযাত্রা ক্রমশঃ ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কুচকাওয়াজে পরিণত হয়। হিন্দুধর্মের রক্ষাকর্তা হইলেন গণপতি দেবতা। সুতরাং গণপতি-উৎসব উপলক্ষে বিদেশী ইংরেজ-রাজের খৃস্টান ধর্ম ও "ম্লেচ্ছ" মুসলমান ধর্মের আক্রমণ

হইতে হিন্দুধর্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রচার চলিতে থাকে। "বিদেশী" মুসলমানদের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া শিবাজী মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতা পুনর্প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাই শিবাজী-উৎসবে শিবাজীর মত বীরত্বের সহিত বর্তমান বিদেশী ইংরেজ-রাজের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার জন্য মারাঠী যুবসম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করা হইত।

হিন্দুর শ্রেষ্ঠ দুইখানি ধর্মগ্রন্থ মহাভারত ও গীতা এবং তিলকের সৃষ্ট এই দুই উৎসব বোম্বাইপ্রদেশের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করে। ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মনোভাব সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে কি ভাবে এই দুই উৎসবকে কাজে লাগান হইত তাহা এই বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত "শিবাজী-শ্লোক" ও "গণপতি-শ্লোক" হইতে বুঝিতে পারা যায়।

শিবাজী-শ্লোক

"শিবাজীকে দেবতা মনে করিয়া তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী আবৃত্তি করিলেই স্বাধীনতা আসিবে না। শিবাজী ও বাজীর (বাজীরাও-এর) অনুকরণে সত্বর দুঃসাহসিক কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। যোগ্য লোক তোমরা, সকল বুঝিয়া শুনিয়া এখন তোমাদের তরবারি ও বর্ম ধারণ করিতে হইবে; আমাদের অসংখ্য শত্রুর শিরশ্ছেদন করিতে হইবে। তোমরা শ্রবণ কর, জাতীয় যুদ্ধের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে আমরা আমাদের জীবন বিসর্জন দিব; আমাদের ধর্ম-নাশকারী শত্রুর রক্তে ধরণীর মাটি রঞ্জিত করিব; আমরা শত্রু মারিয়া তবে প্রাণ দিব, আর তোমরা কি স্ত্রীলোকের মত নিশ্চেষ্ট হইয়া আমাদের বীরত্ব-গাথা শুনিবে?"

গণপতি-শ্লোক

"হায়! তোমাদের দাসত্বে লজ্জা নাই? তাহা হইলে আত্মহত্যা করাই উচিত; হায়! এই কসাইরা দানবীয় নিষ্ঠুরতার সহিত গোমাতা ও গো-বৎসদের হত্যা করে; তোমরা এই যন্ত্রণা হইতে গোমাতাকে রক্ষা করিতে

বদ্ধপরিকর হও ; মৃত্যু বরণ কর, কিন্তু তার পূর্বে ইংরেজদের মার ; অলস হইয়া বসিয়া থাকিয়া বৃথা ধরণীর ভার বৃদ্ধি করিও না। আমাদের দেশের নাম যদি হয় হিন্দুস্থান, তবে ইংরেজরা এখানে রাজত্ব করে কোন অধিকারে ?"(১)

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসব উপলক্ষে জনৈক বক্তার ভাষণরূপে 'কেশরী' পত্রিকা এই আদর্শ প্রচার করে: "প্রত্যেকটি হিন্দু, প্রত্যেকটি মারাঠী—সে যে-দলেরই লোক হউক না কেন—এই শিবাজী-উৎসবে আনন্দিত হইবে। আমরা সকলেই আমাদের হৃত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছি, আমাদের সকলকে একত্র হইয়াই এই ভয়ংকর বোঝা (ইংরেজ-শাসন) উপড়াইয়া ফেলিতে হইবে। যে ব্যক্তি নিজ পথ বাছিয়া লইয়া সেই পথেই শুদ্ধ মনে এই বোঝা উপড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে তাহার পথে বাধা দেওয়া কখনই উচিত নয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধের ফলে আমাদের অগ্রগতি বিশেষ ব্যাহত হয়। যদি কেহ উপর হইতে চাপিয়া বসিয়া আমাদের দেশকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে থাকে তাহাকে কাটিয়া টুক্‌রা করিয়া ফেল। এই উৎসবের মত যে সকল ঘটনা আমাদের সমগ্র দেশকে ঐক্যবদ্ধ করিবার পক্ষে সহায়ক সেই সকল ঘটনাকে স্বাগত জানাও।"

১৭৮৯ খৃস্টাব্দের যুগান্তকারী ফরাসী-বিপ্লবকেও সন্ত্রাসবাদ প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হয়: "যাহারা ফরাসী-বিপ্লবে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা নরহত্যা করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা বিশেষ জোরের সহিত একথাই বলিতেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের পথ হইতে কাঁটা তুলিয়া ফেলিতেছেন। মহারাষ্ট্রেও এই যুক্তি কেন কাজে লাগান হইবে না ?"(২)

স্বয়ং তিলক মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর দৃষ্টান্ত দ্বারা এই ভাবে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদের আদর্শ তুলিয়া ধরেন: "আফজল খাঁকে (মুসলমান-সেনাপতিকে) হত্যা করিয়া শিবাজী কি অন্যায় করিয়াছিলেন ? এই প্রশ্নের জবাব

(১) Sedition Committee Report, P. 2.

(২) Sedition Committee Report, P. 10.

মহাভারতের মধ্যেই পাওয়া যাইবে। ভাগবৎ গীতায় শ্রীকৃষ্ণ এমন কি আমাদের গুরু এবং আত্মীয়-স্বজনকেও হত্যা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন। যদি কোন লোক কর্মফলের জন্য আকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিয়া যায় তবে তাহার কোন পাপ হয় না। শিবাজী তাঁহার নিজের উদর ভরাইবার জন্য কিছু করেন নাই, অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া অন্য সকলের মঙ্গলের জন্যই তিনি আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন। যদি একদল চোর আমাদের গৃহে প্রবেশ করে আর তাহাদের তাড়াইবার মত শক্তি যদি আমাদের না থাকে, তবে আমাদের কর্তব্য হইবে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সেই চোরদের গৃহের মধ্যে আটক করিয়া তাহাদের জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করা। ভগবান হিন্দুস্থানের উপর রাজত্ব করিবার অধিকার তাম্রপত্রে খোদিত করিয়া বিদেশীদের দান করেন নাই। মহারাজা (শিবাজী) তাঁহার জন্মভূমি হইতে বিদেশীদের (মুসলমানদের) বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহা দ্বারা তিনি অপরের দ্রব্য হরণের অপরাধ করেন নাই। কূপের মধ্যে আবদ্ধ মণ্ডুকের মত নিজের দৃষ্টিশক্তিকে সীমাবদ্ধ রাখিও না ; 'পেনাল কোড'-এর বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীমৎভাগবৎগীতার অনন্ত বিস্তারের মধ্যে প্রবেশ কর এবং মহৎ ব্যক্তিদের সাধনা হইতে শিক্ষা লও।"(১) বৈপ্লবিক প্রচারের উদ্দেশ্য শিবাজীর সংগ্রাম ও গীতার এই সকল ব্যাখ্যা 'শিবাজীর উক্তি' নামক পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রের অন্যতম চরমপন্থী নেতা বিনায়ক সাভারকরের ভ্রাতা গণেশ দামোদর সাভারকর গান ও কবিতার মারফত স্বাধীনতা লাভের উপায়স্বরূপ বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রচারের জন্য 'লঘু অভিনব ভারত মেলা' নামে একখানি গান ও কবিতার পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতেও মারাঠী যুবকদের সন্ত্রাসবাদে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য তিনি শিবাজী ও ভাগবৎগীতার আদর্শ তুলিয়া ধরেন।

---

(১). Tilak's Speech Reported by 'Kesari'—Sedition Committee Report, P. 10

এই পুস্তক প্রকাশ করা ও অন্যান্য অভিযোগে তিনি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁহার বিচারকালে বোম্বাই-হাইকোর্টের একজন মারাঠী বিচারপতি এই পুস্তক সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহা হইতে এই পুস্তকের বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য জানা যায়:

"হিন্দুদের কয়েকজন দেবতা ও শিবাজীর মত কয়েকজন যোদ্ধার নাম করিয়া বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা জাগাইয়া তোলাই লেখকের উদ্দেশ্য। পুস্তকের এই নামগুলি ছদ্ম আবরণ মাত্র, আসল কথা হইল এই: 'তরবারি উঠাও, এই সরকারকে ধ্বংস কর, কারণ এই সরকার বিদেশী ও অত্যাচারী।' লেখকের আসল উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য কবিতায় ভাগবৎগীতা হইতে গৃহীত ভাবধারাগুলির উল্লেখ না থাকিলেও চলিত। পুস্তকের কবিতাগুলির নিজস্ব তাৎপর্য খুবই স্পষ্ট। যাহারা মারাঠী ভাষা জানে না তাহারা এইগুলির অর্থ কেবল ইহাই বুঝিবে যে, ইহা বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উন্মাদনা প্রচার ব্যতীত অন্য কিছু নহে।"(১)

ম্যাৎসিনির শিক্ষা

শিবাজী ও গীতার আদর্শ ব্যতীত ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের সিপাহী-যুদ্ধ (বা বিদ্রোহ) ও ইতালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নায়ক ম্যাৎসিনির(২) কর্মাদর্শ হইতেও সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি করা হয়। সিপাহী-যুদ্ধ ও ইতালীর জাতীয় বীর ম্যাৎসিনির দৃষ্টান্তের ব্যবহার তখনকার বিপ্লবীদের চিন্তাধারার এক ধাপ অগ্রগতি সূচনা করে। সিপাহী-যুদ্ধ ও ম্যাৎসিনির দৃষ্টান্ত হইতে ভারতের স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির প্রথম চেষ্টা করেন তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অনুচরদের অন্যতম বিনায়ক দামোদর সাভারকর। তিনি ইংলণ্ডে থাকিয়া "জনৈক ভারতীয় জাতীয়তাবাদী"—এই ছদ্মনামে '১৮৫৭

(১) Sedition Committee Report', P. 9. (২) ইতালীর স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য ম্যাৎসিনি ইতালীর শিক্ষিত যুবকদের লইয়া গোপন-সমিতি গঠন ও সন্ত্রাসবাদী সংগ্রাম পরিচালনা করেন। তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হত্যার নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

খৃস্টাব্দের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মারফত তিনি মহারাষ্ট্রীয় যুবকদের মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে থাকাকালেই তিনি ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দেশে প্রেরণ করেন। ইহার ভূমিকায় তিনি রাজনীতিকে একটি ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে এবং সেই ধর্মের জন্য যুবকদের জীবন উৎসর্গ করিতে আহ্বান করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীকে "ভারতের ম্যাৎসিনি" আখ্যাদান করেন। ইহাতে তিনি ম্যাৎসিনির কর্মপদ্ধতি আলোচনা করিয়া লিখেন যে, ম্যাৎসিনি তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের জন্য যুব-শক্তির উপরেই প্রধাণতঃ নির্ভর করিয়াছিলেন। সাভারকর তাঁহার এই ভূমিকায় নিজের উদ্‌ভাবিত দুইটি কর্মসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, ম্যাৎসিনির মত পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া লুকাইয়া রাখিতে হইবে এবং সুযোগমত তাহা ব্যবহার করিতে হইবে; দেশের মধ্যে অসংখ্য ছোট গোপন-কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে অস্ত্র তৈরী করিতে হইবে; যে সকল গুপ্ত সমিতি গঠিত হইবে সেইগুলি অন্য দেশে অস্ত্র ক্রয় করিয়া মালবাহী জাহাজে লুকাইয়া দেশে লইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিবে।

২। বঙ্গীয় আদর্শ

বাংলা দেশে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ নূতন করিয়া প্রভাব বিস্তার করে অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিন চন্দ্র পালের মারফত। অরবিন্দ বরোদা রাজ্যে চাকুরি করিবার সময়েই পুণার বিপ্লবীনেতা ঠাকুর সাহেবের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত হন। ঐ সময়ে তিনি গণতন্ত্রী ভারতের গুজরাট শাখার সভাপতি ছিলেন এবং মনপ্রাণ দিয়া তিলকের বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন তিলকেরই মন্ত্রশিষ্য। তাঁহার নিজের ও তাঁহার সহকর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টাই এযুগে সর্বপ্রথম বাংলার বিক্ষুব্ধ যুবসমাজকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে।

কিন্তু অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও তাঁহাদের সহকর্মীদের কর্মপ্রচেষ্টা, এমনকি জাতীয় আন্দোলন এবং কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠারও বহু পূর্ব হইতে কয়েকটি নূতন ভাবধারার প্রভাবে বাংলার যুবসমাজের মধ্যে নূতন জাগরণ শুরু হইয়াছিল, চিরাচরিত ধর্ম, সমাজ ও ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দিতে শুরু করিয়াছিল। সেই সকল বিদ্রোহী ভাবধারার প্রভাব ও অর্থনৈতিক বিক্ষোভ একত্রে মিলিয়া বাংলার মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে বিপ্লবের উপযুক্ত ক্ষেত্ররূপে গড়িয়া তোলে। সুতরাং অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র ও তাঁহাদের সহকর্মীদের পক্ষে বাংলার শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।

১৮৬০-৬১ খৃস্টাব্দে নীলচাষীদের ঐতিহাসিক বিদ্রোহ তৎকালীন বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়কে যে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল তাহা বিদ্রোহী চাষীদের পক্ষে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশ গ্রহণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে বাংলা দেশের মধ্যশ্রেণীর ভিতর য়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি যে প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছিল তাহা দ্বিতীয়ার্ধের গোড়ার দিকেই কাটিয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে দেখা দেয় ঐ বিদেশী সভ্যতার প্রতি একটা বিরূপ মনোভাব। এই বিরূপ মনোভাব হইতেই শিক্ষিত সম্প্রদায় হিন্দু-সভ্যতার প্রতি নূতন করিয়া আকৃষ্ট হইতে থাকে। তাহাদের মধ্যে ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, প্রভৃতির জন্য একটা গর্বের ভাব জাগিয়া উঠে। তাহাদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া উঠে যে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইয়া ভারতবর্ষ তাহার আত্মা বিদেশীদের পায়ে বিকাইয়া দিতে বসিয়াছিল। তৎকালীন বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বলিয়াছিলেন : "আমরা বিদেশীদের দেবমূর্তিও বর্জন করিব আর এমনকি আমাদের গৃহপালিত কুকুরকেও পূজা করিব।"

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে য়ুরোপের সভ্যতা, সমাজ ও ধর্মের প্রতি যে ঝোঁক দেখা দিয়াছিল তাহা দ্রুত পরিবর্তিত হইয়া তাহার বদলে দেখা দেয়

ভারতীয় প্রাচীন সমাজ ও ধর্মের প্রতি নূতন আকর্ষণ। পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাস অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন সমিতি গড়িয়া উঠে। সেই সকল সমিতি ভারতের গৌরবময় ঐতিহ্য প্রচার করিতে থাকে। ভারতীয় সমাজ ও ধর্মের প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের উপরেও জোর দেওয়া হয়, কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি তাহাদের প্রতিক্রিয়া বাড়িয়াই চলে। এই সময়ে উত্তর-ভারতে প্রধানতঃ দুইটি ধ্বনি লইয়া আর্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়ঃ (১) বেদের যুগে ফিরিয়া চল; (২) আর্যস্থান আর্যদের। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু-সমাজের সংস্কার এবং ইংরেজ-শাসন হইতে হিন্দুস্থানের মুক্তির আন্দোলন গড়িয়া তোলার দিক হইতে আর্য-সমাজ সেই সময়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষা

স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার শিক্ষিত হিন্দু যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে নবজীবনের সঞ্চার করেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্বামী বিবেকানন্দ বাংলার হতাশাচ্ছন্ন যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে আশার আলো জ্বালাইয়া তাহাদের শক্তি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। ধর্মের আবরণে আবৃত থাকিলেও তাঁহার সেই শক্তি-সাধনার বাণী সেই সময়ে বাংলার হিন্দু যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিল, জাতীয় সত্ত্বার পুনর্প্রতিষ্ঠার জন্য তাহাদের মধ্যে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার সাহস আনিয়া দিয়াছিল। তাঁহার শিক্ষার মূল কথা ছিল,—'পরমাত্মার সহিত আত্মার মিলন নিষ্ক্রিয় কল্পনা দ্বারা সম্ভব নহে, কেবলমাত্র নিঃস্বার্থ কর্মের দ্বারাই সম্ভব'। ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে আমেরিকার সিকাগো নগরীতে অনুষ্ঠিত ধর্ম-সম্মেলনে অকাট্য যুক্তি দ্বারা তিনি সমগ্র পৃথিবীর মনীষীদের অন্যতম বলিয়া গণ্য হন। সেই সম্মেলনে এক ঐতিহাসিক ভাষণে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিয়া তিনি সারা ভারত, বিশেষ করিয়া বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দ্বারা আদর্শ জাতীয় বীর ও জাতীয় জাগরণের প্রতীক বলিয়া গণ্য হন।

তাঁহার এই ঘোষণা যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এক দুর্বার প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে: "আমাদের আধ্যাত্মবাদ ও দর্শনের দ্বারা আমাদের বিশ্বজয় করিতে হইবে। ইহা না করিতে পারিলে আমাদের মৃত্যু। ভারতীয় চিন্তাধারা দ্বারা বিশ্বজয়ই হইবে ভারতের জাতীয় জীবনের—গর্বোন্নত ও প্রাণ-চঞ্চল জাতীয় জীবনের—একমাত্র ভিত্তি।" ইহার পর তিনি ভারতের জাতীয় জীবনের অভিশাপস্বরূপ পরাধীনতাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন,—যে দেশের কোটি কোটি মানুষের অনাহারে মৃত্যু হয়, যে দেশ অস্পৃশ্যতা ও নারী-উৎপীড়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত, সে দেশ কখনই আধ্যাত্মিক শক্তির গর্ব করিতে পারে না। তিনি ভারতবাসীর ভীরুতা এবং জাতীয় জীবনের বহুবিধ অনাচার ও কলঙ্কের প্রতি তীক্ষ্ণ কষাঘাত করিয়া স্বাধীনতা আয়ত্ব করিবার জন্য ভারতবাসীকে শক্তি-সাধনায় উদ্বুদ্ধ হইবার আহ্বান জানাইয়া বলেন: "হায় ভারত! তুমি কি কেবল এই পাথেয় সম্বল করিয়া সভ্যতা ও মহত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে চাও? যে স্বাধীনতা কেবল সাহসী ও বীরেরাই আয়ত্ব করিতে পারে সেই স্বাধীনতা কি তুমি তোমার লজ্জাকর ভীরুতা দ্বারা লাভ করিতে পারিবে?……হে মা শক্তিদায়িনী! আমার দুর্বলতা দূর কর, আমার অপৌরুষত্ব দূর কর, আমাকে পৌরষত্ব দান কর।" "সর্বোপরি, শক্তিমান হও! পৌরুষত্ব লাভ কর! দুষ্ট লোক যদি পৌরুষত্বের অধিকারী ও শক্তিমান হয় তবে আমি সেই দুষ্টকেও শ্রদ্ধা করি, কারণ তাহার শক্তিই একদিন তাহার দুষ্ট স্বভাব দূর করিবে এবং তাহাকে সত্যের পথে লইয়া আসিবে।"(১)

এই মহান সন্ন্যাসী কেবল অতীত ভারতের গৌরবোজ্জল যুগেরই প্রচারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন নূতন আশা, ভারতের জাতীয়-জাগরণ ও স্বাধীনতার অগ্রদূত। তিনি জ্ঞান-শক্তি-আশার আলোক-বর্তিকা হস্তে ভারতের যুব-

(১) J. N, Farquhar: 'Modern Religious Movements in India, P. 213—14. & Vivekananda's Works—Part IV, Mayavati Memorial Ed. P. 970—71.

সম্প্রদায়কে স্বাধীনতা লাভের নূতন পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। ইহা লক্ষ্য করিয়াই সরকারী 'সিডিসন কমিটি' উহার রিপোর্টে বাংলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলে স্বামী বিবেকানন্দের নূতন শক্তি-মন্ত্রের বিপুল প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছে।

স্বামী বিবেকানন্দের শক্তি-সাধনার শিক্ষা বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা-সংগ্রামের উৎসরূপে দেখা দেয়। শক্তির দেবতা কালী তাহাদের প্রেরণার প্রধান উৎস হইয়া উঠে। কালী কেবল শক্তির দেবতাই নহে, ধ্বংসেরও দেবতা, আর ইংরেজ-শাসনের ধ্বংসই তাহাদের লক্ষ্য। তাই মহারাষ্ট্রে যেমন ইংরেজ ও "ম্লেচ্ছ"দের আক্রমণ হইতে হিন্দুধর্ম রক্ষার জন্য গণেশ দেবতা বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস হইয়া উঠিয়া ছিল, তেমনি শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী হইল বাংলার বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস। তাহাদের সংগ্রামের ধ্বনি হইল বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্ট "বন্দেমাতরম"—জন্মভূমি হইতে অভিন্ন শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী বা দুর্গার বন্দনা।

বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা

বঙ্কিম চন্দ্রের রচনা 'আনন্দমঠ' বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার অন্যতম মূল উৎস। 'আনন্দমঠ'এর মারফতই 'সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ' নামক ঐতিহাসিক কৃষক-বিদ্রোহের পরিচালক সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ের ত্যাগ, বৈরাগ্য ও দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণের আদর্শ বিপ্লবীদের সংগ্রামের প্রেরণা যোগায়। বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমিকে কালী দেবতারূপে অঙ্কিত করিয়া বাংলা তথা ভারতের দুর্দশার চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাঁহার অতুলনীয় বর্ণনায় সর্বাভরণ-ভূষিতা দুর্গা এবং সর্বসম্পদ-হৃতা, দুর্দশার মসি-লিপ্ত ও নগ্ন কালী দেবতার বিকট রূপের মধ্য দিয়া জন্মভূমির সমৃদ্ধিশালিনী অবস্থা হইতে চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার রূপান্তরের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাই বাংলার স্বাধীনতাকামী যুবসম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎসে পরিণত হইয়াছে।

পূর্বে মা (জন্মভূমি) ছিলেন: "এক অপরূপ সর্বাঙ্গসম্পন্না সর্বাভরণ-ভূষিতা জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি।" "ইনি কুঞ্জর, কেশরী প্রভৃতি বন্য পশু সকল পদতলে দলিত করিয়া বন্য পশুর আবাসস্থলে আপনার পদ্মাসন স্থাপিত করিয়াছেন। ইনি সর্বালঙ্কার পরিভূষিতা হাস্যময়ী সুন্দরী ছিলেন। ইনি ছিলেন বালার্ক বর্ণাভা, সকল ঐশ্বর্যশালিনী।"

আর এখন মা (জন্মভূমি) হইয়াছেন: "কালী—অন্ধকারসমাচ্ছন্ন কালিমাময়ী। হৃত সর্বস্ব, এই জন্য নগ্নিকা। আজ দেশে সর্বত্রই শ্মশান —তাই মা কঙ্কালমালিনী। আপনার শিব আপনার পদতলে দলিতেছেন।"

ভবিষ্যতে স্বাধীন ও শোষণমুক্ত মা (জন্মভূমি) হইবেন: "দশভুজা প্রতিমা নবারুণ-কিরণে জ্যোতির্ময়ী হইয়া হাসিতেছেন।...দশভুজ দশদিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত; পদাশ্রিত বীর কেশরী শত্রু-নিপীড়নে নিযুক্ত। দিগভুজা—নানা প্রহরণ-ধারিণী শত্রুবিমর্দিনী—বীরেন্দ্র শ্রেষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী —বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী—সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ।"(১)

ভবানী-মন্দির

কালী, দুর্গা, শক্তি—এই কয়টি শক্তি ও ধ্বংসের দেবতার বিভিন্ন নাম। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের রচিত 'ভবানী-মন্দির' নামে যে পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় তাহাতেও দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে শক্তিরূপিনী ভবানী-দেবীর পূজার আদর্শ প্রচারিত হয়। ষোল পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানির গোড়ার দিকে সন্নিবিষ্ট ভবানী-স্তবে ভবানীর নিকট স্বাধীনতা-সংগ্রামে জয় লাভের জন্য শক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে। শিবাজী যেমন উচ্চ শৈল-শিখরে ভবানী-দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই ধরনের একটি ভবানী-মন্দির

(১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়: "আনন্দমঠ", গ্রন্থাবলী সংস্করণ।
(2) Quoted from "Sedition Commilte Report", P. 101.

স্থাপনের পরিকল্পনা এই পুস্তিকাটিতে দেওয়া হয়। এই মন্দির নির্মাণের স্থান হইবে "আধুনিক শহরের দূষিত প্রভাব হইতে বহু দূরে, শান্তি ও শক্তি-সমন্বিত উচ্চ ও পবিত্র বায়ু-প্রবাহিত নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে।" এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে একটি দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ কর্মীদল। পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ হইবে তাহাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য পালন হইবে বাধ্যতামূলক। ব্রহ্মচর্য পালনের সময় দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের উপর ন্যস্ত কর্তব্য প্রত্যেককে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই কর্তব্য পালনের পরেই তাহারা গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। একটি সুগঠিত রাজনৈতিক সন্ন্যাসীদল গড়িয়া তোলাই ছিল এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য।

ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ

শক্তি ও ধ্বংসের দেবতা কালী, দুর্গা বা ভবানীর নিকট আত্মনিবেদন করিয়া বিপ্লবীরা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিত। এই ধ্বংসের দেবতাদের সন্তুষ্টির জন্য বলির প্রয়োজন, অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীরাই হইবে সেই বলি। এইভাবে হিন্দুধর্মের সহিত নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ মিশিয়া এক হইয়া যায়। ধর্মের সহিত জাতীয়তাবাদের এই মিলন বাংলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের গুরু অরবিন্দের ভাষায় আরও স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

"জাতীয়তাবাদ একটা ধর্ম, ভগবানই ইহার উৎস। জাতীয়তাবাদের মৃত্যু নাই, কারণ স্বয়ং ভগবানই বাংলাদেশে ইহা পরিচালনা করিতেছেন। ভগবানকে হত্যা করা যায় না, তাঁহাকে বন্দীশালায় আবদ্ধ করাও চলে না।"(১)

বৈদেশিক ঘটনাবলীর প্রভাব

১৯০৫ খৃস্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট প্রবল-প্রতাপান্বিত জারের রুশিয়ার অভাবনীয় পরাজয় সমগ্র এশিয়ার জাগরণ-

(১) Speech of Aurobindo Ghose—Quoted from H. F. Zacheria's "Renascent India," P. 149.

শীল জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। জাপানের জয়লাভ ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার বিপ্লবীদের গভীর প্রেরণা যোগায়। তাহারা এই জয়কে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের দুর্দ্ধর্ষ সামরিক শক্তির উপর "এসিয়ার আধ্যাত্মিক শক্তির জয়" বলিয়া গ্রহণ করে। য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের প্রবল সামরিক শক্তি অপরাজেয় নহে এবং এই সামরিক শক্তিকেও শক্তি-সাধনার দ্বারা পরাজিত করা সম্ভব—এই ধারণা বিপ্লবীদের ইংরেজ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করে। কেবল তাহাই নহে, ইতালীর জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সাফল্য এবং আয়ার্লণ্ডের "হোম-রুল"-এর সংগ্রাম হইতেও তাহারা যথেষ্ট প্রেরণা লাভ করে।

এই সময়ে "ভারতের বাহিরের ঘটনাবলী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। সমগ্র পৃথিবীতে য়ুরোপের প্রভুত্ব খর্ব হইবার লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। দীর্ঘ 'বুয়র যুদ্ধ'-এর অনিশ্চিত অবস্থা, তুর্কদের হস্তে গ্রীকদের পরাজয়, নিকট-প্রাচ্যে খৃস্টানদের হত্যা এবং সর্বোপরি রুশিয়ার সহিত যুদ্ধে জাপানের বিরাট জয়—এই সকল ঘটনার তাৎপর্য তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে।"(১)

এই সকল ঘটনা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং বিশেষ করিয়া চরমপন্থীদের মনে সাফল্য সম্পর্কে ভরসা ও নিশ্চয়তা জাগাইয়া তোলে। "তৎকালীন ঘটনাবলী হইতে এসিয়ার জাতীয়তাবাদ গভীর প্রেরণা লাভ করে। য়ুরোপ অপরাজেয়—এই ধারণা সেই সকল ঘটনা দ্বারা অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। ১৯০৪-৫ খৃস্টাব্দে এসিয়ার একটা ক্ষুদ্রশক্তি রুশিয়ার বিরাট স্থল-বাহিনীকে মাঞ্চুরিয়ায় পরাজিত করে এবং রুশিয়ার গোটা নৌ-বহর শুশিমার যুদ্ধে ধ্বংস করিয়া ফেলে।...... চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা ইহা হইতে ধারণা করে যে, যে বিরাট শক্তি (রুশিয়া) এতদিন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদকেও সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল, সেই শক্তিটাকে যদি জাপানীরা এত সহজে পরাজিত করিতে পারে, তাহা হইলে

(১) Thomson and Garrat: "British Rube in India", P. 548.

যেহেতু ভারতবাসীরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে জাপানীদের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত, সেই হেতু তাহারাও ইংরেজদের পরাজিত করিতে পারিবে—অবশ্য যদি তাহারা সত্যই তাহাদের দেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। এদিকে 'বুয়র-যুদ্ধ'-এও বৃটিশ সামরিক শক্তি সম্পর্কে পূর্বের উচ্চ ধারণা যথেষ্ট ক্ষুন্ন হইয়াছিল। এই অবস্থায় বাংলার যুবসম্প্রদায় অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও অন্যান্য বিপ্লবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে বিলম্ব করিল না। অরবিন্দ প্রভৃতি নেতারা ইতালী ও আয়ার্লণ্ডের জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম ঘোষণা করিলেন।" (১)

তৃতীয় অধ্যায়

বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন—(১)

মহারাষ্ট্রে

মহারাষ্ট্রের জাতীয়তাবাদ ও বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণার উৎস ছিল 'গণপতি-উৎসব' ও 'শিবাজী-উৎসব'। এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়াই বাল গঙ্গাধর তিলকের চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ সাংগঠনিক রূপ গ্রহণ করে। এই দুই উৎসব উপলক্ষ করিয়াই মহারাষ্ট্রে প্রথমে বিভিন্ন সমিতি ও গুপ্তদল গড়িয়া উঠে। 'সার্বজনিক গণপতি উৎসব' প্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে। প্রথমে এই উৎসব কোন সাম্প্রদায়িক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া শুরু হইলেও ইহা অবিলম্বে প্রধানতঃ বৃটিশ-বিরোধী উৎসবে পরিণত হয়। আর সরাসরি বৃটিশ-বিরোধী ধ্বনি লইয়াই ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে প্রথম অনুষ্ঠিত হয় 'শিবাজী-উৎসব'। তখন হইতে এই দুইটি উৎসব মহারাষ্ট্রীয় যুবসম্প্রদায়ের জাতীয় জাগরণ এবং বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শ ও প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়।

(১) L. Hutchinson : "Empire of the Nabobs", P. 194.

এই উৎসব উপলক্ষে প্রকাশ্যে মহারাষ্ট্রীয় যুবকগণের ছোরা-তরবারি খেলা, ব্যায়াম, শোভাযাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইত। যুবকদের এক-একটি দল এক-একটি গণপতি দেবতার মূর্তি লইয়া মিছিল বাহির করিত, মিছিল হইতে রাস্তায় রাস্তায় জ্বালাময়ী ভাষায় বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতা হইত, ধ্বনি দেওয়া হইত এবং স্কুলের বালকগণ রাস্তায় রাস্তায় বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিবার শপথ গ্রহণ করিত। অবশেষে বড় বড় নেতারা প্রকাশ্য-জনসভায় বৃটিশ-বিরোধী বক্তৃতা করিতেন।

চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়

তিলক মহারাষ্ট্রের এই জাতীয় জাগরণের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রেরণা-দাতা হইলেও তাঁহার প্রাধন শিষ্যেরাই সাংগঠনিক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে দামোদর চাপেকার ও বালকৃষ্ণ চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা এবং গণেশ সাভারকর ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামে দুই ভ্রাতার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিলকের দ্বারা সম্পাদিত দৈনিক 'কেশরী' পত্রিকা, পুনার শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপের দ্বারা সম্পাদিত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'কাল' ও কৃষ্ণবর্মার দ্বারা সম্পাদিত লণ্ডন হইতে প্রকাশিত মাসিক পত্রিকা 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিষ্ট' উক্ত সংগঠন গুলিকে আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইত।

১৮৯৫ খৃস্টাব্দে চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় বহু ছোট ছোট যুব-সংগঠন একত্র করিয়া পুনায় 'হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশের সংঘ' নামে একটি সংগঠন তৈরী করেন। ইহাই মহারাষ্ট্রে প্রথম সুগঠিত ও কেন্দ্রবদ্ধ সংগঠন। এই সংঘে যুবকদিগকে শারীরিক ব্যায়াম, সামরিক শিক্ষা, লাঠিখেলা প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইত। পুলিশের দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই এই সংঘ ধর্মীয় নাম গ্রহণ করিয়াছিল।

বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রস্তুতিই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে এই সংঘ ইংরেজদের উপর প্রথম আঘাত শুরু করে। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে

একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন উক্ত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় একত্রে পুনার দুই অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীকে হত্যা করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্বোধন করেন. এবং তাঁহাদের আগ্নেয়াস্ত্র হইতে নিক্ষিপ্ত অগ্নি-গোলকই বাংলা ও সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের "অগ্নি-যুগ"-এর আরম্ভ ঘোষণা করে।

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা

ভারতবর্ষের বাহিরে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচার-আন্দোলন চালনার দিক হইতে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার দান প্রথম স্মরণীয়। কেবল প্রচার-কার্যই নহে, ভারতবর্ষের, বিশেষ করিয়া দাক্ষিণাত্যের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে আদর্শ ও প্রেরণা দান করিয়া তিনি এই সংগ্রামকে শক্তিশালী করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রচারিত আদর্শ হইতেও দাক্ষিণাত্যের বিপ্লবীরা যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছিল। তিনি ১৯০৫ খৃস্টাব্দে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়া হোম-রুল-সোসাইটি' নামে একটি সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি নিজে ইহার সভাপতি হন। ভারতীয় যুবকগণ যাহাতে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়া ভারতের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিতে সক্ষম হয় তাহার জন্য তিনি ছয়টি বৃত্তি ঘোষণা করেন। এই বৃত্তির পরিমাণ ছিল জন-প্রতি এক হাজার টাকা। কৃষ্ণ বর্মার বৃত্তি লইয়া সেই সময়ে যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন নাসিকের বিনায়ক দামোদর সাভারকর তাঁহাদের অন্যতম।

এই সময়ে পারী নগরীতে এস. আর. রাণা নামে এক ভারতীয় ভদ্রলোকও কৃষ্ণ বর্মার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও একজন মুসলমান-শাসকের নামে তিনটি বৃত্তি দান করেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল দুই হাজার টাকা।

ইংলণ্ডে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালনার জন্য কৃষ্ণ বর্মা 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিষ্ট' নামে একটি মাসিক পত্র প্রকাশিত করেন।

তিনি নিজেই ছিলেন ইহার সম্পাদক। এই মাসিক পত্রিকাখানিতে অন্যান্য বিষয়ের সহিত ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কেও আলোচনা করা হইত। এই সকল আলোচনা মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের সংগঠনের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিষ্ট' পত্রিকায় ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কর্মপদ্ধতি, উদ্দেশ্য ও সংগঠন সম্পর্কে এইমত ব্যক্ত করা হয়ঃ

"সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের আন্দোলন গোপনভাবে চালাইতে হইবে, এবং কেবলমাত্র রুশীয় (নিহিলিস্ট) কর্মপদ্ধতিতেই ইংরেজ-সরকারকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া সম্ভব হইবে। যে পর্যন্ত না ইংরেজরা তাহাদের অত্যাচার বন্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং এই দেশ হইতে বিতাড়িত হয় সেই পর্যন্ত এই রুশীয় পদ্ধতি পূর্ণোদ্যমে অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু কোন একটা বিশেষ কর্মপদ্ধতির নিয়ম-কানুন ও ক্রিয়া-কলাপ কি হইবে তাহা (এতদূর হইতে) কেহই নির্দিষ্ট করিয়া বলিয়া দিতে পারে না। তাহা সম্ভবতঃ স্থানীয় পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনার উপরেই নির্ভর করিবে, কিন্তু ইহা খুবই সম্ভব যে, সাধারণ নীতি হিসাবে রুশীয় পদ্ধতি অনুসারে য়ুরোপীয় কর্মচারীদের দিয়া কাজ আরম্ভ না করিয়া ভারতীয় কর্মচারীদের দিয়াই কাজ আরম্ভ করা উচিত।"(১) কৃষ্ণবর্মার এই কর্মনীতি সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়কে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের সংগঠনের ভিত্তি হিসাবে রুশিয়ার যে সন্ত্রাসবাদী 'নিহিলিস্ট' আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা কৃষ্ণবর্মার নিকট হইতেই শিক্ষা করেন।

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল বোম্বাইপ্রদেশের নাসিকশহর। পুণার পরেই নাসিক মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে মহাত্মা শ্রীঅগম্যগুরু পরমহংস নামে এক সাধু এক বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন। তখন এই সাধু সারা ভারতবর্ষে ঘুরিয়া

(১) Quoted from the Sedition Committee Report, P. 6.

ঘুরিয়া নির্ভীকভাবে বৃটিশ-সরকারের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইতেন। তিনি তাঁহার প্রচারে বলিতেন: বৃটিশ-শাসনকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই, ভারতবাসীদিগকে আত্মত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই সরকারকে উচ্ছেদ করাইতে হইবে।

মহাত্মা অমগ্যগুরুর প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া একদল ছাত্র ১৯০৬ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে পুণাশহরে একটি সংঘ গঠন করে। বিনায়ক সাভারকর এই সংঘের নায়ক নির্বাচিত হইয়া মহাত্মার সহিত সাক্ষাতের জন্য পুণায় আমন্ত্রিত হন। পুণায় উপস্থিত হইয়া সাভারকর মহাত্মার এই আন্দোলন সফল করিয় তুলিবার উদ্দেশ্যে নয় জন লোক লইয়া একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। পুণার ফার্গুসন কলেজের নয় জন ছাত্র লইয়া এই কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি পুণার সকল লোকের নিকট হইতে এক আনা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিতে শুরু করে। এই চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-বিরোধী প্রচার ও সংগ্রামের জন্য তহবিল গঠন। কিন্তু ১৯০৬ খৃস্টাব্দের জুনমাসে সাভারকর ইংলণ্ডে চলিয়া আসিলে এই সংঘটি উঠিয়া যায় এবং ইহার অধিকাংশ সভ্য 'অভিনব ভারত সংঘ' নামক আর একটি সংগঠনে যোগদান করে। বিনায়ক সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর ছিলেন এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। বিনায়কের ইংলণ্ড-যাত্রার পূর্বেই ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে নাসিকশহরে তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর একত্রে 'মিত্র মেলা' নামে একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। 'গণপতি-উৎসব' উপলক্ষ করিয়া 'মিত্র মেলা' গঠিত হইলেও কেবল মাত্র 'গণপতি উৎসব' পালন করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল না, বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের আয়োজন করাই ছিল ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। গণেশ সাভারকর এই সংঘের সভ্যদের শারীরিক ব্যায়াম, ছোরা-খেলা, সামরিক কুচকাওয়াজ শিক্ষা দিতেন। এই সংঘটিই অল্প কিছুদিন পরে ইতালীর সন্ত্রাসবাদী সংগ্রামের নায়ক ম্যাৎসিনির 'নব্য ইতালী' নামক সংঘের আদর্শে 'অভিনব নব্য ভারত-সংঘ' নামে পুনর্গঠিত হয়। বিনায়ক ইংলণ্ড-যাত্রার পূর্বেই এই নূতন সংঘটি প্রতিষ্ঠা করেন। নাসিক-শহরই ছিল এই সংঘের প্রধান কর্মকেন্দ্র।

'অভিনব নব্য ভারত-সংঘ'এর আদর্শগত ভিত্তি ছিল চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের 'হিন্দুধর্মের অন্তরায় বিনাশের সংঘ' হইতে আরও গভীর ও ব্যাপক। 'অভিনব নব্য ভারত-সংঘ'এর প্রত্যেকটি সভ্যকে গণপতি ও শিবাজীর নামে কঠিন শপথ করিতে হইত। এই সংঘের বিভিন্ন দলিল-পত্র হইতে প্রমাণিত হয় যে, ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণ (সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়) রুশিয়ার বিভিন্ন বৈপ্লবিক সংঘের আদর্শেই ইহাকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা ফ্রস্টসাহেবের রচিত '১৭৭৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত য়ুরোপীয় বিপ্লবের গোপন সংঘ'(১) নামক গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। এই গ্রন্থে সারা রুশিয়াব্যাপী 'নিহিলিস্ট'দের(২) সংগঠন-পদ্ধতির যে বিবরণ দেওয়া আছে তাহা 'অভিনব নব্য ভারত-সংঘ'এর সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করা হয়। 'নিহিলিস্ট'রা এক-একটি ক্ষুদ্র এলাকায় এক-একটি ক্ষুদ্র 'চক্র' বা দল গঠন করিত, সেই 'চক্র' বা দল একটি বৃহত্তর এলাকার পরিচালক-কমিটির অধীনে পরিচালিত হইত। প্রত্যেক চক্র বা দলের সভ্যগণ পরস্পরকে চিনিত, কিন্তু অপর কোন চক্রের সভ্যদের তাহারা জানিতে পারিত না। 'অভিনব নব্য ভারত-সংঘ'টিকেও ঠিক এই সাংগঠনিক পদ্ধতিতে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল। বিনায়ক সাভারকর ইংলণ্ডে চলিয়া গেলে ইহার পরিচালনার ভার পড়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের উপর। গণেশের সুযোগ্য পরিচালনায় শীঘ্রই সারা দাক্ষিণাত্যে ইহার শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে যখন 'নাসিক-ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয় তখন এই সংঘের শাখা-প্রশাখা দাক্ষিণাত্যের বোম্বাই, নাসিক (প্রধান কেন্দ্র), পুণা, পেন, ঔরঙ্গাবাদ, হায়দরাবাদ, সাতারা প্রভৃতি স্থানে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং এই সকল কেন্দ্রের কর্মীরা এই ষড়যন্ত্র-মামলায় অভিযুক্ত হইয়াছিল।(৩)

বিনায়ক সাভারকর বিদেশ হইতে নির্দেশ ও প্রবন্ধ পাঠাইয়া এই সংঘের আদর্শ ও প্রেরণা যোগাইতেন। এই সংঘের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও দৃঢ় এবং

(১) Frost: "Secret Societies of Europian Revolution, 1776 to 1876."
(২) রুশিয়ার সন্ত্রাসবাদী দল।
(৩) Sedition Committee Report,, P. 10—11.

ব্যাপকতর করিয়া তুলিবার জন্য তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের বৈপ্লবিক সংগঠন হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহা ভারতবর্ষে প্রেরণ করিতেন। ইংলণ্ডে থাকা কালেই তিনি ইতালীর বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদী নায়ক ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়া উহা তাঁহার ভ্রাতা গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে গণেশ এই গ্রন্থখানি ছাপাইয়া সংঘের সভ্যদের মধ্যে বিতরণ করেন। এই অনুবাদের ভূমিকায় বিনায়ক উক্ত সংঘের আদর্শ ও সংগঠন সম্পর্কে তাঁহার মত ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁহার এই ভূমিকায় বলেন যে, রাজনীতিক একটি ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে। তিনি শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামীকে "ভারতবর্ষের ম্যাৎসিনি" আখ্যা দান করেন। তিনি তাঁহার ভূমিকায় আরও বলেন যে, ম্যাৎসিনি যেমন ইতালীর স্বাধীনতার জন্য যুবসম্প্রদায়ের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন, ভারতবর্ষেও সেইরূপ করিতে হইবে। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামের দ্বিবিধ কার্যসূচী ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য পার্শ্ববর্তী দেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিয়া মজুদ করিতে হইবে এবং যখনই সময় আসিবে তখনই তাহা ব্যবহার করিতে হইবে; ক্ষুদ্র ও গোপন কারখানায় অস্ত্র তৈরীর ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারখানাগুলি দূরে দূরে স্থাপন করিতে হইবে, ইত্যাদি।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় শহীদ মদনলাল ধিংরার ফাঁসী উপলক্ষে রচিত 'বন্দেমাতরম' নামক একখানি পুস্তিকায় বিনায়ক দামোদর সাভারকর স্পষ্ট ভাষায় ভারতীয় সন্ত্রাসবাদের কর্মপন্থা এবং বৈপ্লবিক কার্যসূচী ও বিপ্লবের ভবিষ্যৎ-চিত্র ব্যাখ্যা করেন। এই পুস্তিকায় তিনি লেখেন ঃ

"ইংরেজ ও ভারতীয় সরকারী কর্মচারীদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি কর, সরকারের উৎপীড়ন-যন্ত্রের ধ্বংস আর বেশী দূরে নয়। ক্ষুদিরাম বসু, কানাইলাল দত্ত ও অন্যান্য শহীদগণ অব্যাহতভাবে যে নীতি কার্যকরী করিয়া আসিয়াছে সেই নীতি অব্যাহতভাবে কার্যে পরিণত করিতে থাকিলেই অচিরে ভারতের বৃটিশ সরকার পঙ্গু হইয়া পড়িবে। এই বিচ্ছিন্ন হত্যার অন্দোলনই আমলাতন্ত্রকে

জীব ও জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সুচিন্তিত উপায়। বিপ্লবের প্রথম স্তরের নীতি হইবে বিচ্ছিন্ন হত্যার নীতি।"(১)

'গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ'

সাভারকর-ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নাসিকের "অভিনব ভারত-সংঘ"এর সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যে "গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ" নামে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে। এই প্রতিষ্ঠানটির সংগঠন-পদ্ধতিও কৃষ্ণ বর্মা ও বিনায়ক সাভারকরের আদর্শের ভিত্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সংঘ'এর নিয়মাবলীর চতুর্থ দফার ইহার কার্য ও সংগঠন-পদ্ধতি এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে :

প্রকৃত "শিক্ষালাভ ও স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনার দুইটি উপায় আছে। শিক্ষার মধ্যে থাকিবে স্বদেশী গ্রহণ, বিদেশী-বর্জন, জাতীয় শিক্ষা, মাদক-দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জন, বিভিন্ন ধর্মোৎসব, বক্তৃতার ব্যবস্থা, পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, আর আন্দোলনের মধ্যে থাকিবে আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা লক্ষ্যভেদের অভ্যাস, তরবারি-শিক্ষা, বোমা ও ডিনামাইট তৈরী শিক্ষা, রিভলভার সংগ্রহের ব্যবস্থা, বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা করা এবং অপরকে শিক্ষা দেওয়া। যখন কোন প্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হইবে তখন সেই অভ্যুত্থান সমর্থন করা ও তাহার মারফত স্বাধীনতা লাভ করাই হইবে সকলের কর্তব্য। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের এই আর্যভূমি ইহার নিজের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম।......আত্মবিশ্বাস দাসত্ব দূর করিবার একটি প্রধান উপায়; আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, যদি ভারতের ত্রিশ-কোটি মানুষ এক হইয়া সংগ্রাম করে তাহা হইলে কেহই তাহাদের লক্ষ্য-সিদ্ধির পথে বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। সর্বপ্রথম মানসিক প্রস্তুতির জন্য শিক্ষা দিতে হইবে; তাহার পর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতে হইবে; ধূর্ততা ও কৌশলের দ্বারাই ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইতে হইবে।"(২)

(১) Quoted from "Sedition Committee Report" P. 11.
(২) Quoted from Sedition Committee Report, P. 12.

চতুর্থ অধ্যায়

কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন—(২)

বঙ্গীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পূর্ব-ইতিহাস

বাংলাদেশে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন ১৯০২-৩ খৃস্টাব্দে প্রথম স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলেও পূর্ব হইতেই বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারা ও বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু হইয়াছিল সেই সকল চেষ্টা কালের অমোঘ নিয়মে ব্যর্থ হইয়া গেলেও তাহার গভীর প্রভাব শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে চলিয়া আসিয়াছে। এই ভাবধারা, পরবর্তীকালের বৈপ্লবিক ভাবধারা ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টার সহিত যুক্ত হইয়া বাংলার বিপ্লববাদের পূর্ণ ইতিহাস গড়িয়া তুলিয়াছে। বাংলার বিপ্লববাদের ঐতিহাসিক মূল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে নিহিত।

"বিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে বাংলার বিগত ৮০ বৎসরের ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে। বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্তমান বাংলার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না; কারণ ইহা বিদেশ হইতে আমদানি-করা নহে। ইহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ক্রমবিকাশের একটি স্তর মাত্র। রামগোপাল ঘোষের সময় হইতে 'ইয়ং বেঙ্গল'এর (নব্য বঙ্গের) অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুর বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু-মহামেলা, 'ন্যাশনাল পেপার'এর সংস্থাপনা; 'ন্যাশনাল থিয়েটার'এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেম মূলক নাটকসমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান-কারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপনা; শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশসেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা ও 'ষ্টুডেণ্টস্ এসোসিয়েশন' স্থাপনা এবং শেষে 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ও কংগ্রেসের কার্য; শিশির-কুমার ঘোষের বৈপ্লবিক জল্পনা-কল্পনা; তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম—এইগুলি বাংলার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পর পর স্তর, একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে ধরা যায় না।"(১)

(১) রামমোহন ও ব্রাহ্মসমাজ

বাংলার বৈপ্লবিক ভাবধারার মূল উৎস দুইটি: ভারতের পরাধীন অবস্থা ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা, পরাধীন অবস্থার পটভূমিকায় ভারতীয় শিক্ষা ও উন্নত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংঘর্ষ হইতে ভারতীয় সমাজে একটা নূতন চিন্তাধারা দেখা দেয়। এই চিন্তাধারার প্রথম বাহন ছিলেন রামমোহন রায়। তিনিই প্রথম য়ুরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া মানব-ইতিহাসের যুগান্তকারী 'ফরাসী-বিপ্লব'এর ভাবাধারায় দীক্ষিত হন। কিন্তু তিনি তাঁহার বৈপ্লবিক চিন্তাধারা প্রয়োগের জন্য রাজনীতি অপেক্ষা দেশের সমাজকেই বিশেষ ক্ষেত্ররূপে বাছিয়া লন। তিনি প্রধানতঃ সমাজ-সংস্কারক বলিয়া পরিচিত হইলেও রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাঁহার প্রচেষ্টার সাক্ষ্য মেলে। পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত তাঁহার কয়েকখানি পার্শী ভাষায় লিখিত পত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, রামমোহন তাঁহার সময়ে দিল্লীর নামমাত্র বাদশাহকে কেন্দ্র করিয়া বিদেশী ইংরেজ-রাজের উচ্ছেদের জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।(২) তিনি 'ফরাসী-বিপ্লব'এর প্রতীক ফরাসীদেশের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকার প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাইতেন এবং কলিকাতায় 'ফরাসী-বিপ্লব'এর অন্যতম প্রধান ঘটনা বাস্তিল-দুর্গের পতন-উৎসবের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬।

(২) ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রামমোহন স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা।

রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা সমগ্রভাবে রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা না হইলেও তাঁহার চিন্তাধারা সামাজিক ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক আলোড়ন আনিয়া দিয়াছিল তাহা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের দিকে টানিয়া আনে। রামমোহনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া বাংলার সমাজে এক নূতন বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রবর্তন করে। এইজন্যই গোড়ার দিকের বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। "আজ ইহা শুনিলে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভ্যদলের অনেকের উপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে একবার আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, বাছা বাছা বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মসমাজভুক্ত বা ব্রাহ্মসমাজের ছায়াশ্রিত ছিলেন, এবং বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখা যায় যে, যে-প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজ, প্রার্থনা-সমাজ বা আর্যসমাজ......একটা নূতন চিন্তাস্রোত আনিয়াছে, সেই সব জায়গায় আজ জাতীয় আন্দোলন ও স্বাধীনতা-স্পৃহা বিশেষ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে।"(১)

(২) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টা

জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর-পরিবারের জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বৈপ্লবিক ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন। তিনি 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই গুপ্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন পরবর্তীকালের ফাঁসীর সত্যেনের খুল্লতাত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়। 'হিন্দু-মেলা'র উদ্যোক্তা নবগোপাল মিত্র ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন সেই গুপ্ত সমিতির সভ্য। রবীন্দ্রনাথের 'আত্মপরিচয়' নামক পুস্তিকায় এই গুপ্ত সমিতির সম্পর্কে একটি চিত্র পাওয়া যায়ঃ

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৭।

"জ্যোতি দাদা এক পোড়ো বাড়ীতে এক গুপ্ত সভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়ো বাড়ীতে তার অধিবেশন, ঋগবেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"(১)

৩। 'হিন্দুমেলা'

রাজনারায়ণ বসু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সঞ্জীবনী সভা'র সভাপতি থাকিলেও তিনি নিজে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমিতি সঞ্জীবনী সভা'র সহিত মিলিতভাবেই পরিচালিত হইত। নবগোপাল মিত্র, ডাঃ সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ বসুমহাশয়ের দলের সদস্য হইয়াছিলেন।

নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির উদ্যোগে 'হিন্দু মেলা' নামে একটি বার্ষিক অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। নবগোপাল মিত্র ছিলেন 'হিন্দু মেলা'র প্রধান উদ্যোক্তা। শিক্ষিত হিন্দু-যুবকদের মনে বৈপ্লবিক ভাবধারা জাগাইয়া তোলাই ছিল ইহার মূল উদ্দেশ্য। 'হিন্দু মেলা'র অপর নাম ছিল 'চৈত্র মেলা'। এই মেলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন :

"আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়-সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্যও নহে, ইহা স্বদেশের জন্য,—ইহা ভারত-ভূমির জন্য।"(২)

৪। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রচেষ্টা

১৮৭১ খৃস্টাব্দে দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায় দুর্গামোহন দাস, ডাঃ সুন্দরী-মোহন দাস প্রভৃতি ব্রাহ্মসমাজের তরুণ কর্মীদের লইয়া একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির সভ্যপদে দীক্ষা গ্রহণের সময় একটি

(১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "আত্ম পরিচয়," পৃঃ ৮।
(২) সুকুমার রায়ের "স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস" হইতে গৃহীত," পৃঃ ৬০।

প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহা যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করিতে হইত। প্রতিজ্ঞা-পত্রে লিখিত থাকিত: "স্বায়ত্ব শাসনই আমরা বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া গ্রহণ করি। তবে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমানে সরকারের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব, কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনই এই সরকারের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

তৎকালীন হিন্দু-মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদের সরকারী চাকুরিলাভই ছিল জীবনের প্রধান লক্ষ্য। এই প্রলোভন হইতে যুবকদের নিবৃত্ত করিয়া ইংরেজ-বিরোধী বিদ্রোহী মনোভাব জাগাইয়া তাহাদের দেশ-সেবায় নিযুক্ত করাই ছিল শিবনাথ শাস্ত্রীর দলের উদ্দেশ্য। এই দলের কার্যসূচীতে নারীর মুক্তি, উন্নত ও জাতীয়তামূলক শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতির সহিত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা (স্বায়ত্ব শাসন) লাভের এক পরিকল্পনা স্থান পায়। এই দল উহার আদর্শ-রূপে ঘোষণা করে: "অন্যায়ের উপর ন্যায়ের, অসাম্যের উপর সাম্যের, রাজ-শক্তির উপর প্রজা-শক্তির প্রতিষ্ঠা দ্বারা পৃথিবীব্যাপী এক মহাসাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা।"(১)

আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এই দলে যোগদান করিয়াছিলেন। গোড়ার দিকে আনন্দমোহন বিশ্বাস করিতেন যে, বিপ্লবদ্বারাই ভারতের স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। পরে তাঁহার এই ধারণা বদলাইয়া যায় এবং নূতন ধারণা জন্মে যে, ভারতের পক্ষে সমাজ-সংস্কারই সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

৫। সুরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা

সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু একসঙ্গেই ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রচেষ্টা শুরু করেন এবং তাঁহারা উভয়েই শিবনাথ শাস্ত্রীর বৈপ্লবিক দলে যোগ দেন। সুরেন্দ্রনাথ

(১) যোগেশচন্দ্র বাগল: "মুক্তির সন্ধানে ভারত"।

শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় সর্বপ্রথম 'ছাত্র-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছাত্র-সমিতি'র সভাতেই তিনি ভারতবর্ষে প্রথম ইতালীর বিপ্লববাদী নেতা ম্যাৎসিনিকে পরিচিত করেন। ইহা ব্যতীত তিনি এই সমিতির অধিবেশনে 'ম্যাৎসিনি ও নব্য ইতালী', 'শিখ-শক্তির অভ্যুদয়', 'চৈতন্য ও সমাজ-বিপ্লব' প্রভৃতি বিষয়ের উপর যে সকল বক্তৃতা করেন তাহা শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের উপর বৈপ্লবিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। এই সকল বক্তৃতার জন্য কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি নরমপন্থী নেতারা তাঁহাকে "ম্যাৎসিনির মাথা-গরম শিষ্য" বলিয়া গালি দিতেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দে যখন বাংলাদেশে 'অনুশীলন সমিতি' নামে প্রথম স্থায়ীভাবে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও সুরেন্দ্রনাথ সেই উদ্যোগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। অনুশীলন সমিতির বিখ্যাত সভাপতি ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র মহাশয় (পি. মিত্র) ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পরবর্তীকালে যখন বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রাম পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে তখন আর তিনি সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী না থাকিলেও গুপ্ত সমিতিকে অর্থ-সাহায্য করিতেন এবং উহার সংবাদ রাখিতেন।

৬। বঙ্কিম-হেম-ভূদেব-বিদ্যাভূষণের প্রচেষ্টা

"বঙ্কিমবাবু (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) যখন হুগলীতে কাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ভূদেববাবু (ভূদেব মুখোপাধ্যায়) তথায় চাকুরি করিতেন। তাঁহারা দেশকে জাগাইবার জন্য নানা পরামর্শ করিতেন।"(১) তাঁহাদের মনে বিপ্লবের কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকিলেও তাঁহারা দেশকে জাগাইয়া তুলিবার উপায় হিসাবে বিপ্লবের পথকেই একমাত্র পথ বলিয়া মনে করিতেন এবং বৈপ্লবিক প্রেরণা-উদ্দীপক সাহিত্য সৃষ্টির উপর জোর দিতেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া এই কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টার ফলে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয় তাহা বাংলার বিপ্লববাদের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল। এই উদ্দেশ্য লইয়াই সৃষ্টি হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' ও

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম," পৃঃ ৭৮।

'দেবীচৌধুরাণী', হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের গ্রন্থাবলী, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা' প্রভৃতি যুগান্তকারী সাহিত্য। এই দলভুক্ত ভূদেব বাবুর ভাগিনেয় চন্দননগর-নিবাসী তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁহাদের পরামর্শেই ভারতের সংবাদসমূহ চন্দননগরের ফরাসী কাগজে প্রকাশ করিতেন।"

এই মনীষীগণ কেবল বৈপ্লবিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা তাঁহাদের বৈপ্লবিক চিন্তাধারাকে কালোপযোগী সংগঠনে রূপদান করিবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিয়া তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে চন্দননগরে ও হুগলীর আশে-পাশে শরীর-চর্চার জন্য আখড়া স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন। তিনকড়িবাবু সেই নির্দেশ অনুসারে ঐ সকল অঞ্চলে কয়েকটি আখড়া স্থাপন করেন। সেই সকল আখড়ায় শরীর-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত বৈপ্লবিক সাহিত্য পাঠ ও আলোচনা চলিত। বর্তমান কালে ইহা হাস্যকর বলিয়া মনে হইলেও সেই সময়ে শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপনের একটা বৈপ্লবিক তাৎপর্য ছিল, তৎকালে কেবল ইহার জন্যই অনেকে সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়াছিলেন। এই সকল আখড়া স্থাপন ও ফরাসী কাগজে ভারতীয় সংবাদ প্রকাশ করিবার জন্য তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ইংরেজ-সরকারের কোপ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া সাতবৎসর পণ্ডিচেরীতে পলাইয়া থাকিতে বাধ্য হন। পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অতি বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার পুত্রসহ সেই গুপ্ত সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন।(১)

৭। স্বামী বিবেকানন্দের প্রচেষ্টা

স্বামী বিবেকানন্দ কেবল সমাজ-সংস্কার ও শক্তির বাণী প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি যে দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাও শুরু করিয়াছিলেন তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।

(১) 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃঃ ৮৭।

একথা তিনি অনেক পূর্বেই উপলব্ধি করেন যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত সমাজ-সংস্কার, জনগণের আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রভৃতি কিছুই সম্ভব নয়।(১) সম্ভবতঃ ইহা উপলব্ধি করিয়াই তিনি বিপ্লবের উদ্দেশ্যে দলগঠন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মার্কিন-শিষ্যা ভগ্নি গ্রিনস্টিডল্-এর (Miss Grinstidle) নিকট তাঁহার বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন :

"......বিপ্লবোদ্দেশ্যে আমি সমগ্র ভারত ঘুরিয়াছি। আমি কামান প্রস্তত করিব। আমি স্যার হিরাম ম্যাক্সিম-এর (Sir Hiram Maxim)(২) সহিত বন্ধুত্ব করিয়াছি—কিন্তু ভারত গলিত হইয়াছে (India is in Putrefaction)। এই জন্যই আমি একদল কর্মী চাই, যাহারা ব্রহ্মচারী হইয়া দেশের লোককে শিক্ষা দান করিয়া এই দেশকে পুনঃসঞ্জীবিত করিতে পারিবেন।"

স্বামীজী সখারাম গণেশ দেউস্করের নিকটেও "ঠিক এই কথা বলিয়াছিলেন যে, তিনি (স্বামীজী) দেখিয়া যাইবেন, ভারত একটি বারুদের স্তূপ হইয়া আছে। তিনি তাঁহার জীবদ্দশাতেই বিপ্লব দেখিয়া যাইবেন বলিয়া আশা রাখিতেন। এই ভারত আর ভুল করিয়া বিদেশীদের ডাকিয়া আনিবে না বলিয়া তিনি দেউস্করকে প্রত্যুত্তর দেন।"(৩)

৮। *ভগ্নি নিবেদিতা ও ওকাকুরার প্রচেষ্টা*

বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূলে ভগ্নি নিবেদিতা ও ওকাকুরা নামক দুই জন বিদেশীর দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভগ্নি নিবেদিতার পূর্ব-নাম ছিল 'মিস মার্গারেট নোবেল', তাঁহার পিতা ছিলেন একজন জাতীয়তাবাদী আইরিশ। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতেই জাতীয়তাবাদে দীক্ষালাভ করেন, এবং সেইজন্যই তিনি ভারতের জাতীয়তাবাদকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করিতে

(১) Vivekananda : "From Colombo to Almora."

(২) "ম্যাকসিম" নামক বিখ্যাত কামানের উদ্ভাবক। তাঁহার নিজের নামানুসারেই তাঁহার উদ্ভাবিত কামানের নাম 'ম্যাকসিম' কামান রাখা হয়।

(৩) স্বামী বিবেকানন্দের এই উত্তর উক্তিই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত-রচিত 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক গ্রন্থ হইতে গৃহীত, পৃঃ ৯৯।

পারিয়াছিলেন। বাংলার বিপ্লববাদের মূলে এই মহিয়সী নারীর দান অসামান্য। ওকাকুরা ছিলেন জাপানের একজন চিত্রকলার অধ্যাপক। ইনিও বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার জন্য যথেষ্ট প্রেরণা যোগাইয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মার্কিন-শিষ্যা ম্যাকলিয়ড তাঁহাকে জাপান হইতে ভারতে আনয়ন করেন।

ভগ্নি নিবেদিতা ভারতবর্ষে আসিবার কিছুদিন পরেই বাংলার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহিত নিজেকে জড়িত করিয়াছিলেন। ১৯০০—১ খৃস্টাব্দে যখন বাংলায় বৈপ্লবিক কর্ম পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় পরিষদ (National Council) গঠিত হয়, তখন পরিষদের পাঁচজন নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে ভগ্নি নিবেদিতা ছিলেন অন্যতম।(১) স্বামী বিবেকানন্দের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনে থাকিয়াই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ও রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইয়া প্রচার-কার্য একসঙ্গে চালাইতেন। স্বামীজীর মৃত্যুর পর তিনি মিশনের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বক্তৃতাদ্বারা ভারতীয় যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে তিনি স্বামীজীর মার্কিন-শিষ্যাদের মারফত রুশিয়ার 'এনার্কিস্ট' বিপ্লববাদী নেতা পিটার ক্রোপোটকিন-এর সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। এই জন্য তাঁহার বক্তৃতায় ক্রোপোটকিনের 'এনার্কিজম'-এর প্রভাব ফুটিয়া উঠিত। শোনা যায় যে, কলিকাতার টাউন-হলে ভগ্নি নিবেদিতার 'ডিনামিক্ রিলিজিয়ন' শীর্ষক একটি বক্তৃতা শুনিয়া চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল নাকি এই বক্তৃতাটিকে "ডিনামাইট" আখ্যা দান করিয়াছিলেন।

ভগ্নি নিবেদিতা বক্তৃতা উপলক্ষে বরোদা গমন করিয়া অরবিন্দের সহিত পরিচিত হন এবং অরবিন্দকে কলিকাতার গুপ্ত সমিতির সংবাদ দেন। নিবেদিতার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়াই অরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া গুপ্ত সমিতিটিকে দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বৈপ্লবিক প্রচার-কার্যের জন্য ভগ্নি নিবেদিতা কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য পুস্তক সংগ্রহ

(১) মাদাম হার্বাট নামক জনৈক ফরাসী মহিলা ভগ্নি নিবেদিতার জীবনী রচনা করিবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরীতে অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলে অরবিন্দ তাঁহাকে এই ঘটনাটি বলেন।

করিয়াছিলেন। এই সকল পুস্তকের মধ্যে 'ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী' নামক ছয়খণ্ড পুস্তক বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা ও বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার উদ্যোক্তাদের অন্যতম ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ভগ্নি নিবেদিতার প্রচার-কার্য সম্বন্ধে বলেন ঃ

'ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী'র ছয়খণ্ডের "প্রথম খণ্ডটি তিনি বৈপ্লবিক সমিতিকে প্রদান করেন। ইহা সমগ্র বাংলায় ঘুরিত এবং পঠিত হইত। এই পুস্তকের শেষে 'গেরিলা-যুদ্ধ' কি-প্রকারে করিতে হয় তৎবিষয়ে একটি অধ্যায় আছে। ইহা টাইপ করিয়া চারিদিকে প্রেরিত হইত; উদ্দেশ্য 'গেরিলাযুদ্ধ'-প্রণালী শিক্ষা করা। এই যুদ্ধ-পদ্ধতিই আমাদের লক্ষ্য ছিল।"(১)

জাপানী অধ্যাপক ওকাকুরা ভারতে আসিয়া বেলুড়মঠে থাকিয়া 'আইডিয়াল অফ দি ইষ্ট' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। ইহাতে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পদানত দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার মুক্তির কথা লিখিত হইয়াছিল। ভগ্নি নিবেদিতা পুস্তিকাটি সংশোধন করিয়া প্রকাশিত করেন। ওকাকুরা অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী প্রচারের দ্বারা বাংলাদেশের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ভারতে স্বাধীনতার বাণী প্রচারের জন্য কলিকাতার কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির মধ্যে ছিলেন রাজা সুবোধ মল্লিকের খুল্লতাত হেমচন্দ্র মল্লিক, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগ্নি নিবেদিতা এবং আরও অনেকে।

৯। প্রমথ মিত্রের প্রথম প্রচেষ্টা

ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র নামে পরিচিত) ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের লোক এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইনি পর পর চারিবার গুপ্ত সমিতি স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা- সংগ্রাম," পৃঃ ৯৬।

নেতারা এই কার্যে তাঁহার সহিত সহযোগিতা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, মিত্র মহাশয়ের সেই সকল প্রচেষ্টা সফল হয় নাই। কিন্তু বার বার ব্যর্থতা সত্ত্বেও তিনি বিপ্লবের পথ পরিত্যাগ করেন নাই। একবার এক মানহানির মামলায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া সুরেন্দ্রনাথ জেলে আটক হইলে পি. মিত্র ও তাঁহার সহকর্মীরা পরামর্শ করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে জেল ভাঙ্গিয়া উদ্ধার করিবার জন্য এক বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহের জন্য তিনি বরিশাল গমন করেন। পরে তিনি এই ঘটনা বিবৃত করিয়া বলেন যে, এই জন্য বরিশালে লোকও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু কলিকাতার নেতারা সম্মতি না দেওয়ায় পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়। পরে তিনি আক্ষেপ করিয়া বলিতেন যে, "তাঁহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা পূর্বে বহুবারই বিনষ্ট হইয়াছে। এইবার (১৯০২ খৃস্টাব্দে) তাহা স্থায়ী ও ফলবতী হইল। যখন তাঁহার সমসাময়িকেরা সকলে কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিতে লাগিলেন, তখন একমাত্র তিনিই এ বঙ্গে 'শ্মশান জাগাইয়া' রাখিয়াছিলেন।"(১) কিছুদিন পরেই বাংলার শূন্য শ্মশানে আবার প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখা দেয়, বাংলাব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বলিয়া উঠে।

মিত্র মহাশয়ের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ক্ষান্ত না হইয়া পূর্ণোদ্যমেই চলিতে থাকে। ১৯০১-০২ খৃষ্টাব্দে তিনি অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হেমচন্দ্র মল্লিক, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতির সহযোগে বাংলার প্রথম স্থায়ী বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিই বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 'অনুশীলন সমিতি' নামে বিখ্যাত। মিত্র মহাশয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকেই এই বৈপ্লবিক সমিতির সভাপতি নিবাচিত করা হয়। যে সভায় এই বৈপ্লবিক সমিতি গঠিত হয় সেই সভার অধিবেশন শেষ হইবামাত্র তিনি নাকি আনন্দে আত্মহারা হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন, "এইবার আমার সারা জীবনের উদ্যম সফল ও স্থায়ী হইল।" মিত্র মহাশয়ের এই আশা ও ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হয় নাই।

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ২২।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন—(৩)

গুপ্ত সমিতির প্রতিষ্ঠা

পূর্ব-অধ্যায়ে বর্ণিত দলগুলির পিছনে একটা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য থাকিলেও এই দলগুলিকে প্রকৃত বৈপ্লবিক সমিতি বলা চলে না। প্রথমতঃ, উহাদের পিছনের বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল খুবই অস্পষ্ট; দ্বিতীয়তঃ, উহাদের কোন কর্মপন্থা ছিল না; তৃতীয়তঃ, এই দলগুলি এতই গোপন ও সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল যে, সামাজিক জীবনের সহিত উহাদের কোন সম্পর্ক ছিলা না বলিলেই চলে। এই দলগুলি ছিল তৎকালীন সমাজের কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তৎকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ইহার বেশী কিছু তাঁহাদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু এই দলগঠন-প্রচেষ্টার প্রভাব যে পরবর্তী কালের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ঐতিহ্য লইয়াই বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০১-[illegible] খৃস্টাব্দে) বাংলাদেশে নূতন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দেখা দেয় এবং তাহার পরিণতি স্বরূপ বাংলাদেশব্যাপী গুপ্ত সমিতি স্থায়ীভাবে গড়িয়া উঠে।

বাংলাদেশে বৈপ্লবিক আদর্শের বীজ বিংশ শতাব্দীর শুরুতে নতুন করিয়া আমদানি হয় মহারাষ্ট্র হইতে, আর অরবিন্দ ঘোষ ও যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন সেই বীজের প্রধান বাহক। ১৯০২ খৃস্টাব্দে অরবিন্দ ছিলেন বরোদা রাজ্যের রাজ-কলেজের সহকারী সভাপতি, আর যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ছিলেন বরোদার মহারাজের দেহরক্ষী। তখন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্র-কুমার অরবিন্দের সঙ্গেই থাকিতেন, তিনি তখন দাদার সাহায্যে ইতিহাস ও রাজনৈতিক সাহিত্য অধ্যয়নে নিমগ্ন।

ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ মহারাষ্ট্র-নেতা তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং অরবিন্দও তিলকের শিষ্য পুনার বিপ্লবীনেতা ঠাকুরসাহেবের নিকট হইতে বিপ্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি একদিকে ছিলেন উক্ত ঠাকুরসাহেবের গুপ্ত সমিতির সভ্য এবং অপর দিকে ছিলেন 'গণতন্ত্রী ভারত' নামক প্রতিষ্ঠানের গুজরাট-শাখার সভাপতি।

বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত অরবিন্দ ও যতীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের যুব-সম্প্রদায়কেও বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বাংলাদেশে এই নূতন স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠেন। বহু আলোচনার পর তাঁহারা স্থির করেন, প্রথমে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহারাজার দেহরক্ষীর চাকুরি ছাড়িয়া বাংলাদেশে গিয়া বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গঠনের কাজ শুরু করিবেন এবং শীঘ্রই অরবিন্দও বাংলায় গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যতীন্দ্রনাথ কাজে ইস্তফা দিয়া এবং অরবিন্দের নিকট হইতে একখানি পরিচয়-পত্র সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন।

বাংলাদেশেও একদল নেতা কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আপস-নীতিতে বিরক্ত হইয়া এবং মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া ইতিমধ্যে বিপ্লবের পথ অবলম্বন করিবার জন্য আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. মিত্র নামে খ্যাত), সি. আর. দাস, গুরুদাস বন্দোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রকার একটি আলোচনা-সভায় সর্ব-সম্মতিক্রমে পি. মিত্রের উপর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ভার অর্পণ করা হয়। এই সময় যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়া পি. মিত্রের সহিত যোগদান করেন। ১৯০২ খৃস্টাব্দে পি. মিত্র ও যতীন্দ্রনাথের যুক্ত প্রচেষ্টায় বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম স্থায়ী সংগঠন। সর্ব-সম্মতিক্রমে পি. মিত্রই হন এই সংগঠনের সভাপতি। অরবিন্দ ঘোষ ও চিত্তরঞ্জন দাস হন ইহার দুইজন সহকারী সভাপতি। এই সংগঠনের অধীনে সভ্যদের শারীরিক

ব্যায়াম, লাঠি-খেলা, ছোরা ও তরবারি-খেলা, ঘোড়ায় চড়া ও সামরিক শিক্ষার জন্য একটি ক্লাব (আখড়া) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতীন্দ্রনাথের উপর ইহার পরিচালনার ভার পড়ে।

পি. মিত্রের সহকর্মীদের ও বাংলায় বৈপ্লবিক সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় পি. মিত্র সম্পর্কে বলেন, "মিত্রমহাশয় ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। তিনি ইংরেজীতে উত্তমরূপে লিখিতে ও বলিতে পারিতেন, তত্রাচ কংগ্রেসে গিয়া গলাবাজি করিয়া নামার্জন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার কখনও ছিল না। কংগ্রেসে চেঁচাইয়া দেশ-বিখ্যাত 'নেতা' হইবার সুবিধা তাঁহার বিশেষই ছিল, কিন্তু তিনি বক্তৃতা দেওয়া বিশেষভাবে ঘৃণা করিতেন এবং কখনও আবেদন-নিবেদনকারীদের (কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের) রাজনীতির সহিত মিশেন নাই। তিনি প্রথম অবস্থায় বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ও অন্যান্যের সহিত বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন।"(১)

১৯০২ খৃস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বাংলাদেশে পৌঁছিবার ছয়মাস পরেই অরবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারকেও বাংলায় পাঠাইয়া দেন। বারীন্দ্র কলিকাতায় পৌঁছিয়া সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সমিতির অন্যতম কর্ণধাররূপে ইহাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন জিলায় ঘুরিয়া বেড়ান, কিন্তু সর্বত্র যুবসম্প্রদায়ের মধ্য হইতে আশানুরূপ সাড়া না পাইয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন। তিনি যে রঙিন স্বপ্ন লইয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন শীঘ্রই সেই স্বপ্ন মিলাইয়া যায়, তিনি হতাশ হইয়া ১৯০৩ খৃস্টাব্দে বরোদায় ফিরিয়া যান. তথায় তিনি একবৎসর থাকিয়া ১৯০৪ খৃস্টাব্দের শেষদিকে বাংলায় ফিরিয়া আসেন। পরবর্তীকালে তিনি তাঁহার এই সময়ের প্রচেষ্টা ও ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন:

"বরোদায় একবৎসর থাকিবার পর আমি বাংলা দেশে উপস্থিত হই। রাজনৈতিক প্রচারকরূপে বাংলাদেশে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি জিলায় জিলায় ঘুরিয়া বহু শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন করি।

১। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ২১-২২।

সেই সকল আখড়ায় শরীর-চর্চা ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা হইত। আমি প্রায় দুই বৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। কিন্তু ক্রমশঃ এই কার্যে অবসাদ দেখা দেয় এবং আমি বরোদায় ফিরিয়া যাইয়া এক বৎসর ধরিয়া নানা বিষয় অধ্যয়ন করি। তারপর (১৯০৪ খৃস্টাব্দের শেষ-দিকে) আমি আবার বাংলাদেশে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসি যে, এই দেশে কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা কোন কাজ হইবে না, জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে।"(১)

ইতিমধ্যে অরবিন্দও বরোদা রাজ-কলেজের চাকুরি ত্যাগ করিয়া বাংলায় আগমন করেন এবং কলিকাতার প্রতিষ্ঠানটিকে আদর্শ ও সংগঠনের দিক হইতে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করেন।

১৯০২ খৃস্টাব্দে উক্ত সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর সভাপতি পি. মিত্র উহার নাম দেন 'অনুশীলন সমিতি'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ হইতেই নাকি এই নামটি গ্রহণ করা হয়। 'অনুশীলন' শব্দের অর্থ—চর্চা। চর্চাদ্বারা উন্নতিলাভ ও অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে—ইহাই ছিল এই নাম গ্রহণের গূঢ় উদ্দেশ্য (২)। পি. মিত্রমহাশয় এইভাবে বাংলায় সর্বপ্রথম বিপ্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রথম সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল, এই সংগঠনের মধ্য দিয়া এমন একটি তরুণ সৈনিকদল সৃষ্টি করা যাহারা দৈহিক ও আত্মশক্তি দ্বারা উন্নত হইয়া বিদেশীদের কবল হইতে দেশমাতৃকার মুক্তি সাধনে সক্ষম হইবে।

সমিতির সভ্যদের দেহ-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তাহাদের লইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদল গঠনের পরিকল্পনাও সমিতির কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই উদ্দেশ্যে সামরিক শিক্ষালাভের জন্য যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়কে বরোদা রাজ্যে প্রেরণ করা হয়। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে

(১) ১৯০৮ খৃস্টাব্দে বিচারাধীন অবস্থায় জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বারীন্দ্রের স্বীকারোক্তি।
(২) পুলীন দাসের প্রবন্ধ।

তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই নেতাদের সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি সমিতির সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া 'নিরালম্ব স্বামী' নাম গ্রহণ করেন।

অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ইহার শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সকল শাখার সভ্য-সংখ্যা প্রতিদিন বাড়িয়া চলে এবং বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত বহু আখড়ায় সমিতির সভ্যেরা নিয়মিতভাবে শরীর-চর্চা, লাঠি, ছোরা ও তরবারি-খেলা শিক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম-পদ্ধতি লইয়া সমিতির মধ্যে মতভেদ ক্রমশঃ তীব্র আকারে দেখা দেয়। বৈপ্লবিক সমিতির পরিচালকরূপে পি. মিত্রমহাশয়ের দক্ষতায় কাহারও সন্দেহ ছিল না। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের বিপ্লবী কর্মীদের বরেণ্য। কিন্তু তিনি ছিলেন কিছুটা "সেকেলে" ভাবাপন্ন। দৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলাযুক্ত একটা গুপ্ত সমিতি, সুগঠিত শরীরসম্পন্ন এমন একদল নিষ্ঠাবান তরুণ কর্মীদল যাহারা নিজ নিজ উদ্দেশ্য ও আদর্শ সংগোপনে মনের অন্তঃস্থলে রাখিয়া মুখ বুজিয়া নেতার হুকুম শিরোধার্য করিবে এবং নেতার অঙ্গুলী হেলনে হাসিমুখে প্রাণ বিসর্জন দিতেও ইতস্ততঃ করিবে না—এই চিন্তাধারার গণ্ডীর বাহিরে তিনি আর কিছু ভাবিতেই পারিতেন না। আখড়ার শরীর-চর্চা ও লাঠি-ছুরি-তরবারি-খেলা—ইহাই ছিল মিত্রমহাশয়ের মতে প্রাথমিক ও মৌলিক কর্তব্য। কিন্তু সমিতির তরুণ নেতাদের একটি অংশ এই "নীরব শরীর-চর্চা নীতি" নীরবে মানিয়া লইতে পারিলেন না। পি. মিত্র মহাশয়ের মতে, সর্বাগ্রে শরীর গঠন; আর তরুণ নেতাদের এই অংশের মতে, বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচারই হইল প্রথম ও মূল কাজ। এই তরুণ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি। এই দুই কর্ম-পদ্ধতির ভিত্তিতে একই গুপ্ত সমিতির মধ্যে দুইটি দল গড়িয়া উঠিতে থাকে। উক্ত তরুণ দলের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায়:

পি. মিত্রমহাশয়ের "মত ছিল যে, লাঠি ও ফুটবল-খেলা, বক্সিং ও কুস্তিকরা বাঙ্গালী যুবকদের অবশ্য-কর্তব্য এবং ইহা আমরাও জানিতাম,

কিন্তু তাহা লইয়াই কেন যে আমাদের চিরকাল পড়িয়া থাকিতে হইবে, ইহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। আমাদের মধ্যে জনকতক প্রচার-কর্মের উপর বিশেষ জোর দিতেন। ফলে কলিকাতায় দুইটি দল হইল, যদিচ মিত্র মহাশয় সকলকার উপর সভাপতি ছিলেন।"(১)

ইতিপূর্বে ভূপেন্দ্রনাথ, বারীন্দ্রকুমার প্রভৃতির উদ্যোগে 'আত্মোন্নতি সমিতি' নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শরীর-চর্চা প্রভৃতি এই ক্লাবের বাহিরের কাজ হইলেও প্রধান কাজ ছিল রাজনৈতিক আলোচনা ও রাজনীতি অধ্যয়ন। গুপ্ত সমিতির মধ্যে দুইটি দল হইবার পর যে তরুণ নেতারা রাজনৈতিক প্রচারকেই প্রাথমিক কাজ বলিয়া মনে করিতেন তাঁহারা এই 'আত্মোন্নতি সমিতি'কে কেন্দ্র করিয়া নিজেদের শক্তি ও দল সংহত করিয়া তুলিতে থাকেন। এইভাবে সকলে পি. মিত্রের পরিচালিত একই গুপ্ত সমিতির (অনুশীলন সমিতির) মধ্যে থাকিয়া দুইটি পৃথক দলে বিভক্ত হইয়া পড়িতে থাকেন। অর্থ-বণ্টন প্রভৃতি বিষয় লইয়া ক্রমশঃ এই দুই দলের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয় এবং দুইটি দল কার্যতঃ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে থাকে।

গুপ্ত সমিতির বিস্তার

১৯০৫ খৃস্টাব্দ। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সারা দেশে স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার বহিতে শুরু করিয়াছে। বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া মধ্যশ্রেণীর বিক্ষোভ চারিদিকে ফাটিয়া পড়িতেছে। বাংলার বিপ্লবীরাও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন না, তাঁহারা মধ্যশ্রেণীর এই বিরাট বিক্ষোভকে কাজে লাগাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করেন। গুপ্ত সমিতির দুইটি দলই নিজ নিজ সংগঠন ও প্রভাব বিস্তারের জন্য পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে।

এই সময়ে পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী (২), অন্নদা কবিরাজ প্রভৃতির উদ্যোগে 'পাবনা সম্মিলনী' নামে পাবনাজিলায় একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের দ্বারা রঙ্গপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, রাজসাহী প্রভৃতি জিলায়

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ২২।

(২) ইনি প্রথমে পাটনায় একজন মুনসেফ ছিলেন, পরে রাজনৈতিক-অপরাধে তাঁহার

এই গুপ্ত সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। এই সকল সংগঠনও প্রথমে পি. মিত্রের পরিচালনাধীন অনুশীলন সমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং সভাপতি হিসাবে পি. মিত্রকেই আনুগত্য দেখাইত। কিন্তু পরে এই সকল সংগঠনও 'আত্মোন্নতি সমিতি'র প্রচারবাদী দল, অর্থাৎ অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতিদের সহিত সহযোগিতা করিত। এই সময়ে প্রচারবাদীরা বাংলার বাহিরে উড়িষ্যাতেও নিজেদের সংগঠন বিস্তার করেন।

অপর দিকে পি. মিত্রের চেষ্টায় অনুশীলন সমিতিও সারা বাংলায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিতে থাকে। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে পি. মিত্রমহাশয় বিপিনচন্দ্র পালকে সঙ্গে লইয়া পূর্ববঙ্গ সফরে বাহির হন। তাঁহারা ঢাকায় আসিয়া আনন্দ-চন্দ্র চক্রবর্তী ও পুলীনবিহারী দাস নামক একজন তরুণ শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। মিত্র মহাশয় আনুষ্ঠানিক ভাবে পুলীন দাসকে গুপ্ত সমিতিতে দীক্ষিত করিয়া তাঁহারই হস্তে ঢাকার সমিতি গঠন ও পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। পুলীন দাসের চেষ্টায় ঢাকাতেও দ্রুত একটি গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠে এবং পি. মিত্র এই সমিতিরও নাম দেন 'অনুশীলন সমিতি'। ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ জিলাতেও পরেশ লাহিড়ীর উদ্যোগে 'সুহৃদ সমিতি' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতিও কলিকাতার অনুশীলন সমিতির প্রধান দপ্তরের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া পি. মিত্রের নেতৃত্বে কাজ করিতে থাকে। পরে কলিকাতার সমিতির মধ্যে দুই দলের বিবাদ স্পষ্ট আকার ধারণ করিলে সুহৃদ সমিতির মধ্যেও দুইটি দল দেখা দেয়। সুহৃদ সমিতির মূল অংশটি পি. মিত্রের নেতৃত্ব স্বীকার করে, আর ইহার অন্য অংশটি 'সাধনা সমিতি' নামে অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির সহিত যোগাযোগ রাখিয়া কাজ করিতে থাকে। ইতিমধ্যে বিশেষ করিয়া ঢাকার অনুশীলন সমিতির পরিচালকদের চেষ্টায় বরিশাল, ফরিদপুর (ব্রতী সমিতি), কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী প্রভৃতি জিলাতেও গুপ্ত সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সকল স্থানেও

চাকুরি চালয়া যায়। ইনি ছিলেন পাবনা ও উত্তর-বঙ্গে যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। ইনি পরে বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার কর্ণধার হইয়াছিলেন।

কলিকাতার বিচ্ছেদের প্রভাবে প্রত্যেকটি সমিতির মধ্যে দুইটি করিয়া দল দেখা দেয়। এই সময়ে, ১৯০৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রচারবাদী দলের বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতির চেষ্টায় বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রকাশ ও ইহার জ্বালাময়ী প্রচারের ফলে বাংলার যুবসম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ বিপ্লববাদের দিকে, বিশেষ করিয়া 'যুগান্তর' দলের দিকে আকৃষ্ট হইতে থাকে।

'যুগান্তর'

'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশের পর বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, অবিনাশ প্রভৃতি আত্মোন্নতি সমিতির কর্মিগণ প্রধানতঃ 'যুগান্তর' পত্রিকার কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং পত্রিকার পরিচালনার ব্যাপারে প্রায় সময় সমবেত হইতেন। ইহার ফলে আত্মোন্নতি সমিতির কাজ ও নাম প্রায় বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং 'যুগান্তর' নামটিই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। ইহার ফলে সাধারণ লোকেরা 'যুগান্তর' পত্রিকার পরিচালক ও কর্মীদের 'যুগান্তর' নামেই অভিহিত করিতে থাকে, 'আত্মোন্নতি' নামটি সকলের স্মৃতি হইতে মুছিয়া যায়। এই ভাবেই হয় যুগান্তর সমিতির সৃষ্টি। এই ভাবে সারা বাংলাদেশব্যাপী কার্যতঃ দুইটি দল গড়িয়া উঠে, কিন্তু ধাঁচক আকারের দিক হইতে তখনও যুগান্তর দল পি. মিত্রের পরিচালনাধীন মূল অনুশীলন সমিতিরই অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং সকলেই প্রকাশ্যে পি. মিত্র-মহাশয়কে সভাপতি বলিয়া স্বীকার করে। 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পরেও দুই বৎসর পর্যন্ত এই দুই সমিতির মধ্যে এই ভাবে কিছুটা সাংগঠনিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা চলিয়াছিল, কিন্তু ১৯০৮ খৃস্টাব্দে 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা'র সময় হইতে দুইটি সমিতি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এই ইতিহাসের একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সেই যুগের অন্যতম নায়ক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ হইতে সংশ্লিষ্ট বহু তথ্যপূর্ণ নিম্নোক্ত অংশটি উদ্ধৃত করা হইল :

"গুপ্ত সমিতির মধ্যে যাঁহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা একত্রিত হইলেন এবং ইঁহাদের সঙ্গে আত্মোন্নতি সমিতি রাজনৈতিক কার্যে সহকারিতা করিত। 'যুগান্তর' কাগজ ইঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইত। বাহিরে রহিল পি. মিত্রের পরিচালিত অনুশীলন সমিতি। এই সমিতি প্রচারকর্ম না করিয়া কেবল লাঠি-খেলা ও কুস্তির দিকে নজর রাখিত! এই সমিতি সভাপতি মহাশয়ের (পি. মিত্রের) প্রিয় ও পৃষ্ঠ-পোষিত ছিল। তিনি তাঁহার বন্ধুবর্গকে এই সমিতিকে সাহায্য করিতে বলিতেন।........."

"তৎপরে বঙ্গভঙ্গের হাঙ্গামা এবং স্বদেশী বন্যা আসিল। সেই সঙ্গে আমরাও গাঝাড়া দিয়া উঠিলাম। সেই সময়ে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ মহাশয় তাঁহার ভ্রাতা বারীন্দ্রকে 'ভবানী মন্দির' স্থাপনা উপলক্ষে আবার বঙ্গে পাঠাইয়া দেন।...... এই সময়ে পাবনার দল, যাঁহাদের অনেকে আমাদের দলের লোক ছিলেন,...... আমাদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে যোগদান করিলেন। ইঁহারাই উত্তর-বঙ্গে কার্যক্ষেত্রের প্রসার করিয়াছিলেন। তাহার ফলে দিনাজপুর, রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও পাবনা আমাদের হাতে আসে। ইহার অগ্রে কটকে যে কর্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল আমি গিয়া তাহা আবার জাগাইয়া একটি আখড়া স্থাপন করিয়া আসিয়াছিলাম। এই সমস্ত যোগাযোগ একসঙ্গে সংঘটিত হইবার ফলে 'যুগান্তর' কাগজ প্রকাশিত হয়।"

"বহুদিন ধরিয়া আমরা কাগজ বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলাম।...... এই সময়ে ৺ উপাধ্যায় (ব্রহ্মবান্ধব) 'সন্ধ্যা' কাগজ বাহির করিলেন। কিন্তু এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং উহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরাও একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে—ভূপেন্দ্রনাথ) বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম।......"

" 'যুগান্তর' নাম আমারই মনোনিত।......এই নামটি ৺ শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা অনেকেই ব্রাহ্মসমাজের ছায়ায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হই ; সেই জন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও

সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব—ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। যুগান্তর দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত ও প্রবন্ধ লেখা সমস্ত কর্মই পার্টির অভিপ্রায় অনুসারে হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপরে ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, দেউস্কর (সখারাম গণেশ দেউস্কর) এবং অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।"

" 'যুগান্তর'এর পশ্চাতে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী বৈপ্লবিক সমিতিই ছিল। ইহা তাহাদেরই কাগজ। এই সময়ে যাঁহারা পি. মিত্রের তাঁবেদার ছিলেন (অর্থাৎ তাঁহার নির্দেশ মানিয়া চলিতেন) ও যাঁহারা লাঠি ঘুরাইতেন তাঁহারা একদল হইলেন ; তাহা ছাড়া সমস্ত কেন্দ্র আমাদের সঙ্গে ছিল এবং আমরা অরবিন্দ ঘোষে নেতৃত্বে কার্য করিতাম। এই প্রকারে বঙ্গে বৈপ্লবিক দলের মধ্যে সর্বপ্রথম দলাদলির ছায়া প্রকাশ পায়। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ পি. মিত্রের সরাসরি অধীনে ছিল ; তাহা ছাড়া বঙ্গে যে সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহাদের সকলেই আমাদের সঙ্গে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে কর্ম করিতেন এবং সংখ্যাতেও আমাদের দিকের লোক বেশী ছিল। অথচ বাৎসরিক কনফারেন্স-এ সকলেই পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনেই মিলিতাম।......আমার মনে হয় ভবিষ্যতে এই দলাদলির ছায়ায় শেষে তিনটি দল(১) বঙ্গে ক্রমে বিকাশ প্রাপ্ত হয়।"(২)

১। অনুশীলন সমিতি—সংগঠনের বিস্তার ও পদ্ধতি

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বাংলাদেশের প্রথম ও মূল গুপ্ত সমিতি, অর্থাৎ কলিকাতার অনুশীলন সমিতি হইতে নিম্নোক্ত তিনটি বিরাট সংগঠন সৃষ্টি হয় : অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর সমিতি ও উত্তর-বঙ্গ সমিতি। এই তিনটি সমিতিই

(১) তিনটি দল :—পশ্চিম-বঙ্গে প্রধানতঃ যুগান্তর সমিতি, পূর্ব-বঙ্গে প্রধানতঃ অনুশীলন সমিতি এবং উত্তর-বঙ্গে প্রধানতঃ যুগান্তর সমিতি। উত্তর-বঙ্গের সংগঠন পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতির সহিত সম্পর্কযুক্ত থাকিলেও ইহা অনেকটা স্বাধীনভাবে কাজ করিত।

(২) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম', পৃঃ ২২—২৬।

ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিয়া বিরাট আকার ধারণ করে। ইহাদের প্রত্যেকটি সংগঠন নিজ নিজ স্থানীয় গণ্ডী অতিক্রম করিয়া এবং সারা বাংলাদেশে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া গোটা বাংলাদেশকে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে পরিণত করে। সম্ভবতঃ ১৯০৮ খৃস্টাব্দের 'আলিপুর-বোমার মামলা' পর্যন্ত যুগান্তর সমিতিই ছিল বৃহত্তম সংগঠন। এই মামলার সময় হইতে পুলিশের আক্রমণে ও শত শত কর্মী ধৃত হইবার ফলে এই বিরাট সংগঠন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং ইহার সংগঠন সাময়িক ভাবে সংকুচিত হইয়া পড়ে। কিন্তু এই ধরনের কোন প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিতে হয় নাই বলিয়া এবং প্রথম হইতে অনুসৃত "শক্তি- সঞ্চয়"এর নীতির জন্য অনুশীলন সমিতির সাংগঠনিক বিস্তার বরাবর অব্যাহত ছিল। এই জন্য অনুশীলন সমিতিই একটি অখণ্ড ও একক সংগঠন হিসাবে বৃহত্তম সংগঠন হইয়া উঠে। 'সিডিসন-কমিটি'র মতেও ১৯০৮ খৃস্টাব্দের পর হইতে অনুশীলন সমিতিই বৃহত্তম বৈপ্লবিক সংগঠন হইয়া দাঁড়ায়।

এই সমিতির প্রধান পরিচালন-কেন্দ্র তখন পর্যন্ত কলিকাতায় থাকিলেও ঢাকাই অনুশীলন সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র হইয়া উঠে। বিভিন্ন জিলায় প্রতিষ্ঠিত শাখা-প্রশাখাসহ ঢাকার অনুশীলন সমিতিই ছিল সমগ্র পূর্ব-বঙ্গের বৃহত্তম সংগঠন। ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রথম পরিচালক ছিলেন পুলীনবিহারী দাস। তাঁহার যোগ্য পরিচালনায় বিভিন্ন গ্রামে, স্কুল-কলেজে ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে সমিতির শাখা-প্রশাখা গড়িয়া উঠে। সমিতিদ্বারা পরিচালিত অসংখ্য আখড়ায় শরীর-চর্চা, লাঠি-তরবারি-ছোরাখেলা প্রভৃতিদ্বারা সমিতির বিরাট সভ্য-সংখ্যাকে একটি সৈন্য-বাহিনীরূপে গড়িয়া তোলা হইতে থাকে। এই বাহিনীর নাম রাখা হয় "জাতীয় স্বেচ্ছাসৈন্য-বাহিনী"। এই বাহিনীকে সকল সময়ে এমনভাবে প্রস্তুত রাখা হইত যাহাতে কোন স্থানে আগুন, বন্যা, মহামরী প্রভৃতি দেখা দিবামাত্র অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া ইহারা জনসাধারণকে সাহায্য করিতে পারে। এই সকল সমাজ-সেবামূলক কাজের দ্বারা সমিতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

সংগঠন-বিস্তারের উপায় হিসাবে "এই সমিতি সকল স্কুলের মধ্যে প্রবেশ করে। ঢাকার 'ন্যাশনাল স্কুল' ছিল সমিতির সভ্য-সংগ্রহ ও তাহাদের শিক্ষা দানের প্রধান কেন্দ্র। এই স্কুলেরই শিক্ষক ছিলেন পুলীন দাস ও ভূপেশচন্দ্র রায়। সোনারং 'ন্যাশনাল স্কুল'টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মাখনলাল সেন। পুলীন দাস মহাশয় গ্রেপ্তার হইবার পর মাখনলালই ঢাকার অনুশীলন সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। ছাত্রদের উপর এই সোনারং-স্কুলটির প্রভাব ছিল অতি গভীর······

"ঢাকার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দুইবৎসর পর্যন্ত ইহা প্রকাশ্যেই কাজ চালাইয়াছিল। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের শেষদিকে যখন ইহা 'ক্রিমিনাল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাকট' অনুসারে বে-আইনি বলিয়া ঘোষিত হয় এবং পুলীন-বিহারী দাস ও অন্যান্যেরা গ্রেপ্তার হন, তখন এই সমিতির পরিচালন-কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় এবং ইহা মাখনলালের যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করে। পরবর্তী কয়েক বৎসরে এই সমিতি সারা বাংলায় ইহার সংগঠন ছড়াইয়া দেয় এবং অন্যান্য প্রদেশেও ইহার সংগঠন বিস্তার লাভ করে। ময়মনসিংহ ও ঢাকা জিলাতেই ইহার সংগঠন ছিল সর্বাপেক্ষা সুসংবদ্ধ, কিন্তু উত্তরে দিনাজপুর হইতে দক্ষিণ-পূর্বে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং উত্তর-পূর্বে কুচবিহার হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর পর্যন্ত ইহা বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠে। বাংলাদেশের বাহিরে আসাম, বিহার, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এবং পুনাশহরেও ইহার সভ্যদের কাজ করিতে দেখা গিয়াছে।"(১)

অনুশীলন সমিতির পরিচালকগণ একটি সুগঠিত সাংগঠনিক পদ্ধতিদ্বারা এই বিপুল সংগঠনকে গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং তাহার জন্য তাঁহারা রুশীয়ার 'এনার্কিস্ট'দের সংগঠন-পদ্ধতি হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন।

সমিতির সংগঠন-পদ্ধতির নিম্নোক্ত বিষয়গুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :

(১) Sedition Com. Report P. 105

'রুশ-বিপ্লবীদের সংগঠন-পদ্ধতি'

সমিতির সভ্যদের সাংগঠনিক আদর্শ শিক্ষা দিবার জন্য রুশিয়ার "এনার্কিস্ট" নামক বিপ্লবীদলের সংগঠন-পদ্ধতি এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়। "এনাকিস্ট"দের এই সংগঠন-পদ্ধতিই অনুশীলন সমিতির 'সাধারণ সংগঠন-নীতি'র প্রধান ভিত্তি-রূপে গৃহীত হয়। এই পুস্তিকায় সাধারণ সাংগঠনিক নীতি হিসাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ হয় :—

'সাধারণ নীতি'

"রুশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলন হইতে এই শিক্ষা পাই যে, যাহারা একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের জন্য জনগণকে সংগঠিত করিতে চায় তাহাদের এই সকল নীতি স্মরণ রাখা অবশ্য কর্তব্য :

"(১) দেশের সকল বিপ্লবীদের লইয়া একটা সুদৃঢ় সংগঠন গড়িয়া তুলিতে হইবে, যেখানেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন হইবে সেইখানেই পার্টির সকল শক্তি একত্র করিবার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

"(২) বিভিন্ন কর্ম-শাখা বা বিভাগগুলিকে পরস্পর হইতে কঠোরভাবে পৃথক করিতে হইবে, যথা—যে ব্যক্তি একটি বিভাগে কাজ করে সে অন্য বিভাগের কাজকর্ম কিছুই জানিতে পারিবে না, এবং কোন ক্ষেত্রেই একব্যক্তিকে দুইটি বিভাগের পরিচালনা-ভার দেওয়া হইবে না।

"(৩) বিশেষ করিয়া কয়েকটি বিভাগে (যেমন, সামরিক ও সন্ত্রাসকার্যের বিভাগে) এমনকি যাহারা সম্পূর্ণ স্বার্থলেশহীন ও আত্মত্যাগী সভ্য তাহাদেরও কঠোর শৃঙ্খলা মানিয়া চলিতে হইবে।

"(৪) সম্পূর্ণ গোপনতা অবলম্বন, অর্থাৎ একজন পার্টি-সভ্যের যতখানি জানা উচিত সে কেবলমাত্র ততখানিই জানিবে, তাহার সহকর্মীদের নিকট সে কেবল সেই কাজের কথাই বলিবে যে কাজ সহকর্মীদের জানা উচিত, সেই কাজের কথা যাহাদের জানা উচিত নয় তাহাদের সহিত সে তাহা কিছুতেই বলিবে না।

"(৫) নির্দিষ্ট সাংকেতিক বাক্য, সাংকেতিক লিখন-পদ্ধতি প্রভৃতি ষড়যন্ত্র-মূলক উপায়গুলির নিপুণ ব্যবহার।"

"(৬) পার্টির কাজের ক্রমোন্নতি সাধন, পার্টির পক্ষে সকল প্রকারের কাজ একসঙ্গে আরম্ভ করা উচিত নয়, কাজের ক্রমবিস্তার সাধন করা উচিত ; যেমন— প্রথমতঃ, শিক্ষিত লোকদের ভিতর হইতে বাছা বাছা লোকদের দলে টানিয়া সভ্য করা এবং তাহাদের লইয়া 'নিউক্লেয়াস' বা প্রাথমিক সংগঠন সৃষ্টি করা ; দ্বিতীয়তঃ, সেই প্রাথমিক সংগঠনের মারফত জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার ; তৃতীয়তঃ, সামরিক ও সন্ত্রাসকার্য প্রভৃতির আয়োজন ; চতুর্থতঃ, জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি ; এবং পঞ্চমতঃ, সশস্ত্র অভ্যুত্থান।"

উক্ত পুস্তিকায় শেষোক্ত পাঁচটি নিয়মের বিশেষ ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় নিয়মে (কর্ম-বিভাগ) বলা হইয়াছে যে, একটি বিপ্লবী পার্টির কাজ দুইভাগে ভাগকরা চলে, যথা (ক) সাধারণ কাজ (খ) বিশেষ কাজ। সাধারণ কাজ হইবে সংগঠন, প্রচার ও বিক্ষোভ সৃষ্টি। বিশেষ কাজ হিসাবে সাতটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এই সাতটি বিষয়ের দ্বিতীয়টির (সামরিক কাজের) মধ্যে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রয়োজনে বিস্ফোরক জিনিস-পত্র (বোমা প্রভৃতি) প্রস্তুত করিবার জন্য রসায়ন-বিজ্ঞানের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে ; তৃতীয়টির (বিপ্লবের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহের) মধ্যে "সন্ত্রাসকার্য-বিভাগের সাহায্যে ধনীদের উপর কর বসাইবার কথা বলা হইয়াছে। সর্বশেষ সপ্তম বিষয়টির (সন্ত্রাস-কার্যের) বিভিন্ন কাজের একটি হইল, "প্রধানতঃ অর্থ-বিভাগকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ছোটখাট কাজের জন্য ভ্রাম্যমান সন্ত্রাসকার্যের সংগঠন"। তৃতীয় নিয়মের (শৃঙ্খলা) সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, "সন্ত্রাসকার্য অথবা সামরিক বিভাগের কোন সভ্যের দ্বারা পরিচালকের নির্দেশ পালনে অস্বীকার প্রভৃতি গুরুতর নিয়ম ভঙ্গের অপরাধের শাস্তি হইবে মৃত্যুদণ্ড।"

ইহার পর পার্টি-সংগঠনের রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পার্টি-সংগঠনের বিভিন্ন স্থানীয় অংশ একটি সুগঠিত কেন্দ্রের দ্বারা পরিচালিত হইবে। স্থানীয়

সংগঠনের মধ্যে থাকিবে “প্রাদেশিক সংগঠন”, “জিলা-কমিটি”, “শহর-কমিটি”, “গ্রাম্য-সংগঠন” এবং “পার্টি-সভ্য” ।(১)

“জিলা-সংগঠন পরিকল্পনা” ও “পার্টি-সভ্যের নিয়মাবলী” সাধারণ নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। জিলা-সংগঠন-পরিকল্পনার মধ্যে আছে পঁয়ত্রিশটি অনুচ্ছেদ, শেষ অনুচ্ছেদটি আবার ষোলটি ভাগে বিভক্ত। জিলা-সংগঠনের বিশেষ কয়েকটি নিয়ম নীচে উদ্ধৃত করা হইল।”

‘জিলা-সংগঠন পরিকল্পনা’

“(১) একটি নিম্নবর্তী কেন্দ্রের সকল কার্য ইহার পরিচালকের আদেশে পরিচালিত হইবে। সে এই কার্যভার গ্রহণের পূর্বে অন্তত পাঁচবার সংগঠন-পরিকল্পনাটি পাঠ করিবে।”

“(২) নিম্নবর্তী কেন্দ্রের পরিচালক তাহার পরিচালনাধীন জিলাটিকে সরকারের স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থা অনুসারে (যেমন, মহকুমা, থানা, গ্রাম প্রভৃতি) বিভিন্ন অংশে ভাগ করিবে। প্রত্যেকটি অংশের পরিচালক-পদে একজন বুদ্ধিমান ও স্নেহশীল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইবে।”

“(২৫) যদি কোন জিলায় অন্য একটা পার্টির হাতে অস্ত্র থাকে এবং সেই অস্ত্রের দ্বারা দেশের কোন ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে প্রধান পরিচালনা-কেন্দ্রের অনুমতি লইয়া যে-কোন প্রকারে সেই অস্ত্র হস্তগত করিতে হইবে। এই কাজ এত সাবধানে করিতে হইবে যেন তাহারা (অন্য পার্টি) কিছুই বুঝিতে না পারে।”

“(৩৪) যাহাদের হেফাজতে অস্ত্র বা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গোপন কাগজ-পত্র রাখা হইবে তাহারা কোন হাঙ্গামা, সন্ত্রাসকার্যের সংগঠন অথবা কোন সাধারণ গোলমালে অংশ গ্রহণ করিতে পারিবে না, অর্থাৎ তাহারা এমন কোন কাজে অংশ গ্রহণ করিবে না অথবা এমন কোন স্থানে যাইবে না যাহাতে তাহাদের কোন বিপদ ঘটিতে পারে।”

(১) Sedition Committee Report, P. 96—97.

"(৩৫) প্রত্যেকটি জিলা-সংগঠক নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর প্রধান পরিচালনা-কেন্দ্রের নিকট ত্রৈমাসিক কার্য-বিবরণী পেশ করিবে": জিলার সভ্য-সংখ্যা ও সাধারণ অধিবাসী, স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান, আঞ্চলিক নক্সা, যাতায়াত-ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের হিসাব, স্কুলের ছাত্র ও শিক্ষকদের মনোভাব, সংগঠন, সন্ত্রাস কার্যের হিসাব (এই সম্পর্কিত বিষয় হইল চারিটি—(১) সন্ত্রাস-মূলক ঘটনা, (২) মুদ্রাজাল, (৩) অস্ত্র মেরামত ও উহা চালনা শিক্ষা, এবং (৪) "খামার" অর্থাৎ সভ্যদের অস্ত্রচালনা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দিবার স্থান। প্রত্যেক জিলায় সুদূর গ্রামাঞ্চলে এই ধরণের কয়েকটি "খামার" থাকা চাই) প্রভৃতি ষোলটি বিষয়।

পার্টি-সভ্যদের জন্য নিয়মাবলী

"পার্টি-সভ্যদের নিয়মাবলী" একটি বৃহৎ দালিল। মোট বাইশটি নিয়মের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ নিয়মগুলিই এখানে উদ্ধৃত করা হইল:—

"(১) প্রত্যেকটি পার্টি-সভ্যকে সকলপ্রকার (চারি প্রকার) দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। (পার্টি-সভ্যদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কয়েকটি নিয়ম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে)।

"(৮) পার্টি-সভ্যগণ যখনই যে-অর্থ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিবে তখনই সেই অর্থ ও দ্রব্যাদি পার্টির সাধারণ তহবিলে জমা দিবে।

"(১৪) পার্টি-সংগঠন সম্পর্কিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন পত্র কোথাও পাঠাইতে হইলে সভ্যগণ সেই পত্র পরিচালকের নিকট পেশ করিবে এবং পরিচালকই সেই পত্র যথাস্থানে পাঠাইবেন।" (এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সকল সময়েই একদল লোককে পরিচালকের "পোস্টবক্স" বা "ডাকবাক্স" হিসাবে ব্যবহার করা হইত। এই সকল "পোস্টবক্স"-এর লোকেরা এমনভাবে পর পর চিঠি হস্তান্তর করিত যে প্রথম জন হইতে সর্বশেষ জনের মধ্যে অনেকগুলি "পোস্টবক্স"-এর ব্যবধান থাকিত। এই ব্যবস্থাদ্বারা পুলিশের দৃষ্টি এড়ান ও সংগঠনের গোপনতা রক্ষা করা সহজ হইত।

"(১৭) প্রত্যেকটি সভ্য পার্টি-সংগঠনকে একটা সামরিক সংগঠনের মত মনে করিবে এবং ইহার কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি পাইবে।"

"(১৮) প্রত্যেকটি সভ্যের মনে এই কথা সকল সময়ে জাগরুক থাকা চাই যে, সে একটা বিপ্লব গড়িয়া তুলিতেছে। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য আমোদ-প্রমোদ নয়, ইহার উদ্দেশ্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা। তাহাকে সকল সময়ে সতর্ক থাকিতে হইবে যেন সে কখনই এই আদর্শ হইতে বিচ্যুত না হয়।"

দীক্ষা—প্রতিজ্ঞা গ্রহণ

অনুশীলন সমিতির সভ্যপদ গ্রহণের পূর্বে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত। এই প্রতিজ্ঞা বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা ছিল। নূতন সভ্যদের "আদ্য প্রতিজ্ঞা" গ্রহণ করিয়া দলভুক্ত হইতে হইত। নূতন সভ্যদের মধ্যে যাহারা যোগ্যতার পরিচয় দিত তাহাদের জন্য উচ্চতর পর্যায়ের প্রতিজ্ঞার ব্যবস্থা ছিল। এই সকল প্রতিজ্ঞা পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত চারিভাগে ভাগ করা যায়:—

(ক) আদ্য প্রতিজ্ঞা।

(খ) অন্ত্য প্রতিজ্ঞা।

(গ) প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা।

(ঘ) দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা।

এই সকল প্রতিজ্ঞার প্রত্যেকটি আবার কয়েকটি ভাগে বিভক্ত ছিল—প্রত্যেকটি এক-একটি মন্ত্রের মত। প্রত্যেকটি প্রতিজ্ঞার. মধ্যে যে-সকল মন্ত্র সাংগঠনিক দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কেবল সেইগুলিই নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

(ক) **আদ্য প্রতিজ্ঞা**:—১। (ক) "আমি কখনই এবং কোন অবস্থাতেই এই সমিতি ত্যাগ করিব না।"

৫। (ক) "আমি সকল সময়ে সমিতির নিয়মাবলী মানিয়া চলিব।"

(খ) "আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের সকল আদেশ পালন করিব।"

(গ) "আমি পরিচালকের নিকট কোন কথা গোপন করিব না এবং তাঁহার নিকট কখনই সত্যবিনা মিথ্যা বলিব না।"

(খ) **অন্তাপ্রতিজ্ঞা** :—১। "সমিতির ভিতরের কোন কথাই আমি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিব না, অথবা আমি কখনই কোন কথা অনাবশ্যকভাবে আলোচনা করিব না।"

৩। "পার্টির পরিচালকের অনুমতি না লইয়া আমি কখনই একস্থান হইতে অন্য স্থানে যাইব না। আমি যখনই যেখানে থাকিব তাহা পরিচালককে জানাইব। আমি যখনই সমিতির বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিব তখনই তাহা পরিচালককে জানাইব এবং তাহার নির্দেশে সেই ষড়যন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিব।"

৪। "আমি যখনই যে-অবস্থাতে থাকিনা কেন পরিচালকের নির্দেশ পাইবা মাত্র ফিরিয়া আসিব।"

৫। "আমি সমিতির মধ্যে আসিয়া শপথ গ্রহণ করিয়া যে সকল শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছি তাহা এমন কোন লোককে শিখাইতে পারিব না যে লোক ঐ সকল শিক্ষা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শপথ গ্রহণ করে নাই।"

গ। ***প্রথম বিশেষ প্রতিজ্ঞা*** **:** ওঁ বন্দেমাতরম্

"ভগবান, মাতা, পিতা, দীক্ষাগুরু, পরিচালক ও সর্বশক্তিমান জগদীশ্বরের নামে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছি যে :

১। "এই সমিতির উদ্দেশ্য যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ না হইবে ততদিন আমি ইহার সম্পর্ক ত্যাগ করিব না। আমি পিতা, মাতা, ভাই-ভগ্নির স্নেহ ও সংসারের মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হইব না, আমি বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের অধীনে সমিতির সকল নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। আমি সকল প্রকারের মানসিক চঞ্চলতা ও দ্বিধা পরিহার করিয়া অবিচল দৃঢ়তার সহিত সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব।"

৩। "যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই, তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতা-মাতা ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।"

ঘ। *দ্বিতীয় বিশেষ প্রতিজ্ঞা :* ওঁ বন্দেমাতরম্

১। "ভগবান, অগ্নি, মাতা, দীক্ষাগুরু ও পরিচালককে সাক্ষী করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, সমিতির উন্নতির জন্য আমি আমার জীবন ও সর্বস্ব পণ করিয়া আমার সংগঠনের সকল কর্তব্য সম্পাদন করিব। আমি সকল নির্দেশ পালন করিব এবং যাহারা আমার সংগঠনের ক্ষতিসাধন করিবে আমি আমার সকল শক্তি দিয়া তাহাদের উপর আঘাত হানিব।"

২। "আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি আমার সমিতির কোন গোপন বিষয় আমার আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবদের বলিব না অথবা সেই সম্পর্কে অনাবশ্যকভাবে আমার সংগঠনের কোন সভ্যের নিকটেও জানিতে চাহিব না।"

"যদি আমি এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অপারগ হই, অথবা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করি তবে যেন ব্রাহ্মণ, পিতা-মাতা ও সকল দেশের শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের অভিশাপ আমাকে ভস্ম করিয়া ফেলে।"

ঙ। *রাজনৈতিক ডাকাতি সম্পর্কে বিশেষ প্রতিজ্ঞা :*

১। "স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, তাই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা অর্থ সংগ্রহের উপায় হিসাবে ডাকাতির পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ডাকাতিলব্ধ অর্থের একটি কপর্দকও আমরা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যয় না করিয়া সমুদয় অর্থ আমাদের পরিচালকের হস্তে অর্পণ করিব। আমাদের প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া তিনি যাহা আমাদের দিবেন আমরা তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব।"

২। "যাহারা দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরোধী, সরকারের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি উৎপীড়ন-

কারী, জ্ঞাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎকারী, অতিরিক্ত স্থদখোর, কৃপণ-ধনবান কেবল তাহাদের বাড়ীতেই আমরা ডাকাতি করিব।"

৩। "প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ডাকাতি করিতে যাইয়া আমরা কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতিদের উপর কখনই কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"

দীক্ষাদান-পদ্ধতি

যে সভ্যকে দীক্ষা দান করা হইত তাহাকে একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া ও একবেলা উপবাসী থাকিয়া পরের দিন স্নান ও শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইত। দীক্ষাগুরু ধূপ, দ্বীপ, নৈবদ্য, পুষ্প-চন্দনাদি সাজাইয়া বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রপাঠ করিয়া যজ্ঞ করিতেন। যজ্ঞের পর শিষ্য "প্রত্যালীঢ়াসন"এ (১) উপবিষ্ট হইত এবং দীক্ষাগুরু শিষ্যের মাথার উপর গীতা ও তাহার উপর তরবারি স্থাপন করিয়া দক্ষিণদিকে দাঁড়াইতেন। শিষ্য দুই-হস্তে প্রতিজ্ঞা-পত্র ধারণ করিয়া এবং যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে তাহা পাঠ করিয়া শপথ গ্রহণ করিত। তাহার পর শিষ্য যজ্ঞাগ্নি ও দীক্ষাগুরুকে প্রণাম করিয়া অনুষ্ঠান শেষ করিত।

ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক পুলীন দাস মহাশয় স্বয়ং নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে দীক্ষা দিতেন: "পি. মিত্র আমাকে যে পদ্ধতিতে দীক্ষা দিয়াছিলেন, আমি সেই পদ্ধতিতে আমার নিজের বাসাতেই দীক্ষা দিতাম; একসঙ্গে বহু যুবককে দীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হইলে সাধারণতঃ তৎকালীন ঢাকানগরীর উপকণ্ঠে ঈষৎ জলঙ্গাকীর্ণ পুরাতন ও নির্জন 'সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির'এ যাইয়া একটু জাঁকজমক করিয়াই দীক্ষা দিতাম। দীক্ষাপ্রার্থি-গণ এবং আমি, সকলেই পূর্বদিন একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও যথাবিধি সংযম করিয়া দীক্ষার দিনে উপবাসী থাকিয়া স্নানান্তে শুদ্ধ হইয়া পবিত্রভাবে

(১) বাম হাটুর উপর বসা. সিংহ তাহার শিকারের উপর লক্ষ প্রদান করিতে উদ্যত-'আলীঢ় বা 'প্রত্যালীঢ়' আসনের দ্বারা তাহাই বুঝায়।

কালীমূর্ত্তির সম্মুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেককে 'প্রতিজ্ঞা-মন্ত্র' পাঠ করাইয়া লইতাম। তৎকালে যথাসম্ভব রুদ্রভাব অবলম্বন করিবার মানসে আমি উত্তরীয়সহ কষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া মস্তকে, হস্তে, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ করিতাম। প্রত্যেকেই দীক্ষান্তে ৺কালীমূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া আমাকে প্রণাম করিত। ...দীক্ষান্তে প্রত্যেক সভ্যকেই পর্য্যাপ্তরূপে বিশুদ্ধ ঘৃত ও চিনিযুক্ত টাট্‌কা (কাঁচা) দুগ্ধ সেবন করিতে দিতাম।"(১)

'সম্পাদকগণের কর্তব্য'

'সম্পাদকগণের কর্তব্য' নামক সংগঠনসম্পর্কিত পুস্তিকায় সভ্যদের প্রতি সম্পাদকগণের কর্তব্য ব্যখ্যা করা হইয়াছে। স্কুলের অল্পবয়স্ক ছাত্ররাই প্রথমদিকে অধিক সংখ্যায় সমিতির সভ্য হইত বলিয়া এই সকল অল্পবয়স্ক সভ্যদের প্রতি সম্পাদকগণের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। সেই বিশেষ দায়িত্বই এই পুস্তিকায় বর্ণনা করা হইয়াছে। ষষ্ঠ নিয়মে বলা হইয়াছে যে, সম্পাদক সভ্যপদপার্থী বালকের নাম, তাহার অভিভাবকের নাম, তাহার স্কুলের নাম ও শ্রেণী লিখিয়া রাখিবে; সপ্তম নিয়মে সভ্যদের বাসস্থান লিখিয়া রাখিবার কথা আছে। একবিংশতি ও দ্বাবিংশতিতম নিয়মে বলা হইয়াছে যে, সম্পাদক সকল সভ্যকে সকল প্রকার লাঠি-খেলা শিখাইবে না। যে সভ্য সকল প্রকার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছে, সম্পাদক কেবল তাহাকেই সকল প্রকার লাঠি-খেলা শিখাইবে, আর যে সভ্য কেবল 'আদ্য প্রতিজ্ঞা' গ্রহণ করিয়াছে তাহাকে লাঠি-খেলার প্রাথমিক নিয়ম শিক্ষা দিবে। লাঠি-খেলা সম্পর্কে এই প্রকার বাধা-নিষেধের কারণ সম্ভবতঃ এই যে, উচ্চস্তরের লাঠি-খেলা ছিল অসি-শিক্ষারই নামান্তর।

'পরিদর্শক'

সমিতির সাংগঠনিক কার্যে পরিদর্শকগণের ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নিম্নবর্তী সংগঠন ও শাখা-প্রশাখাগুলির কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে কিনা, না

(১) পুলীন দাসের প্রবন্ধ।

চলিলে তাহার কারণ কি এবং কোথায় নূতন শাখা-প্রশাখা স্থাপন করা যায় তাহা এই পরিদর্শকগণের মতামতের উপরই বহুলাংশে নির্ভর করিত। এই জন্যই পরিদর্শকগণের কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া এই পুস্তিকাটি রচিত হয়। এই পুস্তিকাটির মুখবন্ধেই বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক পরিদর্শককে ইহা অন্তত পাঁচ বার অবশ্যই পাঠ করিতে হইবে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলিই পুস্তিকাটির প্রধান কথা:

কোথায় নূতন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে; স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে সমিতিকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উপায় কি; জনসাধারণকে কি ভাবে বুঝাইতে হইবে যে, "প্রতিজ্ঞা গ্রহণ ব্যতীত যে সংগঠন গড়িয়া উঠিবে তাহা একটা শৃঙ্খলাহীন হট্টগোল ব্যতীত অন্য কিছুই হইবে না এবং কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা ব্যতীত কোথাও কোন সামরিক সংগঠন তৈরী হয় নাই, আর হইতেও পারে না; বিনাবাক্যব্যয়ে পরিচালকের নির্দেশ মানিয়া চলার নিয়মটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; সমিতির শাখা-প্রশাখা অব্যাহতভাবে বাড়াইয়া যাইতে হইবে, ইহার কেন্দ্র যতই বাড়িয়া যাইবে ততই লোক-সংগ্রহের সুবিধা হইবে। মুসলমানদের কেন সমিতির সভ্য করা হইবে না তাহাও ইহাতে ব্যাখ্যা করা হয়।

'অমূল্য সরকারের পুস্তিকা'

এই পুস্তিকাখানি সমিতির একটি স্বীকৃত দলিল না হইলেও ইহা বিভিন্ন দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে তৎকালীন বিপ্লবী নেতাদের কেহ কেহ গতানুগতিক সংগঠন-পদ্ধতি ও কর্মপন্থা হইতে ভিন্নভাবে চিন্তা করিতেন। এই পুস্তিকার রচয়িতা পাবনাজিলার অমূল্য সরকার উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন সমিতির একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন বলিয়া সমিতির উত্তর-বঙ্গ শাখার সংগঠন ও কার্যপন্থার উপর এই পুস্তিকার প্রভাব অন্তত আংশিক ভাবেও যে পড়িয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই পুস্তিকাটি বৈপ্লবিক

সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার মধ্যে নূতনত্বের সন্ধান দেয়। মূল বিষয়বস্তু সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে দেওয়া হইল :

স্বাধীনতার পথ :

"দেশ হইতে বিদেশীদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে অপরিহার্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের দ্বারা দেশের প্রতিষ্ঠিত শাসন-ব্যবস্থার উচ্ছেদ করিতে না পারিলে বিদেশীদের বিতাড়িত করা সম্ভব নয়।

একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের পক্ষে লোকবল ও অর্থ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অপরিহার্য। সংক্ষেপে, আমাদের এই স্বেচ্ছাসংঘকে (বাংলার অনুশীলন সমিতেকে) নিরবচ্ছিন্ন উদ্যম সহকারে লোকবল, অর্থবল ও অস্ত্রবল সংগ্রহ করিতে হইবে এবং ভবিষ্যৎ-সংগ্রামের জন্য এই সকল লোক লইয়া পবিত্র উদ্দেশ্য-প্রণোদিত একটা সামরিক বাহিনী সংগঠিত করিতে হইবে। সুতরাং সংগঠনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই প্রধান কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার জন্য আমাদের স্বেচ্ছাসংঘকে সকল শক্তি নিযুক্ত করিতে হইবে।"

[ইহা লক্ষ্যণীয় যে, এখানে গতানুগতিকভাবে ধর্মের সহিত স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যুক্ত করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই এবং একটা সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুত্থানকেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের চরম রূপ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে।]

পার্টিসভ্য :

পার্টি-সভ্যদের ভবিষ্যতের সশস্ত্র জাতীয় অভ্যুত্থানের জাতীয় বাহিনীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে এবং সৈন্যবাহিনীসুলভ শৃঙ্খলা ও যৌথ জীবনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

পরিচালক—তাঁহার কর্তব্য ও দায়িত্ব :

"পরিচালককে তাঁহার অঞ্চলস্থিত ও অঞ্চল-বহির্ভূত অন্যান্য দলের সহিতও যোগাযোগ রক্ষা এবং আলোচনা করিতে হইবে। তাঁহাকে অন্যান্য

দলের কর্মপদ্ধতি হইতেও শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।" [ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, পুস্তিকাটির রচয়িতা সন্ত্রাসবাদী দলসুলভ "দলীয় সংকীর্ণতা"র দোষ হইতে মুক্ত ছিলেন।]

অর্থসংগ্রহ :

"১০নং ধারা—বলপ্রয়োগদ্বারা অর্থ সংগ্রহ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।"

"১১নং ধারা—সমিতির (লীগের) আয়ের প্রধান উপায় হইবে জনসাধারণের দান ও সমিতির সভ্যদের চাঁদা।"

[এই দুইটি ধারা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, লেখক পার্টির অর্থ-সংগ্রহের জন্য ডাকাতি সমর্থন করেন নাই। তিনি পার্টিকে জনগণের সংগঠন হিসাবে গড়িয়া তুলিয়া অর্থের জন্য জনসাধারণের উপরেই নির্ভর করিতে বলিয়াছেন।]

শিক্ষা :

পুস্তিকাটির একটি বড় অংশে পার্টি-সভ্যদের বৈপ্লবিক শিক্ষা সম্পর্কে বলা হইয়াছে। তাহাদের অধ্যয়নের জন্য ইহাতে সেই সময়ের দেশীয় ও বিদেশী গ্রন্থের একটি তালিকাও সন্নিবেশ করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে লেখকের মূল বক্তব্য বিষয় এই যে, সভ্যদিগকে প্রথমে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন ও ইতিহাস সম্বন্ধে সাধারণ শিক্ষা দিয়া তাহার পরে অথবা তাহার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিতে হইবে।

২। *যুগান্তর সমিতি*

যুগান্তর সমিতির উৎপত্তি ও গোড়ার ইতিহাস এই অধ্যায়ের প্রারম্ভে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উৎপত্তি ও সংগঠন-বিস্তারের ইতিহাসও এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম গুরু শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। এবার এই সম্পর্কে বাংলার বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম গুরু ও নায়ক শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষের উক্তি উদ্ধৃত করা হইল :

বরোদায় "একবৎসর থাকিবার পর আমি বাংলাদেশে উপস্থিত হই। রাজনৈতিক প্রচারকরূপে বাংলাদেশে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আমি জিলায় জিলায় ঘুরিয়া বহু শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপন করি। এই সকল আখড়ায় শরীর-চর্চা ও রাজনীতি অধ্যয়নের জন্য যুবকদের ভর্তি করা হইত। আমি প্রায় দুইবৎসর ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করি। কিন্তু ক্রমশঃ এই কার্যে আমার অবসাদ দেখা দেয় এবং আমি বরোদায় ফিরিয়া আসিয়া একবৎসর ধরিয়া নানা বিষয় অধ্যায়ন করি। তারপর (১৯০৪ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে) আমি আবার বাংলাদেশে এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসি যে, এই দেশে কেবল মাত্র রাজনৈতিক প্রচারের দ্বারা কোন কাজ হইবে না, জনসাধারণকে এমনভাবে আধ্যাত্মিক শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে হইবে যাহাতে তাহারা নির্ভয়ে বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে। আমার একটা ধর্ম-প্রতিষ্ঠান (সম্ভবতঃ ভবানী-মন্দির) গড়িয়া তুলিবার ইচ্ছা ছিল। এই সময়ে 'স্বদেশী' ও বয়কট-আন্দোলন শুরু হয়। যুবকদের শিক্ষা দিবার জন্য তাহাদের আমার নির্দেশে পরিচালনা করিবার কথা চিন্তা করি এবং তাহার ফলেই আমি একটি দল গঠন করি। তাহারাই আজ গ্রেপ্তার হইয়াছে (আলিপুর-মামলায়)। আমি আমার বন্ধু অবিনাশ ভট্টাচার্য ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সহযোগিতায় 'যুগান্তর' সংবাদ-পত্র বাহির করিয়া দেড়বৎসর পর্যন্ত উহা চালাইয়া যাই এবং তারপর উহার চালনার ভার বর্তমান ব্যবস্থাপকদের উপর ছাড়িয়া দিই। পত্রিকার ভার ছাড়িয়া দিবার পর আমি আবার সভ্য-সংগ্রহের কাজে লাগিয়া যাই এবং ১৯০৭ খৃস্টাব্দের শুরু হইতে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের এই পর্যন্ত (আলিপুর-মামলা পর্যন্ত) চৌদ্দ কি পনের জন যুবক সংগ্রহ করি এবং তাঁহাদের ধর্ম ও রাজনৈতিক পুস্তকাদিদ্বারা শিক্ষা দিই। আমরা সকল সময় একটা সুদূরপ্রসারী বিপ্লবের কথাই চিন্তা করি এবং তাহার জন্যই নিজেদের প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছি। এই উদ্দেশ্যে আমরা কিছু অস্ত্রও সংগ্রহ করিয়াছি। আমি সর্বসমেত এগারটা রিভলভার, চারিটি রাইফেল ও একটা 'গান' সংগ্রহ করিয়াছি। আমাদের দলে

য-সকল যুবক যোগদান করিয়াছিল উল্লাসকর দত্ত তাহাদের একজন। সে আমাদের জানায় যে, সে আমাদের সহিত যোগ দিয়া কিছু কাজে লাগিবে বলিয়া বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। সে তাহার পিতার অজ্ঞাতসারে তাহাদের বাড়ীতে একটি রাসায়নিক পরীক্ষাগার স্থাপন করিয়াছিল। সেখানে সে অনেক পরীক্ষাকার্য চালাইয়াছিল। আমি নিজে ইহা কখনও দেখি নাই, সে-ই আমাকে ইহা জানাইয়াছিল। তাহার সাহায্যে আমরা ৩২নং মুরারী পুকুরের বাগানবাড়ীতে অল্পসংখ্যক বোমা তৈরী করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের আর একজন বন্ধু হেমচন্দ্র দাস, মনে হয় তাহার সকল সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া যান্ত্রিকবিদ্যা, সম্ভব হইলে বোমা তৈরি শিক্ষা করিবার জন্য প্যারী নগরীতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া উল্লাসকর দত্তের সহিত একত্রে বিস্ফোরক ও বোমা তৈরী করিতে থাকে। আমরা কখনই বিশ্বাস করিতাম না যে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক হত্যাদ্বারাই স্বাধীনতা পাওয়া যাইবে। তাহা সত্ত্বেও যে আমরা এই কাজ (বোমা তৈরী) করি তাহার কারণ এই যে, আমরা বিশ্বাস করি, জনসাধারণ ইহা চায়।"

[ইহা বারীন্দ্রকুমারের স্বীকারোক্তির একটি অংশ। ১৯০৮ খৃস্টাব্দে গ্রেপ্তার হইবার পর তিনি জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই স্বীকারোক্তি করেন। এই সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দুইটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি এই স্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি ইহার মারফত বাংলা-দেশে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচার ও উহাকে জনপ্রিয় করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, ইহাদ্বারা তিনি সমিতির বহু সভ্যকে পুলিশের কবল হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এই উদ্দেশ্য লইয়া স্বীকারোক্তিতে কেবল তাঁহাদেরই নাম করেন যাঁহারা পূর্বেই গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। তাঁহার তৃতীয় উদ্দেশ্য ছিল, 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র'এর সকল দায়িত্ব নিজের উপর তুলিয়া লইয়া ধৃত সহকর্মীদের দায়িত্ব ও দণ্ড লাঘবের ব্যবস্থা করা। তাঁহার এই সকল উদ্দেশ্য যে বহুলাংশে পূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, উক্ত উদ্দেশ্যগুলি লইয়া এই স্বীকারোক্তি করা হইয়াছিল বলিয়া ইহা

হইতে যুগান্তর সমিতির সংগঠন ও ক্রিয়া-কলাপের একটি পূর্ণ চিত্র না পাওয়া গেলেও ইহা হইতে যুগান্তর সমিতির গোড়া পত্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠনায়কের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অন্ততঃ আংশিকভাবে বুঝিতে পারা যায়।]

প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিবৃতি:

"আমার মনে হইল, ধর্মকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষের লোকদের দিয়া কিছুই করান যাইবেনা, তাই আমি কয়েকজন সাধুর সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু সাধুরা কোন কাজে আসিল না বলিয়া স্কুলের ছাত্রদের দিকে দৃষ্টি দিলাম, তাহাদের কয়েকজনকে ধর্ম, নৈতিক ও রাজনৈতিক শিক্ষা দিতে শুরু করিলাম। তখন হইতেই আমি ছেলেদের শিক্ষা দিবার কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমি তাহাদের শিক্ষা দিতাম আমাদের দেশের অবস্থা; ইহা ব্যতীত তাহাদের শিক্ষা দিতাম যে, আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচারের জন্য দেশের বিভিন্ন অংশে গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিতে হইবে, আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যখন সময় আসিবে তখন সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করিতে হইবে।"(১)

বিভিন্ন তথ্য ও সাহিত্য আলোচনা করিয়া সরকারী 'সিডিসন কমিটি' এই মন্তব্য করে:

"তাহা হইলে আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌছিতে পারি যে, বারীন্দ্র ও তাঁহার সহযোগীদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের ইংরেজি-শিক্ষিত যুবকদের এই বলিয়া অনুপ্রাণিত করা যে, প্রতারণা ও উৎপীড়নই ইংরেজ-সরকারের ভিত্তি আর এই প্রতারণা ও উৎপীড়নমূলক সরকারের উচ্ছেদ সাধনই ধর্ম ও ইতিহাসের নির্দেশ। শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের এদেশ হইতে তাড়াইতেই হইবে। তাহার জন্য অবিলম্বে ধর্ম, চর্চা ও শিক্ষামূলক শৃঙ্খলাযুক্ত একটা একনিষ্ঠ সংগঠন অবিলম্বে গড়িয়া তুলিতে হইবে।" (২)

এবার এক ধরনের নূতন সাহিত্য স্বাধীনতা-সংগ্রামের গভীর প্রেরণা লইয়া উক্ত সংগঠনের ভিত্তিরূপে দেখা দিতে থাকে।

---

(১) Sedition Committee Report, P. 20 - 21.

(২) Sedition Committee Report, P. 21.

'ভবানী-মন্দির'

অরবিন্দ ঘোষের অনবদ্য ভাষায় রচিত 'ভবানী-মন্দির' নামক পুস্তিকাখানি ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য, কর্মাদর্শ ও সাংগঠনিক ভিত্তি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ও নব জাতীয়তাবাদের চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাংলার যুবসম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী কালী বা শক্তিরই ভিন্ন নাম হইল ভবানী। দেবী ভবানী শক্তিস্বরূপিনী, তাই এই পুস্তিকায় অরবিন্দ বাংলার যুবসম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়াছেন মানসিক, দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়ান হইয়া উঠিবার জন্য। প্রবল-পরাক্রান্ত য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী দেশ রুশিয়ার সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করিয়া জাপান সেই শক্তিমত্তাই দুনিয়ার সম্মুখে প্রতিপন্ন করিয়াছে; অতএব নবশক্তিতে বলীয়ান জাপানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করাই ভারতবাসীর কর্তব্য। কিন্তু বাঙ্গালীর সেই শক্তি-সাধনা কিভাবে সম্ভব, তাহার গূঢ় অর্থ কি, তাহার বাস্তব রূপ কি ?

বাংলার শক্তি-সাধনার ধর্মীয় আদর্শ রাজনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শের সহিত মিশিয়া গিয়া ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদের মধ্যে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে, বাঙ্গালীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের বৈপ্লবিক আদর্শে পরিণত হইয়াছে। তাই শক্তিস্বরূপিনী ভবানীর আরাধনা হইল বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরণা ও শক্তির উৎস। তাই স্বাধীনতা লাভের জন্য দেবী শক্তি (কালী) বা ভবানীর আরাধনা অপরিহার্য।

মহারাষ্ট্রীয় নায়ক শিবাজীর শক্তি-সাধনার অনুকরণে গড়িয়া তুলিতে হইবে শক্তি-সাধনার এক পীঠস্থান—ভবানী-মন্দির। এই মন্দির নির্মাণের স্থান হইবে "আধুনিক শহরের দূষিত প্রভাব হইতে বহু দূরে, শান্তি ও শক্তি-সমন্বিত, উচ্চ ও পবিত্র বায়ু-প্রবাহিত নির্জন পার্বত্য অঞ্চলে।" এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিবে একটি দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ কর্মীদল। পূর্ণ সন্ন্যাস গ্রহণ হইবে তাহাদের ইচ্ছাধীন, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মচর্য পালন হইবে বাধ্যতামূলক।

ব্রহ্মচর্য পালনের সময় স্বাধীনতার জন্য প্রত্যেকের উপর ন্যস্ত কর্তব্য প্রত্যেককে অবশ্যই পালন করিতে হইবে। এই কর্তব্য পালনের পরে তাহারা ইচ্ছা করিলে গার্হস্থ্য-জীবনে ফিরিয়া যাইতে পারিবে। এই কর্তব্য শেষ হইবে দেশের স্বাধীনতা লাভে। সংক্ষেপে, একটি সর্বত্যাগী ও দেশ-হিতার্থে নিবেদিত-প্রাণ রাজনৈতিক "সন্ন্যাসী" বা কর্মীদল গঠন করাই 'ভবানী-মন্দির'এর মূল কথা।

'ভবানী-মন্দির'এ স্বাধীনতা-সংগ্রামের ধর্মীয় আদর্শ তুলিয়া ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি সাংগঠনিক আদর্শও দেওয়া হইয়াছে। রুশীয় বিপ্লবীদের (এনার্কিস্টদের) সংগঠন ও নিয়ম-কানুনই বাংলার বিপ্লবীদের সাংগঠনিক আদর্শ ও পন্থা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। অরবিন্দ তাঁহার এই পুস্তিকায় স্বাধীনতার জন্য রাজনৈতিক কর্মপন্থা হিসাবে নরহত্যা ও ডাকাতি সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন নাই। পরবর্তীকালে সমিতির সংগঠনের মধ্যে এই পুস্তিকার ধর্মীয় ও সাংগঠনিক আদর্শ বহুলাংশে গৃহীত হয় এবং তাহার সহিত রাজনৈতিক নরহত্যা ও ডাকাতির পন্থা সংযোজিত হয়। 'সিডিসন কমিটি'র মতে:

"'ভবানী-মন্দির'এ ধর্ম সম্পর্কে বহু আলোচনার সহিত রুশীয় বৈপ্লবিক আদর্শ ও পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের পর সমিতি ও সংঘগুলি 'ভবানী-মন্দির' পুস্তিকায় আলোচিত 'শপথ' ও 'প্রতিজ্ঞা'সমূহ ব্যতীত অন্য সকল ধর্মীয় ভাবধারা ত্যাগ করে এবং ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতি সন্ত্রাসবাদের আনুষঙ্গিক বিষয়গুলি যোগ করে।"(১)

[অরবিন্দের প্রস্তাবিত ভবানীর মন্দির কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শোনা যায়, এই মন্দির প্রতিষ্ঠার ভার দেওয়া হয় বারীন্দ্রের উপর। বারীন্দ্র বহু অনুসন্ধান করিয়া বিহারপ্রদেশের কোন পাহাড়ের উপর একটি স্থান মনোনীত করেন। কিন্তু ইহার পর তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সমিতির কার্যে এমনভাবে জড়িত হইয়া পড়েন যে, মন্দির-প্রতিষ্ঠার কার্য আরম্ভ করা আর সম্ভব হয় নাই।]

(১) Sedition Commitee Report, P. 101.

'যুগান্তর' পত্রিকা

১৯০৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে এই পত্রিকাখানির প্রচার-সংখ্যা ছিল সাত হাজার, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে 'আলিপুর-ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হইবার পর ইহা যখন বন্ধ হয় তখন ইহার প্রচার-সংখ্যা ছিল প্রায় পঁচিশহাজার। 'যুগান্তর'এর লেখক ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দেবব্রত বসু (প্রজ্ঞানন্দ স্বামী), সখারাম গণেশ দেউস্কর, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

এই পত্রিকাখানি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেশব্যাপী, বিশেষ করিয়া বাংলাব্যাপী নূতন জাতীয়তাবাদী জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার যুবসম্প্রদায়ের চেতনার জড়তা কাটাইয়া তাহাদের মধ্যে শক্তি-সাধনার মনোভাব ও বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার কাজে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ইহা ধর্মের সহিত স্বাধীনতার আদর্শ মিশ্রিত করিয়া বাংলার যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে এক নূতন বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইয়া তোলে এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করে। এই উদ্দেশ্যে ইহাতে মহাভারতের ধর্মযুদ্ধে অর্জ্জুনকে প্রেরণা দানের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ, চণ্ডীপুরাণের সুরাসুরের যুদ্ধ, রাজপুতদের ও শিবাজীর স্বাধীনতা-সংগ্রামের কাহিনী, ইতালীর ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির বৈপ্লবিক সংগ্রামের কথা জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। এই সকল প্রবন্ধের মারফত লেখকগণ বাংলার যুবসম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিয়া আত্মত্যাগের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। 'যুগান্তর' পত্রিকাখানি কেবল বাংলার যুবসম্প্রদায়কেই বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে নাই, ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি সুদূর আমেরিকা-প্রবাসী গদর-বিপ্লবীরাও ইহা হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। গদর-বিপ্লবীরা নাকি 'যুগান্তর' পত্রিকার নাম অনুসারে তাহাদের আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত একটি রাজনৈতিক মন্দিরের নাম রাখিয়াছিলেন 'যুগান্তর-মন্দির'।(১)

---

(২) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ১০৯।

১৯০৬ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'যুগান্তর' সারা বাংলার যুবসম্প্রদায়ের বৈপ্লবিক দীক্ষাদাতা রূপে গৃহীত হয়, সারা বাংলার যুবসমাজের মধ্যে ইহা এক বৈপ্লবিক মনোভাবের জোয়ার আনিয়া দেয়। সাহসী যুবকগণ ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় 'যুগান্তর' পত্রিকার সংস্পর্শে আসিতে থাকে। এই বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়াই ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল তারিখের 'যুগান্তর'এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে সদম্ভে ঘোষণা করা হয়: "অশান্তির আগুন জ্বালাইয়া দিতেই হইবে। আমরা আহ্বান করি সেই অশান্তিকে যার নাম বিদ্রোহ।" তখন বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সারা বাংলায় অশান্তির আগুন জ্বলিতেছে। বিপ্লবীরা সেই আগুনকে দেশময় এক বিরাট দাবাগ্নিতে পরিণত করিয়া বিদেশী ইংরেজ-শাসনকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবার জন্য এই উন্মাদনাময় আহ্বান ধ্বনিত করেন।

বিপ্লবের জন্য অস্ত্র চাই, চারিদিক হইতে দাবি আসিতে থাকে, 'অস্ত্র চাই'। 'যুগান্তর' বাংলার যুবকদের ভরসা দিল, অস্ত্র পাওয়া যাইবে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১২ই আগস্টের সম্পাদকীয় স্তম্ভে লেখা হয়: "দেশের মধ্যেই অস্ত্র আছে, তাহা সহজেই পাওয়া যায়, আর বোমা তৈরীর ব্যবস্থা তো আছেই। কিন্তু এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ গোপনতা অবলম্বন করিতে হইবে।" "অস্ত্রশক্তি সংগ্রহ করিবার আর একটি চমৎকার উপায় আছে। অনেকেই জানেন, রুশ-বিপ্লবে দেখা গিয়াছে যে, 'জার'-এর (রুশিয়ার সম্রাটের) সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অনেক সৈন্য রুশ-বিপ্লবীদের সমর্থক। এই সৈন্যেরা বিপ্লবের সময় বিভিন্ন প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র-সহ বিপ্লবীদের পক্ষে যোগদান করিবে। এই উপায়টি যথেষ্ট কার্যকরী বলিয়া ফরাসী-বিপ্লবে প্রমাণিত হইয়াছে। যে দেশের শাসকগণ বিদেশী সে দেশে বিপ্লবীদের আরও অনেক সুযোগ আছে, কারণ শাসকদের বাধ্য হইয়া ঐ পরাধীন দেশের অধিবাসীদের মধ্য হইতেই প্রায় সকল সৈন্য সংগ্রহ করিতে হয়। এই সকল দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র প্রচার করিয়া বিপ্লবীরা যথেষ্ট সুবিধা করিয়া লইতে পারে। যখন শাসকশক্তির সহিত প্রকৃত সংঘর্ষ শুরু হয়, তখন বিপ্লবীরা কেবল এই সৈন্যদেরই তাহাদের দলে পায় না,

শাসকগণ ঐ সৈন্যদের হাতে যে সকল অস্ত্র দেয় তাহাও বিপ্লবীদের হাতে আসে। ইহা ব্যতীত, শাসকদের মনে ভয়ংকর ত্রাস সৃষ্টি করিয়া তাহাদের এত উৎসাহ, এত সাহস সকলই চুরমার করিয়া দেওয়া যায়।"

১৯০৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের ২৬ তারিখের 'যুগান্তর'এ জনৈক 'যোগী'র নাম দিয়া একখানি পত্র প্রকাশিত হয়। তাহাতে লেখা হয়:

"আমি শুনিতে পাই, আপনাদের পত্রিকার হাজার হাজার সংখ্যা বাজারে বিক্রয় হয়। যদি দেশের মধ্যে পনেরহাজার কাগজও বিক্রয় হয়, তবে তাহা পড়ে প্রায় ষাটহাজার লোক। আমি একটি কথা এই ষাটহাজার লোককে বলিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছি না। তাই এই অসময়ে আমি কলম ধরিয়াছি।.........আমি উন্মাদ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও হুজুগপ্রিয়। যখন শুনিতে পাই যে চারিদিকে অশান্তি শুরু হইয়া গিয়াছে তখন আমার আনন্দ আর ধরে না, আমি বধির ও বাকশক্তিহীনের মত চুপ করিয়া থাকিতে পারি না। আমার নিকট চারিদিক হইতে লুণ্ঠনের সংবাদ আসিতেছে, আমি স্বপ্ন দেখি যেন ভবিষ্যৎ গেরিলা-দলগুলি চারিদিকে অর্থলুণ্ঠন করিয়া বেড়াইতেছে, যেন ছোট ছোট ডাকাতির আকারে ভবিষ্যৎ-যুদ্ধ শুরু হইয়া গিয়াছে।......লুণ্ঠন! আজ আমি তোমাকে পূজা করি, তুমি আমাদের সহায় হও! তুমি এতদিন ফুলের মধ্যে কীটের মত লুকাইয়া থাকিয়া দেশের প্রাণশক্তি নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ! এবার তুমি নিজ মূর্তিতে আবার আবির্ভূত হও, যতত্র অবাধ বিচরণ কর, জনসাধারণের মনে জাগাইয়া তোল সেই পুরাতন সামরিক চেতনা!......তোমার নিকট হইতে একদিন ভরসা পাইয়াছিলাম যে, যেদিন ভারতবাসীরা তোমাকে স্মরণ করিবে, তোমার পূজা করিবে, সেদিন তুমি অর্থ দিয়া তাহাদের হাত ভরিয়া দিবে, সেই অর্থ দিয়া তাহারা নিজেদের সশস্ত্র করিয়া তুলিবে, সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিবে। তাই আজ আমি তোমাকে পূজা করি।"

এই বিপ্লবী যোগী যে 'যুগান্তর'এর বিপ্লবী পরিচালকদেরই একজন এবং "উন্মত্ততা", "মস্তিষ্ক-বিকৃতি" ও "হুজুগপ্রিয়তা" প্রভৃতি কথাদ্বারা ইংরেজ-শাসনের

বিরুদ্ধে যে একটা ব্যাপক বিদ্রোহের উন্মাদনা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

'সিডিসন-কমিটি'র রিপোর্ট-রচয়িতাগণ তাই মন্তব্য করিয়াছেন :

"বৃটিশ জাতির (শাসক জাতির) বিরুদ্ধে তাঁহারা ('যুগান্তর'-পরিচালকগণ) একটা জলন্ত ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতেছেন। 'যুগান্তর'এর প্রতিছত্রে বিপ্লবের হুঙ্কার ধ্বনিত হয়, তাঁহারা বিপ্লব সফল করিয়া তুলিবার পথ দেখান। যুবকদের ভাবপ্রবণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এমন কোন নিন্দাবাদ, কোন কৌশলই তাঁহারা তাঁহাদের ভাবধারা প্রচারের জন্য ব্যবহার করিতে ইতস্তত করেন না।"(১)

'যুগান্তর' পত্রিকার তৎকালীন ঐতিহাসিক ভূমিকা যে বহুলাংশে সফল হইয়াছিল তাহা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

অন্যান্য পত্রিকা

বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের পক্ষে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' পত্রিকার অবদানও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ব্রহ্মবান্ধবও তাঁহার এই পত্রিকার মারফত ধর্মীয় ভাবধারার ভিত্তিতে বাংলার যুবকদের বৈপ্লবিক চেতনা জাগাইয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর আত্মশক্তি জাগাইয়া তুলিয়া তাহা ইংরেজ-বিরোধী বৈপ্লবিক সংগ্রামের কর্মধারায় রূপান্তরিত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবে ইংরেজ-শাসনকে অগ্রাহ্য করিতেন। এই বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের পথে বোমা-পিস্তলের সাহায্য গ্রহণের জন্যও তিনি প্রকাশ্যেই আবেদন করিতেন। তাঁহার জ্বালাময়ী ভাষা যুবসম্প্রদায়ের এক অংশকে প্রেরণা যোগাইলেও ব্রহ্মবান্ধব কোন বৈপ্লবিক সংগঠনের সহিত

(১) উপরোক্ত সকল উদ্ধৃতিই 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্ট হইতে গৃহীত এবং ইংরেজি হইতে অনূদিত।

ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না এবং কোন গঠনমূলক কর্মপন্থার ধার ধারিতেন না বলিয়া কেবলমাত্র ধ্বংসমূলক রচনার জন্য এই পত্রিকাখানি অধিক সংখ্যক যুবককে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মবান্ধবের বন্ধু ও সহযোগী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের কথায় :

"এই কাগজে ক্রমাগত ধ্বংসমূলক আলোচনা বাহির হওয়ায় ইহা শিক্ষিত সাধারণের প্রিয় হয় নাই এবং ইহা বৈপ্লবিক মতাবলম্বী না হওয়ায় আমরা একটি বৈপ্লবিক কাগজ (যাহা দলাদলির বাহিরে থাকিবে) বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলাম।"(১)

এই সকল সংবাদ-পত্রের সহিত ইংরেজি-ভাষায় প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম'এর নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্পাদনায় ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। অরবিন্দ পরে ইহাদের সহিত যোগদান করেন। অরবিন্দ ইতিপূর্বে বোম্বাইয়ের 'ইন্দু প্রকাশ' নামক পত্রিকায় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আপস-নীতির মুখোস উন্মোচন করিয়া অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এবার 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় যোগদান করিয়া তিনি নূতন বৈপ্লবিক আদর্শ ও কর্মপন্থা দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহার বিখ্যাত 'নিউ স্পিরিট' (নবভাব) ও 'নিউ পাথ' (নূতন পন্থা) শীর্ষক প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। বলা বাহুল্য, অরবিন্দের এই সকল রচনাই বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

'মুক্তি কোন পথে'

বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা সৃষ্টি ও সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রয়াসের দিক হইতে এই পুস্তকখানির দান অসামান্য। 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি বাছাই-করা প্রবন্ধ লইয়াই এই পুস্তকখানি তৈরী। অরবিন্দের

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃ: ২৪।

'ভবানী-মন্দির'এ বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে সকল বিষয় স্থান লাভ করে নাই, এই পুস্তিকায় সেইগুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। 'ভবানী-মন্দির'এ ডাকাতিদ্বারা অর্থ সংগ্রহের কোন উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ইহাতে "বিপ্লবের উদ্দেশ্যে ডাকাতিদ্বারা অর্থ সংগ্রহ" সম্পর্কে বিশেষ জোর দেওয়া হয় ও অত্যাচারী সরকারী কর্মচারীদের হত্যার কর্মপন্থা ইহাতে বিশেষ স্থান লাভ করে এবং বৈপ্লবিক কর্মপন্থার আরও বিকাশ সাধন করা হয়।

পুস্তকখানির প্রথমাংশে কংগ্রেসী আদর্শের "সংকীর্ণতা ও নীচতা" সম্পর্কে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়, তারপর বিপ্লব গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে একদল "বিক্ষোভ ও অশান্তি সৃষ্টিকারী" লোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার "নির্ভুল পন্থার উপর জোর দেওয়া হয়। "দেশের যুবকদের অসংখ্য দল এই বিক্ষোভ ও অশান্তিমূলক কার্যে যোগদান করুক, দেশের বর্তমান নেতৃবৃন্দ যে সকল ঘটনায় আমাদের অংশ গ্রহণ করিতে বলে সেই সকল ঘটনায়ও এই দলগুলি যোগদান করুক। কিন্তু তাহাদের ইহাতে যোগদানের উদ্দেশ্য হইবে ভিন্ন, তাহাদের যোগদানের উদ্দেশ্য হইবে সমগ্র দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ। এই উদ্দেশ্য লইয়া ঐ দলগুলি এই সকল ঘটনায় সর্বশক্তি লইয়া অংশ গ্রহণ করিবে এবং আন্দোলনের সম্মুখভাগে স্থান গ্রহণের চেষ্টা করিবে।······বর্তমান অবস্থায় আমাদের দেশে বিক্ষোভ ও কর্মের অন্ত নাই ; আর ভগবানের কৃপায় বাঙ্গালীরা সর্বত্র জলন্ত দেশ-প্রেমের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এই ধরনের প্রচেষ্টা দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সুতরাং এই দিকে অবহেলা দেখাইলে চলিবে না।. কিন্তু সর্বদা অন্তরে স্বাধীনতার আদর্শ জাগরুক রাখিয়া এই সকল আন্দোলনে যোগদান না করিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি ও শিক্ষা আয়ত্ব করা কোন দিনই সম্ভব হইবে না। সুতরাং উক্ত দলসমূহের সভ্যগণকে একদিকে যেমন নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও নিজ নিজ দলের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করিতে হইবে, তেমনি অন্যদিকে উক্ত কর্মপন্থা ও বিক্ষোভ সৃষ্টিদ্বারা দেশের মধ্যে উত্তেজনা জিয়াইয়া রাখিবার জন্য ধীর-স্থিরভাবে কর্মপ্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিতে হইবে।"

তারপর এই ধরনের বৈপ্লবিক কর্মপন্থার কার্যকরী রূপ ব্যাখ্যা করিয়া কর্মীদের মনে সাহসের সঞ্চার করিবার জন্য বলা হয়: য়ুরোপীয় কর্মচারীদের হত্যা করিবার জন্য খুব বেশী শক্তির প্রয়োজন হয় না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া কাজে নামিলে অস্ত্রসংগ্রহ করাও সম্ভব, এবং কোন গোপন স্থানে নিঃশব্দে বসিয়া (বোমা প্রভৃতি) হাতিয়ার তৈরী করাও যায়; বোমা প্রভৃতি তৈরী করিবার কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য ভারতবাসীদের বিদেশে পাঠান চলে; ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করিতেই হইবে, দেশের দুঃখ-দুর্দশা তাহাদের উপলব্ধি করাইতে হইবে; শিবাজীর বীরত্ব সকল সময়ে মনে রাখিতে হইবে; বৈপ্লবিক কাজের গোড়ার দিকে চাঁদা তুলিয়াই খরচ চালাইতে হইবে, কিন্তু শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপ্রয়োগের দ্বারা দেশের মধ্য হইতে অর্থসংগ্রহ করিতে হইবে: সমাজের মঙ্গল সাধনই যখন বিপ্লবের উদ্দেশ্য, তখন এই উদ্দেশ্যে সমাজের নিকট হইতে অর্থ আদায় করা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত; আমরা স্বীকার করি যে, চুরি বা ডাকাতি অপরাধ, কারণ ইহার ফলে সমাজের মঙ্গল বিপর্যস্ত হয়, কিন্তু রাজনৈতিক ডাকাতির উদ্দেশ্য হইল সমাজের মঙ্গলসাধন। সুতরাং "বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র মঙ্গল বলি দিলে তাহাতে পাপ তো হইবেই না, বরং তাহাতে পুণ্য হইবে যথেষ্ট। কাজেই বিপ্লবীরা যদি সমাজের কৃপণ অথবা সৌখিন লোকদের নিকট হইতে বল প্রয়োগ করিয়া অর্থ আদায় করে তবে তাহাদের সেই কাজ হইবে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।"

এই পুস্তকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়া বলা হইয়াছে যে, "ভারতীয় সৈন্যদের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে।......এই সৈন্যেরা পেটের দায়ে বিদেশী শাসকদের সরকারের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেও তাহারা রক্ত-মাংস দিয়া তৈরী মানুষ। তাহারাও চিন্তা করিতে পারে; সুতরাং বিপ্লবীরা যদি দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথা তাহাদের বুঝাইয়া দেয়, তবে উপযুক্ত সময়ে তাহারা শাসকদের দেওয়া অস্ত্রশস্ত্রসহ বিপ্লবীদের দলে যোগদান করিয়া বিপ্লবের শক্তি বাড়াইয়া তুলিবে।......সৈন্যদের এইভাবে বিপ্লবের পক্ষে টানা সম্ভব জানিয়াই ভারতের বর্তমান ইংরেজ-রাজ বুদ্ধিমান বাঙ্গালীদের সৈন্যদলে প্রবেশ করিতে

দেয় না।……ইহা ব্যতীত, বৈদেশিক শক্তিগুলির নিকট হইতেও গোপনে অস্ত্র-সাহায্য পাওয়া সম্ভব।"

'বর্তমান রণনীতি'

দেশের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম বা যুদ্ধ অনিবার্য। এই যুদ্ধের জন্য সর্বাঙ্গীন আয়োজন আবশ্যক। 'বর্তমান রণনীতি' নামক পুস্তকে সেই সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজনের কথাই ব্যখ্যা করা হইয়াছে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে এই পুস্তক প্রথম প্রকাশিত হয়।

বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর উৎপীড়ন বন্ধ করিবার অন্য কোন উপায় নাই বলিয়া যুদ্ধ অনিবার্য। কর্ম (বৈপ্লবিক যুদ্ধ) দেশের মঙ্গল ও মুক্তির উপায়। এই কর্মের জন্যই হিন্দুরা শক্তির উপাসনা করে। কর্মই সবকিছুর মূল, তাই কর্ম কর। …ভারতীয় যুবকদের শক্তি-সামর্থ্য অনিয়মিত যুদ্ধে (গেরিলা-যুদ্ধে) নিয়োজিত করিতে হইবে, তাহা হইলেই তাহারা নির্ভীক ও অসিযুদ্ধে নিপুণ হইয়া উঠিবে। তাহাদের বিপদের সম্মুখে দাঁড়াইতে শিখিতে হইবে এবং বীরের গুণ আয়ত্ত করিতে হইবে। ভারতের জাতীয় সত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের জন্য বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা অপরিহার্য। শয়তান ইংরেজ ভারত-বাসীদের চিরকাল পদানত করিয়া রাখিতে সুবিধা হইবে বলিয়াই তাহাদের নিরস্ত্র করিয়া রাখিয়াছে।

ইহার পর এই পুস্তকে বিপ্লবীদের সামরিক শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। সামরিক শিক্ষার সহিত সম্পর্কযুক্ত বলিয়া ইহাতে বোমা তৈরীর বিভিন্ন পদ্ধতি, এই সম্পর্কে বিপ্লবীদের পূর্ব-অভিজ্ঞতা, বোমার কার্যকারীতা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে।

সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি

যুগান্তর সমিতির সংগঠনের রূপ ও পদ্ধতি সম্পর্কে উক্ত দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের উক্তি উদ্ধৃত করা হইল :

"...শ্রীঅরবিন্দ কলিকাতায় আসিয়া অগ্রে যে ভাসা ভাসা দলটি ছিল, তাহা দৃঢ়ভাবে সংগঠিত করেন। ইহারই ফলে মহারাষ্ট্রীয় এবং বঙ্গীয় বৈপ্লবিক দলের সংযোগ স্থাপিত হয় ও উপরোক্ত কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।(১) কার্যের প্রণালী এই প্রকার ছিল :—সভাপতিকে সর্বপ্রকার কার্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক হইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাঁহাকে কার্যের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এককেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য করিত ও কাযের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত। এক কেন্দ্র অপর কেন্দ্রের কার্যের সংবাদ জানিত না। উদ্দেশ্য ছিল, একজন ধরা পড়িলে অন্য সব কর্মীরা ও কেন্দ্রগুলি যেন ধরা না পড়ে এবং বিচ্ছিন্ন না হয়। কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র গ্রহণ করান হইত।(২) এই দীক্ষামন্ত্র নাকি মহারাষ্ট্র হইতে আনয়ন করা হইয়াছিল। দীক্ষায় সংস্কৃত ভাষা, হিন্দুশাস্ত্র, তরবারি ও প্রতিজ্ঞা বিশেষ উপকরণ ছিল। দীক্ষিত ব্যক্তি দীক্ষাদাতার নাম কাহারও কাছে ব্যক্ত করিলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে, এই প্রতিজ্ঞা তাহাকে করিতে হইত। দীক্ষাতে আমার যতদূর মনে হয় 'ধর্মরাজ্য' স্থাপনের চেষ্টার কথা বলা হইত। ইহাতে মহারাষ্ট্রীয় প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হইত, কারণ ইহা স্বামী রামদাসের আদর্শ ছিল। জানিনা অহিন্দুর বেলায় কি ব্যবস্থা হইত। তবে আসল কথা এই যে, গুপ্ত সমিতিতে অহিন্দু-সভ্য বেশী ছিল না।...আমি কেবল হিন্দুশাস্ত্রের নামে প্রতিজ্ঞা করিতে অস্বীকার করাতে আমার জন্য উদার ব্যবস্থা (বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্রের পুস্তক স্পর্শ করান) হইয়াছিল।

"সমিতির সভ্যদের জন্য সামরিক কড়া নিয়ম (discipline) প্রচলনের চেষ্টা সর্বদা করা হইত। একজন অপরের বিষয়ে কৌতূহলী হওয়া বা প্রকাশ্য স্থলে কাহারও সঙ্গে আলাপ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রত্যেক ছাত্রকে তাহার

---

(১) মহারাষ্ট্রীয় দলের সহিত বঙ্গীয় দলের সংযোগ সাধনের কারণ এই যে, অরবিন্দ ইতি-পূর্বে মহারাষ্ট্রীয় দলের সভ্য হইয়াছিলেন—ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে।

(২) 'ভবানী-মন্দির' পুস্তিকায় এই মন্ত্রের সারাংশ দেওয়া হইয়াছিল।

দীক্ষাদাতা এবং যিনি তাহার চালক হইতেন তাঁহার হুকুম মান্য করিতে হইত। ...প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য করিতে হইত। কেহ হেদুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে বা হোস্টলে, কেহ বা বার-লাইব্রেরিতে —যে যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।...

"কর্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম-ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান করা হইত। সেখানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত, ম্যাটসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী ও ও দেউস্করের (সখারাম দেউস্করের) 'দেশের কথা' পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম-উৎসব, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। এই সব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক হইতেন।" (১)

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম," পৃ: ৪৪-৪৭।
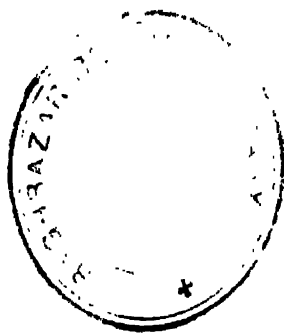
ষষ্ঠ অধ্যায়

কর্ম-পদ্ধতি ও সংগঠন—(৪)

সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি

(১)

গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সমিতির পরিচালকগণ সভ্যসংগ্রহ কার্যে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতি ছিল প্রায় অভিন্ন। মহারাষ্ট্র ও বাংলা দেশের নেতারা সকলেই এই উদ্দেশ্যে যুব-সম্প্রদায়কেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান ও একমাত্র শক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন। যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের লইয়া বিপ্লবের সৈন্যদল গঠন করাই ছিল বিপ্লবী সমিতিগুলির প্রধান লক্ষ্য। এবিষয়ে ম্যাৎসিনির আদর্শ মহারাষ্ট্র হইতে বাংলাদেশ পর্যন্ত সকলেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন সমিতির কর্ম-পদ্ধতির পার্থক্যের জন্য উহাদের সভ্যসংগ্রহ-পদ্ধতিতেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যে সকল সমিতি প্রচারধর্মী ছিল, অর্থাৎ যে সকল সমিতি সংবাদ-পত্র প্রভৃতির দ্বারা বিপ্লবের আদর্শ যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করিয়া তাহাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা বিশেষ করিয়া প্রচার-কার্যের দ্বারাই ছাত্রদের প্রথমে সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। সাধারণতঃ ইহার পরেই তাহারা আখড়া ও আলাপ-আলোচনার সাহায্য গ্রহণ করিত। মহারাষ্ট্রীয় সমিতি ও বাংলার যুগান্তর সমিতি এই পদ্ধতি অনুসরণ করিত। কিন্তু বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতি সংবাদ-পত্রের মারফত প্রচারের বিরোধী ছিল বলিয়া উহা কেবলমাত্র গোপনে ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা ও ব্যাখ্যা-কার্যের পদ্ধতি গ্রহণ করে। আখড়া ও স্কুল-কলেজগুলি ছিল তাহাদের সভ্য-সংগ্রহের প্রধান ক্ষেত্র।

মহারাষ্ট্রদেশে পুণা হইতে প্রকাশিত 'কেশরী', 'কাল' ও 'বিহারী' পত্রিকা এবং বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতির 'যুগান্তর' ও 'নবশক্তি' পত্রিকা যুবসম্প্রদায়, বিশেষ করিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা তাহাদের গুপ্ত সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। এই সকল পত্রিকা, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের 'যুগান্তর' এই কার্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য লাভ করিয়াছিল। 'যুগান্তর' পত্রিকার অগ্নিবর্ষী রচনা ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি যুবসম্প্রদায়ের সকল অংশকেই সমানভাবে বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া গুপ্ত সমিতির দিকে আকর্ষণ করিত। 'যুগান্তর এর বৈপ্লবিক রচনা কিভাবে শিক্ষিত যুবকদের বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিত তাহার দুইটি চমৎকার দৃষ্টান্ত নীচে উদ্ধৃত করা হইল:

"আমি একজন শিক্ষক।......চন্দননগরে থাকিতে উপেন (উপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়) আমাকে কয়েক কপি 'যুগান্তর' পত্রিকা দেখাইয়াছিল এবং তাহা খুব মন দিয়া পড়িয়াছিলাম। ঐ গুলি পড়িয়া আমি প্রতিজ্ঞা করি যে, আমাদের দেশের স্বাধীনতা লাভ করিতেই হইবে, আমি উপেনকে 'যুগান্তর' অফিসে খোজ করিয়া দেখিতে বলি যে, কলিকাতায় এমন কোন সংগঠন আছে কিনা যাহা বিদেশীদের কবল হইতে দেশোদ্ধার করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পরদিন আমি চাতরা (শ্রীরামপুর) চলিয়া যাই এবং শিক্ষা-বিভাগে একটি চাকুরি সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করি। শিক্ষকের কাজ লইলে আমি ছেলেদের নিকট প্রচার করিবার সুযোগ পাইব যে, ইংরেজেরা ভণ্ডামী ও প্রতারণা দ্বারা আমাদের দেশ জয় করিয়াছে। আমি ভদ্রেশ্বর উচ্চ ইংরেজি-স্কুলে একটি শিক্ষকের পদ লাভ করি।"(১)

অপর একজনের বিবৃতি: "যখন সরকার বঙ্গভঙ্গের সময় আমাদের আবেদন শুনিতে অস্বীকার করে তখনই আমরা 'স্বরাজ' লাভের জন্য চেষ্টা শুরু করি। 'যুগান্তর' পত্রিকা হইতেই আমি প্রেরণা লাভ করিয়াছিলাম।"(২)

---

(১) যুগান্তর সমিতির অন্যতম নেতা হৃষিকেশ কাঞ্জিলালের বিবৃতি—'সিডিসন কমিটির রিপোর্ট' হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১।

(২) উক্ত রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত, পৃঃ ২১।

সেই সময়ে 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচারের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য যুবকগণ দলে দলে 'যুগান্তর' পত্রিকার অফিসে আসিয়া বৈপ্লবিক কার্যে আত্মোৎসর্গ করিবার বাসনা জানাইত। নেতারা তাহাদের লইয়া ক্লাস ও আলাপ-আলোচনা চালাইতেন, কাহাকেও বা আখড়ায় পাঠাইতেন দেহ-চর্চার জন্য। তারপর ইহাদের দীক্ষাদানের ব্যবস্থা হইত। ইহার সহিত আখড়ার কার্য, স্কুল-কলেজে প্রচার এবং ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনার মারফত সভ্য-সংগ্রহও সমানভাবে চলিত। যুগান্তর সমিতি উহার 'যুগান্তর' পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে সভ্য-সংগ্রহের কার্য চালাইত তাহার একটি প্রামাণ্য বিবরণ উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠা ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করা হইল :

সমিতির উর্দ্ধতন পরিচালকদের "নীচ ছাত্রদের লইয়া কার্য করিবার জন্য" একজন অধিনায়ক নিযুক্ত ছিলেন। "যুবকদের ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি শারীরিক ব্যায়াম শিক্ষার জন্য" অনেকগুলি আখড়া স্থাপন করা হইয়াছিল। "কার্যের প্রণালী এইরূপ ছিল, :—সভাপতিকে সকল প্রকার কর্মের সংবাদ দিতে হইত। যিনি ক্লাবের অধিনায়ক হইয়া ছাত্রদের চালাইতেন তাঁহাকে কার্যের সংবাদ সভাপতিকে দিতে হইত এবং প্রত্যেক সভ্য স্বয়ং এককেন্দ্রস্বরূপ হইয়া ছাত্রদের মধ্যে কার্য করিত ও কার্যের ফল তাহার উপরিস্থিত নেতাকে জানাইত।...... কোন নূতন লোককে বৈপ্লবিক মতে আনয়ন করিতে পারিলে তাহাকে সমিতির মন্ত্র (দীক্ষা) গ্রহণ করান হইত।"

".........প্রত্যেক সভ্যকে প্রচারের কার্য করিতে হইত। কেহ হেদুয়ায়, কেহ গোলদীঘিতে, কেহ কলেজে বা হোস্টেলে, কেহবা বার-লাইব্রেরীতে—যে যেখানে পারিতেন অন্য লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতেন।"

"বৈপ্লবিক প্রচারকের দলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী-প্রাপ্ত লোকদের সঙ্গে ক্রমাগত তর্কযুদ্ধ করিতে হইত, সেই জন্য প্রচারকদের ভারতীয় রাজনীতি ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের সংবাদ ভাল করিয়া রাখিতে হইত।"

"ইহা হইল চিন্তাক্ষেত্রের কথা। কর্মক্ষেত্রে বঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় ব্যায়াম-ভূমি স্থাপন করিয়া ছাত্রদের আহ্বান করা হইত, যে স্থানে ব্যায়াম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক কথার চর্চা ও সঙ্গীত, ম্যাৎসিনির আত্মজীবনী, যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুস্তকাবলী ও দেউস্করের 'দেশের কথা' পাঠ, স্বদেশী কাপড় ব্যবহার, শিবাজী, প্রতাপাদিত্য ও সীতারাম-উৎসব, 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের প্রচলন ইত্যাদি অনুষ্ঠান হইত। এই সব আখড়ায় স্থানীয় শিক্ষক বা যুবক উকিল বা অপেক্ষাকৃত বয়স্ক লোক চালক হইতেন। এই সকল বৈপ্লবিক কেন্দ্রই বঙ্গভঙ্গের সময়ে স্বদেশী আন্দোলনকে অন্তরাল হইতে চালাইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে এই সব কেন্দ্র স্থাপন করা বড় সহজ কাজ ছিল না।......"

"কর্ম যতই শক্ত হউক, বিপ্লবপন্থীরাও নাছোড়বান্দা হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং নিজেদের কর্মের প্রভাবে বঙ্গে ও তাহার বাহিরে কেন্দ্র স্থাপনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবপন্থীদের চেষ্টা ছিল ছাত্রবৃন্দ ও বাবুর দলকে বিপ্লবপন্থীদের অনুগামী করা ও সুবিধা হইলে রাজরাজড়ার দলকেও বিপ্লববাদী করা।" "সভ্যেরা মধ্যে মধ্যে প্রচার-কর্মের জন্য বাহির হইতেন। একবার জনকতক গেরুয়া পরিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বিভিন্ন জায়গায় যাইয়া প্রচার করা, লোককে স্বমতে আনয়ন করা, তথায় সাধারণের জন্য একটা ব্যায়ামাগার স্থাপন করা ও একটা গুপ্ত কার্যনির্বাহক কমিটি গঠন করা প্রচারকদের কর্ম ছিল।"(১)

২। স্কুল-কলেজ

বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতি প্রচার-বিরোধী ছিল বলিয়া উহার পরিচালকগণ সভ্য সংগ্রহের জন্য কেবলমাত্র ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা, অর্থাৎ স্কুল-কলেজ ও আখড়ার কার্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। এই জন্য সভ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনুশীলন সমিতির স্কুল-কলেজ ও আখড়া-সংগঠন ছিল যুগান্তর সমিতি অপেক্ষা অধিকতর সুসংগঠিত ও ব্যাপক। সমিতির সভ্য-সংগ্রহ এবং

(১) এই সকল উক্তি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক গ্রন্থের বিভিন্ন পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

সভ্যদের শিক্ষার জন্য পরিচালকদের উদ্যোগে কয়েকটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সকল স্কুলের মধ্যে ঢাকার 'ন্যাশনাল স্কুল' ও 'সোনারং ন্যাশনাল স্কুল' ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছে।

ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান পরিচালক পুলীনবিহারী দাস এবং তাঁহার অন্যতম সহকর্মী ভূপেশচন্দ্র রায় ন্যাশনাল স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহাদের চেষ্টায় এই স্কুলটি "সমিতির সভ্য-সংগ্রহের ও সভ্যদের শিক্ষার প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠে।" এই স্কুলের শিক্ষকগণ ও উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ ছাত্র সমিতির সভ্য-সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি করে। এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ সমিতির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে বহু রাজনৈতিক ডাকাতিতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সমিতির কর্ম-কেন্দ্ররূপে এই স্কুলটির বিশেষ গুরুত্ব 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টেও উল্লেখ করা হইয়াছে। এই রিপোর্টেও দেখা যায় যে, এই স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বহু রাজনৈতিক ডাকাতি ও হত্যায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'সিডিসন কমিটি'র মতেঃ

"এই কুখ্যাত স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৮ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে এবং 'ঢাকা-ষড়যন্ত্রমামলা'র সময় (১৯০৮ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে) ইহার ছাত্র-সংখ্যা ছিল ষাট অথবা সত্তর জন। ইহার শিক্ষার মান ছিল সরকারী স্কুলের প্রবেশিকা অথবা ম্যাট্রিকুলেশন-পরীক্ষার মত। পাঠ্য-তালিকার সহিত ব্যায়াম এবং লাঠি-খেলাও শিক্ষা দেওয়া হইত। স্কুলের অংশ হিসাবে একটা কামারশাল ও কাঠের মিস্ত্রিদের কর্মশালাকে কাঠের কাজ ও কামারের কাজ শিক্ষার জন্য ব্যবহার করা হইত। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের তালিকা ও শিক্ষার বিষয়সমূহ কখনই প্রকাশিত হইত না, ইহাতে কি কি বিষয় যে শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা জানা যায় নাই, তবে এই স্কুলে ১৯১০ খৃস্টাব্দের আগষ্টমাসে 'ঢাকা-ষড়যন্ত্রমামলা' সম্পর্কে খানাতল্লাসির সময় স্কুলের লাইব্রেরিতে এই পুস্তকগুলি পাওয়া গিয়াছিলঃ ১। 'তিলকের মামলার ইতিহাস ও তাঁহার জীবনী,' ২। এস. সি. শাস্ত্রী-প্রণীত 'ছত্রপতি শিবাজী,' ৩। সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস।"(১)

(১) Sedition Committee Report, P. 51.

'বরিশাল-ষড়যন্ত্রমামলা' সম্পর্কিত হাইকোর্টের রায়েও এই স্কুলটির গুরুত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে। মামলার বিচারকদের মতে এই স্কুলে বসিয়া বহু রাজনৈতিক ডাকাতির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল।(১)

'সোনারং ন্যানাল স্কুল'টি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন পুলীন দাসের প্রধান সরকারী মাখনলাল সেন। এই স্কুলটিও সমিতির সভ্যসংগ্রহ ও সভ্যদের শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। 'সিডিসন কমিটি'র মতে, এই স্কুলটি "ছাত্রদের উপর সাংঘাতিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ইহা বহু ডাকাতির জন্য দায়ী…।"(২)

স্কুল ও কলেজের, বিশেষ করিয়া স্কুলের ছাত্রদের উপর গুপ্ত সমিতির প্রভাব দেখিয়া বাংলা-সরকারের শিক্ষা-বিভাগের 'ডাইরেকটর' তাঁহার রিপোর্টে সখেদে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন :

"মাধ্যমিক স্কুলগুলির বর্তমান অবস্থা নিঃসন্দেহে প্রদেশের (বাংলার) অগ্রগতি ব্যাহত করিতেছে। বর্তমানের এই সাধারণ অরাজক অবস্থার মধ্যে স্কুলগুলির এই দুর্দশার চিত্রটি কোন ক্রমেই উপেক্ষণীয় নহে। সাধারণতঃ কলিকাতা ও ঢাকার অন্ধকার অলিগলিগুলিকেই রাজদ্রোহ ও অপরাধমূলক ক্রিয়া-কলাপের উৎপত্তিস্থল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। কারণ সেই সকল অলিগলিতে বসিয়াই অরাজকতামূলক ষড়যন্ত্রের পাণ্ডারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্য হইতে তাহাদের অনুচরদের সংগ্রহ করে। এই ধারণা আংশিকভাবে সত্য, কিন্তু উচ্চ ইংরেজি-স্কুলগুলিই আসল ক্ষেত্র যেগুলির শিক্ষকগণ সামান্য বেতনের জন্য বিক্ষুব্ধ, ঘরগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও আলো-বাতাসহীন এবং অসংখ্য ছাত্রের ভিড়ে কম্পিত; আর শিক্ষা-পদ্ধতি হইল পরীক্ষা-পাশের উদ্দেশ্যে পড়া মুখস্থ করিবার জন্য উহার ছাত্রদের উপর নিরবচ্ছিন্নভাবে চাপ দেওয়া যাহার ফলে ছাত্রদের স্বাস্থ্যনাশ অবশ্যম্ভাবী—সেই স্কুলগুলিই

(১) Sedition Committee Report, 'P. 105.

(২) Sedition Committee Report, P. 105.

আসল ক্ষেত্র যেখানে বিক্ষোভ ও উন্মত্ততার বীজ বপন করা হইয়া থাকে।"(১)

অনুশীলন সমিতির সভ্য সংগ্রহের প্রধান দায়িত্ব ছিল উহার জিলা-সংগঠকদের উপর। এই সম্পর্কে জিলা-সংগঠকদের কর্তব্য ও কর্ম-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া যে নির্দেশ-পত্র রচিত হয় তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই নির্দেশ-পত্রে জিলা-সংগঠকদের কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়ঃ

"জিলা-সংগঠক প্রথমে তাহার ভারপ্রাপ্ত জিলার কলেজ এবং উচ্চ ও মধ্য ইংরেজি-স্কুলসমূহের সংখ্যা জানিয়া লইবে। প্রথমে সে প্রত্যেকটি ক্লাসের অন্ততঃ একজন ছাত্রকে নিজের প্রভাবে আনিবে এবং তাহার মারফত গোটা ক্লাসের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিবে। জিলা-সংগঠনের সহিত এক-একটা স্কুলের একজন শিক্ষক বা অধ্যাপকের অধীনে একজন উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের যোগাযোগ করিয়া দেওয়া হইবে। এই উচ্চশ্রেণীর ছাত্রটি অন্যান্য শ্রেণীর প্রধান ছাত্রদের (মনিটর) সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবে।···যদি জিলা-সংগঠক কোন স্কুলের কোন পদে লোক ঢুকাইতে চায় তবে জিলা-সংগঠককে সমিতির কেন্দ্রের নিকট ঐ লোক সম্পর্কে নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ জানাইতে হইবেঃ সে কোন সম্প্রদায়ের লোক, বয়স কত, কি পাশ, ঐ পদে সে কত বেতন পাইবে, সে ছাত্র হইলে তাহাকে কত বেতন দিতে হইবে, তাহার বাড়ী কোথায়, সে যাহার নিকট হইতে আসিয়াছে সে আমাদের লোক কিনা,—তাহাকে স্কুলে ঢুকাইলে আমাদের কাজের কোন বিশেষ সুবিধা হইবে কিনা। কেন্দ্রের প্রধান পরিচালকের (জিলা-সংগঠকের) কর্তব্য হইবে ইংরেজি প্রবেশিকা-স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বেশী করিয়া বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করা, কারণ অল্প বয়স্ক যুবকগণই কর্ম, উৎসাহ ও আত্মত্যাগের উৎসস্বরূপ।"(২)

(১) Annual Report of the Director of Public Instruction, Bengal, for the year 1915—16—Quoted from V. Lovett's 'History of National Movements'.

(২) District Organisational Scheme of the Anusilan Samiti—Quoted from 'Sedition Com. Report', P. 113.

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিয়া ও তাহাদের মধ্য হইতে ছাত্র বাছাই করিয়া আলোচনা এবং শিক্ষার মারফত তাহাদের সভ্যপদের উপযুক্ত করিয়া তোলা হইত। তাহার পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে তাহারা দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সমিতির পূর্ণ সভ্যপদ লাভ করিতে পারিত।

উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন সমিতির একজন শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও সমিতির অন্যতম প্রধান সংগঠক পাবনাবাসী অমূল্য সরকার 'সভ্য-সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি ও স্থান' নামক একখানি সাংগঠনিক পুস্তিকা রচনা করেন। বলা বাহুল্য, অমূল্য সরকারের এই পদ্ধতি উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন সমিতি ব্যাপক ভাবে অনুসরণ করিত। পুস্তিকাখানির কয়েকটি অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হইল:—

"১। **প্রচার-পদ্ধতি**—প্রকাশ্য বক্তৃতা দ্বারা, সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বারা এবং ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদানের দ্বারা।

"২। **স্থান**—স্কুল ও কলেজসমূহ, আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহ, ইত্যাদি; যে সকল উৎসবাদিতে আত্মীয়-স্বজনদের সমাবেশ হয়, ইত্যাদি; এবং জনসাধারণের হিতকর কার্যাদি ও জন-সেবা।"

৩। "**সভ্যদের শ্রেণীভাগ** (তাহাদের জীবনের কর্মক্ষেত্র অনুসারে):

প্রথম শ্রেণী—অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক।

দ্বিতীয় শ্রেণী—অবিবাহিত যুবকবৃন্দ।

তৃতীয় শ্রেণী—বিবাহিত যুবকবৃন্দ।

চতুর্থ শ্রেণী—বয়স্ক ও সংসারিক লোক।

পরবর্তী শ্রেণীসমূহ (তাহাদের কর্ম ও উপযুক্ততা অনুসারে):—

প্রথম শ্রেণী—যে সকল বালক স্কুল-কলেজে পড়ে।

দ্বিতীয় শ্রেণী—যে সকল যুবক নিজেদের জীবন বিপন্ন করিয়াও কর্তব্য পালন করিবে।

তৃতীয় শ্রেণী—যাহারা কেবল অর্থ দিয়া সাহায্য করিবে।

চতুর্থ শ্রেণী—যাহাদের কেবল প্রকৃত সহানুভূতি আছে।

এই শ্রেণীগুলিকে পৃথক পৃথক দল বা চক্রে সংঘবদ্ধ করিতে হইবে।”

৪। **“সভ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি :—**

প্রথম পদ্ধতি—স্কুলের শিক্ষক ও কলেজের অধ্যাপকদের সাহায্যে; ড্রিল ও ব্যায়াম-শিক্ষকদের সাহায্যে।”

“পঞ্চম পদ্ধতি—ছাত্রদের সরকারী ও বে-সরকারী মেস ও হোস্টেলের মারফত।

“ষষ্ঠ পদ্ধতি—মেধাবী ছাত্র ও অল্পবয়স্ক বালকদের সহিত মেলামিশার মারফত। তাহাদের সহিত ছোট ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে হইবে, তাহাদের যখন সাহায্যের প্রয়োজন হইবে তখন সাহায্য দিতে হইবে”, ইত্যাদি।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে যখন স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয়, তখন যে সকল সাধারণ ছাত্র ও যুবক বিলাতী বস্ত্র প্রভৃতির দোকানে পিকেটিং করিত তাহাদের মধ্য হইতেও গুপ্ত সমিতির সভ্য সংগ্রহ করা হইত। এই সকল ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে যাহারা জঙ্গী মনোভাব ও সাহস দেখাইত গুপ্ত সমিতির নেতারা তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ও বৈপ্লবিক সাহিত্য পড়াইয়া তাহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক মনোভাব জাগাইয়া তুলিতেন এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে দীক্ষিত করিয়া গুপ্ত সমিতির সভ্য-শ্রেণীভুক্ত করিতেন।

রাজনৈতিক ডাকাতি

“ডাকাতি বা গুপ্ত হত্যা বীরত্বের লক্ষণ নহে। বীর জাতিরা এই সব উপায় অবলম্বন করে না, তাহারা সম্মুখ-যুদ্ধ করে।”(১) এই সকল কথা বিপ্লবী নায়কদের অবিদিত ছিল না, তাঁহারা এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়াই এই বিপজ্জনক পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য বিপুল

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তঃ “দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম”, পৃঃ ২০।

অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু গরীব মধ্যশ্রেণীর যুবকদের অর্থ নাই, সম্পদ নাই, তাহাদের আছে কেবল "প্রবল ইংরেজ-শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া স্বদেশের মুক্তি সাধনের" দুর্জয় সঙ্কল্প। কিন্তু "দেশের লোক টাকা দেয় না। দুচার জন 'ব্রিফলেস' ব্যারিস্টার, যাঁহারা নেতাগিরি করিতেন তাহারাই, কিছু কিছু সাহায্য করিতেন"। কাজেই "রাজনৈতিক ডাকাতি করিয়া বৈপ্লবিক কর্মের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবার মতবাদ বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতিতে প্রথম হইতেই ছিল।"(১)

কিন্তু বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, ডাকাতি—রাজনৈতিক কারণেই হউক আর যে-কোন কারণেই হউক—একটি সাংঘাতিক সামাজিক অপরাধ। "ইহা সর্বজন-স্বীকৃত সত্য যে, চুরি-ডাকাতি সামাজিক অপরাধ, কারণ ইহাদ্বারা সামাজিক মঙ্গলের মূলনীতি বিপর্যস্ত করা হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ডাকাতেরা সমাজের সর্বাধিক মঙ্গলের (বিপ্লবের) উদ্দেশ্য লইয়াই ডাকাতি করে। সুতরাং বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ক্ষুদ্র মঙ্গল বিসর্জন দিলে তাহাতে পুণ্য ছাড়া পাপ হয় না।" কিন্তু তাই বলিয়া ডাকাতিদ্বারা সকলের অর্থ কাড়িয়া লওয়া চলিবে না, যে ধনীর অর্থ সমাজের জন্য ব্যয়িত হয় না তাহার অর্থই কাড়িয়া লওয়া উচিত। "কাজেই যদি বিপ্লবীরা সমাজের কোন কৃপণ অথবা বিলাসী সভ্যের অর্থ বলপূর্বক কাড়িয়া লয়, তবে তাহাদের কাজ সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে।"(২) এই জন্য রাজনৈতিক ডাকাতিকে ইংরেজ-বিরোধী গেরিলা-যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া প্রচার করা হয়।

ডাকাতিদ্বারা অর্থ সংগ্রহের নীতি বিশেষভাবে বাংলাদেশেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের অংশ হিসাবে গৃহীত হয়, অন্যান্য প্রদেশে দুই-একটা ডাকাতি হইলেও তাহা একটা সাধারণ নীতি হিসাবে গৃহীত হয় নাই। বাংলাদেশের জমিদার-মধ্যস্বত্বভোগীপ্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাই বোধ হয় তাহার

(১) 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ১৯।

(২) "মুক্তি কোন পথে" নামক যুগান্তর সমিতির একটি পুস্তিকা হইতে গৃহীত।

একমাত্র কারণ। কিন্তু বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতিগুলির মধ্যেও ডাকাতি সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি. মিত্রমহাশয় ডাকাতি-দ্বারা অর্থ সংগ্রহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ঢাকার অনুশীলন সমিতি প্রথম হইতেই ডাকাতিদ্বারা অর্থ সংগ্রহের পন্থা অবলম্বন করে। এই জন্য সভাপতি পি. মিত্র একবার ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক পুলীন-বিহারী দাসকে সমিতি হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।(১) কিন্তু সভাপতি মিত্রমহাশয়ের প্রবল বিরোধিতা ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে ডাকাতির পথ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। ঢাকার সমিতির পরিচালকগণ ডাকাতি-দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পন্থাকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের একটি অপরিহার্য অংশ বলিয়া গ্রহণ করেন এবং একদল সভ্যকে ঐ উদ্দেশ্যে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলেন। কিন্তু এই "অসৎ কর্ম" যাহাতে এই সভ্যদিগকে ও সমিতিকে দুর্নীতির পথে লইয়া না যাইতে পারে তাহার জন্য দীক্ষার মধ্যে ডাকাতি সম্পর্কেও প্রতিজ্ঞা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির যে সকল সভ্যকে ডাকাতির জন্য নির্দিষ্ট করিয়া রাখা হইত তাহাদের ডাকাতি সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রতিজ্ঞাটি গ্রহণ করা ছিল বাধ্যতামূলক :

"স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন বলিয়াই অসৎ কর্ম জানিয়াও আমরা ডাকাতি করিতে বাধ্য হই। ডাকাতি-লব্ধ অর্থ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য এক কপর্দকও ব্যয় না করিয়া সমস্ত নেতার হস্তে অর্পণ করিব। তিনি প্রত্যেকের পারিবারিক অভাব বুঝিয়া যাহা আমাদের দিবেন, তাহাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব।

"যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, প্রতারক, মদ্যপায়ী, বেশ্যাসক্ত, অসৎ প্রকৃতির, দরিদ্র ও দুর্বলের প্রতি অত্যাচারকারী, যাহারা জাতি বা দেশকে প্রতারণা করিয়া অর্থ আত্মসাৎ করিয়াছে, অতিরিক্ত সুদখোর এবং ধনী অথচ কৃপণ, কেবলমাত্র তাহাদের বাড়ীতেই ডাকাতি করিব।

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ১৮৭।

"শপথ করিতেছি যে, আমরা ডাকাতি উপলক্ষে কোন রমণী, শিশু, দুর্বল, রুগ্ন, নিঃসহায় প্রভৃতির প্রতি কখনও কোন প্রকার অত্যাচার করিব না।"(১)

বিপ্লবীদের অস্ত্রশস্ত্র

বিপ্লবীরা ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার জন্য নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিত। গোড়ার দিকে ডাকাতির জন্য এমন কি হাতুড়ি, মুগুর প্রভৃতিও ব্যবহৃত হইত। রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও কোন কোন স্থলে প্রথম হইতেই দেখা যায়। মহারাষ্ট্রদেশে বোমা তৈরীর চেষ্টা হইলেও রিভলভারই প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু বাংলাদেশে রিভলভার-পিস্তল অপেক্ষা বোমার দিকেই ঝোঁক ছিল বেশী। ডাকাতির জন্য বোমার ব্যবহার ক্বচিৎ দেখা যায়, এই উদ্দেশ্যে রিভলভারই ব্যবহৃত হইত বেশী। কিন্তু ১৯০৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ডাকাতির জন্য আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারও খুব বেশী হয় নাই। আগ্নেয়াস্ত্রের দুষ্প্রাপ্যতাই সম্ভবতঃ ইহার একমাত্র কারণ। আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের অসুবিধা দূর করিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই বোমা তৈরীর দিকে বেশী দৃষ্টি দেয়। কিন্তু পরে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেও বোমা তৈরী ও উহার ব্যবহারের উপরেই তাহারা সর্বাধিক জোর দেয়। ইহার একমাত্র কারণ, বোমার কার্যকারীতা ও ধ্বংসকারী শক্তি আগ্নেয়াস্ত্র অপেক্ষা বহুগুণ বেশী।

বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই বোমা তৈরীর দিকে দৃষ্টি দিয়াছিল বলিয়া বাংলাদেশে এই ভয়ংকর অস্ত্রটি বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতি ছিল বোমা তৈরীর কাজে পথ-প্রদর্শক। যুগান্তর সমিতির অন্যতম নায়ক উল্লাসকর দত্ত বোমা তৈরীর জন্য গবেষণা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বাড়ীতেই গোপনে একটি ক্ষুদ্র রসায়নাগার স্থাপন করেন।

(১) ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রণীত 'ভারতের বিপ্লব-কাহিনী' নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

এই সমিতির অন্যতম নেতা হেমচন্দ্র দাস নিজের সম্পত্তি বিক্রয়ের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারী নগরীতে গিয়া উন্নত ধরনের বোমা তৈরী করিবার প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসেন।(১) তখন হইতে প্রথমে বাংলাদেশে ও পরে ভারতের সর্বত্র ব্যাপকভাবে বোমা তৈরী ও উহার ব্যবহার হইতে থাকে। এই জন্যই গোটা বৈপ্লবিক যুগ এই ভয়ংকর অস্ত্রটির নামের দ্বারা চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছে। তাই বৈপ্লবিক যুগের নাম হইয়াছে "বোমার যুগ", আর বিপ্লবীদের নাম হইয়াছে "বোমার দল"। বিপ্লবীরা বোমাকে যে দৃষ্টিতে দেখিতেন এবং ইহার উপর যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরোপ করিতেন তাহার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হইল :

"১৯০৬ খৃস্টাব্দ হইতে বোমার আবির্ভাব হয়। বাংলায় বোমার আবির্ভাবের দুইটা কারণ ছিল। (ক) বাঙ্গালী ভাব-প্রবণ, কল্পনা-প্রিয় জাতি। ইহা কোন জাতির ভাল কি মন্দ লক্ষণ তাহা জানি না ; কিন্তু জানি, বাঙ্গালী একদিকে যেমন হুজুগে, তেমনি অন্যদিকে কাজে চট্‌পটে এবং বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া পৃথিবীর চারিদিকে দৌড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই জন্যই বাংলার উদ্যম চাপা রাখা যায় না।

"………আমাদের মধ্যে সকলের ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস জানা ছিল না, কিন্তু ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডির জীবনী ভালবাবে জানা ছিল।……… তৎপরে রুশীয় বৈপ্লবিকদের কার্যকলাপ আমরা পর্যবেক্ষণ করিতাম। নিরস্ত্র স্বদেশ-প্রেমিকতার পক্ষে জাতীয় অবমাননাকারী ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিবার অন্য রাস্তা নাই এবং একটা 'কাপুরুষ' জাতিকে জাগাইয়া তুলিবার অন্য উপায়ও তখন ছিল না। 'কাপুরুষ' বাঙ্গালীকে অন্যান্য প্রদেশের উপর টেক্কা দিতে হইবে--ইহাও আমাদের একটা জিদ হইয়া উঠিয়াছিল। এই সব কারণ একত্রিত হইয়াই বোমার আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল। এক কথায়, ইহার উদ্দেশ্য ছিল যে, কংগ্রেস আবেদন-নিবেদনের পন্থাদ্বারা দেশের লোকের মনুষ্যত্ব নষ্ট

---

(২) "Sedition Committee Report," P. 27. (৩) ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ১৫৩ এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিবৃতি।

করিয়া দিয়াছে। সেই বিনষ্ট মনুষ্যত্বকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য 'বিষস্য বিষমৌষধম' দরকার। সেই জন্য বৈপ্লবিক দলের লোক দৃঢ়-সংকল্প হইল যে, সাহস দেখাইয়া, আত্মজীবন ত্যাগ করিয়া ও অত্যাচারীকে দণ্ড দিয়া স্বাধীনতার স্পৃহা ও সাহস জাগাইয়া তুলিতে হইবে।

"বোমা কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির মস্তিষ্কের খেয়াল বা পাগলামি নহে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার ফলও নহে। অনেকেই এ বিষয়ে ভাবিতেছিলেন, এবং ইহার আবিভাবও সমষ্টির কার্যের ফল। ভারতে বোমার আবির্ভাব বাঙ্গালীর মানসিক ক্রমবিকাশের ফল। বাঙ্গালীর মনস্তত্ব রাজা রামমোহন রায় হইতে স্তরে স্তরে চরম পন্থার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। যদি বাংলার ধর্ম ও সামাজিক পরিবেশে চরম পন্থার অভ্যুদয় না হইত, তবে হয়ত বাংলায় বোমারও আবির্ভাব হইত না।"(১)

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা বোমাকে তৎকালীন বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির একটি চরম নিদর্শন হিসাবে দেখিতেন। তাঁহারা ইহার তাৎপর্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন :

"একটা পিস্তল অথবা বন্দুক পুরাতন ধরনের অস্ত্র, আর বোমা হইল পাশ্চাত্ত্য-বৈজ্ঞানিকদের আধুনিকতম আবিষ্কার। যে পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞান নূতন কামান সৃষ্টি করিয়াছে, বন্দুক সৃষ্টি করিয়াছে, নূতন গোলা-বারুদ সৃষ্টি করিয়াছে, সেই পাশ্চাত্ত্য-বিজ্ঞানই বোমাও সৃষ্টি করিয়াছে।......একথা সত্য যে, বোমাদ্বারা একটা গভর্ণমেণ্টের সামরিক শক্তি ধ্বংস করা যায় না; একটা সৈন্যবাহিনী চূর্ণ করার ক্ষমতা বোমার নাই, অথবা কোন সামরিক অভিযানের গতিরোধ করাও বোমাদ্বারা সম্ভব নয়, কিন্তু সামরিক শক্তির ঔদ্ধত্যের ফলে দেশের মধ্যে যে ভয়ংকর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে তাহার প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা কেবল বোমার দ্বারাই সম্ভব।"(২)

---

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ১০—১২।

(২) 'Kesari' of 22nd. June, 1908,—Quoted from 'Sedition Committee Report', P. 6.

১৮৯৭ খৃস্টাব্দে মহারাষ্ট্রে চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের পিস্তলের গুলিতে র‍্যাণ্ড-সাহেবের হত্যা এবং ১৯০৮ খৃস্টাব্দে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীদ্বারা মজফরপুরে ব্যর্থ বোমা-নিক্ষেপ—এই দুইয়ের তুলনামূলক বিচারের মারফত বাংলাদেশের বোমার কার্যকারিতা ও ইহার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া 'কেশরী' পত্রিকার পূর্বোক্ত সংখ্যায় লিখিত হয়:

"১৮৯৭ খৃস্টাব্দের (র‍্যাণ্ড) হত্যা ও বাংলাদেশের বোমা-নিক্ষেপের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। সাহস ও নিপুণতার সহিত কর্তব্য সাধনের দিক হইতে বিচার করিলে বাংলাদেশের বোমার দল অপেক্ষা মহারাষ্ট্রের চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের স্থান বহু উচ্চে। কিন্তু উদ্দেশ্য ও উপায়ের দিক হইতে বিচার করিলে বাঙ্গালীদেরই বেশী প্রশংসা প্রাপ্য। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় অথবা বাঙ্গালী বোমা-নিক্ষেপকারীরা কেহই তাঁহাদের নিজেদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য হত্যা করিতে যায় নাই; ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব বা ঝগড়া এই হত্যার উদ্দেশ্য নহে।......ইহা সাধারণ হত্যা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু হত্যার উদ্দেশ্য থাকিলেও বাংলাদেশের বোমার উদ্দেশ্য (র‍্যাণ্ড-হত্যা অপেক্ষা) অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে প্লেগের সময় পুণা-শহরবাসীদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার চালান হইয়াছিল, তাহার ফলে ক্রোধের সঞ্চার হওয়ার মধ্যে একটা সম্পূর্ণ রাজনৈতিক তাৎপর্য ছিল না। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, দেশের শাসন-ব্যবস্থাটাই খারাপ, যদি শাসকদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া ব্যক্তিগতভাবে তাহাদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা না হয় তবে তাহারা কখনই এই শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে সম্মত হইবে না। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয়ের লক্ষ্য নিবদ্ধ ছিল প্লেগের মত একটা বিশেষ ঘটনার উপর, আর বঙ্গীয় বোমার লক্ষ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের মত একটা বিশাল ক্ষেত্রের উপর প্রসারিত।"(১) ইহা ব্যতীত মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা পিস্তল বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র অপেক্ষা বাংলাদেশের

(১) 'Kesari' 22nd. June, 1908—Quoted from 'Sedition Committee Report'. P. 7.

বোমাকেই উচ্চতর স্থান দিয়াছেন, কারণ আক্রমণাত্মক অস্ত্র হিসাবে পিস্তল-রিভলভার অপেক্ষা বোমার কার্যকারিতা বহুগুণ বেশী।

বোমার শক্তি ও কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া বাংলাদেশের অনুকরণে অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরাও বোমা তৈরীর প্রচেষ্টা শুরু করে। মহারাষ্ট্রের বিনায়ক দামোদর সাভারকর প্যারী হইতে তাঁহার ভ্রাতা গণেশ সাভারকরের নিকট একটি বোমা তৈরীর প্রণালী প্রেরণ করেন। গণেশ সাভারকরের গৃহ খানাতল্লাসীর সময় এই প্রণালীটি পুলিশের হস্তগত হয়। এই প্রণালীটির অনুরূপ আরও কয়েকটি প্রণালী বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে আমদানি করা হইয়াছিল। তাহার একটি যুগান্তর সমিতির গোপন-কেন্দ্র 'মানিকতলা বাগান-বাড়ী' হইতে পুলিশ হস্তগত করে। পরে অপর একটি হায়দরাবাদ হইতে পুলিশের হস্তগত হয়। এই সকল প্রণালীর মধ্যে সাভারকরের প্রেরিত প্রণালীটিই ছিল অন্যগুলি অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণ। সাভারকরের প্রণালীর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ প্রকার বোমা ও মাইন-এর নক্সা এবং তৈরীর উপায় বর্ণিত ছিল।

বিপ্লবীরা তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের বোমা তৈরী করিয়াছিলেন। এই সকল বোমার বৈচিত্র ও নির্মাণ-কৌশল এমনকি শাসকদের মনেও বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিল। কলিকাতার অত্যাচারী প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডসাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ডাকযোগে পাঠাইয়াছিলেন একখানা নির্দোশ আকারের পুস্তক। কিন্তু পুস্তকখানি ছিল একটি ভয়ংকর প্রকৃতির বিস্ফোরক বোমা। পুস্তকের ভিতরের অংশটি কাটিয়া মধ্যের শূন্য স্থলে বিস্ফোরক পুরিয়া এই অদ্ভুত বোমাটি তৈরী হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৮ খৃস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বিপ্লবীরা সাধারণতঃ গোলাকৃতি বোমাই তৈরী করিতেন। এই বোমার খোল ছিল তাম্র অথবা পিতল-নির্মিত। এমনকি ধাতু-নির্মিত প্রদীপও বোমার খোল হিসাবে ব্যবহৃত হইত। এই সকল বোমার বিস্ফোরক দ্রব্য হিসাবে সাধারণ পিক্‌রিক এসিড ব্যবহার করা হইত। প্যারী হইতে প্রেরিত বোমা তৈরীর প্রণালী অনুসারেই বিপ্লবীরা এই সকল বোমা

তৈরী করিতেন। বহু ক্ষেত্রে এক ধরনের নারিকেলর-বোমাও ব্যবহৃত হইয়াছিল। নারিকেলের ছোবড়াহীন খোলের মধ্যে বিস্ফোরক দ্রব্য পুরিয়া ইহা তৈরী করা হইত, আর ইহা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত রেলগাড়ীর উপর। স্বভাবতই এই বোমার ধ্বংসকারী শক্তি ধাতু-নির্মিত বোমা অপেক্ষা অনেক কমই হইত। বাংলাদেশে সাধারণতঃ গোলাকার বোমাই ব্যবহৃত হইত। লৌহ-নির্মিত গোলাকার খোলের মধ্যে অতি বিস্ফোরক শক্তি-সম্পন্ন রাসয়নিক পদার্থ ভরিয়া উহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোহার টুক্‌রা দিয়া এই বোমা তৈরী হইত। বোমার মুখে একটি পাট বা কাপড়ের পলিতা দেওয়া থাকিত। এই পলিতায় অগ্নি সংযোগ করিয়া বোমা ছুড়িয়া দিলেই ইহা সশব্দে ফাটিয়া যাইত। ইহাতে বিস্ফোরক হিসাবে সাধারণতঃ পিক্‌রিক এসিড ব্যবহার করা হইত। ইহা তৈরী করা অপেক্ষাকৃত সহজ, অথচ ইহার বিস্ফোরণ-শক্তি খুবই বেশী, সম্ভবতঃ এই কারণেই এই জাতীয় বোমা বিপ্লবীরা অধিক সংখ্যায় ব্যবহার করিতেন। যুগান্তর সমিতির অন্যতম নায়ক হেমচন্দ্র দাস প্যারী হইতে বোমা তৈরী শিক্ষা করিয়া আসিয়া সিগারেট-কৌটাদ্বারা এক ধরনের ক্ষুদ্র অথচ বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন বোমা তৈরী করিয়াছিলেন। এই সকল প্রকারের বোমাই বৈপ্লবিক যুগকে "বোমার যুগ" নামে চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছে। বিদেশ হইতে কেহ কেহ রিভলভার তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিলেও কখনও এদেশে বিপ্লবীরা কোন রিভলভার তৈরী করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

বোম্বাই প্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা

(১৮৯৭-১৯১৪)

রাজনৈতিক পটভূমিকা

১৮৮৫ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের জন্মের পর হইতে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের পতাকাতলে নূতন জাতীয়তাবাদী ভারতের ক্রমবর্ধমান সংহতি ও সমাবেশ এবং জ[illegible]ণের [illegible] বর্ধমান সংগ্রামী মনোভাব শাসকদের মনে ত্রাসের সঞ্চার করে। কংগ্রেসের প্রতি শাসকদের তথাকথিত সহানুভূতির পরিবর্তে দেখা দেয় তীব্র বিরূপ মনোভাব এবং তাহা ক্রমশঃ আক্রমণের রূপ গ্রহণ করে। কংগ্রেসের ধ্বংসই সেই আক্রমণের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। তাই ১৯০০ খৃস্টাব্দে বড়লাট লর্ড কার্জন সদম্ভে ঘোষণা করেন: "কংগ্রেসের ধ্বংস আসন্ন, আর ভারতবর্ষে আমি যতদিন থাকিব ততদিন ইহার (কংগ্রেসের) শান্তিপূর্ণ মৃত্যুতে সাহায্য করাই হইবে আমার প্রধান কাজ।"(১)

একদিকে জাগরণোন্মুখ জাতীয় আন্দোলনের প্রতি শাসকদের প্রবল বিরোধিতা ও অপর দিকে তাহাদের শাসন ও শোষণের অবশ্যম্ভাবী ফল-স্বরূপ জনগণের দুঃখ-দুর্দশার ক্রমবৃদ্ধি কংগ্রেসের আপসকামী নেতৃত্বকেও ইংরেজ-বিরোধী করিয়া তোলে। আবেদন-নিবেদনের বদলে তাঁহাদের কণ্ঠ হইতে বিক্ষোভের স্বর ধ্বনিত হইতে থাকে। এমনকি আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের অগ্রগণ্য গোখেলেরও বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, "আমলাতন্ত্রের স্বার্থান্ধতা ও ভারতের জাতীয় আশা-আকাঙ্খার প্রতি তাহাদের বিরোধিতা প্রতিদিন নগ্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।"(২) এই ভাবে কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃত্বের

(১) Ronaldshay : "life of Lord Curzon", Vol. II, P. 511.

(২) Gokhel's Speech—Quoted from Dr. Seetaramiya's "History of Indian National Congress," P. 111.

বৃটিশ-বিরোধী বিক্ষোভ ও চরমপন্থী নেতৃত্বের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের মৌলিক দাবি যুক্ত হইয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের পথ রচনা করে। আবেদন-নিবেদনের বদলে জাতীয় অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামের ধ্বনি ঘোষিত হয়। তাহারই ফলে,—

"উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে বিভিন্ন ভাবধারাসহ একটা প্রচণ্ড আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে থাকে, ইহার মধ্য দিয়া জনগণের দীর্ঘকালের পদ-দলিত আত্ম-মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার গভীর আগ্রহ উদ্দাম হইয়া উঠে। এই আন্দোলন হইতেই পরবর্তী দশকে একটা সুস্পষ্ট জাতীয় বিক্ষোভের 'প্রথম জোয়ার দেশকে প্লাবিত করে।"(১)

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে জনগণের দুঃখ-দুর্দশা সীমা ছাড়াইয়া যায়। ১৮৯৬ খৃস্টাব্দ হইতে একটা ভয়ংকর প্লেগের মহামারী সারা ভারতবর্ষকে ছারখার করিয়া দিতে থাকে, ১৮৯৬ হইতে ১৯০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘস্থায়ী দুর্ভিক্ষ ভারতের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশকে সর্বস্বান্ত করিয়া ফেলে। দাদাভাই নৌরজির মত আপসপন্থী নেতাও বলিতে বাধ্য হন যে, "ইংরেজেরা ভারতের নৈতিক ও বৈষয়িক জীবন উচ্ছন্নে দিয়াছে।" এই দুইটি ঘটনার ফলে ভারতীয় সমাজে যে ভয়ংকর অবস্থার সৃষ্টি হয় তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের আসল রূপ আরও নগ্ন হইয়া পড়ে। কংগ্রেসের জন্ম হইতেই ভারতের মধ্যশ্রেণী কংগ্রেসকেই তাহাদের সংগ্রামী সংগঠন বলিয়া গ্রহণ করিয়া ইহার পতাকাতলে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় মিলিত হইয়াছিল। ঐ দুই ঘটনার ফলে তাহাদের সংগ্রামী চেতনা আরও বিকাশ লাভ করে।

দুর্ভিক্ষ ও প্লেগের মহামারীর সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের অপেক্ষাও ভয়ংকর সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে পিষিয়া মারিতে উদ্যত হয়। লর্ড ডাফরিণ-এর পর লর্ড ল্যান্সডাউন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে "১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুনের অপরাধ" অনুষ্ঠিত হয়।

(১) Hirendra Mukherjee: "India Struggles for Freedom," P. 76.

এতদিন ভারতবাসীরা নিজেদের ইচ্ছামত সরকারী টাকশালে রৌপ্য রৌপ্য-মুদ্রায় পরিবর্তিত করিতে পারিত। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া বড়লাটসাহেব এমন একটি আইন পাশ করাইয়া লন যাহাদ্বারা ভারতীয়দের রৌপ্য ইচ্ছামত মুদ্রায় পরিবর্তিত করিবার অধিকার হরণ করা হয়। সি. ওয়াই. চিন্তামনি তাঁহার গ্রন্থে বড়লাটের এই কুকর্মকে "১৮৯৩ খৃস্টাব্দের ২৬শে জুনের অপরাধ" নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই আইনের দ্বারা রৌপ্য-মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বলবৎ করিয়া ভারতীয়দের উপর এক বিপুল পরোক্ষ-করভার চাপাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ফলে ভারতের কয়েকটি ক্রমবর্ধমান শিল্প ও ব্যবসায় বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অথচ এই আইনের ফলে ইংরেজ-কর্মচারীদের যে ক্ষতি হয় তাহা পূরণ করিবার জন্য তাহাদের ক্ষতিপূরণ-ভাতা দিবার ব্যবস্থা হয়। এই আইন যে বৃটিশ-বণিকগোষ্ঠির স্বার্থরক্ষার জন্যই করা হয় তাহা প্রত্যেকটি ভারতবাসী বুঝিতে পারে। ফলে সারা ভারতে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিক্ষোভের প্রতিধ্বনিরূপে ঐ বৎসর লাহোর-কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে সতর্ক-বাণী ও তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব পাশ হয়। আর্থিক ক্ষতি ছাড়াও শাসকদের বৈষম্যমূলক আচরণ জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণীর মনে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তোলে। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে ইংরেজ-রাজ আরও দুইটি শোষণ ও উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রথমটি হইল বৃটিশ-বস্ত্রব্যবসায়ীদের নির্দেশে ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর একটি বিশেষ উৎপাদন-শুল্ক স্থাপন এবং অপরটি হইল কোন অঞ্চলে গণ-বিক্ষোভ দেখা দিলে সেই অঞ্চলে পুলিশ বসাইবার খরচ বাবদ 'পিটুনি-কর' আদায়ের ব্যবস্থা। এই দুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধেও সারা দেশে বিক্ষোভের ঝড় উঠিতে থাকে এবং ঐ বৎসর মাদ্রাজ-কংগ্রেসের অধিবেশনে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রস্তাব পাশ হয়। কিন্তু এই বিক্ষোভ ও এত সব প্রতিবাদ সত্ত্বেও সরকার আরও ভয়ংকর উৎপীড়নের দ্বারা ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার আয়োজন করে। ইতিপূর্বে গণ-বিক্ষোভ ও গণ-সংগ্রাম দমন করিবার জন্য

বিদেশী শাসকেরা যে সকল দমনমূলক আইন তৈরী করিয়াছিল এবার "তাহারা সেই গুলিই পুরাতন অস্ত্রাগার হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়া" ক্রমবর্ধমান জাতীয় বিক্ষোভ পিষিয়া মারিবার জন্য প্রয়োগ করে। এই উদ্দেশ্যে এই তিনটি পুরাতন আইন "পুনরুজ্জীবিত" করিয়া তোলা হয়ঃ ১। ১৮২৭ খৃস্টাব্দের ২৫নং বোম্বাই-রেগুলেশন, ২। ১৮১৮ খৃস্টাব্দের ৩নং বেঙ্গল-রেগুলেশন (ইহা বাংলার ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রয়োগ করা হইয়াছিল) এবং ৩। ১৮১৯ খৃস্টাব্দের ২নং মাদ্রাজ-রেগুলেশন। এই তিনটি পুরাতন আইন একত্র করিয়া প্রয়োগ করিবার ফলে ভারত-সরকার ইচ্ছা করিলে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনাবিচারে বহিষ্কার, আটক প্রভৃতির ক্ষমতা লাভ করে।(১) ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড এলগিন। ঐ বৎসর বড়লাটসাহেব জব্বলপুর পরিদর্শন করিতে আসিয়া যে উপহাস-সূচক উক্তি করেন তাহাতে ভারতীয় জনগণের ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতিজ্ঞাই দৃঢ়তর হইয়া উঠে। যখন দুর্ভিক্ষ-কমিশনের ভাষায়ই দুর্ভিক্ষের ফলে "কীট-পতঙ্গের মত মানুষ মরিতেছিল", তখন বড়লাটসাহেব উক্ত প্রদেশের সমৃদ্ধি ও জনসাধারণের সুখের জন্য উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। তাঁহার এই উচ্ছ্বাসকে জনসাধারণ তাহাদের দুর্ভাগ্যের প্রতি উপহাস বলিয়া ধরিয়া লয়। তাহাদের বিক্ষোভ চারিদিকে ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে দেখা দিতে থাকে; বড়লাট লর্ড এলগিন পদানত ভারতবাসীর এই স্পর্দ্ধায় ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া তাহাদের এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন :

"তরবারিদ্বারাই ভারতবর্ষ জয় করা হইয়াছিল, আর তরবারিদ্বারাই ভারতবর্ষকে পদানত রাখা হইবে।"(২)

বড়লাটসাহেবের এই অস্ত্রের আস্ফালন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহারা দাম্ভিক শাসকের এই অস্ত্রের আস্ফালনের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া এক নূতন সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া

(১) C. Y. Chintamani: "Indian Politics Since the Mutiny," P. 46-48.

(২) C. Y. Chintamani: 'Indian Politics Since the Mutiny P. 48.

দাঁড়ে। যুবশক্তির ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ এবার সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপ গ্রহণ করে

অত্যাচারের প্রতিশোধ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মতই মহারাষ্ট্রের পুণাশহর প্লেগের মহামারীতে উজাড় হইয়া যায়। বড়লাটসাহেব 'প্লেগ-নিবারক আইন' নামক এক আইন পাশ করিয়া প্লেগ নিবারণ করিবার আয়োজন করেন। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে পুণাশহরে প্লেগ-নিবারণের কর্তা হইয়া আসেন র‍্যাণ্ড নামে এক ইংরেজ-কর্ম্মচারী। প্লেগ দূর করিবার নামে প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ডসাহেব পুণাশহরে যে অত্যাচার শুরু করেন তাহা প্লেগ অপেক্ষাও বেশী ভয়ংকর হইয়া উঠে। প্লেগ-নাশক ব্যবস্থার ফলে শহরবাসীরা গৃহহারা হইয়া মুক্ত আকাশ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল, কত শহরবাসী তাহাদের সম্পত্তি হারাইল, 'প্লেগ-বিরোধী বাহিনী'র সৈন্যদের হাতে স্ত্রীলোকেরা লাঞ্ছনা ভোগ করিল, শহরবাসীর দুর্দশা চরমে উঠিল। কমিশনার র‍্যাণ্ড শহরবাসীদের প্রতিবাদ গ্রাহ্য না করিয়া প্লেগ দূর করিবার নামে প্লেগের চেয়েও ভয়ংকর অত্যাচার চালাইতে থাকেন।

ভারতের নবজাগ্রত জঙ্গী জাতীয়তাবাদের প্রধান কেন্দ্র ও বাল গঙ্গাধর তিলকের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত পুণা কমিশনার র‍্যাণ্ডের অত্যাচারে মরিয়া হইয়া উঠিল। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের চৌঠা মে তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় এক প্রবন্ধ লিখিয়া এই অত্যাচার "কেবল নিম্নপদস্থ সরকারী কর্মচারী-দেরই নহে, স্বয়ং সরকারেরও ইচ্ছাকৃত" বলিয়া অভিযোগ করেন। প্রবন্ধে বলা হয় যে, যে-সরকার স্বয়ং এই অত্যাচারের হুকুম জারি করিয়াছে সেই সরকারের নিকট আবেদন করা বৃথা।(১)

১৫ই জুন, 'শিবাজীর রাজ্যাভিষেক-উৎসব'-এর দিন। এবারের উৎসবে অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করিবার আহ্বান জানান

(১) "Sedition Committee Report", P. 2.

হইল। উৎসবের জন-সমাবেশে বক্তারা একে একে এই আহ্বান ধ্বনিত করিলেন: "যদি কেহ দেশের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া দেশকে চুরমার করিয়া ফেলিতে থাকে তবে তাহাকে কাটিয়া টুক্‌রা করিয়া ফেল, অন্যের পথে বাধা সৃষ্টি করিও না..."। ইংরেজের অত্যাচারের জবাবে কর্তব্যের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া আর একজন বক্তা বলিলেন: "যাহারা ফরাসী-বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা কখনও স্বীকার করে নাই যে তাহারা হত্যা করিয়াছে, তাহারা জোর দিয়া বলিত যে তাহারা তাহাদের পথের কাঁটা তুলিয়া ফেলিতেছে। মহারাষ্ট্রও সেই যুক্তি খাটিবে না কেন?" স্বয়ং তিলকের নির্দেশ আরও স্পষ্ট,— শিবাজী "অতি মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া আফজল খাঁকে হত্যা করিয়াছিলেন। যদি আমাদের গৃহে চোর প্রবেশ করে আর যদি সেই চোরকে তাড়াইবার শক্তি আমাদের না থাকে, তবে এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করিয়া সেই চোরকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া অগ্নিসংযোগে তাহাকে জীবন্ত হত্যা কর।......মহৎ ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ কর।"(১)

১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেকের ষাট বৎসর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষে পুণাশহরের গণেশখিন্দ-অঞ্চলের সরকারী ভবনে ধুমধাম ও উৎসবের আয়োজন হইয়াছে। একদিকে প্লেগের মহামারী ও প্লেগ-নিবারক ব্যবস্থার অত্যাচারে শহরবাসী জর্জরিত, গৃহহারা, ধন-সম্পদহারা, অপর দিকে বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া শাসকগণ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত। পুণার দুই সাহসী যুবক এই অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণের প্রতিজ্ঞা লইয়া পথে বাহির হইলেন। এই যুবকদ্বয়ের একজন হইলেন এক গোপন বৈপ্লবিক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা দামোদর চাপেকার আর অপর জন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা প্রথমে "তাঁহাদের আর্য-ভাইদের অন্তর আনন্দে ও ইংরেজদের অন্তর দুঃখে ভরিয়া দিয়া নিজেদের রাজদ্রোহী বলিয়া চিহ্নিত করিবার জন্য" স্বদেশের পরাধীনতার কলঙ্কস্বরূপ বোম্বাইয়ের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্মর-মূর্তিতে আলকাতরা লেপন করেন।

---

(১) 'Sedition Committee Report', P. 3.

২২শে জুন রাত্রিকালে মহারাণীর রাজ্যাভিষেক-উৎসবে আমোদ-প্রমোদ শেষ করিয়া প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ডসাহেব আয়ার্স্ট নামক অপর এক সাহেবের সহিত বাড়ী ফিরিতেছিলেন। চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় রিভলভার লইয়া পথে তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত, অত্যাচারী প্লেগ-কমিশনার র‍্যাণ্ডসাহেব হইবেন ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রথম বলি, আর দরিদ্র ও লাঞ্ছিত ভারতবাসীদের অর্থে সাম্রাজ্যবাদীদের এই উৎসব-রাত্রিই সেই বলিদানের উপযুক্ত সময়। তাই চাপেকার-ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাদের রিভলভার উদ্যত করিয়া পথের উপর কমিশনার র‍্যাণ্ডের জন্য অপেক্ষমান। সঙ্গীসহ র‍্যাণ্ড-সাহেব নিকটবর্তী হইবামাত্র তাঁহাদের রিভলভার গর্জিয়া উঠিল, সাহেবদ্বয়ের দেহ ধূলায় লুটাইয়া পড়িল।(১)

কমিশনার র‍্যাণ্ডই ছিলেন বিপ্লবীদের লক্ষ্য, আয়ার্স্টসাহেবের হত্যা একটা দুর্ঘটনা মাত্র। পুণার পুলিশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দামোদর চাপেকারকে হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। দুইটি নরহত্যার অপরাধে বিচারক তাঁহার ফাঁসীর হুকুম দেন। দামোদর চাপেকার ভারতের এই নূতন বৈপ্লবিক যুগের প্রথম শহীদ হইলেন।

দামোদরের ফাঁসীর পরেও তাঁহার বৈপ্লবিক সঙ্ঘের কাজ বন্ধ হইল না, বরং তাহা আরও জোরের সহিত চলিতে থাকে। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এই সঙ্ঘের সভ্যগণ পুণার চীফ কনেষ্টবলকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ঐ বৎসর এই উদ্দেশ্যে আবার চেষ্টা চলে, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা পুণাবাসী দুই গোয়েন্দা-ভ্রাতাকে হত্যা করে। কারণ এই দুই ভ্রাতার সংবাদের উপর নির্ভর করিয়াই পুলিশ দামোদর চাপেকারকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং এই গোয়েন্দাগিরির জন্য সরকার উক্ত দুই ভাইকে যথেষ্ট পুরস্কার দিয়াছিল। এই সকল হত্য-প্রচেষ্টা ও গোয়েন্দা-হত্যা সম্পর্কে চাপেকার-সঙ্ঘের কয়েকজন সদস্যকে (দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা-সহ) গ্রেপ্তার করিয়া একটি ষড়যন্ত্র-মামলা দায়ের করা হয়। এই মামলার

(১) "Sedition Committee Report", P. 3.

বিচারে দামোদরের কনিষ্ঠ ভ্রাতাসহ চারিজনের প্রাণদণ্ড ও একজনের দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

সরকারী দমননীতি

ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ইংরেজ-রাজ উন্মত্ত হইয়া আক্রমণ শুরু করে। পুণার উপর দিয়া ভয়ংকর উৎপীড়নের ঝড় বহিয়া যাইতে থাকে। ইতিপূর্বে সরকার যে সকল পুরাতন দমনমূলক আইন ঝালাইয়া রাখিয়াছিল এবার সেইগুলির প্রয়োগ শুরু হয়। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই জুনের 'কেশরী' পত্রিকায় "রাজদ্রোহ"মূলক প্রবন্ধ লেখার অভিযোগে স্বয়ং বাল গঙ্গাধর তিলককে গ্রেপ্তার করিয়া বিচার করা হয়। বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলক কারাগারে আবদ্ধ হন। বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের সহিত সম্পর্ক রাখিবার অভিযোগে সরকার পুণার বিখ্যাত নাটু-পরিবারভুক্ত দুই ভ্রাতাকে '১৮২৭ খৃস্টাব্দের ২৫নং আইন' অনুসারে নির্বাসিত করে। কিন্তু তিলককে অপসারিত করিয়াও পুণায় বৃটিশ-বিরোধী প্রচারের কণ্ঠরোধ করা সম্ভব হইল না। শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে-দ্বারা সম্পাদিত 'কাল' নামক বিখ্যাত মারাঠী পত্রিকাখানি ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অত্যাচারী ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে মারাঠী যুবসম্প্রদায়কে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেছিল। ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে পরাঞ্জপেকে "রাজদ্রহ" প্রচারের জন্য সরকার হইতে কঠোর ভাষায় সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। নির্ভীক পরাঞ্জপে তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্তব্য চালাইয়া যান। ইহার পর ১৯০০, ১৯০৪, ১৯০৫ এবং সর্বশেষে ১৯০৭ খৃস্টাব্দে তাঁহাকে শেষ বারের মত সতর্ক করিয়া দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকীদ্বারা মজফরপুরে বোমা নিক্ষেপ সমর্থন করিয়া প্রবন্ধ রচনার জন্য "রাজদ্রোহ"-এর অভিযোগে গ্রেপ্তার ও উনিশ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পুণার 'বিহারী' নামক অপর একখানি সংবাদপত্র সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার জন্য

অক্লান্তভাবে যুবসম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত করিতে থাকে। ১৯০৬, ১৯০৭ ও ১৯০৮ খৃস্টাব্দে এই পত্রিকার তিনজন সম্পাদক "রাজদ্রোহ"মূলক প্রবন্ধ রচনার অভিযোগে পর পর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই উন্মত্ত দমননীতি সত্ত্বেও তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা সংগ্রামের পুরোভাগে থাকিয়া নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃটিশ-বিরোধী প্রচার-কার্য চালাইয়া যায় এবং প্রতিদিন ইহার বিক্রয়-সংখ্যা বাড়িয়া চলে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে সরকারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া ইহার বিক্রয়-সংখ্যা বিশ হাজারে পরিণত হয়। তৎকালে ইহা পুনঃ পুনঃ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীদের রুশিয়ার বৈপ্লবিক সংগঠন-নীতি ও কর্মপদ্ধতি অনুসরণ করিবার নির্দেশ দেয়।(১)

কংগ্রেসের প্রতিবাদ

মহারাষ্ট্রের উপর সরকারের এই উন্মত্ত দমননীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় উঠিতে থাকে। এমনকি কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দও এই বর্বরতার প্রতিবাদ না করিয়া পারেন নাই। ১৮৯৭ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের অমরাবতী-অধিবেশনে বিশিষ্ট উদারপন্থী নায়ক স্যার শঙ্করণ নায়ার অধিবেশনের সভাপতিহিসাবে নাটু-ভ্রাতৃদ্বয়ের বহিষ্কার ও বাল গঙ্গাধর তিলকের কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন এবং অধিবেশনের সদস্যদের সম্মতি লইয়া তিলকের 'মারাঠা' নামক সংবাদপত্র হইতে নিম্নোক্ত উক্তিটি উদ্ধৃত করিয়া পুনায় সরকারী অত্যাচারের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেন :

"এই শহরে (পুনায়) মনুষ্যরূপী প্লেগের (ইংরেজ-সরকারের) যে অত্যাচার চলিতেছে তাহা অপেক্ষা প্লেগ-রোগ আমাদের প্রতি অনেক বেশী সদয়।" (২)

কংগ্রেসের এই তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাসকগণ বেপরোয়াভাবে দমননীতি চালাইতে থাকে। ভারত-সরকার ১৮৯৭ খৃস্টাব্দেই "রাজদ্রোহ"মূলক অপরাধের সহজ বিচার ও কঠোর দণ্ড দানের ব্যবস্থা করিবার জন্য একটি নূতন

(১) 'Sedition Committee Report : P. 4—5

(২) Congress Presidential speeches, Vol. 1 (G. A. Nateson & Co.)

আইন পাশ করে। ডাক-বিভাগের কর্মচারীরা যাহাতে যে-কোন পার্সেল ও চিঠি খুলিতে পারে তাহার জন্যও একটি নূতন আইন পাশ হয়। কংগ্রেসের পুনঃ পুনঃ প্রতিবাদ ও দেশব্যাপী বিক্ষোভ সত্বেও সরকারী দমননীতি অব্যাহত-ভাবে চলিতে থাকে। ইহার ফলে বৈপ্লবিক ক্রিয়া কলাপ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, বরং তাহা প্রতিদিন বাড়িয়া সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে

লণ্ডন ও প্যারীর বিপ্লব-কেন্দ্র

পুনার ঘটনাসমূহ ঘটিবার অল্প কিছুদিন পরেই শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা* নামে গুজরাটের একজন লোক বোম্বাই হইতে লণ্ডন গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদেশ-যাত্রা পলায়ন ভিন্ন অন্য কিছু নহে। তাঁহার বিদেশ-গমন সম্পর্কে তিনি পরে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহাতে জানা যায় যে, তিনি পুনার বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সহিত, বিশেষ করিয়া র‍্যাণ্ডসাহেবের হত্যার সহিত জড়িত ছিলেন। এই হত্যা সম্পর্কে পুলিশ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল —ইহা জানিতে পারিয়াই নাকি তিনি ইংলণ্ডে পলায়ন করেন।(১)

কৃষ্ণ বর্মা কিছুদিন গোপনে থাকিয়া ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে লণ্ডনে 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল-সোসাইটি' নামে একটি সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেই এই সঙ্ঘের সভাপতি হন এবং সঙ্ঘের মুখপত্র হিসাবে 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট' নামে ইংরেজি-ভাষায় একটি মাসিক পত্র প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি

(১) 'Sedition Committee Report, P. 5.

*কৃষ্ণ বর্মার পূর্ব-ইতিহাস: শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা গুজরাটের অধিবাসী ও একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে যাইয়া ব্যারিস্টার হন এবং পরে দেশে ফিরিয়া জুনাগড় স্টেটের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া পুনরায় লণ্ডনে গমন করেন। এই সময়ে সংস্কৃতভাষা ও দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতভাষা ও প্রাচ্য-দর্শনের অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। কিন্তু কিছু দিন পরেই কর্তৃপক্ষের সহিত মতান্তর হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। এই সময়, অর্থাৎ ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লণ্ডনের নিজ বাড়ীতে 'ইণ্ডিয়া হাউস' প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার পূর্বেই ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ইণ্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা ও 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিষ্ট' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সঙ্ঘের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের জন্য 'হোমরুল' বা স্বায়ত্ব শাসন লাভ এবং ইংলণ্ডে সকল উপায়ে ভারতের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালানই এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। কৃষ্ণ বর্মা আয়ার্লণ্ডের 'হোমরুল'-আন্দোলন হইতেই অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণ বর্মা ভারতের জনগণের মধ্যে ঐক্য ও স্বাধীনতার বাণী প্রচারের উদ্দেশ্য শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ছয়টি বৃত্তি ঘোষণা করেন। প্রত্যেকটি বৃত্তির পরিমাণ ছিল এক হাজার টাকা। এই বৃত্তি লইয়া কোন ভারতীয় গ্রন্থকার, সাংবাদিক ও অন্য যে-কোন যোগ্য ব্যক্তি ভারতের বাহিরে য়ুরোপ, আমেরিকা বা অন্যত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা লাভ করুক এবং দেশে ফিরিয়া গিয়া তাহাদের সেই অভিজ্ঞতাদ্বারা দেশের মানুষকে স্বাধীনতা-সংগ্রাম চালাইতে সাহায্য করুক—ইহাই ছিল এই শ্রেষ্ঠ স্বদেশ-প্রেমিকের উদ্দেশ্য। তাঁহার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া প্যারী হইতে 'এস. আর রাণা' নামক এক ভারতীয় ভদ্রলোক রাণা প্রতাপ, শিবাজী ও অন্য একজন ইতিহাস-বিখ্যাত মুসলমান-শাসকের নামে দুই হাজার টাকার তিনটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। এইভাবে প্রথমে লণ্ডন ও পরে ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারীনগরীতে ভারতীয় বিপ্লবীদের দুইটি কেন্দ্র গড়িয়া উঠিতে থাকে।

এই সময়ে নাসিকজেলার অধিবাসী বিনায়ক দামোদর সাভারকর নামক বাইশ বৎসর বয়স্ক এক যুবক কৃষ্ণ বর্মার বৃত্তি লইয়া লণ্ডনে আসিয়া কৃষ্ণ বর্মার সহিত মিলিত হন। ইনি পুনার ফার্গুসন কলেজ হইতে বি. এ. ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রকাল হইতেই সাভারকর বৈপ্লবিক আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হন। তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর একসঙ্গে মিলিয়া ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে 'মিত্রমেলা' নামে একটি সংগঠন স্থাপন করেন। 'গণপতি-উৎসব' পালনের উদ্দেশ্যেই ইহা প্রথমে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পরে ইহা একটি বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত হয়। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে ১৯০৫ খৃস্টাব্দে ইনি মহাত্মা শ্রীঅগম্য গুরু পরমহংস নামক জনৈক সাধুদ্বারা পরিচালিত এক বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেন। এই সাধু দাক্ষিণাত্যের সর্বত্র ঘুরিয়া

ঘুরিয়া বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঘৃণা জাগাইয়া তুলিতেন, ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করিতে বলিতেন। তাঁহার এই প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া পুনার একদল ছাত্র ১৯০৬ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করে। বিনায়ক দামোদর সাভারকর এই গুপ্ত সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। সভাপতি সাভারকরের পরামর্শে আন্দোলন চালনার জন্য সমিতির নয় জন সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। অগম্য গুরুর পরামর্শে পুনাশহরের সকল লোকের নিকট হইতে এক আনা করিয়া চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সমিতির একটি তহবিল গঠনেরও সিদ্ধান্ত হয়। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের জুনমাসে দামোদর সাভারকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই গুপ্ত সমিতিও ভাঙ্গিয়া যায়। দামোদর সাভারকর লণ্ডনে আসিয়া কৃষ্ণ বর্মার সহিত মিলিত হন এবং দুই জনে একত্রে মিলিয়া পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করেন।

কৃষ্ণ বর্মা ইতিপূর্বেই লণ্ডনে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া ইহার নাম রাখেন 'ইণ্ডিয়া হাউস'। ১৯০৬ ও ১৯০৭ খৃস্টাব্দ ব্যাপী 'ইণ্ডিয়া হাউস' ভারতীয়দের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠে। যে সকল ভারতীয় যুবক 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ আসিত তাহাদের কৃষ্ণ বর্মা শিক্ষা দিতেন: ইংরেজেরা ভারতের মিত্র নহে; ভারত হইতে বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিতে না পারিলে ভারতের অব্যাহতি নাই; অতএব বিপ্লববাদ—সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিতে হইবে। এইজন্য রুশ, পোলিশ, আইরিশ বিপ্লবীদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গুপ্ত হত্যা, বিদ্রোহ, ট্রেজারী-লুণ্ঠন প্রভৃতি করিবার জন্য দলবদ্ধ হইতে হইবে। এই সময় বাসুদেব ভট্টাচার্য নামে একজন ভারতীয় ছাত্র ও 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সভ্য ভারত-সচীবের সহকারী লি ওয়ার্নারসাহেবের গণ্ডে চপেটাঘাত করেন। ইহার ফলে ইংলণ্ডে ও সারা য়ুরোপে হৈ চৈ পড়িয়া যায়। বিচারে বাসুদেবের দশ পাউণ্ড জরিমানা হয়।

'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর ক্রিয়া-কলাপ ইংলণ্ডের শাসকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের জুলাইমাসে পার্লামেণ্টে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর পরিচালক কৃষ্ণ বর্মার বিরুদ্ধে সরকারী হস্তক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই

সরকারী হস্তক্ষেপের আশঙ্কা করিয়া কৃষ্ণ বর্মা ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া ফরাসীদেশের রাজধানী প্যারীনগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অনেক পূর্ব হইতেই প্যারীনগরীতে মাদাম কামা নামক একজন ভারতীয় পার্শী মহিলা, জিজিভাই নামক একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী, এস. আর. রানা নামক একজন ভারতীয় ধনী ব্যক্তি ও অপর কয়েকজন একত্রে মিলিয়া একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এতদিন ইঁহারা লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন। কৃষ্ণ বর্মা আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগদান করায় প্যারীর বৈপ্লবিক কেন্দ্রটি আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে। প্যারীনগরীতে আসিয়া তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে বৈপ্লবিক কাজকর্ম চালাইতে থাকেন। কিন্তু তখনও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান সোসিওলোজিস্ট' নামক মাসিক পত্রখানি লণ্ডন হইতেই প্রকাশিত হইত এবং ইহাতে নিয়মিতভাবে কৃষ্ণ বর্মার বৈপ্লবিক প্রবন্ধ ছাপা হইত। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ইংলণ্ডের সরকারকর্তৃক পত্রিকার মুদ্রাকর "রাজদ্রোহ"-এর অপরাধে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর অপর এক ব্যক্তি পত্রিকাখানির মুদ্রণের ভার গ্রহণ করিলে ১৯০৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তাহারও এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দ হইতে পত্রিকাখানি প্যারীনগরী হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকাখানির মারফত প্রধানতঃ ভারতীয় বৈপ্লবিক আন্দোলনের স্বপক্ষে প্রচার-কার্য চালান হইত এবং ইহাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের, বিশেষ করিয়া রুশিয়ার, বৈপ্লবিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ভারতীয় বৈপ্লবিক সমিতিগুলির গোপন সংগঠন গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করা হইত।

ইংলণ্ড-সরকারের দমননীতি উপেক্ষা করিয়া কৃষ্ণ বর্মা প্যারী হইতে লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ পরিচালনা করিতেন। তিনি এই উদ্দেশ্যে প্যারীর এস. আর. রাণা নামক ভদ্রলোকটির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রাণাকে কৃষ্ণ বর্মার নির্দেশ লইয়া প্রায়ই প্যারী হইতে লণ্ডনে আসা-যাওয়া করিতে হইত।

কৃষ্ণ বর্মার লণ্ডন ত্যাগ করিবার পর ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মে মাসে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ সিপাহী-বিদ্রোহের বার্ষিক দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় একশত প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ইংলণ্ডের বিভিন্ন শহর হইতে আসিয়া এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। এই অনুষ্ঠানে "স্মরণীয় ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের" শহীদগণের উদ্দেশ্যে রচিত "শহীদদের স্মরণে" নামক একখানি প্রবন্ধ-পুস্তিকা পঠিত হয়। ইহাতে 'ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-যুদ্ধ'-এর শহীদদের আদর্শ অনুসরণ করিবার জন্য ভারতবাসীদের আহ্বান জানান হয়। এই পুস্তিকার বহু কপি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশেও প্রেরিত হইয়াছিল। 'কঠোর সতর্কবাণী' নামে একখানা ইস্তাহারও 'ইণ্ডিয়া হাউস' হইতে বিতরণ ও ভারতবর্ষে প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত এখানে প্রত্যেক রবিবার প্রবাসী ভারতীয়দের লইয়া সভা হইত এবং তাহাতে ভারতবর্ষে বৈপ্লবিক সংগ্রাম পরিচালনা ও এই উদ্দেশ্যে বোমা তৈরী সম্পর্কে আলোচনা চলিত।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাভারকর 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর প্রধান পরিচালকের পদ লাভ করেন। ঐ বৎসর ফেব্রুয়ারীমাসে বিনায়ক প্যারী হইতে কুড়িটি 'ব্রাউনিং' অটোম্যাটিক পিস্তলের একটি প্যাকেট পান। ভারতবর্ষে প্রেরণের জন্যই ইহা তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি ঐ পিস্তলগুলি তাঁহার ভাই গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু ঐগুলি ভারতে পৌঁছিবার পূর্বেই গণেশ গ্রেপ্তার হন। সাভারকরের নির্দেশে 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর সভ্যগণ লণ্ডনের কোন-এক নিভৃত অঞ্চলে গিয়া রিভলভার ছোড়া অভ্যাস করিতে থাকে। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১লা জুলাই লণ্ডনের 'ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট'-এর এক জনসভায় 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এর মদনলাল ধিংরা নামক একজন মারাঠী সভ্যের রিভলভারের গুলিতে ভারত-সচীবের এ-ডি-সি স্যার উইলিয়াম কার্জন ওয়াইলি নিহত হন। গ্রেপ্তারের সময় মদনলালের পকেটে যে পত্রখানি পাওয়া যায় তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল :

"অমানুষিকভাবে ভারতীয় যুবকদের দ্বীপান্তর ও প্রাণদণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে

ক্ষীণ প্রতিবাদ হিসাবে আমি স্বেচ্ছায় ইংরেজদের রক্তপাতের চেষ্টা করিলাম।"(১)

ইহার কিছুদিন পূর্বেই মহারাষ্ট্রে কেবলমাত্র একখানি বৈপ্লবিক কবিতার পুস্তিকা রচনা ও প্রকাশনার অপরাধে বিনায়ক সাভারকরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ওয়াইলি-হত্যার পর ইংলণ্ড-সরকার সাভারকরকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য তাঁহাকে জাহাজে করিয়া ভারতে প্রেরণ করে। জাহাজটি যখন দক্ষিণ-ফ্রান্সের মার্সাইবন্দরে উপস্থিত হয় তখন সাভারকর এক বিস্ময়কর উপায়ে জাহাজের স্নান-ঘরের ছিদ্রপথ দিয়া সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়েন এবং সাঁতার কাটিয়া সমুদ্র পারি দিয়া ফরাসীদেশে প্রবেশ করেন। কিন্তু জাহাজের লোকেরা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করায় তিনি অন্য কোন উপায় না দেখিয়া ফরাসী-পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ফরাসী-পুলিশ বৃটিশ-সরকারের চাপে তাঁহাকে বৃটিশ-পুলিশের হস্তে সমর্পণ করে। এই ঘটনার ফলে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। চারিদিক হইতে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে তাঁহার বিচারের জন্য দাবি জানান হয়। কিন্তু সকল দাবি ও সকল আন্দোলন অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ-সরকার সাভারকরকে ভারতবর্ষে লইয়া আসে। ইহার পর বোম্বাইয়ের আদালতে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। বিচারে সাভারকর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

দমননীতির দাপট

লণ্ডন ও প্যারীনগরীকে কেন্দ্র করিয়া যখন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল তখন বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নি-তরঙ্গ পুনাশহরের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশকে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশকে প্লাবিত করিতে থাকে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল বাংলাদেশের দুইজন বিপ্লবীদ্বারা নিক্ষিপ্ত

(১) Sedition Committee Report, P. 9.

বোমায় ভ্রমক্রমে মজফরপুরে দুইজন শ্বেতাঙ্গ-রমণী নিহত হয়। কলিকাতার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস্‌ফোর্ডসাহেবই ছিল বিপ্লবীদের লক্ষ্য। অত্যাচারী ইংরেজ-কর্মচারীর শাস্তিবিধানের উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া পুনার বিভিন্ন বিপ্লবপন্থী সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা হয়। স্বয়ং বাল-গঙ্গাধর তিলক তাঁহার 'কেশরী' পত্রিকায় বঙ্গীয় বোমার প্রশস্তি গাহিয়া দুইটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। উন্মত্ত শাসকগণ এই অপরাধে তাঁহার নামমাত্র বিচারের পর তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। এই প্রকার প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে পুনার 'কাল' পত্রিকার সম্পাদক শিবরাম মহাদেব পরাঞ্জপে ১৯০৮ খৃস্টাব্দের জুলাইমাসে কারাদণ্ড লাভ করেন। উন্মত্ত শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া বাংলা ও মহারাষ্ট্রের উপর বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করে।

নাসিকের বিপ্লব-প্রচেষ্টা

বিনায়ক দামোদর সাভারকর ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার বহু পূর্বে, ১৮৯৯ খৃস্টাব্দে বিনায়ক ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গণেশ সাভারকর নাসিকে 'মিত্রমেলা' নামক যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন সেই সংগঠনটিকে গণেশ সাভারকর বিনায়কের ভারত ত্যাগের পর একটি গুপ্ত সমিতিরূপে পুনর্গঠিত করেন। ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইটালী' নামক গুপ্ত সমিতির অনুকরণে নাসিকের এই পুনর্গঠিত গুপ্ত সমিতির নাম রাখা হয় 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'। ইহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন গণেশ সাভারকর। বিনায়ক লণ্ডন হইতে এই সমিতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়া সাহায্য করিতেন।(১)

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীমাসে বিনায়ক লণ্ডন হইতে বিশটি 'ব্রাউনিং' পিস্তল চতুর্ভুজ আমিন নামক এক ব্যক্তির মারফত গণেশের নিকট প্রেরণ করেন। কিন্তু এই অস্ত্রগুলিসহ চতুর্ভুজ ভারতে পদার্পণ করিবার এক সপ্তাহ

(১) এই গুপ্ত সমিতির সংগঠন-পদ্ধতি ও আদর্শ পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

পূর্বে পুলিশ গণেশকে রাজদ্রোহের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। গণেশ এই পিস্তলগুলির সংবাদ পূর্বেই পাইয়াছিলেন এবং এই গুলির আশায় একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও তৈরী করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে গণেশকে গ্রেপ্তার করা হয়। 'লঘু অভিনব ভারত-মেলা' নামে একখানি বিপ্লবাত্মক কবিতার পুস্তক রচনা ও তাহা প্রকাশ করাই ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে একমাত্র প্রমাণযোগ্য অপরাধ। গণেশের গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহে পুলিশ ষাট পৃষ্ঠায় টাইপকরা একটি বোমা তৈরীর প্রণালী হস্তগত করে। ইহা বিনায়ক লণ্ডন হইতে গণেশের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। এই অপরাধে গণেশ সাভারকরকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গণেশের প্রতি এই অমানুষিক দণ্ডদানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর সভ্যগণ এক কঠোর প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। গণেশের প্রতি এই প্রকার দণ্ড দানের জন্য সমগ্র মহারাষ্ট্রে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। গণেশের বিচারক ছিলেন নাসিকের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাক্সনসাহেব। গুপ্ত সমিতির সভ্যগণ জ্যাক্সনকে হত্যা করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু নাসিকের গুপ্ত সমিতির কোন সভ্যকে ইহার ভার দিলে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'এর ঔরঙ্গাবাদ-শাখার একজন অল্পবয়সী সভ্যকে আনয়ন করা হয়।(১)

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ২১শে ডিসেম্বর স্থানীয় থিয়েটার-গৃহে জ্যাক্সনসাহেবকে বিদায়-সংবর্ধনা জ্ঞাপনের জন্য এক জনসভার আয়োজন হয়। জনাকীর্ণ সভাগৃহে জ্যাক্সন উপস্থিত এবং ঔরঙ্গাবাদ গুপ্ত সমিতির সভ্যটিও বিনায়কের প্রেরিত একটি ভয়ংকর 'ব্রাউনিং'-পিস্তল লইয়া প্রস্তুত। জ্যাক্সনসাহেব বিদায়-সংবর্ধনার উত্তর দিতে উঠিবামাত্র উক্ত সভ্যের হস্তস্থিত পিস্তলের গুলিতে জ্যাক্সনের দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। অত্যাচারী বিচারক জ্যাক্সন নাসিক

(১) 'Sedition Committee Report', P. 9.

হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে উঠিয়া ধরাধাম হইতেই চিরবিদায় গ্রহণ করেন। হত্যাকারী বিপ্লবী যুবক পলায়নের কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া পুলিশের নিকট ধরা দেয়।

জ্যাক্‌সন-হত্যার পর নাসিকের পুলিশ আতঙ্কে অস্থির হইয়া চারিদিকে উন্মাদের মত অনুসন্ধান করিতে থাকে এবং গণেশ সাভারকরকে কেন্দ্র করিয়া এক বিরাট ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে। এই অনুসন্ধানের ফলে মোট আটত্রিশ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদের লইয়া বিখ্যাত 'নাসিক ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয়। মামলার বিচারে সর্বসম্মত সাতাশ জন দোষী সাব্যস্ত হয় এবং জ্যাক্‌সনের হত্যা প্রভৃতির অপরাধে তিনজনের ফাঁসী ও অপর সকলের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। এইভাবে 'নাসিক-ষড়যন্ত্রমামলা'র সঙ্গে সঙ্গে নাসিকের বিপ্লব-প্রচেষ্টারও অবসান ঘটে।

গোয়ালিয়র রাজ্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

'নাসিক-ষড়যন্ত্রমামলা'র সূত্র ধরিয়া পুলিশ গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যেও একটি ব্যাপক বৈপ্লবিক সমিতির সন্ধান পায়। পূর্বেই এই দেশীয় রাজ্যে 'নব ভারত-সঙ্ঘ' নামে একটি গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সঙ্ঘের প্রধান পরিচালক ছিলেন 'যোশী' নামে এক ব্যক্তি। যোশীর সহিত নাসিকের গণেশ সাভারকরের নিয়মিত পত্র আদান-প্রদান চলিত। সম্ভবতঃ গণেশ সাভারকরের চেষ্টাতেই 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং গণেশের সাহায্য লইয়াই যোশী এই সঙ্ঘের কায পরিচালনা করিতেন। গণেশের গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিবার কালে পুলিশ যোশীর একখানি পত্র হস্তগত করে। এই পত্রের সূত্র ধরিয়াই 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সঙ্ঘ'-এর অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়।

এই সঙ্ঘের আদর্শ ও ক্রিয়া-কলাপ ছিল নাসিকের 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর অনুরূপ। "রিভলভারদ্বারা লক্ষ্যভেদ, তরবারি-চালনা শিক্ষা, বোমা ও ডিনামাইট তৈরী শিক্ষা, রিভলভার সংগ্রহ, বিভিন্ন অস্ত্রের ব্যবহার-প্রণালী

শিক্ষা" প্রভৃতি বিষয়গুলি এই সঙ্ঘের অবশ্য করণীয় কর্তব্য ছিল। সঙ্ঘের গঠন-তন্ত্রে ইহার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া বলা হয়:

"যে-কোন প্রদেশে একটা সাধারণ বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান যখনই শুরু হইবে তখনই সকলকে সেই অভ্যুত্থানে যোগদান করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে। প্রথমে দেশবাসীর মন শিক্ষাদ্বারা বিপ্লবের জন্য তৈরী করিতে হইবে, তাহার পর অভ্যুত্থান শুরু করিতে হইবে, আর কৌশল ও বুদ্ধিদ্বারাই স্বাধীনতা-যুদ্ধ চালাইয়া জয় লাভ করিতে হইবে।"

গণেশ সাভারকরের নিকট যোশীর পত্রের সূত্র ধরিয়া 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সঙ্ঘ'-এর অস্তিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপের সন্ধান পাইবামাত্র গোয়ালিয়র রাজ্যের পুলিশ রাজ্যব্যাপী ধরপাকড় শুরু করে। সর্বসমেত একচল্লিশ জন লোককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের সহিত সঙ্ঘের পরিচালক যোশীও গ্রেপ্তার হন। এবার ইহাদের লইয়া 'গোয়ালিয়র-ষড়যন্ত্রমামলা' শুরু হয়। ভারত-সরকারের নির্দেশে গোয়ালিয়র রাজ্যের সরকার একটি স্টেট-ট্রাইবুনাল গঠন করিয়া এই মামলার বিচারের ব্যবস্থা করে। সাক্ষ্য-প্রমাণাদিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ধৃত একচল্লিশ জনের মধ্যে বাইশজন 'গোয়ালিয়র নব ভারত-সঙ্ঘ'এর সভ্য এবং অপর উনিশ জন 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'এর সভ্য। এই মামলার বিচারে বিভিন্ন অপরাধে উনত্রিশ জনের কারাদণ্ড হয়।

আমেদাবাদের গুপ্ত সমিতি

গুজরাটের প্রধান শহর ও ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্প-কেন্দ্র আমেদাবাদেও বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টা বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখানকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা যে মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আমেদাবাদের গুপ্ত সমিতি ও ইহার কর্ম-প্রচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণ এমনকি 'সিডিসন কমিটি'ও সংগ্রহ করিতে পারে নাই। কেবল একটি মাত্র ঘটনাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, এখানেও একটি বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

১৯০৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বরমাসে তৎকালীন বড়লাট লর্ড মিণ্টো সস্ত্রীক আমেদাবাদ ভ্রমণ করিতে আসিয়া যখন ঘোড়ার গাড়াতে চড়িয়া যাইতে-ছিলেন তখন বিপ্লবীরা ভিড়ের মধ্য হইতে তাঁহার গাড়ীর উপর দুইটি বোমা ছুড়িয়া মারে। কিন্তু ঐ বোমাগুলির একটিও ফাটে নাই। এই গুলি ছিল দুইটি নারিকেল-বোমা। পরে একটি লোক বোমাদুইটি তুলিতে গেলে উহাদের একটি ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার একখানা হাত উড়িয়া যায়। এই ঘটনাটি ব্যতীত আমেদাবাদের বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টার আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

সাতারার বিপ্লব-প্রচেষ্টা

সাতরা জিলায় বৈপ্লবিক সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯০৭ খৃস্টাব্দে। দেশের স্বাধীনতা লাভ করাই ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। এই সমিতি প্রকৃতপক্ষে নাসিকের গণেশ সাভারকরের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর একটি শাখা হিসাবেই গড়িয়া উঠে। এই সমিতির সদস্যগণ ছিল কোলাপুর ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী। 'নাসিক-ষড়যন্ত্রমামলা'র কোন সূত্র ধরিয়াই পুলিশ প্রথম ইহার সন্ধান পায় এবং ১৯১০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে এই সমিতির তিন জন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার-কালে একজন সদস্য বোমা তৈরী করিতেছিল। ইহা ব্যতীত পুলিশ ইহাদের নিকট হইতে কতগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্যও হস্তগত করে। এই তিন জন সদস্যকে লইয়াই 'সাতরা-ষড়যন্ত্রমামলা' শুরু হয় এবং বিচারে তিন জন সদস্যেরই বিভিন্ন অপরাধে দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

পুনার শেষ বৈপ্লবিক কর্মোদ্যম

পর-পর তিনটা ষড়যন্ত্র-মামলা এবং বহু বিপ্লবী নায়ক ও কর্মীর কারাদণ্ডের ফলে মহারাষ্ট্রের বিপ্লব-প্রচেষ্টা নিস্তেজ হইয়া পড়ে। ইহার পর ১৯১১ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাষ্ট্রের কোথাও কোন বৈপ্লবিক কর্ম-প্রচেষ্টার লক্ষণ দেখা যায় নাই। কিন্তু অপর দিকে এই সময়ে সারা ভারতে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশে, বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যাপক ভাবে শুরু হয়। যখন সারা ভারতবর্ষ মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক মন্ত্র

গ্রহণ করে ঠিক তখনই মহারাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে—ইহা উপলব্ধি করিয়া মহারাষ্ট্রের যুবসম্প্রদায়ের মধ্যেও আবার বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। মহারাষ্ট্র-কেশরী তিলকের কর্মস্থান পুনার যুবকগণই মহারাষ্ট্রের এই কলঙ্ক মোচনের জন্য অগ্রসর হয়। সম্ভবতঃ ১৯১২ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে তাহারা আবার নূতন করিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ শুরু করে। তখন আর প্রকাশ্যভাবে সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবার সুযোগ ছিল না। সরকার পূর্বেই ইহার পথ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তাই পুনার বিপ্লবীরা গোপনে একটি ছাপাখানা বসাইয়া মারাঠী ভাষায় ইস্তাহার ও পুস্তিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করে। দুইজন মারাঠী যুবক এই গোপন ছাপাখানায় দিবা-রাত্র কাজ করিত।

প্রথম ইস্তাহারটি প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী। ইহার কয়েক দিন পূর্বে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিজ-এর উপর বোমা পড়ে এবং তাহার ফলে বড়লাট ভীষণ আহত হন। এই ঘটনাই ছিল প্রথম ইস্তাহারের উপলক্ষ। ইস্তাহারখানির উপরে মারাঠী ভাষায় লিখিত ছিল, "মারাঠাবাসীদের প্রতি আহ্বান", আর উহার নীচে এই স্বাক্ষর ছিল "বাংলার বিপ্লবীগণ"। এই ইস্তাহারে আবার বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুরু করিবার জন্য মারাঠী যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলা হয়:

"মারাঠীরা এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছে কেন? মহারাষ্ট্রে দুই বৎসর পূর্বে কয়েকটি স্বদেশপ্রেমিক তারকা জ্বলিয়া উঠিয়া অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কি তাহারা স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়াছে? সমস্ত দেশ আশা করিয়াছিল যে, মহারাষ্ট্র কিছু অসাধারণ কর্মের দ্বারা অক্ষয় খ্যাতি অর্জন করিবে; সেই আশা কি তবে মিথ্যা? সেতুবন্ধ হইতে হিমালয় পর্যন্ত গোটা দেশ আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, আজিকার এই শুভ দিনটিতে (১৯১৩ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী) সমগ্র জাতি ঐকবদ্ধ হইবে।"(১)

মহারাষ্ট্রীয় বিপ্লবীরা 'স্বাধীনতা' শীর্ষক বহু ইস্তাহার প্রকাশ করে। উপরোক্ত ইস্তাহারটি সেইগুলির অন্যতম। তাহারা পুনার ফার্গুসন কলেজের ছাত্রদের

প্রতি আহ্বান জানাইয়াও বহু ইস্তাহার কলেজের মধ্যে প্রচার করে।[১] এই ধরনের বহু ইস্তাহার পুনার বিজ্ঞান-কলেজ এবং কৃষি-কলেজের মধ্যেও প্রচার করা হয়। 'স্বাধীনতা' শীর্ষক ইস্তাহারটি সর্বসমেত চারিখানা প্রকাশিত হইয়াছিল। চতুর্থখানা ছাপা হইবার সময় ১৯১৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পুলিশ এই ছাপাখানাটি আবিষ্কার করে। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই পুনা এবং গোটা মহারাষ্ট্রের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক সংগ্রামের রাজনৈতিক পটভূমিকা

সাম্রাজ্যবাদের নূতন আক্রমণ

সমগ্র দেশব্যাপী একটা প্রবল বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলনের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া ভারতবর্ষ বিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে। ক্রমবর্ধমান ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি রোধের জন্য বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর চেষ্টা, প্রজা-শোষণের তীব্রতা বৃদ্ধি ও ১৮৯০—৯৯ খৃস্টাব্দের দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব হইতেই সেই বিক্ষোভ ও আন্দোলনের সৃষ্টি। পুরাতন শতাব্দীর শেষ ও নূতন শতাব্দীর প্রারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামও এক নূতন স্তরে প্রবেশ করিতে উদ্যত—এই পটভূমিকায় দুইটি "মূল উদ্দেশ্য" লইয়া বড়লাট-রূপে ভারত-শাসন করিতে আসেন লর্ড কার্জন। তাহার দুইটি "মূল উদ্দেশ্য" হইল (১) ভারতের বৃটিশ-শাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করা এবং (২) বৃটিশ ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষকে একচেটিয়া বাজারে পরিণত করা। এই দুই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে লর্ড কার্জন শাসনভার গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভয়ংকর দমননীতিমূলক স্বেচ্ছাচারী শাসন শুরু করিয়া দেন। ভারতীয়

---

(১) The leaflet was summarised in this language by the 'Sedition Committee' in their Report, P. 12-13.

জনসাধারণের বিক্ষোভের অভিব্যক্তি ও আন্দোলনের কেন্দ্র হইল কংগ্রেস। তাই ১৯০০ খৃস্টাব্দে লর্ড কার্জন সদম্ভে ভারত-সচীবকে জানাইয়া দেন: ধ্বংসোন্মুখ কংগ্রেসের উচ্ছেদ ত্বরান্বিত করাই ভারতের বড়লাটরূপে তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য হইবে।(১) একদিকে ভারতীয় জনগণের অগ্রগতির মূল উৎসগুলিকে একে একে বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য এবং অপর দিকে "সর্বশক্তিমান বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ"-এর শক্তি জাহির করিবার জন্য তিনি নূতন নূতন ব্যবস্থা ভারতের উপর চাপাইয়া দিতে শুরু করেন।

(১) কার্জন স্থির করিলেন, উন্নত পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রসারই ভারতের এই বিক্ষোভ ও জাতীয় আন্দোলনের কারন, সুতরাং "অত্যধিক শিক্ষা" ভারতীয়দের পক্ষে মারাত্মক। কাজেই অবিলম্বে শিক্ষার প্রসার রোধ করাই হইল তাহার প্রধান কাজ। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের জন্য তিনি শিমলায় এক সম্মেলন ডাকিয়া এক নূতন পরিকল্পনা তৈরী করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতন বৃদ্ধি করা হয়; বে-সরকারী কলেজগুলি, বিশেষ করিয়া যে সকাল কলেজে আইন শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল সেই গুলিকে বন্ধ বা নানা ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়; এবং শিক্ষকদের রাজনীতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়। এই সকল বিধান লইয়া '১৯০৪ খৃস্টাব্দের বিশ্ববিদ্যালয়-আইন' পাশ হয়। শিক্ষায় অগ্রণী বলিয়া এই ব্যবস্থায় বাংলাদেশই ক্ষতিগ্রস্থ হয় সর্বাপেক্ষা বেশী। বাংলার শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর ভিতরে বিক্ষোভের ঝড় উঠে।

(২) দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও কার্জন দিল্লীতে বিপুল অর্থব্যয়ে সপ্তম এডোয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক-উৎসব করিবার সিদ্ধান্ত করেন। তখন একদিকে ১৮৯৮-১৯০০ খৃস্টাব্দর দুর্ভিক্ষর ফলে হাজার হাজার লোক মারিতেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়াছে। তাই কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারী উৎসব ও তাহার জন্য নূতন ট্যাক্স ধার্য করিবার ফলে

(১) Ronaldshay: "Life of Lord Curzon", P. 151.

ভারতবাসীদের, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে।

(৩) কার্জনের পরবর্তী আক্রমণের লক্ষ্য হইল কলিকাতা-কর্পোরেশন। তিনি ভাবিলেন, বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্পোরেশনকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিতেছে, কর্পোরেশনই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৃটিশ-বিরোধিতার শক্তি যোগাইতেছে। সুতরাং তিনি কলিকাতা-কর্পোরেশনের স্বাধীনতা হরণ করিয়া ইহাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে 'মিউনিসিপ্যালিটি-আইন' পাশ করেন। এই আইনকে এমনকি কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতারাও "চরম অপমান" হিসাবে গ্রহণ করেন আর ইহার ফাল বাংলার যুবশক্তির ক্রোধ শত গুণ বাড়িয়া যায়।

(৪) এই সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থাদ্বারা বাংলার বিক্ষোভ ও আন্দোলন চূর্ণ হওয়া তো দূরের বরং তাহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সারা বাংলাদেশ কাঁপাইয়া এক বিরাট বিক্ষোভের ঝড় উঠে। ইহার ফলে কার্জন মরিয়া হইয়া ১৯০৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরমাসে "অশান্তির উৎস"স্বরূপ বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ভারতের "অশান্তির উৎস" চিরতরে বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারিলে দুইটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে—(ক) বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিলে ইহার বৃটিশ-বিরোধিতা এবং আন্দোলন-শক্তি দ্বিখণ্ডিত হইয়া দুর্বল হইবে এবং (খ) বিভক্ত বাংলার পূর্বাংশের জমির বর্ধিত খাজনায় ভাগ বসান সম্ভব হইবে।(১)

"বাংলাদেশ বিভক্ত করিয়া মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ ও আসাম লইয়া একটা নূতন প্রদেশ গঠনের পরিকল্পনার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালীদের সংহতি নষ্ট করিয়া দেওয়া। ইহার ফলে কলিকাতার ব্যবসায়-বাণিজ্য ও উহার গুরুত্ব হ্রাস পাইবে এবং নূতন প্রদেশের রাজধানী ঢাকার ব্যবসায়-বাণজ্য ও উহার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার রাজনৈতিক প্রভাবও বিশেষভাবে

(১) Joan Beauchamp: "British Imperialism in India", P. 113.

খর্ব হইবে। ইহা বাঙ্গালীরা কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারে না। বাঙ্গালীর বিক্ষোভ ক্রোধের আগুনে পরিণত হইল। কার্জন প্রতিবাদে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সারা বাংলাদেশে বড় বড় সভা হইতে লাগিল, প্রতিবাদের ঝড় উঠিল। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হইতে ষাট হাজার গণ-স্বাক্ষরসহ এক দরখাস্ত বৃটিশ-পার্লামেণ্টে পেশ করা হইল। সারা বাংলার মানুষ বৃটিশের এই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। (১)

স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর হইতে ১৯০৫ খৃস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রায় দুই হাজার বড় বড় সভা হয়, সরকারের নিকট শত শত প্রতিবাদ-পত্র প্রেরিত হয়। কিন্তু এই প্রতিবাদ ও আন্দোলন উপেক্ষা করিয়া ১৯০৫ খৃস্টাব্দের জুলাইমাসে ভারত-সরকার ঘোষণা করেন যে, ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গ-বিভাগ তো কার্যকরী হইবেই, এমনকি উত্তর-বঙ্গের ছয়টি জিলাও পূর্ব-বঙ্গের নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। এই ভয়ংকর আঘাতে বাঙ্গালীরা আবেদন-নিবেদন বা হা-হুতাশ করিল না, তাহারা ক্রোধে গর্জিয়া উঠিল। সেদিন সারা ভারতবর্ষ এই বিপদে বাংলার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাংলার নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া পরামর্শ করিলেন, তাঁহারা বৃটিশের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিবার জন্য খুঁজিয়া পাইলেন এক নূতন অস্ত্র। তাঁহারা বিদেশী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলিকাতায় এক বিশাল জন-সমাবেশে "স্বদেশী" আন্দোলন শুরু করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। এই স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশকে স্বদেশ-প্রেমের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত করিল। সাম্রাজ্যবাদী দৈত্যের আঘাতে এক নূতন বাংলার—বিপ্লবী বাংলার জন্ম হইল।(২)

রুশ-জাপান যুদ্ধে ক্ষুদ্র ও অখ্যাত জাপানের নিকট য়ুরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশাল রুশিয়ার শোচনীয় পরাজয় হইতে

---

(১) Lester Hutchinson : "Empire of the Nabobs", P. 193.

(২) Hirendranath Mukherji : "India Struggles for Freedom," P. 87.

বাংলার বিপ্লবী যুবশক্তি ভরসা খুঁজিয়া পাইল। সামান্য শক্তি লইয়া ক্ষুদ্রদেশ জাপান যদি রুশিয়ার মত একটা বিশাল ও পরাক্রান্ত শক্তিকে পরাজিত করিতে পারে তবে অফুরন্ত ধন-সম্পদের অধিকারী বিশাল ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি মানুষ কেন বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে পরাজিত করিতে পারিবে না? বাংলার যুবশক্তি নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া এক নূতন, বৈপ্লবিক সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় হইতে বাংলার যুবসম্প্রদায় যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিল তাহার একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে সি. এফ. এণ্ড্রুজ সাংসারিক সমস্যাবলীদ্বারা বিশেষভাবে জড়িত একটি যুবক সম্পর্কে এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছেন:

যুবকটি রুশ-জাপান যুদ্ধ হইতে "একটা নূতন দৃষ্টি লাভ করিতে শুরু করে। দূর-প্রাচ্য হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন জয়ের সংবাদ আসিতে থাকে। অবশেষে একদিন সে সংবাদ পাইল, শুসিমা-প্রণালীতে গোটা রুশ-নৌবহরটা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। সে আমাকে বলে যে, সেই রাত্রে সে ঘুমাইতে পারে নাই। তাহার দেশ-মাতা যেন প্রায় বাস্তবমূর্তি ধরিয়া তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাহার মনে হয় যেন তাহার মাতা (দেশ) বিষন্ন বদনে ও কাঙ্গালিনী রূপে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন, তিনি যেন তাহার নিকট সন্তানের ভক্তি দাবি করিতেছেন। সে যেন তাহার মায়ের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবার দুর্নিবার আহ্বান শুনিতে পায়। ইহার পর সে আর কিছু স্মরণ করিতে পারে না।" (১)

নূতন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বাংলার যুবসম্প্রদায়ও ঐ যুবকের মতই দেশমাতৃকার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করিবার সেই দুর্নিবার আহ্বান শুনিতে পায়। তাহারা বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ঐক্যতানে গাহিয়া উঠিল, "বন্দেমাতরম।" কার্জনের "অপরিবর্তনীয়" সিদ্ধান্ত বানচাল করিবার জন্য বাংলার যুবশক্তি দেশব্যাপী বিপ্লবের আগুন জ্বালাইয়া দিল।

"উত্তর-বাংলায়, বিশেষ করিয়া পূর্ব-বাংলায় এমন একটা বিক্ষোভ দেখা দেয়

(১) C. F. Andrews: "The Renaisssance in India," P. 34.

তিক্ততার দিক হইতে যাহার কোন তুলনা নাই। বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে, পুস্তিকায় ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে ঘোষিত হইল,—সম্পদশালিনী ও মহিমাময়ী বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ করা হইয়াছে; মায়ের সকল সন্তানের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইয়াছে, এই কথা বৃটিশ-পণ্য বর্জনের মারফত বৃটিশ জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে; নিজেদের মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে কর্ম-প্রচেষ্টা শুরু করিতে হইবে। ইহার সহিত বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গও উঠিতে থাকে। য়ুরোপের সর্বাপেক্ষা গর্বিত জাতির সহিত যুদ্ধে জাপানের অপূর্ব জয়ের সহিত এইভাবে বাঙ্গালীর এই সংগ্রামের তুলনা করা হয়ঃ "বাঙ্গালীর কি কোন ধর্ম নাই, স্বদেশ-ভক্তি নাই? বাঙ্গালী! শক্তির দেবী মা-কালীকে স্মরণ কর, শক্তি-সাধনায় রত হও, মহারাষ্ট্র-বীর শিবাজীর মহান কার্যাবলী স্মরণ কর!...... তোমার নিজের মঙ্গল-সাধনের জন্য তৎপর হও।"(১)

১৯০৫ খৃস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ছিল বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখ। ঐ দিন অসংখ্য জন-সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মধ্য দিয়া বাংলার জনসাধারণ যে বিক্ষোভ প্রকাশ করে, ভারতের ইতিহাসে তাহার কোন তুলনা নাই। ঐ দিন সারা বাংলা-দেশব্যাপী জনসাধারণ উপবাস করিয়া ও নগ্নপদে থাকিয়া দেশ-মাতৃকার অঙ্গচ্ছেদের জন্য শোক প্রকাশ করে, দোকানীরা দোকান-পাট বন্ধ রাখে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাবানুসারে সমগ্র বাঙ্গালীর ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতীক-স্বরূপ হস্তে হরিদ্রা-বর্ণের সূত্র ধারণ করিয়া "রাখীবন্ধন"-এর অনুষ্ঠান ও রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদীর প্রস্তাবানুসারে "অরন্ধন" পালন করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় এবং বাঙ্গালী জনসাধারণ তাহাদের সর্বশক্তি নিয়োজিত করিয়া জন্মভূমির ঐক্য অব্যাহত রাখিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। ঋষি বঙ্কিমের অমর সঙ্গীত 'বন্দে-মাতরম' প্রথমে বাঙ্গালীর ও পরে ভারতের জনগণের জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয় এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ সমগ্র জাতির সাধারণ কর্মপন্থা-রূপে গৃহীত হয়। বাঙ্গালীর এই নূতন স্বদেশ-প্রেমের মন্ত্র দ্রুত সারা ভারত-

(১) 'Sedition Committee Report,' P. 19.

বর্ষকেও দীক্ষিত করে, সারা ভারতের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হইয়া বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে।

যখন সারা বাংলা ও ক্রমশঃ সারা ভারতবর্ষ বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া উঠে তখন কংগ্রেসের আপসপন্থী নেতৃবৃন্দও দেশব্যাপী বিক্ষোভে চঞ্চল হইয়া তাঁহাদের গতানুগতিক পদ্ধতিতে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত রদ করাইবার জন্য সরকারের নিকট আবেদন করিতে থাকেন। কেন্দ্রীয় আইন-সভায় দাঁড়াইয়া গোপালকৃষ্ণ গোখেল বড়লাটকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, "মহাশয়, বাংলাকে শান্ত করুন!" বৃটিশ-জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য তিনি ইংলণ্ডেও গমন করেন। কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না, আবেদনে বৃটিশ-প্রভুদের মন গলিল না। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের আবেদনের উত্তরে ভারত-সচীব মর্লে ঘোষণা করিলেন: যদিও বঙ্গভঙ্গ "সংশ্লিষ্ট জনগণের অধিকাংশের ইচ্ছার বিরোধী বলিয়া সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হইয়াছে," তথাপি "যে বিষয়টি পূর্বেই কার্যকরী করা হইয়াছে" তাহা পরিবর্তন করা অসম্ভব। সুতরাং এবার ইহার পরিবর্তন করাইবার ভার পড়ে বাংলাদেশের উপর, এবং বাংলাদেশ স্বেচ্ছায় সেই ভার গ্রহণ করে। আপসপন্থী নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতার পর বাংলা ও ভারতের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরা আগাইয়া আসে। বিপ্লবী বাংলা ও বিপ্লবী ভারতের জন্ম তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় একটা অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক ঘটনা হইয়া উঠে।

'নরম' ও 'চরম' পন্থার বিরোধ

উপরোক্ত রাজনৈতিক পটভূমিকায় ১৯০৫ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরমাসের শেষ দিকে বারানসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি হন সর্বজনমান্য নেতা গোপালকৃষ্ণ গোখেল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের ফলে বিক্ষুব্ধ চরম-পন্থীদের নিয়ন্ত্রিত করা এই সর্বজনমান্য নেতার পক্ষেও সম্ভব হইল না। বিষয়-নির্বাচনী কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেস-নেতৃত্বের তরফ হইতে যখন সপত্নীক 'প্রিন্স অফ ওয়েলস্'-এর আসন্ন ভারত-ভ্রমণ উপলক্ষে রাজদম্পতিকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের প্রস্তাব তোলা হয় তখন মহারাষ্ট্রের তিলক, পাঞ্জাবের লাজপৎ রায়,

বাংলার বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতির নেতৃত্বে চরমপন্থীরা গোখেলসহ সকল আপসপন্থী নেতাদের ইংরেজ-তোষণ নীতির প্রতি তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বিদ্রুপ-বাক্য বর্ষণ করিতে থাকেন। এই ঘৃণ্য প্রস্তাবের আলোচনা শুরু হইবা-মাত্র চরমপন্থীরা অধিবেশন ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। কিন্তু আপসপন্থীরাও শর্তাধীনভাবে হইলেও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বৃটিশ-পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধ্য হন এবং এইভাবে কংগ্রেস-নেতৃত্ব ও চরমপন্থীদের মধ্যে একটা সাময়িক আপস স্থাপিত হয়।

চরমপন্থীরা তাঁহাদের সংগ্রামের প্রচার অব্যাহতভাবে চালাইতে থাকেন এবং বাংলা ও ভারতের জনসাধারণ ক্রমশঃ তাঁহাদের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। ১৯০৩ খৃস্টাব্দ হইতে চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপস-পন্থী রাজনীতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিয়া জনগণকে বৃটিশ-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ দেখান। ১৯০৫ খৃস্টাব্দ হইতে চরমপন্থীদের বৃটিশ-বিরোধী প্রচার চরমে ওঠে এবং জনসাধারণের মধ্য হইতেও সংগ্রামের ধ্বনি উঠিতে থাকে। ইহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ গণ-আন্দোলনের সহিত সমান তালে অগ্রসর হইতে না পারিয়া পিছাইয়া পড়েন এবং বাংলার বিপিনচন্দ্র ও অরবিন্দ, মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেন।

১৯০৬ খৃস্টাব্দে বাংলা ও মহারাষ্ট্রের চরমপন্থীদের যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। ইহার পূর্ব হইতেই বাংলাদেশে মহারাষ্ট্রের আদর্শে ‘শিবাজী-উৎসব’এর অনুষ্ঠান শুরু হইয়াছিল। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের ‘শিবাজী-উৎসব’ ও ‘স্বদেশী মেলা’ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া স্বয়ং বালগঙ্গাধর তিলক এবং পাঞ্জাবের চরমপন্থীদের নায়ক লালা লাজপৎ রায় বাংলাদেশে আগমন করেন। এই দুই দেশ-বিখ্যাত চরমপন্থী নেতার পদার্পণে বাংলার যুবশক্তি বৈপ্লবিক উৎসাহে চঞ্চল হইয়া উঠে, মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীদের সহিত বাংলার বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং মহারাষ্ট্র ও বাংলার বৈপ্লবিক

আন্দোলনের স্রোত পাঞ্জাব ও অন্যান্য প্রদেশেও পৌছিবার পথ প্রস্তুত হয়।

বেনারস-কংগ্রেসে আপসপন্থী নেতৃত্ব ও চরমপন্থীদের মধ্যে যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা তখন সাময়িকভাবে মিটান সম্ভব হইলেও আবার তীব্র-ভাবে শুরু হয়। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতায়। এই অধিবেশনে দুই দলের বিরোধের ফলে অধিবেশনের কার্য-পরিচালনা অসম্ভব হইয়া উঠে। বাংলাদেশে দুই দলের বিরোধ চরম আকারে দেখা দেয়। সুরেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ রহিলেন একদিকে, আর একদিকে রহিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি বামপন্থী নেতৃবৃন্দ। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একদিকে গেলেন গোখেল ও ফিরোজশা মেটার নেতৃত্বে সকল আপসপন্থীরা, আর তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন তিলক ও লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে সকল চরমপন্থীরা। কলিকাতা-কংগ্রেসে এই দুই পরস্পর-বিরোধী দল দুইটি পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক লক্ষ্য লইয়া শেষ বুঝাপড়ার জন্য দণ্ডায়মান হইল।

দক্ষিণপন্থীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হইল, বৃটিশ-সাম্রাজ্যের যে সকল দেশে স্বায়ত্ব শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেগুলির অনুরূপ একটা শাসন-ব্যবস্থা এবং তাহা আরও পরে হইলেও ক্ষতি নাই। বামপন্থীদের রাজনৈতিক লক্ষ্য হইল ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সেই স্বাধীনতা ভারতবাসীরা আবেদন-নিবেদনের দ্বারা নহে, নিজেদের শক্তিদ্বারাই অর্জন করিবে। দক্ষিণপন্থীদের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় হইল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন, আর বামপন্থীদের লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় হইল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাদ্বারা অবিলম্বে বৃটিশ-শাসনের ধ্বংস-সাধন।

কলিকাতা-কংগ্রেসে এই দুই পরস্পর-বিরোধী দল ও উদ্দেশ্যের সমন্বয় সাধন করিয়া কংগ্রেসের ঐক্য বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিলে কেবলমাত্র সর্বজন-মান্য নেতা দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্ব গ্রহণের ফলেই তাহা কোন প্রকারে সম্ভব হয়। এবারেও সভাপতি দাদাভাই নৌরজির বিশেষ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত এই দুই দলের মধ্যে একটা আপস স্থাপিত হয় এবং কংগ্রেসের সংগঠনিক

ঐক্য কোন প্রকারে বজায় থাকে।(১) আপসের শর্ত অনুসারে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের লক্ষ্য হিসাবে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন' ঘোষণা করিলেও বৃটিশ-পণ্য বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের আন্দোলন সমর্থন করিবার স্বীকৃতি দেন। এই কংগ্রেসেই প্রথম "স্বরাজ" (ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন) কথাটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। চরমপন্থীরা কংগ্রেসের অধিবেশনে পরাজয় বরণ করিলেও তাঁহারা তাঁহাদের মতবাদের জন্য দেশের মধ্যে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করিলেন তাহা এ পর্যন্ত অন্য কোন নেতার ভাগ্যে ঘটে নাই। সারা দেশের যুবশক্তি তাঁহাদের নিকট হইতে বিপ্লবের পথে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের মন্ত্র গ্রহণ করে।

কিন্তু কলিকাতা-কংগ্রেসে ভারতের প্রবীণতম নেতা দাদাভাই নৌরজির চেষ্টায় দুই দলের মধ্যে সাময়িকভাবে আপস স্থাপন সম্ভব হইলেও পরবর্তী অধিবেশনে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখা কোন প্রকারেই সম্ভব হইল না। পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯০৭ খৃস্টাব্দে, কংগ্রেসের অধিবেশন হয় সুরাটে। প্রথমে নাগপুর অধিবেশনের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু নাগপুর ছিল তিলকের পরিচালনাধীন চরমপন্থী মারাঠীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। তাই নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে দক্ষিণপন্থীরা বিশেষ সুবিধা করিতে পারিবেনা ভাবিয়া ফিরোজশা মেটার চেষ্টায় সুরাটে অধিবেশনের আয়োজন হয়। বামপন্থীরা লালপৎ রায়কে সভাপতি করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহাতে শাসকগণ রুষ্ট হইতে পারে এই ভয়ে দক্ষিণপন্থীরা রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচিত করেন। বামপন্থীদের সহিত দক্ষিণপন্থীদের বিরোধ আর এক ধাপ অগ্রসর হইল।

দক্ষিণপন্থীরা যেন পূর্ব হইতেই এবারের কংগ্রেস-অধিবেশনে চরমপন্থীদের সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব হইতেই ঘোষণা করেন যে, এবারের কংগ্রেস-অধিবেশনে বৃটিশ-পণ্য বর্জন, স্বরাজ প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা চলিবে না। ইহার ফলে দুই দলের বিরোধ

(১) C. Y. Chintamani : "Indian Politics Since the Mutiny", P. 80-81.

চরমে উঠে। দক্ষিণপন্থীরা এবার প্রকাশ্যেই বিচ্ছেদের কথা বলিতে থাকেন। কারণ, তাঁহারাই ছিলেন কংগ্রেসের মধ্যে সংখ্যাধিক দল। দক্ষিণপন্থীদের নেতা ফিরোজশা মেটার চেষ্টায় দুই দলের বিচ্ছেদ স্পষ্ট হইয়া উঠে। অধিবেশনের পূর্বে সুরাটে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বে চরমপন্থীদের এক সভা হয়। এই সভায় দক্ষিণপন্থীদের "অপচেষ্টা" ও আপস-নীতির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়া বাধা দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অধিবেশনে বামপন্থীদের প্রস্তাব উত্থাপন করেন বালগঙ্গাধর তিলক। কিন্তু ভোটাধিক্যে প্রস্তাবগুলি পরাজিত হয়। প্রস্তাবের উপর বিতর্কের সময় চরমপন্থীরা ক্রুদ্ধ হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ও ফিরোজশা মেটাকে লক্ষ্য করিয়া পাদুকা নিক্ষেপ করে। এই অধিবেশনে কোন কাজই সম্ভব হইবে না বুঝিয়া বামপন্থীরা অধিবেশন পণ্ড করিয়া দেয়। দুই দলের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। ইহার পর কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে দক্ষিণপন্থীদের অধিকারে চলিয়া গেলেও দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ বামপন্থীদেরই নেতা বলিয়া মানিয়া লয় এবং চরমপন্থীদের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিই প্রাধান্য লাভ করে।(১)

বৈপ্লবিক সংগ্রাম

কংগ্রেসের এই আভ্যন্তরিক বিরোধ বাহিরের প্রচণ্ড আন্দোলনেরই অনিবার্য পরিণতি। বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ করিয়া সারা বাংলাদেশে ও গোটা ভারতবর্ষে যে সংগ্রামের আগুন জ্বলিতেছিল তাহাতে দক্ষিণপন্থীদের আপস-নীতির কোন স্থান ছিল না, তাই সেই সংগ্রাম কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে অব্যবহার্য বলিয়া বিসর্জন দিয়া সক্রিয় বৃটিশ-বিরোধিতা ও বিপ্লবের পথ ধরিল। এই সংগ্রাম এখন আর বঙ্গভঙ্গের মত কোন স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করিয়া কোন স্থান বা সময়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাই ইহা এখন বাংলাদেশের গণ্ডী পার হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষের বিস্তৃত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইল। তাই দেখা

(১) Ambika Charan Majumdar: "Indian National Evolution," P. 972.

যায় যে, মহারাষ্ট্রে যে বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বালিতে শুরু করিয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িয়া দ্রুত সারা ভারতবর্ষকে গ্রাস করিবার জন্য ছুটিয়াছে এবং ১৯১১ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ হইবার পরেও তাহা দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়াছে। বামপন্থী বা চরমপন্থী নেতৃত্ব ছিল সেই সংগ্রামের মুখপাত্র। বঙ্গভঙ্গ না হইলেও সেই সংগ্রাম অনিবার্যভাবেই বাংলাদেশে ও ভারতবর্ষে দেখা দিত। বঙ্গভঙ্গ তাহাতে ইন্ধন যোগাইয়াছিল মাত্র। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে :

"বৃটিশ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক চরিত্র লইয়া যে সংগ্রাম শুরু হইল তাহার পক্ষে বঙ্গভঙ্গ ছিল কেবল একটা উপলক্ষ, কারণ নহে।"(১)

সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভ্যালেণ্টাইন চিরল-এর কথায় কংগ্রেসের ঘটনাবলীর মধ্য দিয়া সেই সংগ্রামের রূপই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। এই সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সেই সংগ্রামের এই রূপ অঙ্কিত করেন :

"বাহিরে যাহা ঘটিতেছিল তাহারই প্রতিচ্ছবি হইল কংগ্রেসের এই অধিবেশনের (১৯০৭ খৃস্টাব্দের সুরাট-কংগ্রেসের) পরিণতি।......'স্বরাজ'-এর ধ্বনি জনগণ অন্তর দিয়া গ্রহণ করে এবং তাহা বৃটিশ-ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। কলিকাতার বিখ্যাত কালী-মন্দীরে এক বিরাট সভায় 'স্বদেশী'র প্রতিজ্ঞা গৃহীত হয়।...সর্বত্যাগী হিন্দু-সন্ন্যাসীরা জনগণের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ গ্রহণ করে এবং আইন-ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকটি সঙ্ঘ পাশ্চাত্ত্য গণতান্ত্রিক আদর্শে এক-একটি সক্রিয় রাজনৈতিক প্রচার-কেন্দ্র হইয়া উঠে। স্কুল-কলেজের ছাত্রদের লেখা-পড়া বন্ধ করিয়া পথে বাহির করা হয়, তাহারা দেশভক্তরূপে প্রচারের গাড়ীতে চাপিয়া 'স্বরাজ'-এর ধ্বনি তুলিতে থাকে অথবা বিদেশী-বর্জনের জন্য পিকেটিং শুরু করে।......এই ভাবে অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা ও সংবাদ-পত্রে জ্বালাময়ী রচনাদ্বারা নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের উত্তেজনা চরমে

---

(১) L. S. S. O' Malley : "History of Bengal, Behar and Orissa under British Rule," P. 528—29.

তোলেন, তাঁহারা হিন্দুধর্মের কাহিনীর সহিত রুশীয় 'এনার্কিস্ট' মতবাদের সমন্বয় সাধন করিতেও সমান দক্ষ ছিলেন। ধ্বংসের দেবতা শিব ও হত্যাকারীদের সহিত বোমার সমন্বয় সাধিত হয়, দেশীয় ও বৃটিশ সরকারী কর্মচারীরা উভয়েই সেই হত্যাকারীদের শিকারে পরিণত হয়। আর সেই হত্যাকাণ্ডই ধর্ম ও স্বদেশ-প্রেমের কাজ বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। এমনকি উচ্চ শ্রেণীর যুবকেরাও দেশভক্তির নামে একত্র হইয়া লুণ্ঠনের দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিতে শুরু করে।"(১)

১৯১০ খৃস্টাব্দে বড়লাটের কাউন্সিলে নূতন সংবাদপত্র-আইনের খসড়া উপস্থিত করিয়া ভারত-সরকারের আইন-সচীব স্যার হার্বাট রিজ্‌লি আতঙ্কে অস্থির হইয়া বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই চিত্রটি অঙ্কিত করেন :

"প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে সরাসরি বা প্রকারান্তরে ঘোষণা করা হইতেছে যে, ভারতের সকল ব্যাধির একমাত্র ঔষধ হইল বিদেশী শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভ। আর সেই স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে দেশের যুবকদের বীরত্বপূর্ণ কাজ, আত্মত্যাগ ও শহীদের মৃত্যু বরণ করিয়া,অর্থাৎ কোন না কোন বৈপ্লবিক কর্মের দ্বারা। হিন্দুর ধর্মগ্রন্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস, এবং বিশেষ করিয়া য়ুরোপীয় বৈপ্লবিক সাহিত্য মন্থন করিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পক্ষে দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া বাহির করা হইতেছে। সেই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখান হইয়া থাকে যে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। সার্কাসিয়া, স্পেন ও দক্ষিণ আফ্রিকায় যে গোরিলা-যুদ্ধ হইয়াছিল সেই গোরিলা-যুদ্ধের পদ্ধতি, ম্যাৎসিনির রাজনৈতিক নরহত্যার মতবাদ, কসুথ-এর বৈপ্লবিক মতবাদ, রুশীয় 'নিহিলিস্ট'দের ক্রিয়াকলাপ, মার্কুইস ইটো-এর হত্যা, গীতায় অর্জ্জুনের সহিত কৃষ্ণের কথোপকথন—ইহাদের সকলই ভাবপ্রবণ মনে আগুন জ্বালাইয়া দিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।……ঠিক এই মুহূর্তে আমরা একটা ভয়ংকর ষড়যন্ত্র-মামলায় ব্যস্ত আছি। ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টিদ্বারা সরকার ও বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করাই ছিল এই

(১) Valentine Chirol : "India, Old and New," P. 118—119.

ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। ইহাদের সংগঠন খুবই ব্যাপক ও কার্যকরী, ইহাদের সংখ্যা অগণিত, ইহাদের নেতারা অতি গোপনে কার্য পরিচালনা করিয়া থাকে আর নেতাদের অল্প বয়সী অনুচরবৃন্দ তাহাদের কথা অন্ধের মত মানিয়া চলে। বর্তমানে তাহারা রাজনৈতিক নরহত্যার পদ্ধতি অনুসরণ করিতেছে। ....” (১)

সরকারী দমননীতি

সুরাটের ঘটনার পর নরমপন্থীরাই কংগ্রেস দখল করিয়া থাকে। শাসকগণ এই বিভেদের সুযোগ পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করে। তাহারা একদিকে কংগ্রেসের সংগ্রাম-বিরোধী দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে আরও কাছে টানিতে থাকে এবং অপর দিকে চরমপন্থীদের উপর পূর্ণোদ্যমে দমন-নীতি প্রয়োগ করে। চরমপন্থীদের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই ১৯০৯ খৃস্টাব্দে 'মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কার' প্রবর্তিত হয়। এই শাসন-সংস্কার ১৮৯২ খৃস্টাব্দের শাসন-সংস্কারের সামান্য বর্ধিত সংস্করণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এই সংস্কার অনুসারে পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হইতে বাছিয়া কয়েকজনকে বড়লাটের পরামর্শ-পরিষদে গ্রহণ করা হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এই সকল পরিষদের কোন ক্ষমতাই ছিল না, শাসকদের পরামর্শদান ব্যতীত এই গুলির অন্য কোন ক্ষমতাই ছিল না।

এই ভূয়া সংস্কারকে চরমপন্থীরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা এই ভূয়া সংস্কারকেই "প্রকৃত ও আন্তরিক" বলিয়া বরণ করিয়া ইহাকে নিজেদের চেষ্টার ফল বলিয়া জাহির করেন। তাঁহারা এই সংস্কারের জন্য আনন্দের সহিত ১৯১০ খৃস্টাব্দে বড়লাটসাহেবকে রাজভক্তি-মূলক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। প্রচণ্ড দমন-নীতি সত্ত্বেও গণ-আন্দোলন ও

---

(১) L. S. S. O' Malley : 'Bengal, Bihar and Orissa under British Rule,' P. 535—36.

বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা দমন করিতে না পারিয়া বৃটিশ-সরকার ১৯১১ খৃস্টাব্দে যখন বঙ্গভঙ্গ রদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে তখনও কংগ্রেস-সভাপতি বিষণ নারায়ণ দাস ইহাকে "আধুনিক ভারতের নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জয়" হিসাবে ঘোষণা করিয়া বলেন : "এই সিদ্ধান্তের ফলে বৃটিশ-শাসনের প্রতি ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয় শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং বৃটিশের রাজনীতি-জ্ঞানের প্রতি ভারতবর্ষে পুনরায় বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার জোয়ার বহিতেছে।"(১)

একদিকে এই শাসন-সংস্কার প্রবর্তিত হয় এবং অপর দিকে নূতন দমন-নীতির খড়্গ শাণিত করিয়া তোলা হয়। এই শাসন-সংস্কার ১৯১০ খৃস্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর প্রথম প্রবর্তিত হয়। বড়লাট লর্ড মিণ্টো নূতন ব্যবস্থা-পরিষদের উদ্বোধন-কালে আরও কঠোর দমন-নীতিদ্বারা স্বদেশী আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চূর্ণ করিবার সংকল্প ঘোষণা করেন। ১৯১১ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী সংবাদ-পত্রের কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য নূতন প্রেস-আইন চালু করা হয়।

১৯০৬ খৃস্টাব্দ হইতেই সরকার উন্মত্তের মত দমন-নীতি প্রয়োগ করিতে শুরু করিয়াছিল। এক মাত্র বাংলাদেশেই ১৯০৮ হইতে ১৯১৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে কমপক্ষে ৫৫০টি রাজনৈতিক মামলা দায়ের করা হয়। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকে বিনাবিচারে আটক করিবার জন্য ১৯০৭ খৃস্টাব্দে কুখ্যাত '১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন নং আইন' পুনঃপ্রবর্তিত হয়, ঐ বৎসর 'রাজদ্রোহমূলক জনসভা-আইন', ১৯০৮ খৃস্টাব্দে 'বিস্ফোরক দ্রব্য-আইন' ও 'প্রেস-আইন' প্রভৃতি দমনমূলক আইনের বন্যা সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে। কিন্তু এত সব দমনমূলক ব্যবস্থা সত্ত্বেও বৃটিশ-বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন :অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে, বরং এই উৎপীড়নের ফলে তাহা আরও উদ্দাম হইয়া উঠে। কলিকাতার 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' ও 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার প্রচার-সংখ্যা দ্রুত বাড়িয়া যায়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিংকে আটক করা

(১) C. Y. Chintamoni : 'Indian Politics Since the Mutiny,' P. 95—96.

হইলে বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রামের মুখপত্র 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় পাঞ্জাবের জনসাধারণের প্রতি এই বৈপ্লবিক আহ্বান জানান হয়:

"বক্তৃতা ও কাব্য রচনার দিন শেষ হইয়াছে, আমলাতন্ত্র আমাদের যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছে। আমরা সেই আহ্বান গ্রহণ করিতেছি। পাঞ্জাবের ভাইসব! সিংহের জাতি! যাহারা লাজপৎ রায়কে ছিনাইয়া লইয়াছে তাহারা তোমাদের ধূলিসাৎ করিয়া দিতে চায়, তোমরা তাহাদের দেখাইয়া দাও, যে-লাজপৎ রায়কে তাহারা ছিনাইয়া লইয়াছে, একশত লাজপৎ তাঁহার শূন্য স্থান গ্রহণ করিবেন। শতগুণ বেশী উচ্চৈঃস্বরে ধ্বনিত হউক—'জয় হিন্দুস্থান'।" (১)

১৯০৮ খৃস্টাব্দে কৃষ্ণকুমার মিত্র, অশ্বিনীকুমার দত্ত, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং আরও পাঁচ জন বিনাবিচারে বন্দী হন। দুইটি প্রবন্ধ রচনার জন্য বালগঙ্গাধর তিলককে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। মাদ্রাজের জন-নায়ক চিরম্বরম পিলাই, হরিসর্বোত্তম রাও এবং অন্ধ্রের বহু লোককে আটক করা হয়। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের উপর দিয়া অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের বন্যা বহিতে থাকে। কিন্তু ইহাতেও শাসকদের আতঙ্ক দূর হইল না, বরং তাহা দিন দিন বাড়িতে থাকে। এই আতঙ্ক এতদূর বাড়িয়াছিল যে, ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ভারতের প্রধান সেনাপতি লর্ড কিচ্‌নার সারা ভারতবর্ষে সামরিক আইন জারি করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন।(২)

কিন্তু এত উৎপীড়ন সত্ত্বেও ভারতের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা কিছু মাত্র হ্রাস পাইল না, তাহা ক্রমশঃ দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়া বিদেশী শাসনকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল। এই ভাবে মহারাষ্ট্রে প্লেগ-ব্যাধিকে উপলক্ষ করিয়া যে-বিপ্লবের আগুন প্রথম জ্বলিতে শুরু করিয়াছিল তাহাই পরে মনুষ্যরূপী প্লেগ কার্জনের বর্বরসুলভ আক্রমণকে

(১) Hirendranath Mukherjee: 'India Struggles for Freedom,' P. 93.

(২) Thomson &Garrat: 'Rise and Fulfilment of British Rule in India,' P. 577.

উপলক্ষ করিয়া বাংলাদেশ ও সমগ্র ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া পরাধীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ রঞ্জিত করিয়া তুলিল। ভারতের পরাধীন মানুষ সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া সর্ব প্রথম উহার শ্রেষ্ঠতম ঐতিহাসিক অবদানস্বরূপ পূর্ণ স্বাধীনতার বাণী শুনিতে পাইল। ভারতবর্ষের পরবর্তী ইতিহাস হইল সেই বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশে প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা (১৯০৬—১৯১৭)

১৯০৬-০৮ খৃস্টাব্দ

প্রাথমিক চেষ্টা

গোড়ার দিকে বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। সমিতিগুলির দ্রুত বিস্তার ও সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থের অনটন আরও বাড়িয়া যায়, তাহার ফলে এমন অবস্থা দেখা দেয় যে, অর্থ সংগ্রহ না করিতে পারিলে কোন কাজেই অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয়। তাই ডাকাতিদ্বারাই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়।

প্রথমে বিপ্লবীরা ডাকাতিতে বিশেষ অপটু ও অভিজ্ঞতাহীন ছিল বলিয়া গোড়ার দিকের ডাকাতির প্রচেষ্টাও নিতান্ত হাস্যকর পরিণতি লাভ করে। কিন্তু শীঘ্রই এই বিষয়ে তাহাদের সকল দুর্বলতা কাটিয়া যায় এবং তাহারা বড় বড় ও চাঞ্চল্যকর ডাকাতি করিতে সক্ষম হয়।

শোনা যায়, বাংলাদেশের বিপ্লবীদের প্রথম ডাকাতির চেষ্টা হয় ১৯০৩ খৃস্টাব্দে। বলা বাহুল্য, সেই চেষ্টা হাস্যকর ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১৯০৩ খৃস্টাব্দে যুগান্তর দলের কয়েকজন অল্প বয়সী ছেলে একত্রিত হইয়া তারকেশ্বর লাইনের কোন স্থানে ডাকাতি করিতে যায়। তাহারা সংবাদ পাইয়াছিল যে,

ঐ অঞ্চলের জনৈক ব্যক্তির গৃহে যথেষ্ট টাকা আছে। কিন্তু ছেলেরা নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া কেবল কয়লার বড় বড় স্তূপ দেখিতে পায়। তাহারা মনের দুঃখে ফিরিয়া আসে।(১)

ইহার পর ১৯০৬ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে নাকি রংপুর জিলায় কোন এক বিধবার গৃহে বিপ্লবীরা ডাকাতি করিবার মতলব আঁটিয়াছিল। তাহারা রাত্রিকালে ঐ উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট গ্রামে ঢুকিয়া শুনিতে পায় যে, ঐ গ্রামে এক দারোগা আছে। দারোগার উপস্থিতির সংবাদে তাহারা ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।(২) ইহার কয়েক দিন পরে ডাকাতি হয় নারায়ণগঞ্জে। ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। তাহারা এক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করিয়া এক হাজার রৌপ্য-মুদ্রাপূর্ণ একটি থলি লইয়া ফিরিবার সময় থলিটি ছিঁড়িয়া যায় এবং মাত্র আশী টাকা ব্যতীত আর সবই পথে পড়িয়া যায়। ঐ বৎসর সেপ্টেম্বরমাসে ঢাকার শেখরনগর নামক স্থানে একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি বড় দল এক গৃহস্থ-বাড়ী ডাকাতি করিতে গিয়া প্রকাণ্ড একটা লোহার সিন্দুক দেখিতে পায়। তাহাদের নিকট লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার কোন যন্ত্র ছিল না। কাজেই তাহারা সিন্দুকটাই লইয়া আসিয়া নৌকায় তোলে। কিন্তু লোহার সিন্দুকের ভারে নৌকা ডুবিয়া যায়। বিপ্লবীরা সামান্য কয়েকটি টাকা লইয়া হতাশ মনে ফিরিয়া আসে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের মেমাসে নয়-দশ জনের একটি দল ঢাকার আরসুলিয়া নামক স্থানের একটি পাটের অফিসে ডাকাতি করিতে গিয়া ঐ অফিসে একটি দোনালা বন্দুক আছে শুনিবামাত্র চম্পট দেয়।

বিপ্লবীদের প্রাথমিক চেষ্টার ব্যর্থতা ও হাস্যকর পরিণতিই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তাহাদের কঠোর করিয়া তোলে এবং অভিজ্ঞতা আনিয়া দেয়। ইহার পর হইতে তাহারা আরও দুঃসাহসিক কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার এক উন্নততর স্তরে আরোহণ করে।

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ১৩১।

(২) 'Sedition Committee Report,' P. 31.

গভর্ণর ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা

বাংলার লেফ্‌টানাণ্ট গভর্ণর এণ্ড্রু ফ্রেজার ছিলেন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ-পরিকল্পনার প্রধান উৎসাহদাতা। বিপ্লবীরা গভর্ণর ফ্রেজারকে হত্যা করিয়া অত্যাচারী ইংরেজ-শাসকদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করে। কলিকাতার বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই তাহাকে হত্যা করিবার জন্য সচেষ্ট ছিল। পূর্বে ফ্রেজার-হত্যার চেষ্টা তিনবার ব্যর্থ হয়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে বিপ্লবীরা নূতন করিয়া চেষ্টা শুরু করে। ঐ বৎসর ৬ই ডিসেম্বর ফ্রেজারসাহেব ট্রেণে মেদিনীপুর সফরে যাইতেছিলেন। পথে নারায়ণগড় স্টেশনের নিকট বোমাদ্বারা ফ্রেজারের ট্রেণ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা হয়। বোমার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ট্রেণখানির কয়েকটি কামড়া লাইনচ্যুত হয়। যে স্থানে বোমাটি পড়িয়াছিল সেই স্থানটিতে পাঁচ ফুট চওড়া ও পাঁচ ফুট গভীর একটি গর্ত হইয়া যায়। কিন্তু ছোট লাটসাহেব প্রাণে বাঁচিয়া যান। ইহার পূর্বে ঐ বৎসর অক্‌টোবর মাসেও দুইটি চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

১৯০২ খৃস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ভূতপূর্ব ম্যাজিস্ট্রেট এলেনসাহেবকে গুলি করা হয়। কিন্তু আঘাত গুরুতর ছিলনা বলিয়া এলেনসাহেব বাঁচিয়া যান। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল গুপ্ত সমিতির সাতজন সভ্য পিস্তল ও ছোরা লইয়া শিবপুরের জনৈক গৃহস্থের বাড়ী ডাকাতি করিয়া চারিশত টাকা সংগ্রহ করে। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বরমাসে চন্দননগরে একটি জনসভা বন্ধ করিবার শাস্তিস্বরূপ ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল চন্দননগরের মেয়রের গৃহে বিপ্লবীরা একটি বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি ফাটিলেও কেহ হতাহত হয় নাই।

কিংসফোর্ড-হত্যার চেষ্টা

কিং[illegible] ছিলেন কলিকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি-ম্যাজিস্ট্রেট। যাহারা স্বদেশী আন্দোলন উপলক্ষে গ্রেপ্তার হইত তাহাদের উপর কিংসফোর্ডের নির্দেশে ভয়ংকর নির্যাতন চালান হইত। এই ম্যাজিস্ট্রেট একবার এ

বালককে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আদালত-প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যে বালকটির উপর নিষ্ঠুরভাবে বেত্রদণ্ড প্রয়োগ করা হয়। এই নিষ্ঠুর ঘটনা উপলক্ষে কলিকাতায় প্রবল বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়। কলিকাতার বিপ্লবীরা ইহার প্রতিশোধের জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। যুগান্তরের পরিচালকগণ পরামর্শ করিয়া কিংসফোর্ডকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন। বারীন্দ্র ঘোষ এই দণ্ড কার্যকরী করিবার ভার দেন ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক যুগান্তর সমিতির দুইজন সভ্যের উপর। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড মজফরপুরের জিলা-জজ হইয়া বদলী হন। কাজেই ক্ষুদিরাম এবং প্রফুল্লও মজফরপুর যাত্রা করেন।

ইহার পূর্বেও কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। বিপ্লবীরা একখানি পুস্তকের আকারে একটি ভয়ংকর বোমা কিংসফোর্ডের নামে পার্শেল করিয়া ডাকে প্রেরণ করে। ইহাতে এমন ব্যবস্থা ছিল যে, পার্শেলের মধ্যস্থিত পুস্তকখানি হাতে লইয়া খুলিবামাত্র বোমাটি ফাটিয়া যাইবে। পুস্তকের মধ্যভাগ কাটিয়া তাহাতে বিস্ফোরক পদার্থ ভরিয়া বোমাটী তৈরী হইয়াছিল। কিন্তু সেই পার্শেলটি কিংসফোর্ড নিজে না খুলিয়া অন্য একজনকে খুলিবার জন্য দেন। যে চাপরাসীটি ইহা খুলিয়াছিল সে বোমা-বিস্ফোরণে নিহত হয়।

পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম মজফরপুর আসিয়া সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল সন্ধ্যাবেলা কিংসফোর্ডের গাড়ীর মত একখানা গাড়ীতে চড়িয়া দুইজন শ্বেতাঙ্গ-মহিলা (ব্যারিস্টার কেনেডিনাহেবের স্ত্রী ও কন্যা) যাইতেছিল। প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম ভুল করিয়া ঐ গাড়ীর উপরেই বোমা নিক্ষেপ করেন। তাহার ফলে মহিলা দুইজন নিহত হয়।

পরদিন ১লা মে বেলা দ্বিপ্রহরের কাছাকাছি নন্দলাল ব্যানার্জি নামক একজন পুলিশ-কর্ম্মচারীর হস্তে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য প্রফুল্ল নিজের রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করিয়া বিংশ শতাব্দীর প্রথম শহীদ হইবার গৌরব অর্জন করেন। ঐ দিবস বেলা ১টার সময় মজফরপুর হইতে চব্বিশ মাইল দূরবর্তী ওয়াইনী নামক স্টেশনে প্রফুল্লের সহকর্মী ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন। ইহার পর মজফরপুর-আদালতে হত্যার অভিযোগে ক্ষুদিরামের বিচার আরম্ভ হয়।

ক্ষুদিরাম আদালতে হত্যার অভিযোগ স্বীকার করেন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হয়। এই হুকুমের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হইলেও ঐ দণ্ডাদেশ বহাল থাকে। ১১ই আগস্ট ইংরেজ-রাজের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়া বাংলার বীর সন্তান ক্ষুদিরাম বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শহীদ হিসাবে চিরবরেণ্য হইয়া থাকেন।(১)

আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা

মজফরপুরের বোমা-বিস্ফোরণ এবং প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা ও ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের সূত্র ধরিয়া কলিকাতার পুলিশ ২রা মে তারিখ যুগান্তর সমিতির কলিকাতার প্রধান কর্মকেন্দ্র মাণিকতলার বাগান-বাড়ী ও বিপ্লবীদের অন্যান্য বাসস্থান খানাতল্লাসী করে। এই খানাতল্লাসীর ফলে বাগান-বাড়ী হইতে বোমা, ডিনামাইট ও কার্তুজ প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি, বন্দুক, রিভলভার ও বহু চিঠি-পত্র পুলিশের হস্তগত হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, অবিনাশ ভট্টাচার্য, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, উল্লাসকর দত্ত, শৈলেন্দ্রনাথ বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, কানাইলাল দত্ত প্রভৃতি যুগান্তর সমিতির চৌত্রিশ জন নেতা ও প্রধান কর্মী গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদের লইয়া এবার ইতিহাস-বিখ্যাত 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয়। এই মামলায় সমিতির অন্যতম সভ্য নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী রাজসাক্ষী হইয়া পুলিশের নিকট সকল তথ্য ফাঁস করিয়া দেয়।(২)

---

(১) এই দুই বিপ্লবী যুবকের, বিশেষ করিয়া ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তার ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে ব্রজবিহারী বর্মন-রচিত 'ক্ষুদিরামের জীবনী' প্রামাণ্য পুস্তক হিসাবে গ্রহণ করা চলে। ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম' নামক প্রামাণ্য গ্রন্থেও ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্লের দুইটি সংক্ষিপ্ত জীবনী দেওয়া আছে।

(২) নরেন্দ্র গোস্বামী সম্পর্কে মতভেদ আছে। কেহ বলেন, নরেন্দ্র পুলিশের গুপ্তচর হিসাবে যুগান্তর সমিতির গোপন সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য লইয়াই বিপ্লবীদলে যোগদান করে; আবার কেহ বলেন যে, নরেন্দ্রের বিপ্লবীদলে যোগদানের পিছনে কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না, ধরা পড়িবার পর ভয় পাইয়া সে রাজসাক্ষী হয়। তৎকালীন নেতাদের মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রথমোক্ত মত এবং বারীন্দ্রকুমার ঘোষ দ্বিতীয় মত সমর্থন করেন।

বারীন্দ্রকুমার এই ষড়যন্ত্রের প্রধান দায়িত্ব নিজের উপর লইয়া পুলিশের নিকট এক স্বীকারোক্তি করেন। তাঁহার স্বীকারোক্তির ফলে (রাজা) সুবোধ মল্লিক(১) এবং আরও কয়েকজন গ্রেপ্তার হন। বারীন্দ্রের পর উল্লাসকর, উপেন্দ্রনাথ এবং আরও কয়েকজন স্বীকারোক্তি দেন। ধৃত বিপ্লবীদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন অন্যতম। এইভাবে ধৃত মোট চল্লিশ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম'-এর অভিযোগে 'আলিপুর-ষড়যন্ত্রমামলা'র বিচার আরম্ভ হয়। মামলার বিচার চলিবার সময় আসামী কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়া আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের হাসপাতালে যান এবং ১লা সেপ্টেম্বর নরেন গোস্বামীকে হত্যা করেন। এই জন্য তাঁহাদের পৃথক বিচার করিয়া ফাঁসীর আদেশ দেওয়া হয়। কানাইলাল বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় শহীদ এবং সত্যেন চতুর্থ শহীদ ও "ফাঁসীর সত্যেন" রূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।(২)

১৯০৮ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মে হইতে ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত দুই ভাগে এই মামলা পরিচালিত হয়। চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিস্টার হিসাবে অরবিন্দের পক্ষ সমর্থন করেন এবং বিচারে অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। এই মামলায় মোট ২০৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় এবং ১৯০৯ খৃস্টাব্দের ৬ই মে রায় বাহির হয়। সেশন-আদালতে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসী এবং হেমচন্দ্র দাস, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিভূতি সরকার, ঋষিকেশ কাঞ্জিলাল, বীরেন্দ্র সেন, সুধীর সরকার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, অবিনাশ ভট্টাচার্য, শৈলেন্দ্রনাথ বসু ও ইন্দুভূষণ রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম হয়। কিন্তু হাইকোর্টের আপীলে বারীন্দ্র ও উল্লাসকরের ফাঁসীর আদেশ মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড দেওয়া হয়; হেমচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড বহাল থাকে এবং বিভূতি সরকার, ঋষিকেশ ও ইন্দু রায়ের দশ বৎসরের দ্বীপান্তর, সুধীর সরকার, পরেশ

---

(১) দেশ-সেবার উদ্দেশ্যে তাঁহার উল্লেখযোগ্য দানের জন্য তাঁহাকে 'রাজা' উপাধি দেওয়া হয়।

(২) ব্রজবিহারী বর্মন-রচিত 'কানাইলাল' ও 'ফাঁসীর সত্যেন' দ্রষ্টব্য।

মৌলিক, অবিনাশ ভট্টাচার্য,—ইঁহাদের প্রত্যেকের সাত বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ড হয়। অরবিন্দসহ সতের জন মুক্তিলাভ করেন।

'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' বিভিন্ন কারণে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। প্রথমতঃ, ইহাই বিংশ শতাব্দীর বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে প্রথম ষড়যন্ত্র-মামলা; দ্বিতীয়তঃ, ভারতে এই প্রথম বোমাদ্বারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা হয় এবং এই বিপ্লবীরাই ভারতে প্রথম বোমা ব্যবহার করেন; তৃতীয়তঃ, কানাইলাল ও সত্যেনের দ্বারা জেলের মধ্যে নরেন গোস্বামীর হত্যা কেবল ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে নহে, "সমগ্র বিশ্বের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে এক অতি বিস্ময়কর ঘটনা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে এই সংবাদটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন:

"গোস্বামীর মৃত্যু-শাস্তিতে নাকি য়ুরোপীয় বৈপ্লবিকেরা বাহবা দিয়াছিলেন। প্যারিসের (তৎকালে) সোসালিস্ট (উপস্থিত) কমিউনিস্ট-মুখপত্র 'Humanite' ('হুমানিতে') নাকি লিখিয়াছেন: ভারতীয় বৈপ্লবিকেরা যে-প্রকারে শত্রুপুরীর মধ্যে থাকিয়াও রক্ষীবেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে, তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।"(১)

'বোমার বিভীষিকা'

১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২রা মে তারিখ কলিকাতার বিপ্লবীদের একটি বিরাট দল গ্রেপ্তার করিয়া ও ৪ঠা মে হইতে তাহাদের লইয়া 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু করিয়া বাংলাদেশের পুলিশ যখন আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠে সেই সময়েই তাহাদের সাফল্যের উল্লাস হতাশায় পরিণত করিয়া কলিকাতার রাস্তাঘাট ঘনঘন বোমা-বিস্ফোরণে কম্পিত হইতে থাকে এবং পূর্ব-বঙ্গে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যা শাসকগোষ্ঠীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে।

নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া লইয়াই যুগান্তর দলের সভ্যগণ

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ৬০।

এই গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে 'আলিপুর-মামলা'র সরকারী উকিল মিঃ হিউম-এর প্রাণনাশের জন্য তৎপর হইয়া উঠে। এই সময়ে, অর্থাৎ অরবিন্দ প্রভৃতি শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর যুগান্তর দলের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম পাবনার অবিনাশ চক্রবর্তী দলের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং প্রধান কর্মকর্তারূপে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সহযোগে দলের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অব্যাহত রাখেন।(১)

কলিকাতার বিপ্লবীরা তাঁহাদের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ খুঁজিতে থাকে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১৫ই মে সরকারী উকিল হিউমসাহেব গ্রে স্ট্রীট দিয়া গাড়ীতে যাইবার সময় তাহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া চারিজন পথচারীকে আহত করে। জুন মাসের প্রথম দিকে রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় কলিকাতার নিকটবর্তী হাওড়া স্টেশনে বিপ্লবীরা হিউমের কামরা লক্ষ্য করিয়া চারিটি নারিকেল-বোমা নিক্ষেপ করে, কিন্তু হিউমসাহেব এবারেও বাঁচিয়া যান। এই ব্যক্তিকে হত্যার জন্য পরে আরও দুইবার—১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী ও ৫ই এপ্রিল—চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তাহাও ব্যর্থ হয়। ইহার পর হিউম-হত্যার চেষ্টা পরিত্যক্ত হয়।

ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যা

১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২রা জুন ঢাকার অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঢাকা জিলার বাড়ড়া গ্রামের এক কুখ্যাত ধনীর গৃহে ডাকাতি করে। ঐদিন রাত্রিকালে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক রাইফেল, রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া নৌকাযোগে বাড়ড়া গ্রামে উপস্থিত হয়। বিপ্লবীরা নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া অর্থ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিতে থাকে, ইতিমধ্যে গ্রামবাসীরা আসিয়া তাহাদের বাধা দেয়। বিপ্লবীরা প্রায় ২৬ হাজার টাকা লইয়া গুলি বর্ষণ করিতে করিতে নৌকায় আরোহণ করে। গুলিবর্ষণের ফলে গ্রামের চৌকিদার নিহত হয়, গ্রামবাসীদের বল্লমের আঘাতে কয়েকজন বিপ্লবীও আহত হয়।

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃঃ ১৩৩।

সকাল বেলা পুলিশ ও গ্রামের লোক একত্র হইয়া বিপ্লবীদের নৌকার পশ্চাৎ-ধাবন করে এবং দুই পক্ষে গুলিবর্ষণ চলে। ইহার ফলে গ্রামবাসীদের কয়েকজন এবং বিপ্লবীদের একজন নিহত হয়। বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে পুলিশ ও গ্রামবাসীরা ভয় পাইয়া পলায়ন করে। কিন্তু কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর আর একদল লোক বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। এখানেও একটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ঐ লোকগুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করে। ইতিমধ্যে এই ডাকাতির সংবাদ চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিপ্লবীদের বড় নৌকাখানি দেখিবামাত্র বিভিন্ন অঞ্চলের গ্রামবাসীরা সন্দেহ করিয়া বিভিন্ন স্থানে তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা সকল বাধা অতিক্রম করিয়া পরদিন অস্ত্র ও লুণ্ঠিত অর্থসহ ঢাকাশহরে ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হয়। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়া মাত্র তিনজন লোককে বিচারের জন্য আদালতে উপস্থিত করে। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণাদি না থাকায় তাহারা মুক্তি পায়।

আগস্টমাসের গোড়ার দিকে অনুশীলন সমিতির তিন জন সভ্য ডাকাতির উদ্দেশ্যে নৌকায় যাইবার সময় পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ নৌকা খানাতল্লাস করিয়া কয়েকখানি ছোরা হস্তগত করে। এই নৌকাখানি বিপ্লবীরা বাড়া ডাকাতির সময় অপহরণ করিয়াছিল। ঐ মাসের ১৫ই তারিখ ময়মনসিংহ জিলার বাজিতপুর নামক স্থানে বিপ্লবীরা এক ধনীর গৃহে ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। এই ডাকাতিতে বিপ্লবীরা পুলিশের বেশ ধরিয়া ঐ ধনীর গৃহে খানাতল্লাসীর অজুহাত লইয়া উপস্থিত হয় এবং পুলিশ দেখিয়া গৃহস্বামী সভয়ে দ্বার খুলিয়া দেয়। ১৬ই সেপ্টেম্বর ঠিক এই কৌশলে বিপ্লবীরা হুগলী জিলার বিঘাতি নামক স্থানে ডাকাতি করে। এই দুই ডাকাতিতে একই কৌশল অবলম্বন করিতে দেখিয়া পুলিশ সহজেই বুঝিতে পারে যে, এই উভয় ক্ষেত্রেই একই দলভুক্ত বিপ্লবীরা ডাকাতি করিয়াছে। পরের ঘটনা সম্পর্কে চারি ব্যক্তি ধরা পড়ে ও তাহারা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

১লা সেপ্টেম্বর 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'য় অভিযুক্ত কানাইলাল দত্ত ও

সত্যেন্দ্রনাথ বসু আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের হাসপাতালে ঐ মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীকে হত্যা করেন।

৩০শে অক্টোবর ফরিদপুর জিলার নড়িয়া নামক স্থানের বাজারে একটি বড় রকমের ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা (ঢাকা অনুশীলন সমিতি) পূর্বে সংবাদ পাইয়াছিল যে, নড়িয়া বাজারের এক মহাজনের নিকট আশী হাজার টাকা ও অন্যান্য দোকানে বহু টাকা সঞ্চিত আছে। এই সংবাদ পাইয়া প্রায় চল্লিশ জন বিপ্লবী বন্দুক, রিভলভার ও অন্যান্য অস্ত্র লইয়া নড়িয়া গ্রামের খেয়াঘাটে নৌকায় উপস্থিত হয় এবং বন্দুক ছুড়িয়া খেয়াঘাটের মাঝিদের তাড়াইয়া দেয়। ইহার পর তাহারা খেয়াঘাটের স্টিমার-অফিস ও তিনটি দোকান লুট করে। স্টিমার-অফিসের লোকেরা ও দোকানদারগণ সম্ভবতঃ পূর্বেই সংবাদ পাইয়া তাহাদের সঞ্চিত অর্থ সরাইয়া ফেলিয়াছিল। কাজেই বিপ্লবীরা এখানে আশানুরূপ অর্থলাভ করিতে না পারিয়া হতাশ মনে ফিরিয়া যায়। সরকার এই বিপ্লবীদের সম্পর্কে পুলিশকে সংবাদ দিলে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্তু কেহই পুরস্কারের লোভে পুলিশকে বিপ্লবীদের সংবাদ দেয় নাই। কাজেই পুলিশ এই ডাকাতি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার বা শাস্তি দিতে পারে নাই।

২রা নভেম্বর বৃটিশ-সরকার বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে একটি ভূয়া শাসন-সংস্কার ঘোষণা করে। কিন্তু বিপ্লবীরা এই ভূয়া শাসন-সংস্কার ঘৃণাভরে ছুড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে।

৭ই নভেম্বর বাংলার ছোট লাট ফ্রেজারসাহেবকে হত্যার জন্য কলিকাতা ওভারটুন-হলে এক সভায় আবার গুলি বর্ষিত হয়। কিন্তু ফ্রেজারসাহেব এবারেও বাঁচিয়া যান। এক যুবক গ্রেপ্তার ও দশ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ৯ই নভেম্বর মজফরপুরে প্রফুল্ল চাকীর গ্রেপ্তারকারী সাব-ইনস্পেক্টর নন্দলাল ব্যানার্জি কলিকাতার আরপুলি লেনে বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দিয়া দেশদ্রোহিতার প্রায়শ্চিত্ত করে। নভেম্বর মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির

সুকুমার চক্রবর্তী, কেশব দে ও অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ নামক তিনজন সভ্যকে দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহে হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট দলসম্পর্কিত গোপন তথ্য ফাঁস করিয়াছিল। ইহারা গ্রেপ্তার হইয়া মুক্তিলাভের পর ইহাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায় নাই।

নভেম্বর মাসের প্রথম দিকে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক পুলিনবিহারী দাসকে '১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন আইন' অনুসারে আটক করা হয়। নভেম্বর মাসের শেষে ও ডিসেম্বর মাসের প্রথম দিকে নদীয়া জিলার রায়টা ও হুগলী জিলার মোরেহাল নামক স্থানে দুইটি ডাকাতি হয়। এই উভয় ক্ষেত্রেই বিপ্লবীরা আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে বাখরগঞ্জের দেহেরগতি নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা প্রচুর অর্থ লাভ করে। পুলিশ কেবলমাত্র মোরেহালের ডাকাতি সম্পর্কেই এক যুবককে আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। বিচারে এই যুবকের সাত বৎসর কারাদণ্ড হয়। কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ না থাকায় অন্য দুইটি ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯০৬ হইতে ১৯০৮ খৃস্টাব্দ সময়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ এইভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

*   *   *   *

১৯০৯ খৃস্টাব্দ

দমননীতি

১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর '১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১৪নং সংশোধিত ফৌজদারী আইন' প্রবর্তিত হয়। এই আইন অনুসারে কতগুলি বিশেষ অপরাধের অভিযোগে হাইকোর্টের তিন জন জজ জুরির সাহায্য ব্যতীত সংক্ষিপ্ত ও নামমাত্র অনুসন্ধানের পর সরাসরি বিচার করিতে পারিতেন। এই আইনের দ্বারা সরকার যে-কোন সভা-সমিতি বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিবার ক্ষমতা লাভ করে। আইনের দ্বারা এই ক্ষমতা লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই

১৯০৯ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পূর্ববঙ্গের নিম্নোক্ত সমিতিগুলি বেআইনী বলিয়া ঘোষিত হয় :—

১। ঢাকার অনুশীলন সমিতি

২। বাখরগঞ্জের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি

৩। ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি

৪। ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি

৫। ,, সাধনা সমিতি

বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ত্রিপুরা জিলার কুমিল্লা শহরে বিপ্লবীরা ঢাকার নবাবের একটি মাল-গুদাম হইতে তিনটি রাইফেল অপহরণ করে। এই উপলক্ষে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া অন্তরীণ করা হয়।

১০ই ফেব্রুয়ারী সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাস কলিকাতা সুবার্বন পুলিশ কোর্টের সম্মুখে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই সরকারী উকিল অন্যান্য-দের সহযোগে প্রথমে 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' এবং পরে কানাইলাল ও সত্যেন বসুর মামলা পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিদেশী সরকারকে সাহায্য করার শাস্তি হিসাবেই বিপ্লবীরা তাহাকে হত্যা করে। এই হত্যা সম্পর্কে পুলিশ ঘটনাস্থলেই খুলনা জিলার শোভনা গ্রামের চারু বসু নামক যুগান্তর সমিতির এক সভ্যকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাহার ফাঁসী হয়। ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই চব্বিশ পরগণা জিলার আগরপাড়া নামক স্থানে এক পুলিশ-কর্মচারীর উপর দুইটি নারিকেল-বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমা দুইটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া দুইজন লোককে আহত করে। ৩রা এপ্রিল চব্বিশ পরগণার ডায়মণ্ড হারবার থানাতে 'নেত্র' নামক গ্রামে বিপ্লবীরা ডাকাতি করিয়া ২৪ শত টাকা সংগ্রহ করে। বিপ্লবীরা মুখোস পড়িয়া ও রিভলভার উদ্যত করিয়া গৃহস্বামীর নিকট হইতে লোহার সিন্দুকের চাবি আদায় করে। তাহারা টাকা লইয়া চলিয়া আসিবার সময় গৃহস্বামীকে বলিয়া

আসে যে, ইংরেজদের এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তাহারা এই অর্থ ঋণ হিসাবে গ্রহণ করিতেছে।

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ৩রা জুন অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ফরিদপুর জিলার ফতেজঙ্গপুর গ্রামের গাবেশ চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশের সহিত সহযোগিতার শাস্তি-স্বরূপ হত্যা করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে তাহার ছোট ভাই প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়কে হত্যা করে। পূর্বে গাবেশ কোন ক্রমে বিপ্লবীদের গোপন তথ্য জানিতে পারিয়া পুলিশকে বলিয়া দেয়। বিপ্লবীরা গাবেশের দেশদ্রোহিতার শাস্তি দানের সিদ্ধান্ত করে। এই হত্যা সম্পর্কে একব্যক্তি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১৬ই আগস্ট খুলনা জিলার নাঙ্গলা নামক স্থানে এক উল্লেখযোগ্য ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ঐ তারিখ রাত্রিকালে আট-নয় জন লোক মুখোস পরিয়া ও পিস্তল-রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তাহারা রিভলভার উদ্যত করিয়া গৃহস্বামীর নিকট হইতে সিন্দুকের চাবি আদায় করিয়া নগদে ও অলংকারে মোট ১০৭০ টাকা পায়। এই ডাকাতি সম্পর্কে বহুস্থানে খানাতল্লাসী হয় ও বহু ব্যক্তি গ্রেপ্তার হয়। খানাতল্লাসীর সময় পুলিশ বহু "রাজদ্রোহ"মূলক পুস্তক ও বোমা তৈরীর নিয়মাবলী হস্তগত করে। এই সকল লোক লইয়া ৩০শে আগস্ট 'নাঙ্গলা ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয়। এই মামলার বিচারে একজনকে সাত বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড, ছয় জনকে সাত বৎসরের-জন্য, তিন জনকে পাঁচ বৎসরের জন্য এবং দুইজনকে তিন বৎসরের জন্য দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯০৯ খৃস্টাব্দের ১১ই অকটোবর ঢাকা জিলার রাজেন্দ্রপুর স্টেশনে বিপ্লবীরা এক দুঃসাহসিক ট্রেন-ডাকাতি করিয়া ২৩ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। ঐ দিন ট্রেনে সাতটি থলিয়ায় করিয়া এক ব্যবসায়ী তেইশ হাজার টাকা লইয়া যাইতেছিল। পূর্ব হইতে এই সংবাদ পাইয়া গুপ্ত সমিতির সাত-আট জন সভ্য রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ট্রেনে আরোহণ করে। ট্রেন-খানি রাজেন্দ্রপুর স্টেশন ত্যাগ করিবামাত্র বিপ্লবীরা রিভলভার ও ছোরা লইয়া টাকার থলিয়াবাহী তিন জন লোককে আক্রমণ করে। এই ভাবে ঐ তিন

জন লোককে আহত করিয়া তাহারা টাকার থলিয়াগুলি হস্তগত করে এবং থলিয়াগুলি ট্রেন হইতে ছুড়িয়া ফেলিয়া নিজেরা লাফাইয়া পড়ে। পরে পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া প্রায় বার হাজার টাকার তিনটি থলিয়া উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনায় থলিয়াবাহীদের একজন নিহত ও অপর দুইজন আহত হয়। পুলিশ এই উপলক্ষে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহাদের লইয়া মামলা শুরু করে। মামলার বিচারে একজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও কয়েক জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে চারিজন স্বীকারোক্তি করে। তাহাদের স্বীকারোক্তি হইতে জানা যায় যে, যুগান্তর ও অনুশীলন এই উভয় সমিতির সভ্যেরা একত্রিত হইয়াই এই ডাকাতি করে এবং লুন্ঠিত অর্থ দুই সমানভাগে ভাগ করা হয়।(১) এই সময়ে বাংলাদেশের দুইটি শ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক সমিতি যে পরস্পরের সহিত সহযোগিতা করিত এই ডাকাতিটি তাহারই একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

এই বৎসর আরও কয়েকটি বড় ডাকাতি হয়। ১৬ই অক্টোবর অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ মুখোস, রিভলবার, ছোরা, হাতুড়ি ও টর্চদ্বারা সজ্জিত হইয়া ফরিদপুর জিলার দরিয়াপুর গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া ২৬ শত টাকা সংগ্রহ করে। পুলিশ সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ২৮শে অক্টোবর যুগান্তর সমিতির সভ্যগণ নদীয়া জিলার হলুদ-বাড়ী গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ১৪ শত টাকা লুন্ঠন করে। এই ডাকাতি উপলক্ষে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাহাদের পাঁচ জন আট বৎসর, এক জন সাত বৎসর এবং এক জন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহারা প্রয়োজন হইলে আত্মহত্যার জন্য 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' নামক তীব্র বিষ সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল।

১০ই নভেম্বর অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ঢাকা জিলার রাজনগর গ্রামে একটি ডাকাতি করিয়া নগদ ও অলংকারে প্রায় ২৮ হাজার টাকা পায়। পরদিন ১১ই নভেম্বর তাহারা ত্রিপুরা জিলার মোহনপুরের বাজারে ডাকাতি

(১) "Sedition Committee Report", P. 41.

করিয়া নগদ ১৬ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। তবে পলিশ অনুমান করে যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত 'সোনারং ন্যাশনাল স্কুল'-এ বসিয়াই উক্ত সমিতির পরিচালকগণ উপরোক্ত ডাকাতিগুলির পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিলেন।

এই বৎসর আরও বহু রাজনৈতিক ডাকাতি হইয়াছিল। সেইগুলির কয়েকটি মাত্র এখানে উল্লেখ করা হইল। এই বৎসর বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি কয়েকটি গুপ্ত হত্যার পরিকল্পনা করিয়াছিল। কিন্তু সম্ভবতঃ প্রয়োজনীয় সুবিধা-সুযোগের অভাবেই সেইগুলি কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। এই বৎসরের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল পূর্ব-বাংলার নূতন প্রদেশের ছোটলাটকে হত্যার চেষ্টা। নভেম্বর মাসে ছোট লাটসাহেব পার্বত্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় আসিয়াছিলেন। লাটসাহেবের বাড়ীর সম্মুখে সাধুর ছদ্মবেশে তিনজন যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া পরে মুক্তি দেওয়া হয়। এই তিন জনের মধ্যে দুইজন পরে অপর একটি বৈপ্লবিক কর্মের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল।

* * * *

১৯১০ খৃস্টাব্দ

সামশুল আলম-হত্যা

১৯১০ খৃস্টাব্দের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল কলিকাতা-পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের কুখ্যাত অফিসার সামশুল আলমের হত্যা। এই গোয়েন্দা-অফিসারটি 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র তদ্বির করিতেছিলেন। ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা-হাইকোর্টে উক্ত মামলার আপীলের শুনানীর পর যখন সামশুল আলম হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিলেন তখন বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত নামে যুগান্তর সমিতির একজন আঠার বৎসর বয়স্ক যুবক তাহাকে পিছন হইতে গুলি করে। পুলিশ-অফিসারটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলে বীরেন্দ্র উত্তেজনার বশে পলায়ন না করিয়া রাস্তায় নামিয়া গুলি চালাইতে থাকে। এই সময় একজন

পুলিশ-সার্জেন্ট তাহাকে ধরিয়া ফেলে। বীরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইবার পর পুলিশের নিকট এক স্বীকারোক্তি করে। স্বীকারোক্তিতে সে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে (বাঘা যতীন) যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালক বলিয়া পরিচয় দেয়। সে আরও বলে যে, যতীন্দ্রনাথই তাহাকে এই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বীরেন্দ্রনাথের স্বীকারোক্তির কয়েকদিন পরেই যতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন।

হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা

১৯১০ খৃস্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী যশোহর জিলার ধূলগাঁও গ্রামে বিপ্লবীরা একটি ডাকাতি করিয়া ৬১৭৫ টাকা সংগ্রহ করে। এই ডাকাতি উপলক্ষে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

মার্চ মাসে বিখ্যাত 'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার শুরু হয়। সামশুল আলমের হত্যার পর কলিকাতা-পুলিশ উন্মাদের মত চারিদিকে খানাতল্লাস করিয়া যতীন্দ্রনাথ মুখার্জিসহ পঞ্চাশ জন লোককে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি, গুপ্ত হত্যা, হত্যার সহযোগিতা, এবং সর্বোপরি "ভারত-সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগ আনয়ন করা হয়। অভিযোগের মধ্যে পূর্বোক্ত বিঘাতি, রায়টা, মোরেহাল, হলুদবাড়ী প্রভৃতি স্থানের ডাকাতি গুলিও উল্লেখ করা হয় এবং অভিযুক্তদের মধ্যে 'হলুদবাড়ী ডাকাতি-মামলা'র ছয় জন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই মামলার বিচার শুরু হয় ১৯১০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে, আর শেষ হয় ১৯১১ খৃস্টাব্দের এপ্রিলমাসে। অর্থাৎ অভিযুক্ত সকলকে এক বৎসরকাল জেল হাজতে কাটাইতে হইয়াছিল। কিন্তু এত দীর্ঘ সময় ধরিয়া বহু চেষ্টা করিয়াও পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করিতে পারে নাই। অবশেষে বাধ্য হইয়া পুলিশ ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলিয়া লইয়া 'হলুদবাড়ী ডাকাতি-মামলা'র দণ্ডপ্রাপ্ত ছয়জন ব্যতীত অন্য সকলকে মুক্তি দেয়। এই ভাবে সরকারের বহুঘোষিত 'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা'র অবসান ঘটে। এই

ষড়যন্ত্র-মামলা চলিবার সময়েই সামশুল আলমকে হত্যার অভিযোগে ধৃত বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের বিচার চলে এবং বিচারে তাহার ফাঁসী হয়। নাথ মুখোপাধ্যায়ের উপরেও এই হত্যার অভিযোগ আনয়ন করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ইহা হইতেও তিনি মুক্তিলাভ করেন।

খুলনা ষড়যন্ত্র-মামলা

১৯১০ খৃস্টাব্দের পূর্বেই যুগান্তর সমিতির শাখা হিসাবে খুলনা জিলায় একটি গুপ্ত বৈপ্লবিক দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই বৎসরের প্রথম দিকে এই দলের উদ্যোগে যশোহর ও খুলনা জিলায় ষোলগাঁতি (২০০ টাকা), ধূলগ্রাম (৬১৭৫ টাকা), নন্দনপুর (৬৫০০ টাকা) ও মহিশা (২২০৪ টাকা) নামক স্থানে ডাকাতি হয়। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়াও ঐ ডাকাতিগুলি সম্পর্কে কোন লোককে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই, কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে পুলিশ উক্ত বৈপ্লবিক দলের সন্ধান পায় এবং ঐ দলের সভ্য বলিয়া সন্দেহ করিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। পরে তাহাদের সাতের জনকে লইয়া একটি ষড়যন্ত্র-মামলা দাঁড় করায়। এই মামলাই 'খুলনা ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত। 'সিডিসন কমিটি'র মতে ধৃত ব্যক্তিরা সকলেই দোষ স্বীকার করে এবং ভবিষ্যতে সদ্ভাবে থাকিবার মুচলেকা দিয়া সকলে মুক্তিলাভ করে।

ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা

১৯১০ খৃস্টাব্দের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'। ইতিপূর্বে ঢাকা জিলায় যে সকল বড় বড় ডাকাতি ও অন্যান্য বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল সেইগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা দলকে প্রমাণসহ গ্রেপ্তার করিতে না পারায় এবং এই প্রকার ঘটনার ক্রমবৃদ্ধির ফলে পুলিশ বিশেষভাবে অপদস্থ হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ না থাকিলেও তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল যে এইগুলি ঢাকার অনুশীলন সমিতিরই কাজ।

সুতরাং এই সমিতিকে একটা মারাত্মক আঘাত দেওয়ার উদ্দেশ্যে পুলিশ "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম" প্রভৃতি বহু অভিযোগ একত্র করিয়া একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র দাঁড় করিবার চেষ্টা করে।

এই বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতির প্রধান পরিচালক পুলীন-বিহারী দাসও নির্বাসন-দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসেন। সুতরাং কাল-বিলম্ব না করিয়া পুলিশ কাজ শুরু করিয়া দেয়। চারিদিকে গ্রেপ্তার ও খানা-তল্লাসী পূর্ণোদ্যমে শুরু হইয়া যায়। পুলীন দাস এবং আরও তেতাল্লিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তারপর জুলাই মাসে ইহাদের লইয়া "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম", ডাকাতি, নরহত্যা প্রভৃতির অভিযোগে 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার শুরু হয়। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিচারের পর মাত্র পনের জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। পুলীন দাস সাত বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অপর চৌদ্দ জনকে দুই হইতে সাত বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। অন্য সকলে মুক্তিলাভ করে। এইভাবে বিখ্যাত 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'র পরিসমাপ্তি ঘটে।

কিন্তু এত করিয়াও ঢাকার অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বন্ধ করা গেল না, বরং তাহা ক্রমশঃ বাড়িয়াই চলে। তাই 'সিডিসন কমিটি' সখেদে মন্তব্য করিয়াছেন :

"দুঃখের বিষয়, এই বিচার ও শাস্তি বিধান এই জিলার অপরাধ নিবারণের দিক হইতে নিষ্ফল হয়। সম্ভবতঃ এই ব্যর্থতার কারণ এই যে, ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং তাহাদের সংগঠন বড় বেশী রকমে বিস্তৃত, আর গ্রেপ্তারের জালও বেশী দূর বিস্তৃত করা যায় নাই।"(১) তাই দেখা যায় যে, ১৯১০ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসের পর হইতে, অর্থাৎ 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হইবার পর হইতে, ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে নিম্নোক্ত বড় ডাকাতিগুলি অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং পুলিশ একটি ব্যতীত অপর কোন ডাকাতি উপলক্ষে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে বা শাস্তি দিতে পারে নাই :—

---

(১) Sedition Committee Report, P. 46.

তারিখ	স্থান	ঘটনা	লুণ্ঠিত দ্রব্য	আহত বা মৃত	শাস্তি
১। ২১শে জুলাই	ময়মনসিংহের গোরক্ষপুর	বন্দুক ও রিভলভার চুরি	*	*	*
২। ৫ই সেপ্টেম্বর	ঢাকার মুন্সীগঞ্জ	বোমা আবিষ্কার	*	*	একজনের দশ-বৎসরের দ্বীপান্তর
৩। ৩০শে সেপ্টেম্বর	ঢাকার হলদিয়াহাট	ডাকাতি	১৫০০ টাকা	একজন মৃত ও একজন আহত	*
৪। ৭ই নভেম্বর	ফরিদপুরের কলারগাঁও	ডাকাতি	১২৬৬০ টাকা	*	*
৫। ৩০শে নভেম্বর	বাখরগঞ্জের দাদপুর	ডাকাতি	৪৯৩৬৮ টাকা	পাঁচজন আহত	*

১৯১০ খৃস্টাব্দের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দমননীতির কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে ভারত-সরকার কর্তৃক প্রেস-আইনের সংশোধন (১৯১০ খৃস্টাব্দের ১নং আইনের প্রবর্তন)। বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ করাই ছিল ইহার উদ্দেশ্য। এই আইনের খসড়া ঐ বৎসরের ৯ই ফেব্রুয়ারী বড়লাটের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া আইনে পরিণত হয়। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের 'সংবাদপত্র-আইন'-এর দ্বারা 'রাজদ্রোহ' মূলক রচনাযুক্ত সংবাদ-পত্র মুদ্রণের অভিযোগে যে-কোন ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ১৯১০ খৃস্টাব্দের প্রেস-আইনের দ্বারা সরকার যে-কোন ছাপাখানার নিকট জামিন দাবি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। এই কুখ্যাত আইনের ফলে ছাপাখানাগুলির পক্ষে কাজকর্ম চালান অসম্ভব হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন দেখা দেয়। এমন কি, কংগ্রেসের বৃটিশঘেঁষা আপসপন্থী নেতৃবৃন্দও ইহার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

* * * *

১৯১১ খৃস্টাব্দ

ডাকাতি

১৯১১ খৃস্টাব্দে বিপ্লবীদের দ্বারা সারা বাংলায় মোট আঠারটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ষোলটি হইয়াছিল পূর্ব-বঙ্গে। পূর্ব-বঙ্গে অনুষ্ঠিত বড় বড় ডাকাতিগুলি এখানে উল্লেখ করা হইল :—

২১শে জানুয়ারী সোনারং গ্রামে বিপ্লবীরা ডাক-পিয়নের নিকট হইতে একটি মেল-ব্যাগ কাড়িয়া লয়। এই ব্যাগের মধ্যে বহু টাকার 'মনি-অর্ডার' ছিল। লুণ্ঠিত টাকার পরিমান অজ্ঞাত। এই উপলক্ষে বিখ্যাত সোনারং ন্যাশনাল স্কুলের চৌদ্দ জন শিক্ষক ও ছাত্র গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদের সাত জনের কারাদণ্ড ও জরিমানা হয়। সোনারং গ্রামের রসুল দেওয়ান নামে একটি মুসলমান ও তাহার ভ্রাতা এই ঘটনাটি দেখিতে পায় এবং পুলিশের নিকট বিপ্লবীদের নাম বলিয়া দেয়। বিপ্লবীরা ইহাতে রসুল দেওয়ান ও তাহার ভাইয়ের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের হত্যা করিবার সুযোগ খুঁজিতে থাকে।

৫ই জানুয়ারী অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ ফরিদপুর জিলার পণ্ডিতচরের এক বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া নগদ ৫৫০০ টাকা লাভ করে। পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। ২০শে ফেব্রুয়ারী ঢাকার গোয়াড়িয়া নামক স্থানে ডাকাতি হয় এবং তাহাতে নগদে ও অলংকারে ৭৪৫৭ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাতি সম্পর্কে কেহ গ্রেপ্তার হয় নাই। ৩১শে মার্চ ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জিলার গুয়াকাইর নামক স্থানে। ইহাতে ১২ শত টাকা লুণ্ঠিত এবং একজন আহত হয়। উক্ত সমিতির সভ্যগণ ২২শে এপ্রিল তারিখে বাখরগঞ্জ জিলার লক্ষ্মণকাঠী গ্রামে ডাকাতি করিয়া ১০২০০ টাকা লইয়া পলায়ন করে। ৩০শে এপ্রিল ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জিলার চরশশা গ্রামে। এই ডাকাতিতে ২১৫০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৫ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জিলার সিংঘাইর নামক স্থানে এক ডাকাতিতে ৮১৭০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৩রা অক্টোবর ময়মনসিংহের কালিয়াচর নামক স্থানের ডাকাতিতে ৩১২৫ টাকা, ৬ই নভেম্বর যুগান্তর সমিতিদ্বারা রংপুরের বালিন্দা গ্রামের ডাকাতিতে ১২১৮ টাকা, ৩১শে ডিসেম্বর অনুশীলন সমিতিদ্বারা নোয়াখালির চাউলপালি গ্রামের ডাকাতিতে ১৯৭৭ টাকা লুণ্ঠিত হয়। পুলিশ উপরোক্ত ডাকাতিগুলি সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

গুপ্ত হত্যা

এই বৎসরের ২১শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতার অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য কলিকাতা-পুলিশের সি-আই-ডি বিভাগের হেড কনেস্টবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে হত্যা করে। এই লোকটি দিবারাত্র বিপ্লবীদের পিছনে ছায়ার মত ঘুরিয়া বেড়াইত। ২রা মার্চ বিকাল পাঁচটার সময় ষোল বৎসর বয়স্ক এক যুবক সি-আই-ডি পুলিশের বড় কর্তা ডেনহামসাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে কলিকাতার রাস্তায় একটি ভয়ংকর বিস্ফোরক বোমা নিক্ষেপ করে। বোমাটি ভ্রমক্রমে কাউলি নামক এক সাহেবের গাড়ীর মধ্যে পতিত হয়। কিন্তু উহা বিস্ফোরিত না হইবার ফলে কাউলিসাহেব বাঁচিয়া যান। এই ধরণের ভয়ংকর বোমা নাকি

চন্দননগরে বসিয়া বিপ্লবীরা তৈরী করিত। ১০ই এপ্রিল ঢাকা জিলার রাউথ-ভোগ গ্রামের মনোমোহন দে নামক এক গোয়েন্দা অনুশীলন সমিতির সভ্যদের দ্বারা নিহত হয়। এই গোয়েন্দাটির জ্বালায় বিপ্লবীরা অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। ১৯শে জুন বিপ্লবীরা ময়মনসিংহ শহরে পুলিশ সাব-ইনস্পেক্টর রাজকুমারকে হত্যা করে। ১১ই জুলাই ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ সোনারং গ্রামের রসুল দেওয়ান ও তাহার ভাই এবং অপর এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিবার প্রতিশোধ লয়। ইহারা ২১শে জানুয়ারী সোনারং ডাক-লুটের ঘটনাটি দেখিয়া লুণ্ঠনকারী বিপ্লবীদের নাম পুলিশের নিকট বলিয়াছিল এবং এই মামলায় পুলিশকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। ১১ই ডিসেম্বর বরিশালের অনুশীলন সমিতি উহার যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করার অপরাধে পুলিশ-ইনস্পেক্টর মনোমোহন ঘোষকে হত্যা করে।

'রাজদ্রোহ'মূলক জনসভা-আইন

এই বৎসর সরকার ইহার দমননীতির অপর একটি অস্ত্র হিসাবে 'রাজদ্রোহ-মূলক জনসভা-নিবারক আইন' (১৯১১ খৃস্টাব্দের ১০নং আইন) প্রবর্তন করে। পুলিশ এই আইন অনুসারে পূর্বে বিজ্ঞপ্তি দিয়া যে-কোন জনসভা বন্ধ করিবার ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু, 'সিডিসন কমিটি'র ভাষায়, "ইহাতেও বিশেষ কোন ফল হয় নাই।"

বঙ্গভঙ্গ রদ

যখন দমননীতি, গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড, জরিমানা এবং নানাবিধ অত্যাচার করিয়াও বাংলার বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও গণ-আন্দোলন দমন করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইল না, তখন বৃটিশ-সরকার "বাংলাকে শান্ত করিবার" অন্য কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার সিদ্ধান্ত করে। এই বৎসর দিল্লীতে বৃটিশ-সম্রাটের রাজ্যাভিষেক-দরবারে এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। বিভক্ত

বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ আবার এক হইল। কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল সেই বৈপ্লবিক সংগ্রাম বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না, বরং বৃটিশ-শক্তির এই পরাজয়ের ফলে তাহা আরও জোরের সহিত চলিতে থাকে।

* * * *

১৯১২ খৃস্টাব্দ

ডাকাতি

১৯১২ খৃস্টাব্দে প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের অনুশীলন সমিতি ও 'মাদারীপুর সমিতি'-দ্বারা কতগুলি বড় বড় ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে ছয়টি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। ২৩শে জানুয়ারী ঢাকা জিলার বাইগুনতেয়ারী নামক স্থানে একটি ডাকাতি হয়। বিপ্লবীরা এখানে ৩১৭০ টাকা পায়। ২১শে ফেব্রুয়ারী একটি ডাকাতি হয় ঢাকা জিলার আয়নাপুর গ্রামে, এখানে প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ ছিল ৭৫৯৩ টাকা। ২৩শে মে বিপ্লবীরা ঢাকার বিরঙ্গল নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া ৮০৮০ টাকা সংগ্রহ করে। ১১ই জুলাই ঢাকা জিলার পানাম নামক স্থানের ডাকাতিতে ২০ হাজার টাকা লুন্ঠিত হয়। অনুশীলন সমিতি ১৫ই জুলাই বাখরগঞ্জ জিলার প্রতাপপুর গ্রামের ডাকাতিতে ৭৫৯৫ টাকা এবং ১৪ই নভেম্বর ঢাকার নাঙ্গলবন্দ নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া ১৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। উপরোক্ত ডাকাতিগুলির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পিস্তল, রিভলভার বা বন্দুক ব্যবহার করা হয় এবং কেবলমাত্র নাঙ্গলবন্দের ডাকাতি সম্পর্কেই পুলিশ কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। তাহাদের মধ্যে মাত্র একজন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহা ব্যতীত অন্য সকল ডাকাতি সম্পর্কে পুলিশ যাহাদের গ্রেপ্তার করে তাহাদের সকলেই সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে মুক্তি পায়।

১৭ই এপ্রিল বাখরগঞ্জের কুশঙ্গল নামক স্থানে যে ডাকাতি হয় তাহা পর বৎসরের বিখ্যাত 'বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা'র সহিত জড়িত করা হইয়াছিল। এই ডাকাতিতে বিপ্লবীদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একজন সরকারী কর্মচারীর

একটি বন্দুক হস্তগত করা। ১৯শে এপ্রিল বাখরগঞ্জের কাকুড়িয়া নামক স্থানের ডাকাতি উপলক্ষে পুলিশ যাহাদের গ্রেপ্তার করে তাহাদের মধ্যে রজনী দাস নামক অনুশীলন সমিতির একজন সভ্য রাজসাক্ষী হইয়া সমিতির বহু গোপন তথ্য পুলিশের নিকট ফাঁস করে। তাহার বিবৃতি হইতে পুলিশ জানিতে পারে যে, বরিশালের গুপ্ত সমিতি ঢাকা অনুশীলন সমিতির একটি শাখাবিশেষ। বরিশালের গুপ্ত সমিতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা সংক্রান্ত সকল তথ্য এবং গুপ্ত সমিতির পরিচালক ও সভ্যদের তালিকাও পুলিশের হস্তগত হয়। এই সকল তথ্য সংগ্রহ করিবার সময় হইতে পুলিশ স্থানীয় গুপ্ত সমিতির মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে একটি বড় রকমের ষড়যন্ত্র-মামলা দাঁড় করাইবার চেষ্টা শুরু করে। পর বৎসর এই মামলাটি শুরু হয়। এই মামলাই 'বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত।

মাদারিপুর সমিতি

এই বৎসর নূতন একটি বৈপ্লবিক সমিতির সন্ধান প্রথম পাওয়া যায়। ইহা 'মাদারিপুর সমিতি' নামে খ্যাত। সম্ভবতঃ ইহা পূর্বেই অনেকটা স্বাধীনভাবে, অর্থাৎ বাংলাদেশের দুই প্রধান দল অনুশীলন বা যুগান্তর সমিতির অধীনে না থাকিয়া, ফরিদপুর জিলার মাদারিপুর শহরকে কেন্দ্র করিয়া স্থানীয় যুবকদের উদ্যোগে গঠিত হইয়াছিল। এই সমিতির আদর্শ ও কর্মপন্থা ছিল অনেকটা ঢাকার অনুশীলন সমিতির অনুরূপ। যুগান্তর বা অনুশীলন সমিতির মত এই সমিতিও রাজনৈতিক ডাকাতিকে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অপরিহার্য অংশস্বরূপ 'গেরিলা-যুদ্ধ' হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিল। এই নীতি অনুসারে তাহারা ১৯১২ খৃস্টাব্দে বড় বড় তিনটি 'গেরিলা-যুদ্ধ' করে—(১) জানুয়ারী মাসে বাইগুনতেয়ারীর ডাকাতি, (২) ফেব্রুয়ারী মাসে আয়নাপুরের ডাকাতি ও (৩) নভেম্বর মাসে কোলার পোস্ট-অফিস ডাকাতি। এই তিনটি ডাকাতিদ্বারা তাহারা প্রায় ১১ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। তাহারা এই সকল ডাকাতিতে আগ্নেয়াস্ত্র, মুখোস প্রভৃতি ব্যবহার করিয়াছিল

এবং "ডাকাতেরা সামরিক শিক্ষার পরিচয়ও দিয়াছিল"। তাহারা বোমা তৈরী করিতে জানিত। প্রথম দুইটি ডাকাতিতে তাহারা বোমা ফাটাইয়া গ্রামবাসীদের বিতাড়িত করিয়াছিল।

গুপ্ত হত্যা

১৯১২ খৃস্টাব্দের জুনমাসে অনুশীলন সমিতির নোয়াখালি শাখার সারদা-চরণ চক্রবর্তী নামক এক সভ্যকে সমিতির শৃঙ্খলা-বিরোধী কার্যের অপরাধে হত্যা করা হয়। সারদাচরণ সমিতির কয়েকটি রাইফেল কোন প্রকারে হস্তগত করিয়া নিজে একটি দল গঠনের প্রয়াস পায়। এই জন্য পার্টি হইতে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। পুলিশ যাহাতে এই নিহত ব্যক্তিকে সনাক্ত করিতে না পারে তাহার জন্য বিপ্লবীরা তাহার মৃতদেহ কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া একটি পুকুরে নিক্ষেপ করে। পরে সমিতির কয়েক জন সভ্য রাজসাক্ষী হইয়া ইহা পুলিশের নিকট ফাঁস করিয়া দেয়।

২৪শে সেপ্টেম্বর ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্যগণ রতিলাল রায় নামক এক হেড কনেস্টবলকে ঢাকা শহরের জনবহুল রাস্তায় সন্ধ্যা ৭টার সময় গুলি করিয়া হত্যা করে। রতিললাল পুলিশের বড় কর্তাদের নির্দেশে সমিতির কর্মীদের সকল সময় ছায়ার মত অনুসরণ করিত। বিপ্লবীরা এই "দুষ্ট ছায়া"টিকে অপসারিত করিয়া অন্যান্য গোয়েন্দাদের সতর্ক করিবার জন্য ইহাকে হত্যা করে। পুলিশ রতিলালের হত্যাকারীর সন্ধান পায় নাই।

১৩ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে 'মেদিনীপুর-বোমার মামলা'র তথ্যানুসন্ধানকারী গোয়েন্দা আব্দুর রহমানকে হত্যার জন্য তাহার গৃহে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ঐ রাত্রে রহমান গৃহে না থাকায় হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

* * * *

১৯১৩ খৃস্টাব্দ

ডাকাতি

১৯১৩ খৃস্টাব্দে বিপ্লবীরা অর্থ সংগ্রহের জন্য দশটি স্থানে ডাকাতি করে। এই সকল ডাকাতিদ্বারা মোট ৬১ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই

ডাকাতিগুলির মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ঢাকা জিলার ভরাকাইর নামক স্থানে যে ডাকাতি হয় তাহাতে ৩৪০০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করে, তাহাদের মধ্যে এক জনের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। ঐ তারিখে ময়মনসিংহের ধুধুলিয়া নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ৯ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ডাকাতির সময় গ্রামবাসীরা বিপ্লবীদের বাধা দিলে তাহারা গ্রামবাসীদের উপর গুলি ছুড়িতে বাধ্য হয় এবং তাহার ফলে একজন নিহত ও তিনজন আহত হয়। ৩রা এপ্রিল ডাকাতি হয় গোপালপুর নামক স্থানে। এই ডাকাতিতে প্রায় ৭ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং বিপ্লবীদের গুলিতে একজন আহত হয়। ২৯শে তারিখে অপর একটি ডাকাতি হয় ফরিদপুর জিলার কাওয়াকুরি নামক গ্রামে। ইহাতে ৫১৩০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৬ই আগস্ট ময়মনসিংহ জিলার কেদারপুর নামক স্থানে একটি ভীষণ ডাকাতি হয় এবং ইহাতে ১৯৮০০ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। এই ডাকাতির সময় গৃহের একব্যক্তি বাধা দিলে সে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ফিরিবার সময় গ্রামবাসীরা বাধা দিলে বিপ্লবীরা গুলি ছুড়িয়া আত্মরক্ষা করে, তাহাতে পাঁচজন গ্রামবাসী আহত হয়। ইহা ব্যতীত ২৪শে নভেম্বর ময়মনসিংহের সরাচর নামক স্থানে (৪৩৯০ টাকা), ৩রা ডিসেম্বর ত্রিপুরা জিলার খরমপুর নামক স্থানে (৬ হাজার টাকা) এবং ১৯শে ডিসেম্বর ত্রিপুরার পশ্চিমসিং নাম স্থানে (৩১০০ টাকা) উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হয়। সম্ভবতঃ ইহার সব গুলিই অনুশীলন সমিতিদ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুপ্ত হত্যা

১৯১৩ খৃস্টাব্দে আসামের শ্রীহট্ট জিলার ম্যাজিস্ট্রেট গর্ডনসাহেবের অত্যাচারে শ্রীহট্টবাসীরা অস্থির হইয়া প্রতিকারের পথ খুঁজিতেছিল। এই সময় বিপ্লবীরা এই অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিয়া ইংরেজ-শাসকদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। ২৭শে মার্চ এক সাহসী যুবক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া শ্রীহট্টের মৌলভীবাজারে গর্ডনসাহেবের বাগান-

বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করে। তাহার সঙ্গে ছিল একটি ভয়ংকর বোমা ও দুইটি রিভলভার। গর্ডন যাহাতে কোন প্রকারেই প্রাণ লইয়া পলাইতে না পারে তাহার জন্যই এত সাবধানতা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু বাগানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার সময় যুবকের হস্তস্থিত বোমাটি একটা ঝাকুনি লাগিয়া ফাটিয়া যায় এবং যুবকের দেহের উপরাংশ টুকরা টুকরা হইয়া ছড়াইয়া পড়ে। এই দুর্ঘটনার ফলে গর্ডনসাহেব সে যাত্রা বাঁচিয়া যান।

এপ্রিল মাসে বর্ধমান জিলার রাণীগঞ্জের এক গৃহের মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি না ফাটিবার ফলে কেহ হতাহত হয় নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাকালে হরিপদ দেব নামে কলিকাতার গোয়েন্দা-বিভাগের একজন কনেস্টবল যুগান্তর সমিতির দুই জন কর্মীর পশ্চাদনুসরণ করিতে করিতে মধ্য-কলিকাতার জনাকীর্ণ কলেজ-স্কোয়ারে প্রবেশ করে। হরিপদ পূর্ব হইতেই কোন প্রকারে বিপ্লবীদের অনেককে চিনিয়া ফেলিয়াছিল এবং তাহাদের পিছনে দিবা-রাত্র ঘুরিয়া তাহাদের অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে হরিপদ দুইজন বিপ্লবীর পিছনে থাকিয়া কলেজ-স্কোয়ারে প্রবেশ করিবামাত্র তাহারা একটা ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গিয়া পিছন হইতে তাহার পৃষ্ঠে গুলি করে এবং আবার ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়ে। হরিপদের গোয়েন্দাগিরির সাধ চিরতরে মিটিয়া যায়। পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও হত্যা-কারীদের কোন সন্ধান পায় নাই।

ময়মনসিংহের বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী ছিল পূর্ববঙ্গের পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগের একজন কুখ্যাত ইনস্পেক্টর। 'ঢাকা ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় এই লোকটি অনুশীলন সমিতির বিশেষ ক্ষতি সাধন করিয়াছিল। তাই সমিতি ইহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু দুই বারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩০শে সেপ্টেম্বর বঙ্কিম সন্ধ্যাকালে যখন বাড়ী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিল তখন তাহার সম্মুখে অকস্মাৎ একটা বোমা পড়ে। বোমাটি ভয়ংকর শব্দে ফাটিয়া যায় এবং বঙ্কিম সঙ্গে সঙ্গেই নিহত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই।

গত বৎসর মেদিনীপুরের কুখ্যাত গোয়েন্দা আব্দুর রহমানের হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর বিপ্লবীরা সেই চেষ্টা পরিত্যাগ করে নাই। এই বৎসর ৯ই ডিসেম্বর মুসলমানদের একটি ধর্ম-সক্রান্ত শোভাযাত্রা পরিচালনা কালে বিপ্লবীরা আবার বোমা নিক্ষেপ করে। কিন্তু উহা না ফাটিবার ফলে এই চেষ্টা এবারেও ব্যর্থ হয়। ৩০শে ডিসেম্বর হুগলী জিলার ভদ্রেশ্বর থানায় দুই জন পুলিশ-অফিসারকে হত্যা করিবার জন্য একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহা না ফাটিবার ফলে ঐ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা

পূর্ব-বৎসর বাখরগঞ্জ জিলায় পরপর কতকগুলি রাজনৈতিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় অনুসন্ধানের পর পুলিশ এই জিলার অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে বহু সংবাদ জানিয়া যায়। তখন হইতে একটি ষড়যন্ত্র-মামলা দাঁড় করিবার আয়োজন চলে। পূর্ব-বৎসর, অর্থাৎ ১৯১২ খৃস্টাব্দে নভেম্বর মাসের একটি ঘটনায় মামলার আয়োজন আরও কয়েক ধাপ আগাইয়া যায়। ১৯১২ খৃস্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর ঢাকার জনৈক এডিশনাল ম্যাজিস্ট্রেটের পুত্র গিরীন্দ্রমোহন দাস নামক অনুশীলন সমিতির এক সভ্যের নিকট হইতে অনুশীলন সমিতির বহু গোপন কাগজ-পত্র এবং বন্দুক-রিভলভারের বহু কার্তুজ, গান-পাউডার প্রভৃতি উদ্ধার করে। ইহার মধ্যে বাখরগঞ্জে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ডাকাতিতে লুণ্ঠিত অলংকারও হস্তগত হয়। কাগজ-পত্রের মধ্যে সমিতির সভ্যদের নাম-ধামও ছিল। এবার এই সকল প্রমাণাদি লইয়া পুলিশ ষড়যন্ত্র-মামলার আয়োজন করে। এই সম্পর্কে মোট ছাব্বিশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গিরীন্দ্র রাজসাক্ষী হয়। ১৯১৩ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি ডাকাতি, নরহত্যা, ষড়যন্ত্র এবং "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে উক্ত ছাব্বিশ জনকে লইয়া 'বরিশাল-ষড়যন্ত্র মামলা' শুরু হয়। উক্ত ছাব্বিশ জনের সকলেই ছিল ঢাকা অনুশীলন সমিতির বরিশাল-শাখার সভ্য। এই জন্যই এই মামলা 'বরিশাল ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত। এই মামলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, অভিযুক্ত ছাব্বিশ জনের

মধ্যে বারো জন ডাকাতি প্রভৃতির অভিযোগ স্বীকার করে। ইহাদের বারো বৎসর হইতে দুই বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয় এবং অন্য সকলে মুক্তিলাভ করে। এই ভাবে এই বিখ্যাত মামলার অবসান ঘটে।

রাজাবাজার বোমার মামলা

এই বৎসর নভেম্বর মাসে পুলিশ রাজাবাজার অঞ্চলে সার্কুলার রোডের একবাড়ী খানাতল্লাস করিয়া অমৃতলাল হাজরার ছদ্ম নামধারী শশাঙ্কমোহন ও অপর কয়েকজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ এই বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া বহু বৈপ্লবিক সাহিত্য ও বহু সিগারেটের টিন আবিষ্কার করে। বিপ্লবীরা এই টিনগুলি বোমার খোল হিসাবে ব্যবহার করিত। ইহা ব্যতীত এখানে অন্যান্য ধরনের বোমা তৈরীর সাজসরঞ্জামও পাওয়া যায়। শশাঙ্ক ও তাহার সঙ্গীদের লইয়া বোমা তৈরীর অভিযোগে এক মামলা শুরু হয়। এই মামলাই 'রাজা-বাজার বোমার মামলা' নামে খ্যাত। এই ধরনের সিগারেট-টিনের বোমা বাংলার সর্বত্র এখান হইতেই সরবরাহ করা হইত বলিয়া প্রমাণিত হয়। মামলার বিচারে বোমা তৈরীর অভিযোগে কেবল শশাঙ্কমোহনকে পনের বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯১৪ খৃস্টাব্দ

ডাকাতি

কলিকাতার গোয়েন্দা-পুলিশের কুখ্যাত ইনস্পেকটর নৃপেন্দ্র ঘোষ কলিকাতার বিপ্লবীদের সম্পর্কে তথ্যাদি অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। একদিন সন্ধ্যাকালে নৃপেন ঘোষ চিৎপুর-শোভাবাজার মোড়ে ট্রাম হইতে নামিবামাত্র কয়েকজন যুবক একত্রে তাহাকে গুলি করে। নৃপেন্দ্রের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। তাহার দেহরক্ষী পুলিশটিও বিপ্লবীদের পশ্চাৎ-ধাবন করিয়া গুলির আঘাতে নিহত হয়। বিপ্লবীরা অসংখ্য লোকের ভিড়ের মধ্য দিয়া পলাইয়া যায়। ইতিমধ্যে কয়েকজন পুলিশ

গোলমাল শুনিয়া দৌড়াইয়া আসে এবং পাড়ার কয়েক জন গুণ্ডার সাহায্যে এক যুবককে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকটি নির্মলকান্ত রায় নামে কলেজের একটি ছাত্র। এবার নির্মলকে লইয়া হাইকোর্টে জুরির বিচার হয়। নির্মলের পক্ষ সমর্থন করেন সেই সময়ের বিখ্যাত ব্যারিস্টার নর্টনসাহেব। জুরিরা নির্মলকে নির্দোষ বলিয়া রায় দেয়, কিন্তু জজসাহেব পুনর্বিচারের আদেশ দেন। এবারের বিচারেও জুরিরা নির্দোষ বলিয়া রায় দিলে নির্মল মুক্তিলাভ করে।

চট্টগ্রামের সত্যেন সেন নামক এক ব্যক্তি পুলিশের বেতনভোগী গুপ্তচর হিসাবে বিপ্লবীদের পিছনে ছায়ার মত ঘুরিত। তাহার জ্বালায় বিপ্লবীদের কাজে বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়। ১৯শে জুন চট্টগ্রাম শহরের রাজপথে বিপ্লবীরা তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। রামদাস নামক এক ব্যক্তি প্রথমে ছিল গুপ্ত সমিতির সভ্য, পরে সে পুলিশের সহিত যোগ দিয়া বিপ্লবীদের যথেষ্ট ক্ষতি সাধন করে। এই ব্যক্তি কুখ্যাত ডেপুটি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বসন্ত চাটার্জির সহিত ঘোরাফেরা করিত। ১৯শে জুলাই তারিখ রামদাস ও বসন্ত চাটার্জি একত্রে ঢাকার বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রিজের উপর দিয়া যাইবার সময় লুক্কায়িত বিপ্লবীদের রিভলভার গর্জিয়া উঠে। রামদাস ধরাশায়ী হয়, কিন্তু বসন্ত চাটার্জি জলে ঝাঁপাইয়া কোন রকমে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলেও রামদাসের হত্যাই এই কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট-এর মৃত্যুর নোটিশ হইয়া থাকে। এই নোটিশ পুনরায় জারি করাও হইয়া যায়। ২৫শে নভেম্বর সন্ধ্যাকালে বসন্ত চাটার্জি কলিকাতার এক বাড়ীতে বসিয়া যখন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন তখন সেই ঘরে বোমা পড়ে, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি বাহিরে গিয়াছিলেন বলিয়া সেবারেও তিনি প্রাণে বাঁচিয়া যান।

'রডা' কোম্পানির মশার-পিস্তল চুরি

'রডা-কোম্পানি' বিদেশ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আমদানি করিয়া এদেশে ব্যবসায় করিত। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ দিকে এই কোম্পানি বিদেশ হইতে 'মশার' নামক পিস্তলের বড় একটা চালান আনে। মশার-পিস্তল

একটা ভয়ংকর আগ্নেয়াস্ত্র, ইহার অংশ বিশেষ খুলিয়া ইহাকে পিস্তল হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, আবার ঐ অংশটি জুড়িয়া ইহাকে রাইফেলের মতও ব্যবহার করা চলে। এই জন্যই বরাবর এই পিস্তলের উপর বিপ্লবীদের লোভ ছিল। কোম্পানির মালপত্র কাস্টমস্-অফিস হইতে খালাস করিয়া অফিসের গুদামে লইয়া আসিবার ভার ছিল একজন বাঙ্গালী কর্মচারীর উপর। ২৬শে আগস্ট ঐ কর্মচারীটি কাস্টমস্-অফিস হইতে মশার পিস্তল ও উহার গুলিপূর্ণ ২০২টি বাক্স বুঝিয়া লয় এবং উহা হইতে মাত্র ১৯২টি বাক্স অফিসের গুদামে লইয়া আসে। তাহার পর বাকী বাক্সগুলি আনিবার অজুহাত দিয়া কর্মচারীটি পুনরায় রাস্তায় বাহির হয়। বলা বাহুল্য, কর্মচারীটি আর অফিসে ফিরিয়া যায় নাই এবং মশার-পিস্তলের পঞ্চাশটি বাক্স বিপ্লবীদলের হস্তগত হয়। সিডিসন-কমিটির ধারণা যে, যুগান্তর সমিতির অন্তর্ভুক্ত বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর দলের দ্বারাই এই কার্যটি সম্পন্ন হইয়াছিল। পরে এই অপহৃত মশার-পিস্তলগুলি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সমিতির নিকট বিলি করা হয়। পশ্চিম-বঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালিত যুগান্তর সমিতি, সতীশ চক্রবর্তীর পরিচালিত চন্দননগরের যুগান্তর-শাখা, বিপিন গাঙ্গুলীর পরিচালিত যুগান্তর-শাখা, মাদারীপুর সমিতি, ঢাকা ও বরিশালের অনুশীলন সমিতি প্রভৃতি নয়টি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান এই অস্ত্রগুলি লাভ করিয়াছিল এবং তখন হইতে প্রায় প্রত্যেকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে এইগুলি ব্যবহৃত হইয়াছিল। 'সিডিসন কমিটি'র মতে :

"পুলিশ যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, অপহৃত পিস্তলগুলির মধ্যে চৌচল্লিশটি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের নয়টি বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল এবং ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এইভাবে বিলি-করা পিস্তলগুলি ১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের পর অনুষ্ঠিত চুয়ান্নটি ডাকাতি ও নরহত্যায়, অথবা ডাকাতি ও নরহত্যার চেষ্টায় ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহা অনায়াসে বলা চলে যে, ১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের পর এমন বৈপ্লবিক ঘটনা খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়াছে যাহাতে 'রডা-কোম্পানি'

হইতে অপহৃত মশার-পিস্তলগুলি ব্যবহৃত হয় নাই। পরে পুলিশের প্রাণপণ চেষ্টার ফলে অপহৃত পিস্তলগুলির একত্রিশটি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে উদ্ধার করা সম্ভব হইয়াছিল।"(১)

পরবর্তীকালে 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার' সম্পর্কিত রিপোর্টে বলা হয় যে, পঞ্চাশটি মশার-পিস্তল বাংলা-সরকারকে প্রায় অচল করিয়া তুলিয়াছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে য়ুরোপের রাষ্ট্রগুলি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু করে। এই বিশ্বযুদ্ধে বৃটিশ-শক্তি জড়াইয়া পড়িবার ফলে বিপ্লবীদের সম্মুখে এক অভাবনীয় সুযোগ দেখা দেয়। সারা ভারতের বিপ্লবীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া ভারতের স্বাধীনতা উদ্ধারের জন্য দেশব্যাপী এক সশস্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। তাহারা এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ে বৈদেশিক সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা শুরু করিয়া দেয়। তাহাদের এই নূতন উদ্যম ও কর্ম-প্রচেষ্টা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করে।

১৯১৫ খৃস্টাব্দ

যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব

১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার সময় হইতেই যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উপর যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে ন্যস্ত হয়। এই দায়িত্ব পালন করিয়া যতীন্দ্রনাথ বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছেন।

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন নদীয়া জিলার কয়া নামক গ্রামের লোক। যখন কলিকাতায় অনুশীলন-সমিতি নামে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়

(১) Sedition Committee Report, P. 65.

তখন হইতেই তিনি ইহার সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৬ খৃস্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসের সময় যখন 'নিখিল বঙ্গ বৈপ্লবিক সম্মেলন' হইয়াছিল তখন তিনি সেই সম্মেলনে প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে কেবল-মাত্র দৈহিক শক্তিদ্বারা এক ব্যাঘ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে হত্যা করায় তিনি সহকর্মীদের নিকট হইতে "বাঘা যতীন" আখ্যা লাভ করেন। আলিপুর-ষড়যন্ত্রমামলায় অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রভৃতির কারাদণ্ডের পর যুগান্তর সমিতির প্রধান পরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন উক্ত সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অবিনাশ চক্রবর্তী।(১) তিনি যতীন্দ্রনাথকে তাঁহার সহকারীরূপে গ্রহণ করিয়া সমিতির কার্য পরিচালনা করিতেন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইবার পর যখন বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন জোয়ার দেখা দেয় তখন অবিনাশ চক্রবর্তী মহাশয় যুগান্তর সমিতির সকল প্রধান কর্মীদের ডাকিয়া বলেন, "তোমাদের মধ্যে যতীনই best man (সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক), সে-ই নেতৃত্ব গ্রহণ করুক।"(২) ইহার পূর্বেই যতীন্দ্রনাথ এই গুরু দায়িত্ব বহনের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছিলেন। তাই তাঁহার নেতৃত্ব সকলে এক বাক্যে মানিয়া লয়। সমিতির মধ্যে, এমনকি কলিকাতার অনুশীলন সমিতির মধ্যেও, দলীয় বিবাদ-বিসংবাদ যতই থাকুক না কেন, যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্ব মানিয়া লইতে কাহারও আপত্তি ছিল না। এবার যতীন্দ্রনাথ দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমেই যতীন্দ্রনাথ বিচ্ছিন্ন কর্মীদের ও সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ ও পুনর্গঠিত করিতে শুরু করেন। আলিপুর-মামলার পর যুগান্তর সমিতি বহু অংশে ভাগ হইয়া গিয়াছিল, যতীন্দ্রনাথের চেষ্টায় সেই অংশগুলির মধ্যে যাহাতে অন্ততঃ কার্যক্ষেত্রে সহযোগিতা চলে তাহার ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থানুসারে বিপিন গাঙ্গুলি, অনুকূল মুখার্জি প্রভৃতির দলগুলি সাংগঠনিক স্বাধীনতা বজায় রাখিলেও কার্যক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের পরিচালিত যুগান্তরের মূল অংশের সহিত সহযোগিতা

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃ: ১৩১।

(২) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃ: ১১৬।

করিত। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথের অন্যতম কাজ হইল বৈপ্লবিক সংগঠনগুলিকে বিভিন্ন দোষ হইতে মুক্ত করা। একার্যে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ(১) তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করেন এবং তাঁহার সহায়তায় যতীন্দ্রনাথ একার্যেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেন।

'হাওড়া ষড়যন্ত্র-মামলা" হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর যতীন্দ্রনাথ সরকারী চাকুরি হইতে পদচ্যুত হন। ইহার পর তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার চেষ্টায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও উহার অন্তর্ভুক্ত দলগুলি ব্যতীত অন্য সকল দলের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দেই কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতির বিভিন্ন অংশ, পূর্ণদাসের পরিচালিত মাদারীপুর-সমিতি, ময়মনসিংহের যুগান্তর-শাখা, উত্তর-বঙ্গের যুগান্তর ও অনুশীলন-শাখা প্রভৃতি তাঁহার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। এই সময়ে তিনি যে-সকল সহকর্মীদের সহযোগিতা লাভ করেন তাঁহাদের মধ্যে ময়মন-সিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ; মাদারীপুরের পূর্ণদাস; বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, মনোরঞ্জন গুপ্ত, নরেন ঘোষ; উত্তর-বঙ্গের যতীন রায়, যোগেন দে-সরকার; খুলনার সতীশ চক্রবর্তী; যশোহরের বিজয় রায়; কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণার নরেন ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, অতুল ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যতীন্দ্রনাথ ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে অপর চারিজন সঙ্গীসহ ইংরেজদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন।(২)

(১) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ—ইহার পূর্বনাম দেবব্রত বসু, ইনি ছিলেন যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম।

(২) [illegible] বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের পূর্ণ বিবরণ 'বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ঢাকা অনুশীলন সমিতি

১৯১০ খৃস্টাব্দের 'ঢাকা-ষড়যন্ত্রমামলা' ও ১৯১৩ খৃস্টাব্দের 'বরিশাল-ষড়যন্ত্র মামলা'র পর পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতি বিশেষভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে। সমিতির প্রধান পরিচালক পুলীনবিহারী পূর্বেই সাত বৎসরের দীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারান্তরালে চলিয়া গিয়াছেন। তখন এই সমিতির ঘোর দুর্দিন চলিতেছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতিও নবোদ্যমে কাজ শুরু করে। পুলীনবিহারীর গ্রেপ্তারের পর প্রধান পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন গিরিজাবাবু। ইঁহার প্রকৃত নাম 'নগেন্দ্রনাথ দত্ত', ইনি শ্রীহট্টের লোক। গিরিজা বাবুর চেষ্টায় সমিতি পুনর্গঠিত হইয়া বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে। মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর এই সমিতি কেবল পূর্ব-বঙ্গের সীমার মধ্যেই নিজ কর্ম-প্রচেষ্টা নিবদ্ধ রাখিল না, ইহার পরিচালকগণ এক সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্যে এক নূতন পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতব্যাপী একটা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজনের উদ্দেশ্য লইয়া সমিতির বাছা বাছা প্রায় দুই শত কর্মী বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। অনুশীলন সমিতির কর্মীরা বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ, ও পাঞ্জাব প্রদেশে নূতন গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু করিয়া দেন।

ডাকাতি

১৯১৫ খৃস্টাব্দ হইতে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অভূতপূর্বরূপে বৃদ্ধি পাইবার ফলে বিপ্লবীদের প্রচুর অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। ডাকাতি ব্যতীত এই অর্থ সংগ্রহের অন্য কোন উপায় ছিল না। তাহারা ডাকাতিদ্বারা দেশের ধনীদের অর্থ কাড়িয়া লইয়া তাহাদ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করে। এই জন্য এই বৎসর অসংখ্য রাজনৈতিক ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উপায়ে বিপ্লবীরা এই বৎসর মোট এক লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। এই সময়ে অনুষ্ঠিত কয়েকটি ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য

১৯১৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কলিকাতার যুগান্তর সমিতি গার্ডেনরিচ্-এ, 'বার্ড-কোম্পানির' গাড়ী হইতে ১৮ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাতি সম্পর্কে একজনের সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারী উক্ত সমিতি বেলিয়াঘাটায় এক চাউল-ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতি করিয়া পায় ২২ হাজার টাকা। এই ডাকাতিতে একজন ট্যাক্সি-চালক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই সমিতি আর একটি বড় রকমের ডাকাতি করে ২রা ডিসেম্বর। কলিকাতার কর্পোরেশন স্ট্রীটে এই ডাকাতি অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহাতে ২৫ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে একজনের তের বৎসর, একজনের দুই বৎসর ও আর একজনের এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই তিনটি ডাকাতিই অনুষ্ঠিত হয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও পরিচালনায়। প্রথম দুইটিতে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর পরিচালনায় ৬ই এপ্রিল আড়িয়াদহে ও ২রা আগস্ট আগরপাড়ায় দুইটি ডাকাতি হয়। দ্বিতীয়টিতে বিপিনবিহারী স্বয়ং একটি রিভলভারসহ ধরা পড়েন।

১৯১৫ খৃস্টাব্দে পূর্ব-বঙ্গে যে সকল ডাকাতি হয় তাহার মধ্যে চারিটি ডাকাতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ৫ই জুন বাখরগঞ্জের গাজীপুর নামক স্থানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ১৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। ১৪ই আগস্ট ত্রিপুরা জিলার হরিপুর গ্রামের ডাকাতিতে তাহারা ১৮ হাজার টাকা লাভ করে। ৭ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহ জিলার চন্দ্রকোনা নামক স্থানের ডাকাতিতে ২১ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয় এবং ২৯শে ডিসেম্বর ত্রিপুরা জিলার কারতলা নামক স্থানের ডাকাতিদ্বারা ১৫ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়। এই চারিটি ডাকাতিতেই বিপ্লবীদের গুলিতে একজন বা দুজন করিয়া লোক নিহত হয়।

গুপ্ত হত্যা

১৯১৫ খৃস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পাথুরিয়াঘাটার এক বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী নিরোদ হালদার নামক এক গোয়েন্দা অকস্মাৎ যতীন্দ্রনাথের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকে। সে এমন ভাব দেখায় যেন সে যতীন্দ্রনাথকে চিনিতে পারিয়াছে এবং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে। গোয়েন্দাটি সত্যই যতীন্দ্রনাথকে এবং তাঁহার সঙ্গীদের চিনিতে পারিয়াছিল। সুতরাং ইহাকে ছাড়িয়া দিলে বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা বুঝিয়া যতীন্দ্রনাথ নিজেই তাহাকে গুলি করেন। বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্রনাথের গুলিতে দুঃসাহসী গোয়েন্দা নিরোদ হালদারের গোয়েন্দা-লীলার অবসান হয়।

১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কনভোকেশন' উপলক্ষে বড়লাটসাহেবের আসিবার কথা ছিল। বড়লাটসাহেবের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবার ভার পড়ে পুলিশ-ইনস্পেকটর সুরেশ মুখার্জির উপর। সুরেশ মুখার্জি ইতিপূর্বে বিপ্লবীদের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বিপ্লবীরা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। 'কনভোকেশন'-উৎসবে সুরেশ মুখার্জি যখন পুলিশি ব্যবস্থা দেখাশুনা করিতেছিল ঠিক সেই সময়ে যতীনাথের সহকর্মী ও পূর্বে এক গুপ্তচর-হত্যার জন্য ফেরারী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী অকস্মাৎ সেই স্থানে উপস্থিত হন। তাহাকে দেখিয়াই ইনস্পেক্টর-সাহেবের ফেরারী আসামী ধরিবার উৎসাহ জাগিয়া উঠে, সুরেশ মুখার্জি চিত্তপ্রিয়কে ধরিবার জন্য অগ্রসর হইবামাত্র চিত্তপ্রিয় তাহাকে গুলি করেন। নিকটেই আরও চারি জন বিপ্লবী অপেক্ষা করিতেছিল, তাহারাও আসিয়া চিত্তপ্রিয়ের সহিত রিভলভার হস্তে যোগ দেয়। চারিটি বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত সুরেশ মুখার্জির প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। বিপ্লবীরা নিরাপদে পলায়ন করিতে সক্ষম হয়।

কুমিল্লা জিলা-স্কুলের হেড মাস্টার শরৎকুমার বসু ও তাঁহার ভৃত্য বিপ্লবীদের

বিরুদ্ধে পুলিশকে সাহায্য করিবার অপরাধে ৩রা মার্চ তারিখে নিহত হয়। ২৫শে আগস্ট চব্বিশ পরগণার মুরারীমোহন মিত্র নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেয়। এই ব্যক্তি চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন ডাকাতি সম্বন্ধে পুলিশকে বিপ্লবীদের সংবাদ দিয়াছিল। ১৯শে অক্টোবর ময়মনসিংহের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যতীন্দ্রনাথ ঘোষ বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হয়।

২১শে অক্টোবর রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় মসজিদবাড়ী স্ট্রিটের একঘরে বসিয়া পুলিশ-ইনস্পেক্টর সতীশ ব্যানার্জি দুই জন দারোগার সহিত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। অকস্মাৎ সেই ঘরের দরজায় এক যুবক উপস্থিত হইয়া পিস্তল হইতে গুলি ছুড়িতে থাকে। তাহারা সকলে প্রাণের ভয়ে বারান্দায় দৌড়াইয়া যায়। পিস্তলধারী যুবকদের সহিত আরও কয়েকজন আসিয়া যোগদান করে এবং তাহারাও গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে পুলিশ কর্মচারীদের পিছু-তাড়া করে। এই গুলি চালনার ফলে একজন দারোগা নিহত ও একজন আহত হয়। ইনস্পেকটর সতীশ ব্যানার্জি বাঁচিয়া যান।

৩০শে নভেম্বর সারপেণ্টাইন লেনে একজন কনেস্টবল ও অপর এক ব্যক্তিকে বিপ্লবীরা হত্যা করে। ১৯শে ডিসেম্বর ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস নামক একব্যক্তি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই ব্যক্তি পূর্বে ছিল বাজিতপুরের গুপ্ত সমিতির একজন সভ্য, সে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া পুলিশকে সাহায্য করিত।

উত্তর-বঙ্গে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ

১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী পঁচিশ জন যুবক মশার-পিস্তল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া রংপুর জিলার কুর্ণুল নামক স্থানে এক ধনী ব্যবসায়ীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ৫০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। বিপ্লবীরা তাহাদের পরিচয় গোপন করিবার জন্য মুখোস ধারণ করিয়াছিল।

এই ডাকাতি সম্পর্কে তদন্ত করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের পুলিশের ডেপুটি ইনস্পেক্টর-জেনারেল, রংপুর জিলার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও তাহার সহকারী রংপুরে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাকালে

তাঁহারা সকলে পরামর্শ করিতেছিলেন, এমন সময় চারিজন যুবক মশার-পিস্তল ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া তাহাদের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হয়। তাহাদের দুইজন ঘরে ঢুকিয়াই সহকারী সুপারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। তিনি কোন প্রকারে পলাইয়া যান, কিন্তু তাহার ভৃত্য নিহত হয়।

২০শে ফেব্রুয়ারী প্রায় চল্লিশ জন মুখোসধারী যুবক রিভলভার-পিস্তল প্রভৃতি লইয়া রংপুরে এক দুশ্চরিত্র মহাজনের গৃহে প্রবেশ করিয়া ৫ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঘটনায় বিপ্লবীরা মশার-পিস্তল ব্যবহার করিয়াছিল, কারণ প্রত্যেকটি ঘটনাস্থলেই ঐ পিস্তলের খালি কার্তুজ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়। পুলিশের অনুমান, এই সকল কর্ম উত্তর-বঙ্গের অনুশীলন সমিতিদ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

* * * * *

মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় জাতীয় আন্দোলন

১৯১২ খৃস্টাব্দের শেষভাগ হইতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া পড়ে। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বাংলদেশের আন্দোলন প্রায় বন্ধ হইয়া আসে। কংগ্রেস আপস-পন্থীদের কবলে পড়িয়া একটা বার্ষিক মজলিশে পরিণত হয়।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এক বিপুল জাগরণ দেখা দেয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের রুশ-জাপান যুদ্ধে রুশিয়ার পরাজয় ভারতের জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করিয়াছিল যে, য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অপরাজেয় নহে, সুতরাং বৃটিশ-শক্তিকেও পরাজিত করা সম্ভব। মহাযুদ্ধের প্রথম হইতে সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠে। যুদ্ধের অনিবার্য ফলস্বরূপ জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য আরও বাড়িয়া গেল। তাহার ফলে এক বিরাট গণ-আন্দোলন মাথা তুলিতে থাকে। এই নূতন গণ-জাগরণের মধ্যে কয়েকটি নূতন বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়। এতদিন জাতীয় আন্দোলন কেবলমাত্র ভারতের শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান-নেতৃবৃন্দ বৃটিশের সহিত সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করায় মুসলমান-জনসাধারণ এতদিন আন্দোলন হইতে দূরে সরিয়াছিল। এবার যুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতে বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সমাবেশের ফলে মুসলমান-নেতৃবৃন্দ বৃটিশের সহিত সহযোগিতার পন্থা ত্যাগ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের সহিত সহযোগিতা করিতে শুরু করেন। ইহার ফলে মুসলমান-মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণও ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করে। তখন হইতে স্বায়ত্ত শাসন যেমন জাতীয়তাবাদী নেতাদের প্রধান দাবি হইয়া দাঁড়ায়, তেমনি মুসলমানগণও ইহাকে প্রধান দাবি বলিয়া গ্রহণ করে। এই দাবির উপর ভিত্তি করিয়াই ১৯১৬ খৃস্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার উনিশ জন বে-সরকারী হিন্দু-মুসলমান সদস্য দেশের ভাবী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব কাউন্সিলে পেশ করেন তাহা লইয়া দেশের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি হইয়াছিল।

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেস ছিল সম্পূর্ণরূপে আপস-পন্থীদের দখলে। উক্ত দাবি লইয়া এখন আন্দোলন শুরু করিলে যুদ্ধের ফলে বিপন্ন বৃটিশ-শক্তি আরও বিপন্ন হইবে—এই মনে করিয়া তাঁহারা আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন। এমনকি তাঁহারা পূর্ব হইতে আরও বেশী করিয়া বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতা শুরু করিয়া দেন।

কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের আপস-পন্থী নেতৃত্ব সংগ্রাম বন্ধ রাখিলেও সেই নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করিয়াই সংগ্রাম গড়িয়া উঠিতে থাকে। এখন হইতে জাতীয় সংগ্রাম দুইটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়া বৃটিশ-শাসনকে সত্যই বিপন্ন করিয়া তোলে। তাহার একটি এ্যানি বেশান্ত, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতির নেতৃত্বে "হোমরুল" বা স্বায়ত্ত শাসনের দাবি লইয়া সারা ভারতকে চঞ্চল করিয়া তোলে, এবং অপরটি পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য বৈপ্লবিক প্রচেষ্টারূপে ভারতের বৃটিশ-শাসনকে চরম আঘাত দিতে উদ্যত হয়।

১৯১৪ খৃস্টাব্দে এ্যানি বেশান্ত ভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করিয়াই জাতীয় আন্দোলনের বিভিন্ন দল ও নেতাদের মিলনের চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু

এই চেষ্টা তখন সফল হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তাহার পর তিনি মাদ্রাজে 'হোমরুল-লীগ' প্রতিষ্ঠা করিয়া "হোমরুল" বা স্বায়ত্ব শাসনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে, ১৯১৪ খৃস্টাব্দের জুন মাসে, কারাদণ্ড ভোগ করিয়া তিলক কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি পুনরায় রাজনীতিতে যোগদান করিয়া বোম্বাইয়ে 'ন্যাশনাল লীগ' স্থাপন করিয়া পৃথক ভাবে "হোমরুল"-এর পক্ষে ব্যাপক আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতে আসিয়া এই 'হোমরুল'-আন্দোলনে যোগদান করিবার ফলে এই আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে।

এই ভাবে একদিকে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রাম ও অপর দিকে 'হোমরুল'-দাবি লইয়া জাতীয় আন্দোলন সারা দেশকে চঞ্চল করি তোলে। সংগ্রামের চাঞ্চল্য কংগ্রেসের আপস-পন্থী নেতৃবৃন্দকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে দিল না। কংগ্রেসের একাংশের মধ্যেও সংগ্রামের মনোভাব দেখা দেয়। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে এই অবস্থার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সকল মতের ও সকল সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকিয়া শাসন-সংক্রান্ত দাবির একটি খসড়া তৈরী করেন। পরে মুসলীম লীগ উহা অনুমোদন করিলে কংগ্রেস ও লীগ একত্রে ঐ খসড়া ভারত-সরকারের নিকট পেশ করে। কিন্তু এই নেতাদের বেশীর ভাগের মনোভাব ছিল এই যে, যত দিন যুদ্ধ চলিবে তত দিন শাসকদের বিপদগ্রস্ত করা উচিত নয়। এমনকি তিলকও তখন এই মত সমর্থন করিতেন।

শাসকগণ এই দাবি সম্পর্কে পরে বিবেচনা করিবার মামুলী আশ্বাস দিয়া তাহাদের পূর্ব-নীতিই অব্যাহতভাবে চালাইয়া যায়। তাহারা বিভিন্ন উপায়ে আপস-পন্থী নেতৃবৃন্দকে আরও বেশী করিয়া নিজেদের দিকে টানিয়া লইতে থাকে এবং অপর দিকে সংগ্রাম-পন্থী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনের উপর দমননীতি চালাইতে শুরু করে। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের মার্চমাসেই 'ভারতরক্ষা-আইন' পাশ হইয়া গিয়াছিল। এই আইন অনুসারে সরকার যাহাকে বিপজ্জনক বলিয়া

মনে করিবে তাহাকেই গ্রেপ্তার, আটক বা অন্তরীণ করিবার ক্ষমতা গ্রহণ করে। এই আইন অনুসারে বিশেষ ট্রাইবুনালের বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপীল চলিত না।

১৯১৫ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতেই 'ভারতরক্ষা-আইন'-এর প্রয়োগ শুরু হয়। এই বর্বরসুলভ আইনের কবলে পড়িয়া বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের শত শত যুবক বিনাবিচারে আটক হইল। যাঁহারা কেবল মাত্র 'হোমরুল'-এর দাবি লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন তাঁহারাও এই আইনের কবল হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। "রাজদ্রোহ"মূলক বক্তৃতার জন্য তিলকের নিকট চল্লিশ হাজার টাকা জামিন স্বরূপ দাবি করা হইল। মুসলীম নেতা মহম্মদ আলি এবং সৌকত আলিও কারাগারে বিনাবিচারে আবদ্ধ হইলেন। দমন-নীতির দাপটে জাতীয় আন্দোলন নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কিন্তু সরকারী দমন-নীতির বিভীষিকা যতই বাড়িয়া যাইতে থাকে ততই বৃটিশ-শাসনকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঝড় বৃটিশ-শাসনকে কাঁপাইয়া তোলে।

১৯১৬ খৃস্টাব্দ

ডাকাতি

১৯১৫ খৃস্টাব্দের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর চারিদিকে বহু মামলা শুরু হওয়ায় অর্থের প্রয়োজনও বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যুগান্তর সমিতি অর্থের জন্য বড় বড় ডাকাতি করিতে বাধ্য হয়। ১৯১৬ খৃস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী, কলিকাতার যুগান্তর সমিতির পুলীন মুখার্জি ও অতুল ঘোষের(১) নেতৃত্বে বিপ্লবীরা হাওড়ায় একটি ডাকাতি করিয়া ৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। এই সময় তাহারা আর একটি ডাকাতি করিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। বিপিন

(১) ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বরে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হইলে পুলীন মুখার্জি ও অতুল ঘোষ একত্রে যুগান্তর সমিতির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

গাঙ্গুলীর দলের সভ্যগণ হাওড়া জিলার একটি গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ২ হাজার টাকা পায়। এই ডাকাতির সূত্র ধরিয়া পুলিশ বিভিন্ন স্থানে খানা-তল্লাসী করে এবং তার ফলে বিপিন গাঙ্গুলীর দল ও বরিশালের যুগান্তর-শাখার বহু সভ্য গ্রেপ্তার হইয়া 'ভারতরক্ষা-আইন'-এ আবদ্ধ হয়। এই সময় যুগান্তর সমিতি একটি বড় রকমের ডাকাতি করে কলিকাতার গোপী রায় লেনে। ২৬শে জুন কয়েকজন যুবক একধনী ব্যক্তির গৃহে প্রবেশ করিয়া নগদে ও অলংকারে ১১৫০০ টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাতির পর যুগান্তরের অন্যতম পরিচালক পুলীন মুখোপাধ্যায় গ্রেপ্তার ও আটক হন। ইহার পর পুলিশ অন্যতম পরিচালক অতুল ঘোষকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে থাকে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ সালখিয়ার এক বাড়ীতে হানা দিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু অতুল ঘোষ সেখান হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হন। ইহার পর যুগান্তর সমিতির চরম দুর্দিন শুরু হয়।

১৯১৫ খৃস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর দমন-নীতির আঘাতে পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতি দুর্বল হইয়া পড়িলেও পূর্ব-বঙ্গের অনুশীলন সমিতির শক্তি প্রায় অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সমিতি উহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অব্যাহতভাবেই চালাইয়া যায়। সমিতি উহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার কাজে ব্যস্ত হইয়া উঠে। সুতরাং অর্থের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য উহার সভ্যগণ পূর্ব-বঙ্গে কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি করে।

সমিতির সভ্যগণ ত্রিপুরা জিলার গণ্ডোরা গ্রামে ডাকাতি করিয়া ১৪৭০০ টাকা সংগ্রহ করে। এখানে বিপ্লবীদের গুলিতে এক ব্যক্তি আহত হয়। এই সম্পর্কে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া এক মামলা শুরু করে এবং মামলার বিচারে এক ব্যক্তির চারি বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৩০শে এপ্রিল আর একটি ডাকাতি হয় ত্রিপুরা জিলার নাটঘর গ্রামে। এই ডাকাতিতে ১৭৫০০ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয় পুলিশ এই ডাকাতি সম্পর্কে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। তাহাদের মধ্যে ছয় জন পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করে। ৯ই জুন বিপ্লবীরা ফরিদপুর জিলার ধানুকাঠি গ্রামে ডাকাতি করিয়া ৪৩ হাজার

হাজার টাকার হুণ্ডি লইয়া যায়। ২রা সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা জিলার সাহাপতুয়া নামক এক গ্রামের ডাকাতিতে ৩৩৭০ টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই বছরে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডাকাতি হয় ময়মনসিংহ জিলার সাহিদেও নামক স্থানে। ১৭ই অক্টোবর রাত্রিকালে বিপ্লবীরা মশার-পিস্তল, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া এক মুসলমান-ব্যবসায়ীর গৃহ আক্রমণ করিয়া ৮০ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। মুসলমান-ব্যবসায়ীটি বাধা দিতে গিয়া বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহা ব্যতীত ফরিদপুর ও ত্রিপুরা জিলায় আরও কয়েকটি বড় বড় ডাকাতি হয়। ফরিদপুরের একটি ডাকাতিতে সাত জন স্কুলের ছাত্র ধরা পড়িয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই সময়ে উত্তর-বঙ্গেও কয়েকটি ডাকাতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুপ্ত হত্যা

১৯১৬ খৃস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী মেডিকাল কলেজের উল্টা দিকে কলেজ-স্কোয়ারের মধ্যে সকাল দশটার সময় মধুসূদন ভট্টাচার্য নামক পুলিশের এক দারোগা বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই সময় কলেজ-স্কোয়ারের মধ্যে বহুলোক বেড়াইতেছিল। সেই ভিড়ের মধ্যে থাকিয়া দুই জন যুবক মশার-পিস্তল ও একটি রিভলভার হইতে তিনটি গুলি করে। বিপ্লবীরা কাজ শেষ করিয়া পলাইবার সময় বহুলোক তাহাদের পিছু তাড়া করিলে তাহারা বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষণ করিয়া ধূম্রজালের আড়ালে পলায়ন করে। বহু অনুসন্ধানের পর পুলিশ পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া 'ভারতরক্ষা-আইন'এ আটক করে। এই সম্পর্কে আর একজন যুবক একটি মশার-পিস্তলসহ গ্রেপ্তার হয়। 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে এই যুবককে বরিশাল-দলের পরিচালক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৯শে জানুয়ারী ময়মনসিংহ জিলার বাজিৎপুর নামক স্থানে শশিভূষণ চক্রবর্তী নামক এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সাহায্য করিবার অপরাধে নিহত হয়। জুন মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতির একদল সভ্য কলিকাতায় আসিয়া কয়েকজন অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীকে হত্যা করিবার

পরিকল্পনা করে। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত নামক এক দারোগা বিশেষ করিয়া অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে অনুসন্ধান-কার্যে নিযুক্ত ছিল। জুন মাসের গোড়ার দিকে এই দারোগাকে হত্যা করিবার জন্য সমিতির তিন জন সভ্যকে নিযুক্ত করা হয়। দুইবার এই দারোগাকে হত্যা করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ৩০শে জুন কলিকাতার সি-আই-ডি পুলিশের কুখ্যাত ডেপুটি সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়কে বিপ্লবীরা গুলি করিয়া হত্যা করে। এই পুলিশ-কর্মচারীকে হত্যা করিবার জন্য প্রায় সকল দলই দীর্ঘকাল ধরিয়া চেষ্টা করিতেছিল। ঢাকা অনুশীলন সমিতির যে সভ্যগণ কলিকাতায় আসিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ শুরু করিয়াছিল, অবশেষে তাহারাই এই কার্যে সফলতা লাভ করে।

৩০শে জুন সন্ধ্যার পূর্বে বসন্ত চট্টোপাধ্যায় একজন আর্দালি সঙ্গে লইয়া সাইকেলে চড়িয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। তিনি কোন্ পথে প্রত্যহ যাতায়াত করিতেন তাহা বিপ্লবীরা লক্ষ্য করিয়া পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। পাঁচ জন যুবক দুইটি মশার-পিস্তল ও তিনটি রিভলভার লইয়া ভবানীপুরের প্রেসিডেন্সী-হাসপাতালের নিকট অপেক্ষা করিতেছিল। বসন্ত হাসপাতালের নিকটবর্তী হইবামাত্র বিপ্লবীদের তিন জন অপর দুই জনকে ইঙ্গিত করিয়া সরিয়া পড়ে। বসন্ত ঐ স্থানে পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর দুই জন যুবক বসন্ত ও তাহার আর্দালিকে গুলি করে। উভয়েই সাইকেল হইতে পড়িয়া যায়। বসন্তের উপর নয়টি গুলি ছোড়া হইয়াছিল। আর্দালিটিও সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া পরে হাসপাতালে মারা যায়।

বিপ্লবীরা তাহাদের কর্তব্য নিঃসন্দেহে শেষ করিয়া পূর্ব দিকে পলায়ন করে। পথে একটি কনেস্টবল তাহাদের পথ রোধ করিয়া গুলি ছোড়ে। কিন্তু তাহারা এড়াইয়া গিয়া ভবানীপুরের বাঙ্গালী-লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া অন্তর্ধান হয়। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়াও কোন লোককে এই হত্যার অভিযোগে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু এই হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করে এবং তাহার ফলে অনুশীলন সমিতির কলিকাতা-শাখা নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

আগস্ট মাসের মাঝামাঝি কলিকাতার যুগান্তর সমিতির শেষ পরিচালক অতুল ঘোষের এক আত্মীয়কে পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করিয়া তাহার মৃতদেহ একটি বাক্সে পুরিয়া ট্রেনের কামরার ফেলিয়া রাখা হয়। এই বছরের শেষ দিকে ঢাকা শহরে দুই জন গুপ্তচর—তাহাদের একজন এক স্কুলের হেড মাস্টার ও দুই জন কনেস্টবল বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। গুপ্তচর দুই জন পুলিশের নিকট নিয়মিতভাবে বিপ্লবীদের সংবাদ দিত এবং কনেস্টবল দুই জন দিবারাত্র বিপ্লবীদের অনুসন্ধানে ফিরিত। ইহাই এই বৎসরের শেষ গুপ্ত হত্যা।

১৯১৭ খৃস্টাব্দ

ডাকাতি

১৯১৭ খৃস্টাব্দে সারা বাংলাদেশে মোট ছয়টি ডাকাতি হয় এবং এই সকল ডাকাতিতে মোট ১২২১৪২ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৫ই এপ্রিল রাজসাহী জিলার জামনগর গ্রামে এক ভীষণ ডাকাতি হয়। প্রায় বিশ জন যুবক মুখোস ও আগ্নেয়াস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রথমেই টেলিগ্রাফ-লাইন কাটিয়া দেয়, পরে এক ধনী গৃহস্থ-বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া ২৬৫৬৭ টাকা লুণ্ঠন করে। এই ডাকাতির অভিযোগে চারি জনের এক বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। ৭ই মে তারিখে কলিকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রীটে এক অলংকারের দোকান লুট করিয়া বিপ্লবীরা ৫৪৫৯ টাকার অলংকার হস্তগত করে। বিপ্লবীরা দোকানের দুই জন মালিককে নিহত ও দুই জন কর্মচারীকে আহত করে। ২০শে জুন রংপুর জিলার রাখালব্রুজ গ্রামে এক ডাকাতি করিয়া ঢাকার অনুশীলন সমিতি নগদে ও অলংকারে ৩১ হাজার টাকা সংগ্রহ করে। কিন্তু বিপ্লবীদের দুই জনকে লুণ্ঠিত সকল অলংকার ও একটি মশার-পিস্তলসহ ঢাকা শহরে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৭শে অক্টোবর ঢাকা জিলা আবদুল্লাপুর নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা নগদ ও

অলংকারে ২৪৮৩০ টাকা পায়। ৩রা নভেম্বর ত্রিপুরা জিলার মাঝিয়ারা গ্রামের এক বাড়ীর দুই ঘরে ডাকাতিতে নগদ ও অলংকারে ৩৩ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়।

গুপ্ত হত্যা

জ্ঞান ভৌমিক নামে এক ব্যক্তি গুপ্ত সমিতির সভ্য ছিল। সভ্য থাকিয়াই সে পুলিশের গুপ্তচর হিসাবে বিপ্লবীদের সংবাদ পুলিশকে জানাইয়া দিত। এইভাবে সে বহু বিপ্লবীকে পুলিশের নিকট ধরাইয়া দেয়। আটক বিপ্লবীরা জেল হইতে খবর দেয়, জ্ঞান পুলিশের গুপ্তচর। বাহিরের বিপ্লবীরা তাহাকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু গুপ্তচর জ্ঞান ব্যাপার বুঝিয়া সতর্ক হইয়া যায়। জানুয়ারী মাসের শেষ দিকে সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নামে গুপ্ত সমিতির এক সভ্যকে পার্টির নিয়ম-শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে হত্যা করা হয়। ২৩শে জুলাই বিপ্লবীরা ঢাকা শহরে এক অত্যাচারী পুলিশ-কর্মচারীকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

গৌহাটি পাহাড়ের যুদ্ধ

১৯১৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গৌহাটি পাহাড়ে পুলিশের সহিত বিপ্লবীদের যুদ্ধ 'বুড়ী বালামের যুদ্ধ'-এর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সংগঠন ভাঙ্গিয়া পড়ে। বিপ্লবীরা দলে দলে পুলিশের হাতে ধরা পড়িতে থাকে। সমিতির নেতাদের পক্ষে ঢাকায় গুপ্তভাবে থাকিয়া সমিতির কার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। তাই নেতারা স্থির করেন, পুলিশের নাগাল হইতে দূরে কোথাও যাইয়া সেখান হইতে সমিতির কার্য পরিচালনা করিবেন। এই সময়ে আসামে বিশেষ কোন বৈপ্লবিক সংগঠন বা বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ ছিল না। কাজেই আসামের উপর পুলিশের নজর নাই মনে করিয়া সমিতির নেতারা আসামের গৌহাটি শহরে সমিতির কেন্দ্র স্থাপন করেন এবং সমিতির তৎকালীন পরিচালক সতীশ পাকড়াশী, নলিনী বাগচী

প্রভৃতি কয়েক জন ঢাকা হইতে পলাইয়া গৌহাটিতে আশ্রয় লন। ইহারা সেখান হইতেই সমিতির বাংলাদেশ-জোড়া সংগঠন পরিচালনা করিতে থাকেন। বিপ্লবীরা দুইটি বাড়ীতে ভাগ হইয়া থাকিতেন।

ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন শেষ রাত্রে বহু সশস্ত্র পুলিশসহ গোয়েন্দা-অফিসারগণ বিপ্লবীদের দুইটি বাড়ীই ঘিরিয়া ফেলে। বিপ্লবীরা কোন প্রকারে পলাইয়া পাহাড়ে আশ্রয় লন। পুলিশ নিকটবর্তী হইবামাত্র সাত জন বিপ্লবী তাঁহাদের রিভলভার ও পিস্তল হইতে গুলিবর্ষণ শুরু করেন। পুলিশ ভয় পাইয়া পিছাইয়া যায়। কিন্তু পুলিশের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, বিপ্লবীদের হাতে কেবল ছোট অস্ত্র—রিভলভার ও পিস্তল, রাইফেল নাই এবং বিপ্লবীদের গুলি-গোলাও সামান্য, আর তাহাদের হাতে রহিয়াছে দূর পাল্লার রাইফেল, গুলিও যথেষ্ট। সুতরাং সশস্ত্র পুলিশদল নিঃশব্দে অন্ধকারে পাহাড় ঘিরিয়া ফেলে। এদিকে মরিয়া হইয়া গুলি ছুঁড়িবার ফলে বিপ্লবীদের গুলি নিঃশেষ হইয়া আসে। পুলিশদল তাহা বুঝিতে পারিয়া বিপ্লবীদের বেড়াজালে ঘিরিয়া ধরিয়া তাঁহাদের নিকটবর্তী হয়। পাঁচ জন বিপ্লবী পুলিশের হাতে ধরা পড়েন।

পুলিশের দল যখন বিপ্লবীদের ঘিরিয়া ফেলিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্তী হইতেছিল, তখন অপর দুই জন বিপ্লবী—সতীশ পাকড়াশী ও নলিনী বাগচী—সকলের অলক্ষ্যে সরিয়া পড়েন। দুই জন বিপ্লবী দুই দিক দিয়া হাঁটাপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। গাড়ীতে উঠিলে পাছে ধরা পড়িয়া যান এই ভয়ে তাঁহারা অরণ্য-পর্বত উল্লঙ্ঘন করিয়া হাঁটিতে শুরু করেন। সতীশ পাকড়াশী কলিকাতায় পৌছিবার কয়েকদিন পর একদিন ভোরবেলা একজন বিপ্লবী কর্মী নলিনীকে অচৈতন্য অবস্থায় কলিকাতার ময়দানে পড়িয়া থাকিতে দেখেন। তখন নলিনীর সর্বাঙ্গে বসন্ত ফুটিয়া বাহির হইয়াছে, ভয়ংকর জ্বরে তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কর্মীটি নলিনীকে লইয়া কোন প্রকারে তাহার গৃহে পৌছে। তাহার ও অপর কয়েকজন কর্মীর আপ্রাণ সেবায় ও যত্নে নলিনী সে যাত্রা বাঁচিয়া উঠেন।

নলিনী বাগচীর যুদ্ধ

নলিনী কিছুটা সুস্থ হইবামাত্র ঢাকার সমিতির দুরবস্থার সংবাদ শুনিয়া অবিলম্বে ঢাকা যাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। সতীশবাবুও নাই। তিনি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর আত্ম-গোপন করিয়া থাকিবার পর ১৯১৮ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কাজেই অসুস্থতা সত্ত্বেও নলিনী নিজেই পলাইয়া ঢাকায় উপস্থিত হন এবং ঢাকা ফল্তাবাজারের এক বাড়ীতে গোপনে আশ্রয় লন। ঢাকার পুলিশ কোন প্রকারে এই সংবাদ পাইয়া যায়।

একদিন ভোররাত্রে পুলিশ সেই বাড়ীটি ঘিরিয়া ফেলে। নলিনী ও তাঁহার সাথী তারিণী মজুমদার বুঝিলেন, বাড়ীর মধ্যে বসিয়া থাকিলে গ্রেপ্তার এড়ানো অসম্ভব। কাজেই তাঁহারা পলায়নের শেষ চেষ্টা করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ভোর হইলে দরজা খুলিয়া বাহির হইবামাত্র তাঁহারা একটি হাবিলদারের দিকে গুলি করিয়া দ্রুত বাহির হইবার চেষ্টা করেন। হাবিলদার ধরাশায়ী হয়, কিন্তু অসংখ্য পুলিশ রাইফেল হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। তারিণীর গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া নলিনী ঘরে ফিরিয়া গিয়া জানালা দিয়া গোয়েন্দা-ইনস্পেকটরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন, ইনস্পেকটর ধরাশায়ী হয়। এই সময় ঘরের মধ্যে থাকিয়া নলিনী পুলিশের সহিত কিছুক্ষণ যুদ্ধ চালান। অবশেষে পুলিশদল রাইফেল হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুঁড়িয়া কাঠের দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ঘরে প্রবেশ করে। তখন নলিনী সর্বাঙ্গে গুলিবিদ্ধ—প্রচুর রক্তপাতের ফলে দেহ অবশ হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে মশার-পিস্তল, কিন্তু উহা চালাইবার শক্তি নাই। পুলিশ তাঁহাকে প্রায় মূর্ছিত অবস্থায় ধরাধরি করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া নেয়। হাসপাতালে যখন অর্ধচেতন অবস্থায় নলিনী জীবনের শেষ মুহূর্ত আসিয়া পৌঁছিতেছিলেন, তখন গোয়েন্দারা অসংখ্য প্রশ্নবাণে তাঁহাকে জর্জরিত করিতেছিল। নলিনী জীবনের শেষ মুহূর্তেও অখ্যাত, অজ্ঞাত থাকিতে বদ্ধপরিকর। মৃত্যুপথযাত্রী নলিনীর এক

জবাব—"Let me die peacefully" (আমাকে শান্তিতে মরিতে দাও)। কয়েক মুহূর্ত পরেই বিপ্লবী নলিনী ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অম্লান স্বাক্ষর রাখিয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।(১)

বিপ্লবীদের অস্ত্র সরবরাহ

বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন তথ্য ও অনুসন্ধানের ফলে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের বিপ্লবীরা তাহাদের প্রয়োজনীয় আগ্নেয়াস্ত্রের সরবরাহের জন্য ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরের উপর নির্ভর করিত। মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর অস্ত্র সরবরাহের এই প্রধান ঘাঁটি বন্ধ হইয়া যায়।

১৯০২ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশে প্রথম গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই বিপ্লবীরা যথেষ্ট সংখ্যায় আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। তাহারা পার্শ্ববর্তী ফরাসী উপনিবেশকেই অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত করে। ইহার কারণ ছিল এই যে, প্রথমতঃ, ফরাসী-দেশে তখন আগ্নেয়াস্ত্রের উপর কোন বাধা-নিষেধ ছিল না এবং সেখান হইতে ঐ দেশের উপনিবেশসমূহে অবাধে অস্ত্র আমদানি করা সম্ভব হইত; দ্বিতীয়তঃ, চন্দননগরের ফরাসী শাসনকর্তারা ভারতের বৃটিশ-শাসনকর্তাদের মত এই বিষয়ে প্রথম দিকে তেমন সতর্ক ছিল না।

যতদূর জানা যায়, কলিকাতার যুগান্তর সমিতির বারীন ঘোষ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দই সর্বপ্রথম চন্দননগরকে আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করিতে শুরু করেন। যুগান্তর সমিতির বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্য উভয়ে মিলিয়া চন্দননগর-নিবাসী কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক এক ব্যক্তিকে খুঁজিয়া বাহির করেন। কিশোরী ছিলেন বারীন্দ্র ও অবিনাশের বন্ধু এবং এক উকিলের মুহুরী। কিশোরী বারীন্দ্র ও অবিনাশের পরামর্শে

(১) সতীশ পাকড়াশীর 'অগ্নিদিনের কথা' নামক পুস্তক হইতে তথ্য সংগৃহীত, পৃঃ ৭৮।

ফরাসীদেশ হইতে রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র আমদানি করিয়া তাহা বারীন্দ্র ও অবিনাশের হস্তে অর্পণ করিতেন। এই সময় চন্দননগরে কোন অস্ত্র-আইন ছিল না। এইভাবে ১৯০৭ খৃস্টাব্দের মধ্য সময় পর্যন্ত অস্ত্র সংগ্রহের কাজ চলিতে থাকে। কিন্তু এই সময় কোন কারণে এই অস্ত্র সরবরাহের সংবাদ বাংলাদেশের পুলিশ জানিয়া ফেলে এবং এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য একজন পুলিশ-কর্মচারী:ক নিযুক্ত করে। উক্ত পুলিশ-কর্মচারীটি চন্দন-নগরের ফরাসী-সরকারের সাহায্যে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল তথ্য সংগ্রহ করে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"১৯০৬ খৃস্টাব্দে কেবলমাত্র দুইটা বন্দুক ও ছয়টা রিভলভার চন্দননগরের অধিবাসীদের দ্বারা আমদানি করা হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০৭ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধেই 'সেণ্ট এতিন' নামক ফরাসীদেশের সরকারী অস্ত্র-কারখানা হইতে চৌত্রিশটি রেজেস্ট্রি-করা পার্শেল আসে। এই পার্শেলগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ রিভলভার ছিল। ইহাদের মধ্যে বাইশটি পার্শেল আসে কিশোরীমোহন সাঁপুই নামক এক ব্যক্তির নামে। কিশোরী ষোলটি পার্শেল লইয়া যায়, কিন্তু এই সময় চন্দননগরেও অস্ত্র-আইন প্রয়োগ করা সম্পর্কে কথাবার্তা চলিতেছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ বাকী ছয়টি পার্শেল সে লইতে আসে নাই। সুতরাং ঐ ছয়টি পার্শেল ফরাসীদেশে প্রেরকের নিকট ফেরৎ দেওয়া হয়। কিছুদিন পরে কিশোরী-মোহনের নামেই আরও পার্শেল আসে। উক্ত পুলিশ-কর্মচারীটি তাহার উনিশটি পার্শেল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যে, পার্শেলগুলির প্রত্যেকটার মধ্যেই রিভলভার রহিয়াছে।......১৯০৭ খৃস্টাব্দে চন্দননগরের শাসনকর্তা কিশোরীকে ডাকিয়া জানিতে চাহেন, ঐ রিভলভারগুলি কেন সে আমদানি করিয়াছে আর কাহাকেই বা উহা দিয়াছে। প্রথমে সে রিভলভারের কথা অস্বীকার করিয়া বলে যে, ঐ পার্শেলগুলির মধ্যে কেবলমাত্র কতকগুলি ঘড়ি ছিল। কিন্তু যখন কালেকটর সাহেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন তখন সে স্বীকার করে যে, পার্শেল-গুলির মধ্যে পনেরটি রিভলভার ছিল এবং সেগুলি সে তাহার বন্ধুদের দিয়াছে। কিন্তু সে কাহারও নাম প্রকাশ করে নাই। আমরা আরও তদন্ত করিয়া

জানিতে পারিয়াছি যে, সে শেষ বারের রিভলভারগুলি হইতে চারিটি মানিক-তলা বাগানের (যুগান্তর সমিতির) বারীন্দ্র ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচার্যের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। তাঁহাদের এক বন্ধু বনবিহারী মণ্ডলের মারফতই সে উহা তাঁহাদের দিয়াছিল। এই সময়ে বারীন্দ্র ও অবিনাশ প্রায়ই চন্দননগর আসিতেন।"(১)

বলা বাহুল্য, কেবল যুগান্তর সমিতিই নহে, অনুশীলন প্রভৃতি অন্যান্য সমিতিও কিশোরীমোহনের মত গোপন দালালদের নিকট হইতে প্রচুর সংখ্যায় অস্ত্র সংগ্রহ করিত এবং চন্দননগরই ছিল এই দালালদের অস্ত্র সংগ্রহের প্রধান ঘাঁটি। এই সকল তথ্য জানিতে পারিয়া ভারত-সরকারের প্ররোচনায় চন্দননগর-সরকার চন্দননগরে অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয় নিয়ন্ত্রিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি অস্ত্র-আইন চালু করিয়াছিল। কিন্তু এই আইনকে চন্দননগরের অধিবাসীদের ব্যক্তি-স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ মনে করিয়া ফরাসী-সরকার ইহা সমর্থন করে নাই। সুতরাং ফরাসীদেশ হইতে চন্দননগরের অস্ত্র আমদানি অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে এবং বিপ্লবীরাও দালালদের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করিতে থাকে। অস্ত্র সরবরাহের এই ঘাঁটি মহাযুদ্ধ শুরু হইবামাত্র বন্ধ হইয়া যায়।

বিপ্লবীদের পক্ষে এইভাবে বেশী অস্ত্র সংগ্রহ করা সম্ভব হইত না, কারণ এক-একটি অস্ত্রের জন্য দালালদের প্রচুর অর্থ দিতে হইত। এইভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একটা ব্যাপক অভ্যুত্থান শুরু করা অসম্ভব ছিল। এইজন্য বিপ্লবীরা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ গুপ্ত হত্যার উপরেই বেশী জোর দেয়, দ্বিতীয়তঃ কলিকাতার অস্ত্রের দোকান ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত লোকদের বাড়ী চুরি-ডাকাতি করিয়া অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করে। কলিকাতার 'রডা' কোম্পানি হইতে মশার-পিস্তল ও ছেচল্লিশ হাজার কার্তুজ চুরি এই প্রচেষ্টারই ফল।

অস্ত্রের অভাবে বিপ্লবীরা প্রধানতঃ ডাকাতি ও গুপ্ত হত্যার মধ্যে তাহাদের ক্রিয়া-কলাপ সীমাবদ্ধ রাখিলেও ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানই ছিল

(১) 'Sedition Committee Report', P. 91.

তাহাদের চরম লক্ষ্য। এই চরম লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবে তাহারা কোন কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লাভের চেষ্টা করে। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পরেই বিদেশ হইতে প্রচুর অস্ত্র-সাহায্য লাভের চেষ্টা বিশেষভাবে শুরু হয় এবং সেই চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাও রচিত হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জার্মাণ-সরকারের নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লাভ ও ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রচেষ্টাই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে "ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র" নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের বিপ্লবীরাই প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেও ইহা ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া এই প্রচেষ্টা পৃথকভাবে পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

"ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র"

প্রথম পর্ব

ষড়যন্ত্রের সূচনা

প্রথম হইতেই ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা, বিপ্লবীদের অতুলনীয় সাহস ও বুদ্ধি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। বিপ্লবীরা তাহাদের সাহস ও আত্মত্যাগের জন্য পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের শ্রদ্ধালাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা আলিপুর জেলের মধ্যে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামীর হত্যার সংবাদ শুনিয়া প্যারীর তৎকালীন সোস্যালিস্টদলের মুখপত্র 'হুম্যানিতে'

(Humanite) পত্রিকা নাকি বাংলার বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া লিখিয়াছিল, "ভারতীয় বিপ্লবীরা যে প্রকারে শত্রুপুরীর ভিতর থাকিয়াও রক্ষী-বেষ্টিত বিশ্বাসঘাতক স্বজাতিদ্রোহীকে শাস্তি দিয়াছে তাহা জগতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে প্রথম।"(১)

ভারতীয় বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা বৃটিশ-বিরোধী জার্মাণদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাহারা তখন বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। জার্মাণ-সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহস ও বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া বৃটিশ-শক্তিকে ঘায়েল করিবার জন্য তাহাদের ব্যবহার করিবার মতলব আঁটিয়াছিল। ১৯১১ খৃস্টাব্দে জার্মাণ-গ্রন্থকার বার্ণহার্ডি-রচিত 'জার্মাণী ও পরবর্তী যুদ্ধ' নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে বার্ণহার্ডি "এই আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, স্পষ্ট বৈপ্লবিক ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবসম্পন্ন বাঙ্গালী হিন্দু-জনসাধারণ সারা ভারতের মুসলমান-জনসাধারণের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং ইহাদের সহযোগিতায় এমন একটা ভয়ংকর বিপদ সৃষ্টি হইবে যাহা ইংলণ্ডের বিশ্বব্যাপী প্রভাবের মূল পর্যন্ত নাড়াইয়া দিবে।"(২)

জার্মাণ-সাম্রাজ্যবাদীরা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করিয়া সমগ্র বিশ্বে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ভারতের জনগণের বৃটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতীয় বিপ্লবীরা তাহা বুঝিয়াও জার্মাণদের সাহায্যে ভারতের বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য আয়োজন শুরু করে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার বহু পূর্ব হইতেই ভারতীয় বিপ্লবীদের সেই আয়োজন শুরু হইয়াছিল। য়ুরোপ-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বৃটিশ-শক্তির বিরুদ্ধে জার্মাণীর যুদ্ধ আসন্ন।

১৯০৫ খৃস্টাব্দে হরদয়াল নামক একজন পাঞ্জাবী ছাত্র ইংলণ্ডে পড়িতে যাইয়া প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং তাহাদের নিকট বিপ্লববাদে

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬০।
(২) 'Sedition Committee Report', P. 119.

দীক্ষা লাভ করেন। বৈদেশিক সাহায্যে ভারতে বিপ্লব সাধনের উদ্দেশ্য লইয়া হরদয়াল ১৯১১ খৃস্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করেন এবং প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহযোগিতায় আমেরিকায় 'গদর সমিতি' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই তিনি জার্মাণদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় জার্মাণীর সাহায্য সম্পর্কে আলোচনা শুরু করেন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে তিনি তাঁহার বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক প্রচারের জন্য মার্কিন-সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া আমেরিকা হইতে পলায়ন করেন এবং জার্মাণীর রাজধানী বার্লিন নগরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।(১)

ইতিপূর্বে সুইজারল্যাণ্ডেও 'আন্তর্জাতিক ভারত-কমিটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল, চম্পকরমন পিল্লাই নামক এক মাদ্রাজী যুবক ছিলেন উহার সভাপতি। জার্মাণীতে যাইয়া বৃটিশ-বিরোধী প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি বার্লিনে উপস্থিত হন এবং হরদয়াল, তারকনাথ দাস, বরকতুল্লা, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল গুপ্ত—এই পাঁচ জন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীর সহযোগিতায় বার্লিনে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পরে আসিয়া ইঁহাদের সহিত যোগদান করেন। এই প্রতিষ্ঠান জার্মাণ সামরিক দপ্তরের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়া কার্য পরিচালনা করিতে থাকে।

'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি'র সভ্যগণ প্রথম দিকে কেবলমাত্র বৃটিশ-বিরোধী সাহিত্য ও পত্রিকা ছাপাইয়া চারিদিকে প্রচার করিতেন। তাহার পর যুদ্ধ যতই জোরে চলিতে শুরু করে তাঁহাদের ক্রিয়া-কলাপও ততই বাড়িয়া যায়। এই সময়ে জার্মাণ-বাহিনী যে সকল বৃটিশ-সৈন্যদল বন্দী করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বহু ভারতীয় সৈন্য ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালাইবার ভার পড়ে বরকতুল্লার উপর। ভারতের সীমান্তবর্তী শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে একটি বৈপ্লবিক কেন্দ্র স্থাপন এবং শ্যাম-ব্রহ্ম-সীমান্ত দিয়া ভারতবর্ষে যুদ্ধের

(১) হরদয়াল ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গদর সমিতি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সংবাদ প্রচারের উদ্দেশ্যে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিবার ভার গ্রহণ করেন পিল্লাই স্বয়ং। এই উদ্দেশ্যে তিনি এক ব্যক্তিকে আমেরিকার পথে ব্যাঙ্কক শহরে প্রেরণ করেন। হেরম্বলাল গুপ্ত গেলেন আমেরিকায়। সেখানে যাইয়া তিনি বোয়েন নামক এক জার্মাণ সামরিক কর্মচারীর সহিত ব্যবস্থা করেন যে, বোয়েন ব্যাঙ্কক শহরে যাইয়া সামরিক শিক্ষা দিয়া একটি সৈন্যদল তৈরী করিবে, তারপর সেই সৈন্যদল লইয়া ব্রহ্মদেশের উপর আক্রমণ করিবে। এই ব্যবস্থা করিয়া হেরম্ব অন্য কাজে চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী তাঁহার স্থান গ্রহণ করেন।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

জার্মাণ সামরিক বিভাগের সহযোগিতায় ভারতীয় বিপ্লবীদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাংগঠনিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া তুলিবার চেষ্টা শুরু হয়। এই পরিকল্পনা অনুসারে ভারতের বাহিরে পূর্ব-এসিয়ায় দুইটি সংগঠন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় শ্যামদেশের রাজধানী ব্যাঙ্কক শহরে, অপর কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্দোনেশিয়ার ব্যাটাভিয়া শহরে। ব্যাঙ্কক হইতে আমেরিকার গদর সমিতির সহিত এবং ব্যাটাভিয়া হইতে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যবস্থা হয়। চীনের সাংহাই নগরীতে অবস্থিত জার্মাণ-দূতাবাসের সহিত উভয় কেন্দ্রের বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাংহাইয়ের জার্মাণ-দূত আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরীর জার্মাণ-দূতের মারফত বার্লিনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে থাকেন। প্রবাসী বিপ্লবীরা এইভাবে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া এবার ভারতের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অগ্রসর হন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক এক মারাঠী যুবক ও সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন বাঙ্গালী যুবক আমেরিকা হইতে জাহাজযোগে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন। পশ্চিম-ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ করিবার উদ্দেশ্যে পিংলে যান পশ্চিম-ভারতে, আর

সত্যেন্দ্রনাথ বাংলার বিপ্লবীদের সহিত সংযোগ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। সত্যেন্দ্রনাথ যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পূর্ব-এসিয়ায় ঘাঁটি-স্থাপন ও ভারতীয়দের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় জার্মাণ-সাহায্য লাভের সংবাদ যতীন্দ্রনাথকে জ্ঞাপন করেন।

এইভাবে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন ভারতের বাহিরে সাংগঠনিক আয়োজন শেষ করিয়া খাস ভারতবর্ষের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে উপস্থিত হন, তাহার পূর্ব হইতেই বাংলা ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের বিপ্লবীরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা লইয়া ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা খোঁজ লইলেন,—কোন্ জিলায় কত বন্দুক রিভলভার আছে, কোথায় কোথায় সরকারী ট্রেজারী ও অস্ত্রাগার আছে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর কত সৈন্য বিপ্লবীদের সহায়তা করিবে, কোথায় পুল উড়াইয়া দিয়া সৈন্যচলাচল-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে, ইত্যাদি। ঢাকার বিপ্লবীরা পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সাহায্যে ঢাকায় অবস্থিত শিখ-সৈন্যদের সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতে থাকেন। ময়মনসিংহ, কুমিল্লা ও ফরিদপুর জিলার বিপ্লবী যুবকেরা গোপনে দ্রুত সামরিক শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করে, জিলায় জিলায় বন্দুক-রিভলভার চুরি হইতে থাকে। ঠিক এই সময়ে, ১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে, 'রডা' কোম্পানীর ৫০টি মশার-পিস্তল ও ৪৬ হাজার কার্তুজ চুরি হয়। এই সময়ে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে ও নেতৃত্বে পশ্চিম-বঙ্গের যুগান্তর সমিতির নেতৃবৃন্দ ব্যাপকভাবে অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় দুইটি "ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান" স্থাপন করেন। ইহাদের একটি হইল 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে এক কাপড়ের দোকান ও অপরটি হইল 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্' নামে বিবিধ পণ্য-সরবরাহের প্রতিষ্ঠান। প্রথমটি পরিচালনা করিতেন রামচন্দ্র মজুমদার ও অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপরটির নাম পশ্চিম-বঙ্গের বিখ্যাত বিপ্লবী ও যতীন্দ্রনাথের সহকর্মী হরিকুমার চক্রবর্তীর নাম অনুসারে 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্' রাখা হইয়াছিল এবং তিনিই ইহার কার্য পরিচালনা করিতেন। বালেশ্বরে 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' নামে 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স্'-এর

একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত দুইটি "ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান" ও বালেশ্বরের 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

এদিকে ভারতবর্ষের বিপ্লবীরা প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ও জার্মাণ-সাহায্য লাভের সম্ভাবনার সংবাদ পাইয়া উল্লসিত হইয়া উঠেন এবং বাহিরের প্রচেষ্টার সহিত নিজেদের প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন করিয়া জার্মাণ-অস্ত্রের সাহায্যে অবিলম্বে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহারা বৈদেশিক সাহায্যের পরিকল্পনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখেন। তাঁহাদের মনে এই সন্দেহ দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, হয়ত জার্মাণদের এই অস্ত্র-সাহায্যের পিছনে তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে। তাই তাঁহারা বিশেষ সতর্কতার সহিত জার্মাণ-সাহায্যের শর্ত-সমূহ পরীক্ষা করিয়া দেখেন। এই সকল শর্ত সম্পর্কে 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে কোন উল্লেখ না থাকিলেও ইহা অনুমান করা চলে যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা যখন বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিবার জন্য জার্মাণীর নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য গ্রহণে সম্মতি দেন, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই কোন শর্ত-আরোপ করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহারা জানিতেন যে, সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়াই জার্মাণরা ভারতীয় বিপ্লবীদের অস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতেছে। 'সিডিসন কমিটি' প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের জার্মাণ-গুপ্তচর বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহিলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মাণীর সাম্রাজ্য-বিস্তারের যন্ত্র হিসাবে কাজ করেন নাই, তাঁহারা জার্মাণদের নিকট হইতে অস্ত্র-সাহায্য লইয়া বৈপ্লবিক উপায়ে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্যই কাজ করিয়াছিলেন।

তৎকালীন বিপ্লব-প্রচেষ্টা ও "ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র"-এর অন্যতম নায়ক ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকাসম্বলিত 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে শ্রীসুকুমার রায় জার্মাণীর অস্ত্র-সাহায্য গ্রহণের এই সকল শর্ত উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

"বিপ্লবীরা জার্মাণ-গভর্নমেণ্টের নিকট হইতে একটি জাতীয় ঋণ গ্রহণ করিবে। দরখাস্তে বলা হয় যে, ভারত স্বাধীন হইলে তাহা পরিশোধ করা হইবে। জার্মাণ সামরিক শক্তির ভারতে প্রবেশাধিকার থাকিবে না। স্বাধীন ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকার ও ক্ষমতা ভারতবাসীর হাতেই থাকিবে।" "কোন জার্মাণ-বাহিনী ভারতে আসিবে না বলিয়া শর্তাবলীর মধ্যে উল্লেখ ছিল। কেবল অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া এবং বাংলার বিপ্লবীদের শিক্ষার জন্য জার্মাণ সমর-বিশেষজ্ঞ দিয়া জার্মাণী ভারতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবে।"(১)

১৯১৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে পশ্চিম-বঙ্গের বিপ্লবীদের এক পরামর্শ-বৈঠক বসে। এই বৈঠকেই জার্মাণীর অস্ত্র-সাহায্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত হয়। জার্মাণীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্ককের বিপ্লবীদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অবিলম্বে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই বিপ্লবীরা জার্মাণী হইতে অর্থ-সাহায্য আসিয়া পৌঁছিবার অপেক্ষায় না থাকিয়া নিজেরাই ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারেই যতীন মুখার্জির নেতৃত্বে ১১ই জানুয়ারী বেলিয়াঘাটায় ও ২২শে ফেব্রুয়ারী গার্ডেনরিচ-এ ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা মোট ৪০ হাজার টাকা সংগ্রহ করে।

অভ্যুত্থানের আয়োজন

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে ব্যাঙ্ককের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়কে ব্যাঙ্ককে প্রেরণ করা হয়। মার্চ মাসে জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ি নামক এক ব্যক্তি সংবাদ লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হয় যে, জার্মাণরা ব্যাটাভিয়ার পথে অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে,

(১) সুকুমার রায়: 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস', পৃঃ ১১২—১১৩।

কাজেই বাংলার বিপ্লবীদের অবিলম্বে ব্যাটাভিয়ায় লোক পাঠাইয়া তাহাদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করা কর্তব্য এই যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবীরা পরামর্শ করিয়া ব্যাটাভিয়ায় গিয়া জার্মাণদের সহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য নরেন ভট্টাচার্যকে (১) প্রেরণ করেন। নরেন্দ্রনাথ 'সি. মার্টিন' নাম গ্রহণ করিয়া এপ্রিল মাসে ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন। এই সম্পর্কে ঐ মাসেই অবনী মুখার্জিকেও জাপানে প্রেরণ করা হয়। এই সময় বেলিয়াঘাটায় ও গার্ডেনরিচ-এর ডাকাতির জন্য পুলিশ যতীন মুখার্জিকে গ্রেপ্তারের জন্য সারা বাংলাদেশ তোলপাড় করিয়া তোলে। এই অবস্থায় বাংলাদেশে থাকা নিরাপদ নয় মনে করিয়া যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে গিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকেন। বাংলার বিপ্লবীরা যখন তাঁহাদের পরিকল্পনা কাজে পরিণত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করেন, তখন অপর দিকে আমেরিকার ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশের 'সান পেড্রো' নামক বন্দর হইতে 'এস. এস. ম্যাভারিক' নামক একখানি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাংলাদেশের উদ্দেশে যাত্রা করে।

এদিকে 'মার্টিন' নামধারী নরেন্দ্রনাথ ব্যাটাভিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হন। ব্যাটাভিয়ার জার্মাণ-কন্সাল তাঁহাকে থিয়োডোর হেল্‌ফেরিখ্ নামক এক জন জার্মাণের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। হেল্‌ফেরিখ্ তাঁহাকে সংবাদ দেন যে, ভারতবর্ষের বিপ্লবে সাহায্য করিবার জন্য এক জাহাজ অস্ত্র ও গোলাবারুদ করাচীর দিকে আসিতেছে। এই অস্ত্র-বাঝাই জাহাজখানা যাহাতে করাচী না গিয়া বাংলাদেশে আসে তাহার জন্য 'মার্টিন' চেষ্টা করেন। অবশেষে সাংহাই-এর জার্মাণ-কন্সাল সম্মতি দিলে জাহাজখানাকে বাংলাদেশে প্রেরণ করাই স্থির হয়। 'মার্টিন'-এর অনুরোধে স্থির হয় যে, জাহাজখানা সুন্দরবন-অঞ্চলের রায়মঙ্গল নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং সেইস্থান হইতে বিপ্লবীরা জাহাজ হইতে অস্ত্র ও গোলা-গুলি নামাইয়া লইবে। 'মার্টিন' অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত কলিকাতার 'হ্যারি এণ্ড সন্‌স' কোম্পানির নিকট টেলিগ্রাম করিয়া এই ভাষায় জানাইয়া দেন, "ব্যবসায়ের সংবাদ খুবই সন্তোষজনক"। ইহার

(১) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ইনিই পরবর্তীকালে "এম. এন. রায়" নাম গ্রহণ করেন।

উত্তরে জুন মাসের গোড়ার দিকে 'হ্যারি এণ্ড সনস্' হইতে 'মার্টিন'কে অবিলম্বে টাকার ব্যবস্থা করিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হয়। ইহার পর ব্যাটাভিয়ার হেল্‌ফেরিখ্-এর নিকট হইতে জুন ও আগস্ট মাসের মধ্যে 'হ্যারি এণ্ড সনস্'-এর নামে মোট ৪৩ হাজার টাকা পাঠান হয়। ইহার মধ্যে মোট ৩৩ হাজার টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয় এবং বাকী টাকা পুলিশ সন্দেহবশে আটক করে।

এই সকল ব্যবস্থা করিয়া 'মার্টিন' জুন মাসের মাঝামাঝি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসেন। 'মার্টিন' ফিরিয়া আসিবার পর অস্ত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া যতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিপ্লবীরা অভ্যুত্থানের সকল আয়োজন পূর্ণ করিবার জন্য এক বৈঠকে মিলিত হন। এই ঐতিহাসিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ('মার্টিন'), ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়, ও অতুল ঘোষ। এই বৈঠকে 'ম্যাভারিক' জাহাজ হইতে অস্ত্র ও গোলা-গুলি নামাইয়া লইবার পরিকল্পনা তৈরী হয়। 'ম্যাভারিক' জাহাজে আসিতেছে ৩০ হাজার রাইফেল; প্রত্যেক রাইফেলের জন্য ৪ শত রাউণ্ড করিয়া কার্তুজ (মোট এক লক্ষ বিশ হাজার কার্তুজ) এবং ২ লক্ষ টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-গুলি গোপনে জাহাজ হইতে নামাইয়া লওয়া অতি কঠিন কাজ, সুতরাং ইহার জন্য ভাল ব্যবস্থা চাই। এই কঠিন কাজটির ভার পড়ে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় ও অতুল ঘোষের উপর। তাঁহারা অস্ত্র ও গোলা-গুলি জাহাজ হইতে নামাইয়া নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতে উহা ভাগ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন :—

(১) নোয়াখালির দক্ষিণে হাতিয়া (সন্দীপ)—এখানে বরিশালের বিপ্লবীরা এই অস্ত্রগুলি বুঝিয়া লইবে এবং পূর্ব-বঙ্গের সকল জিলার বিপ্লবীদের নিকট পৌঁছাইয়া দিবে।

(২) কলিকাতা

(৩) বালেশ্বর

যতীন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণ পরামর্শ করিয়া এই ভাবে অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনাটি তৈরী করিলেন :—বাংলাদেশে সরকারের সৈন্যবাহিনীর

সৈন্য-সংখ্যা বেশী নহে, সুতরাং সরকারের সামরিক শক্তি উচ্ছেদ করিবার পক্ষে বিপ্লবীদের শক্তিই যথেষ্ট। কিন্তু অভ্যুত্থান শুরু হইবামাত্র বাংলার বাহির হইতে ইংরেজেরা নিশ্চয়ই আরও সৈন্য পাঠাইবে। এই আশঙ্কা করিয়া বিপ্লবের নায়ক-গণ সৈন্য-চলাচলের পথ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। এই উদ্দেশ্যে বাংলা-দেশের তিনটি প্রধান রেলপথ বন্ধ করা প্রয়োজন, রেলপথের উপর বড় বড় পুলগুলি উড়াইয়া দিলেই রেলপথগুলি অচল হইয়া যাইবে। স্থির হইল, স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরে ঘাঁটি করিয়া মাদ্রাজ-রেলপথ অচল করিয়া দিবেন; চক্রধরপুরে ঘাঁটি করিয়া বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ বন্ধ করিবেন ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়; আর সতীশ চক্রবর্তী 'অজয়' নামক স্থানে গিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া-রেলপথ-এর প্রধান পুলটি উড়াইয়া দিবেন। নরেন্দ্র চৌধুরী ও ফণীন্দ্র চক্রবর্তী হাতিয়ায় গিয়া একটি বাহিনী তৈরী করিবেন, সেই বাহিনী প্রথমে পূর্ব-বঙ্গের জিলাগুলিকে মুক্ত করিবে এবং পরে তাঁহারা সেই বাহিনী লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইবেন। কলিকাতার বিপ্লবীদের নেতৃত্ব করিবেন নরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী। তাঁহারা প্রথমে কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী স্থানের অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রাগারগুলি দখল করিয়া পরে 'ফোর্ট উইলিয়াম' দুর্গটি দখল করিবেন, তারপর কলিকাতা অধিকার করিবেন। আর 'ম্যাভারিক' জাহাজে যে সকল জার্মাণ সামরিক অফিসার আসিতেছে তাহারা পূর্ব-বঙ্গে থাকিয়া একটি সৈন্যবাহিনী তৈরী করিয়া তাহাদের সামরিক শিক্ষা দিবে।

ইতিমধ্যে 'ম্যাভারিক' জাহাজ হইতে অস্ত্র নামানো সম্পর্কে পূর্ব-পরিকল্পনার কিছু পরিবর্তন করা হয়। ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় অন্য কাজে চলিয়া যান এবং এই কাজের ভার পড়ে যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপর। তিনি রায়-মঙ্গলের এক জমিদারের সাহায্য লাভের ব্যবস্থা করেন। এই জমিদার এই উদ্দেশ্যে লোকজন ও আলোর ব্যবস্থা করিতে স্বীকৃত হন। 'ম্যাভারিক' জাহাজটি রাত্রিকালে রায়মঙ্গল পৌছিয়া আলোর সংকেত করিবার কথা ছিল। ইহা স্থির হইয়াছিল যে, ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে অস্ত্রগুলি বিলি করা শুরু হইবে। জাহাজ জুন মাসের শেষ সপ্তাহে আসিয়া পৌছিবার কথা। সুতরাং

অতুল ঘোষের নেতৃত্বে একদল লোক রায়মঙ্গল হইতে নৌকায় করিয়া সমুদ্রের দিকে আগাইয়া যায়। তাহারা সেখানে দশ দিন অপেক্ষা করে, কিন্তু জাহাজ আসিল না। জুন মাস শেষ হইয়া গেল, কিন্তু 'ম্যাভারিক' জাহাজের কোন সন্ধান মিলিল না, এমন কি এই বিলম্বের জন্য ব্যাটাভিয়া হইতেও কোন সংবাদ আসিল না।

'ম্যাভারিক' জাহাজ আসিল না, কিন্তু ৩রা জুলাই ব্যাঙ্কক হইতে এক বাঙ্গালী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। এই বাঙ্গালী যুবকটি ব্যাঙ্ককের আত্মারাম নামক এক পাঞ্জাবী বিপ্লবীর নিকট হইতে সংবাদ লইয়া আসে যে, শ্যামের জার্মাণ-কনসাল নৌকায় করিয়া ৫ হাজার রাইফেল ও উহার কার্তুজ এবং এক লক্ষ টাকা রায়মঙ্গলে পাঠাইতেছেন। কলিকাতার বিপ্লবীরা ভাবিলেন যে, 'ম্যাভারিক' জাহাজের পরিবর্তেই এই ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহারা ঐ বাঙ্গালী যুবকটির মারফত ব্যাঙ্ককে সংবাদ দেন যে, মূল পরিকল্পনা যেন পরিবর্তন করা না হয় এবং 'ম্যাভারিক' জাহাজের অবশিষ্ট অস্ত্র যেন রায়মঙ্গলের পরিবর্তে বঙ্গোপসাগরে সন্দীপের হাতিয়া ও বালেশ্বর অথবা ভারতের পশ্চিম-উপকূলের গোকর্ণী নামক স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু অকস্মাৎ পুলিশ রায়মঙ্গলে অস্ত্র আসিবার সংবাদ জানিয়া ফেলে।

জুলাই মাসে পুলিশ জানিয়া ফেলে যে, বিদেশ হইতে বহু অস্ত্র রায়মঙ্গলে আসিয়া পৌঁছিতেছে। তাহারা অবিলম্বে রায়মঙ্গল অঞ্চলে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করে এবং ঐ সংবাদের সূত্র ধরিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে শুরু করে। ৭ই আগস্ট পুলিশ 'হ্যারি এণ্ড সনস্'-এর দোকানে খানাতল্লাস করিয়া কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে এবং কয়েকটি মূল্যবান গোপন সংবাদ জানিয়া ফেলে। এই দুর্ঘটনায় বিপ্লবীরাও সতর্ক হইয়া যায়। কলিকাতা হইতে ব্যাটাভিয়ায় সংবাদ প্রেরণ করা বিপজ্জনক বুঝিয়া এক ব্যক্তি বোম্বাই গিয়া ১৩ই আগস্ট সেখান হইতে ব্যাটাভিয়ায় টেলিগ্রাম পাঠাইয়া হেল্‌ফেরিখ্‌কে সতর্ক করিয়া দেয়। এই নূতন পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য ১৫ই আগস্ট নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ('মার্টিন') অপর এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া ব্যাটাভিয়া যাত্রা করেন।

বুড়ীবালামের যুদ্ধ

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চূড়ান্ত পরিকল্পনা অনুসারে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বয়ং মাদ্রাজ-রেলপথ অচল করিয়া দিবার ভার গ্রহণ করিয়া বালেশ্বর চলিয়া আসিয়াছিলেন। বালেশ্বরের যেখানে মহানদী বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে মহানদীর সেই মোহনার নিকটবর্তী 'কাপ্তিপোদা' নামক স্থানের সন্নিকটস্থ এক জঙ্গলে ঘাঁটি করিয়া তিনি অস্ত্র-বোঝাই জার্মাণ-জাহাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। এদিকে কলিকাতায় যে সকল ঘটনা ঘটে তাহা তিনি কিছুই জানিতে পারেন নাই।

কলিকাতায় 'হ্যারি এণ্ড সনস্'-এর দোকান খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ উক্ত কোম্পানির বালেশ্বর-শাখা 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম'-এর সন্ধান পায়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর পুলিশ 'য়ুনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' খানাতল্লাস করিয়া কিছু কাগজপত্র হস্তগত করে। তাহারা এই সকল কাগজপত্রের মধ্যে 'কাপ্তিপোদা' নামক স্থানটির উল্লেখ দেখিতে পায়। কাপ্তিপোদা স্থানটি ছিল ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পুলিশ খোঁজ করিতে করিতে কাপ্তিপোদায় আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে পুলিশের এত আনাগোনা দেখিয়া যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, পুলিশ তাঁহাদের গোপন ঘাঁটির সন্ধান পাইয়াছে। ইহা বুঝিতে পারিয়া যতীন্দ্রনাথ তাঁহার চারি জন সঙ্গীসহ জঙ্গলের পথে বুড়ীবালাম নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা যখন নদী পার হইতেছিলেন তখন গ্রামের চৌকিদার, দফাদার প্রভৃতিরা তাঁহাদের দেখিয়া ফেলে। তাহারা বুঝিতে পারে যে, ইহাদের খোঁজেই পুলিশ ঘুরিতেছে। তাহারা গ্রামবাসীদের সাহায্যে বিপ্লবীদের ধরিবার জন্য আগাইয়া আসে। ইহার ফলে গ্রামবাসীদের সহিত বিপ্লবীদের এক খণ্ড-যুদ্ধ হয় এবং কয়েকজন গ্রামবাসী নিহত ও আহত হয়। গ্রামবাসীরা পলাইয়া গেলে বিপ্লবীরা নদী পার হইয়া জঙ্গলে আশ্রয় লন। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশের এক বিরাট দল জঙ্গল ঘিরিয়া ফেলে। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সঙ্গীরা বুঝিলেন, আর পলায়নের উপায় নাই।

তাঁহারা স্থির করিলেন, তাঁহারা কিছুতেই পুলিশের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না, বীরের মত শত্রুর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিবেন। বিপ্লবীরা সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীর সহিত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর। যুদ্ধক্ষেত্র—বুড়ীবালাম নদীর তীর। একদিকে বাংলার পাঁচজন শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী—যতীন্দ্রনাথ, চিত্তপ্রিয়,(১) মনোরঞ্জন, নীরেন ও জ্যোতিষ; আর অপর দিকে অগনিত সশস্ত্র পুলিশ ও একদল রাইফেল-ধারী অশ্বারোহী সৈন্য। এই অসমান যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে উচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য লইয়া বিপ্লবীরা নদীতীরের বালুকারাশির মধ্যে এক অপূর্ব ট্রেঞ্চ কাটিলেন। পুলিশদল নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র তাঁহারা সেই ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকিয়া শত্রুপক্ষের উপর প্রাণপণে গুলি বর্ষণ শুরু করিলেন। বিপ্লবীদের গুলি বর্ষণে শত্রুপক্ষের কয়েকজন ধরাশায়ী হইল। এই অভাবনীয় যুদ্ধ ও বিপ্লবীদের সাহস দেখিয়া শত্রুরাও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। দুই পক্ষের গুলি বর্ষণ চলিল বহুক্ষণ। পুলিশ ও সৈন্যদের রাইফেলের গুলিতে বিপ্লবীদের দুই জন সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। তাঁহাদের একজন—চিত্তপ্রিয়—ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন, আর অপর জন হইলেন বিপ্লবীদের সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ স্বয়ং। তাঁহার দেহ গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত, প্রচুর রক্তপাতের ফলে শরীর অবসন্ন। এখনও অক্ষত রহিয়াছে তিন জন—তিনটি বালক। তিন জনে প্রাণপণে গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল, বীরের মত প্রাণ দিবার জন্য তাহারা উন্মাদ হইয়া উঠিয়াছে। এমন সময় সেনাপতি যতীন্দ্রনাথ যুদ্ধ বন্ধ করিয়া শান্তির শাদা নিশান উড়াইবার আদেশ দিলেন।

ট্রেঞ্চের মধ্য হইতে একখানি শাদা কাপড় উড়াইয়া যুদ্ধ বন্ধ করিবার সংকেত জানান হইল, শত্রুপক্ষ হাপ ছাড়িয়া বাঁচিল। পুলিশদলের অধিনায়ক জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট আগাইয়া আসিলেন। এই বীর যোদ্ধাদের দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন, টুপি খুলিয়া মৃত যোদ্ধার প্রতি সম্মান দেখাইলেন, তারপর তাঁহার

(১) চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী—ইনিই ১৯১৪ খৃস্টাব্দে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন হলে পুলিশ-ইনস্পেকটর সুরেশ মুখার্জিকে হত্যা করিয়াছিলেন।

টুপিতে করিয়া নদী হইতে জল আনিয়া আহতদের পান করাইলেন। তখন যতীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিষ ভীষণ আহত, চিত্তপ্রিয় মৃত, আর মনোরঞ্জন ও নীরেন অক্ষতই রহিয়াছে। পরদিন, ১০ই সেপ্টেম্বর সকালবেলা যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বরের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। যতীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেম ও বীরত্বের অতুলনীয় আদর্শ স্থাপন করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিলেন। পরে নীরেন ও মনোরঞ্জন ইংরেজ-রাজের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেয়, আর জ্যোতিষ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পরে উন্মাদ অবস্থায় মারা যায়।

বুড়ীবালামের যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের ডেপুটি পুলিশ-কমিশনার কুখ্যাত টেগার্ট সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। তিনি নাকি ব্যারিস্টার জে. এন. রায়ের প্রশ্নের উত্তরে যতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলিয়াছিলেন :

"আমাকে আমার কর্তব্য করিতে হইয়াছে বটে, কিন্তু যতীন্দ্রনাথকে আমি শ্রদ্ধা করি। তিনিই একমাত্র বাঙ্গালী যিনি ট্রেঞ্চের মধ্যে থাকিয়া সম্মুখ-যুদ্ধে জীবন দান করিয়াছেন।"

শেষ চেষ্টা

এদিকে 'মার্টিন' ১৫ই আগস্ট ব্যাটাভিয়া যাত্রা করিবার পর হইতে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত তাঁহার কোন খবর না পাইয়া কলিকাতার বিপ্লবীরা চিন্তিত হইয়া উঠেন। ২৭শে ডিসেম্বর ফরাসী উপনিবেশ গোয়া হইতে তাঁহার নিকট এই টেলিগ্রাম পাঠান হয়—"ব্যাপার কি, কোন সংবাদ নাই কেন, আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।" এই টেলিগ্রাম পাঠান হয় 'বি. চ্যাটারটন' নামে। 'বি. চ্যাটারটন' হইলেন ভোলানাথ চাটার্জি। পুলিশের দৃষ্টি গোয়ার উপরেও পড়িয়াছিল। তাহারা এই টেলিগ্রামের মর্ম বুঝিয়া ফেলে এবং অপর একজন বাঙ্গালী যুবকের সহিত ভোলানাথকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহাকে ১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন আইন অনুসারে পুণা জেলে আটক রাখা হয়।(১)

---

(১) পুনাজেলে আটক থাকা কালে, ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী তাঁহার মৃত্যু হয়। সরকারী ঘোষণায় 'তিনি আত্মহত্যা করিয়াছেন' বলিয়া প্রচার করা হয়।

এবার 'ম্যাভারিক' জাহাজখানার রহস্য আলোচনা করা প্রয়োজন। জার্মাণীর একটি ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান আমেরিকার নিকট হইতে এই তৈলবাহী জাহাজখানা ক্রয় করিয়াছিল। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২২শে এপ্রিল যখন ইহা সান পেড্রো বন্দর হইতে ব্যাটাভিয়ার দিকে যাত্রা করে তখন ইহাতে কোন অস্ত্র ছিল না, ইহার পঁচিশ জন কর্মচারীকে 'পারস্য দেশবাসী' বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইলেও তাঁহারা সকলেই ছিলেন আমেরিকা-প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী। তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন আমেরিকার গদর সমিতির পরিচালক রামচন্দ্র, তাঁহার সহিত হরি সিং নামক এক পাঞ্জাবী বিপ্লবী গদর সমিতির বহু প্রচার-সাহিত্য লইয়া আসিতেছিলেন। 'ম্যাভারিক' জাহাজখানি আমেরিকার এক বন্দর হইয়া 'সোকোরো' দ্বীপ অভিমুখে যাত্রা করে। পথে 'এ্যানি লারসেন' নামে আর একখানি ছোট জাহাজের সহিত উহার সাক্ষাৎ ঘটিবার কথা ছিল। প্রকৃত পক্ষে 'এ্যানি লারসেন' জাহাজেই ছিল অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-গুলি। পূর্বে স্থির হইয়াছিল যে, তৈলবাহী জাহাজ 'ম্যাভারিক'-এর একটি শূন্য স্থানে অস্ত্র ও আর একটি শূন্য স্থানে গোলা-গুলি ভর্তি করিয়া ঐ শূন্য স্থান দুইটি তেল দিয়া ভরিয়া রাখা হইবে এবং এই ভাবে লুকাইয়া অস্ত্র ও গোলা-গুলি ভারতে প্রেরণ করা হইবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে 'এ্যানি লারসেন'-এর সহিত 'ম্যাভারিক'-এর সাক্ষাৎ ঘটে নাই, 'ম্যাভারিক' ইহার জন্য পথে দীর্ঘ কাল অপেক্ষা করিয়া অবশেষে হনলুলু দ্বীপ হইয়া ব্যাটাভিয়ার দিকে যাত্রা করে। ব্যাটাভিয়া পৌঁছিবামাত্র স্থানীয় সরকার জাহাজ খানাতল্লাস করে এবং দোষাবহ কিছু না পাইয়া উহাকে ছাড়িয়া দেয়। ইহার কিছু দিন পরেই, ১৯১৫ খৃস্টাব্দের জুন মাসের শেষ দিকে, 'এ্যানি লারসেন' জার্মাণী হইতে অস্ত্র লইয়া মার্কিন-মুল্লুকে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র মার্কিন-সরকার ইহা খানাতল্লাস করিয়া অস্ত্র ও গোলা-গুলি বাজেয়াপ্ত করে। ওয়াশিংটনের জার্মাণ-রাজদূত বহু চেষ্টা করিয়াও উহা উদ্ধার করিতে পারিলেন না।

এদিকে 'ম্যাভারিক' জাহাজখানা ব্যাটাভিয়া পৌঁছিবামাত্র ইহার

কর্মচারীরা (অর্থাৎ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা) জাহাজ খানাতল্লাসের পূর্বেই শহরে প্রবেশ করিয়া হেলফেরিখ্-এর আশ্রয় লন। কিছু দিন পরে হেল্‌ফেরিখ্‌ই তাঁহাদের আমেরিকায় ফিরিয়া যাইবার ব্যবস্থা করে। তাঁহাদের সঙ্গে 'মার্টিন'কেও আমেরিকায় পাঠান হয়। 'মার্টিন', অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'হরি সিং' নাম গ্রহণ করিয়া আমেরিকায় পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন-সরকার তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে।

এই হতাশজনক ব্যর্থতার পরেও জার্মাণরা ভারতের বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য 'হেন্‌রি এস' নামে আর একখানি অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ প্রেরণ করে। এই জাহাজখানি অস্ত্র ও গোলা-গুলি লইয়া ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী ম্যানিলা হইতে চীনের সাংহাই বন্দরের দিকে যাত্রা করে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ইহার মালপত্র ও উদ্দেশ্য বুঝিয়া ফেলিলে জাহাজখানি গতি পরিবর্তন করিয়া পন্টিয়ানাক্ দ্বীপের দিকে চলিয়া যায়। কিন্তু পথে ইহার মোটর বিগড়াইয়া গেলে ইহা সেলিবিস্ দ্বীপপুঞ্জের একটি বন্দরে আসিয়া নোঙ্গর করে। এই জাহাজে ছিল 'ভেদে' ও 'বোয়েম' নামক দুইজন আমেরিকা-প্রবাসী জার্মাণ। ইহাদের উদ্দেশ্য ছিল যে, জাহাজখানি ব্যাঙ্কক পৌছিলে তাহারা ইহার কিছু অস্ত্র শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তের 'পাকোয়া' নামক স্থানের একটি সুরঙ্গের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবে এবং সীমান্তে থাকিয়া একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিবে, তারপর সেই সৈন্যবাহিনী লইয়া ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিবে। কিন্তু এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। বোয়েম সেলিবিস্ হইতে ব্যাটাভিয়া যাইবার পথে সিঙ্গাপুরে গ্রেপ্তার হয়। আমেরিকার সিকাগো শহর হইতে হেরম্বলাল গুপ্ত বোয়েমকে ম্যানিলা হইতে 'হেন্‌রি এস' জাহাজে আরোহণ করিতে নির্দেশ পাঠাইয়াছিলেন। বোয়েম ম্যানিলায় আসিয়া স্থানীয় জার্মাণ-কন্‌সালের নিকট হইতে নির্দেশ পাইয়াছিল যে, বোয়েম যেন ঐ জাহাজ হইতে ৫০০ মশার-পিস্তল ব্যাঙ্ককে রাখিয়া অবশিষ্ট ৪৫০০ মশার-পিস্তল চট্টগ্রামে নামাইয়া দিবার ব্যবস্থা করে।

ভারত-সরকারের গোয়েন্দা-বিভাগের মতে, 'ম্যাভারিক' জাহাজ ধরা পড়িবার পর সাংহাই-এর জার্মাণ-কন্‌সাল আরও দুইখানি অস্ত্র-বোঝাই জাহাজ

ভারতবর্ষে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একখানি জাহাজ ২০ হাজার রাইফেল, ৮০ লক্ষ কার্তুজ, দুই হাজার পিস্তল ও হাত-বোমা এবং দুই লক্ষ টাকা লইয়া রায়মঙ্গল এবং অপর জাহাজখানা ১০ হাজার রাইফেল, ১০ লক্ষ কার্তুজ ও হাত-বোমা লইয়া বালেশ্বর যাইবার কথা ছিল। ঠিক এই সময় 'মার্টিন' ব্যাটাভিয়ায় উপস্থিত হন এবং বাংলাদেশের ও বালেশ্বরের বিপজ্জনক অবস্থার সংবাদ জানাইয়া দেন। তাহার ফলে এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। তখন 'মার্টিন'-এর পরামর্শে ভারতবর্ষে অস্ত্র প্রেরণের নূতন পরিকল্পনা তৈরী হয়। এই নূতন পরিকল্পনা অনুসারে সাংহাই হইতে সরাসরি একখানা জাহাজ অস্ত্র লইয়া ডিসেম্বর মাসে হাতিয়ায় আসিবার কথা ছিল। আর একখানা জার্মাণ-জাহাজ ইন্দোনেসিয়ার কোন বন্দর হইতে যাত্রা করিয়া পথে অন্য একখানা জাহাজ হইতে অস্ত্র লইয়া সরাসরি বালেশ্বরে আসিবার কথা হয়। আরও কথা ছিল যে, অন্য একখানা জার্মাণ-জাহাজ সরাসরি আন্দামান দ্বীপে অস্ত্রসহ পৌছিয়া আন্দামানের প্রধান কেন্দ্র পোর্টব্লেয়ার আক্রমণ করিবে এবং আন্দামান-জেলের বিপ্লবী বন্দীদের ও সিঙ্গাপুরে সৈন্যবাহিনীর যে রেজিমেণ্টটি(১) বিদ্রোহ করিয়াছিল সেই রেজিমেণ্টের বন্দী সৈন্যদের মুক্ত করিয়া তাহাদের লইয়া রেঙ্গুন আক্রমণ করিবে। ইহা ব্যতীত বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সাহায্য করিবার জন্য সাংহাই-এর জার্মাণ-কন্‌সাল বিপুল পরিমাণ অর্থসহ একজন চীনা লোককে হেল্‌ফেরিখ্‌-এর নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পেনাঙ্গ-এর একজন বাঙ্গালীকে দিবার জন্য অথবা কলিকাতার কোন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্য একখানা জরুরী পত্রও এই লোকটির সঙ্গে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু অর্থ ও পত্রসহ এই চীনা লোকটি সিঙ্গাপুরে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে।

'মার্টিন'-এর সঙ্গে কলিকাতা হইতে যে বাঙ্গালী যুবকটি আসিয়াছিল তাহাকে জার্মাণ-কন্‌সালের সহিত পরামর্শ করিবার জন্য এই সময় সাংহাই পাঠান হয়। যুবকটি বহু কষ্টে সাংহাই পৌছিবামাত্র সাংহাই-এর বৃটিশ-পুলিশ তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই যুবকের গ্রেপ্তারের পর ভারতে অস্ত্র প্রেরণের

(১) 'ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পরিকল্পনা ও চেষ্টা ত্যাগ করা হ   এদিকে যতীন্দ্রনাথের ম   পশ্চিম-বঙ্গের বিপ্লবী নায়কদের অনেকে বৃটিশ-অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া চন্দননগরের ফরাসী উপনিবেশে আশ্রয় লন।

এই সময়ে মার্কিন-পুলিশ সিকাগো শহরে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রের অপরাধে বাঙ্গালী বিপ্লবী হেরম্বলাল গুপ্ত এবং জার্মান-অফিসার ভেদে ও বোয়েমকে গ্রেপ্তার করে। মার্কিন রাষ্ট্রীয় আদালতে তাঁহাদের বিচার হয় এবং বিচারে তাঁহারা দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯১৫ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে জার্মাণরা সাংহাই হইতে ভারতে অস্ত্র প্রেরণের শেষ চেষ্টা করে। জার্মাণ কন্সাল-অফিসের 'নিলসেন' নামক এক কর্মচারী দুই জন চীনা লোকের মারফত একটা বড় কাঠের চালানের মধ্যে করিয়া ১২৯টি মশার-পিস্তল ও ২৬ লক্ষ ৮৭ হাজার কার্তুজ প্রেরণের চেষ্টা করে। এই অস্ত্রগুলি পৌছাইবার কথা ছিল কলিকাতার বিপ্লবীদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান 'শ্রমজীবী সমবায়'-এর অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট। কিন্তু কাঠের চালান ও অস্ত্র এবং চীনা লোক দুইটি সাংহাই হইতে বাহির হইতে পারে নাই। অক্টোবর মাসে সাংহাইয়ের শহর-পুলিশ সকল মালপত্রসহ চীনা লোক দুইটিকে গ্রেপ্তার করে। এই সকল অস্ত্র নাকি রাসবিহারী বসু(১) ও অবনী মুখার্জির চেষ্টাতেই নিলসেন-এর দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর রাসবিহারী পলাইয়া আসিয়া সাংহাইতে নিলসেন-এর গৃহে আশ্রয় লইয়াছিলেন এবং অবনী মুখার্জিও(২) জাপান হইতে আসিয়া এখানে বাস করিতেন। তাঁহাদের অনুরোধেই নিলসেন এই দায়িত্ব গ্রহণ করে। অবনী মুখার্জির গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার নোট-বইতে নিলসেনের নাম পাওয়া যায়।

(১) রাসবিহারী বসুর ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে "যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

(২) অবনী মুখার্জি ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র সম্পর্কিত কোন কাজে যতীন্দ্রনাথ কর্তৃক জাপানে প্রেরিত হইয়াছিলেন।

অবিনাশ রায় নামক আর এক জন বাঙ্গালী বিপ্লবী ভ
প্রেরণের ব্যাপারে জড়িত ছিলেন এবং ভারতে অস্ত্র প্রেরণের জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেন। তিনিও রাসবিহারী এবং অবনী মুখার্জির সহিত সাংহাই নগরীতে নিলসেনের গৃহে বাস করিতেন। অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া বাংলাদেশে পাঠাইবার জন্য অবিনাশ রায়কে অবনী মুখার্জি চন্দননগরের মতিলাল রায়ের নাম ও ঠিকানা দেন। অবিনাশ নিজেই অস্ত্র লইয়া চন্দননগরে যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টাও পুলিশের সতর্কতায় ব্যর্থ হয়। অবনী মুখার্জির নোট-বইতে অমর সিং নামক শ্যামদেশ-প্রবাসী এক ভারতীয় ইঞ্জিনিয়ারের নাম পাওয়া যায়। ইনিও ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত ছিলেন। 'হেন্‌রি এস' জাহাজখানি যদি ব্রহ্ম-শ্যাম সীমান্তে অস্ত্র পৌছাইয়া দিতে পারিত তবে ইনিই সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া একটি সুরঙ্গের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ব্রহ্মের মান্দালয় শহরে ইনি গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। অবনী মুখার্জিও পরে জাপানে গ্রেপ্তার হন। এই ভাবে বৈদেশিক সাহায্যে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব শেষ হয়।

দ্বিতীয় পর্ব

মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধিতা

আমরা দেখিয়াছি, ওয়াহাবী-বিদ্রোহ ও সিপাহী-যুদ্ধের পর হইতে ভারতের মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধিতার অবসান হইয়াছিল। তারপর স্যার সৈয়দ আহম্মদের দুর্বার প্রভাব ভারতের মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলন হইতে সরাইয়া বৃটিশ-শাসকদের সহিত সহযোগিতার পথে লইয়া গিয়াছিল। ১৯১১ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দেয়

নাই,বঙ্গভঙ্গ রদের পর হইতে তাহাদের মধ্যে আবার নূতন করিয়া বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দিতে থাকে। মহাযুদ্ধ শুরু হইবামাত্র ভারতে যে বিরাট জাতীয় জাগরণ দেখা দেয় তাহা মুসলমান-জনসাধারণকেও প্রবল ভাবে নাড়া দিয়াছিল। মুসলমানগণ মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের পতাকাতলে হিন্দুদের সহিত কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি লইয়া যে আন্দোলন শুরু করে তাহা বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। সৌকৎ আলী, মহম্মদ আলী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি মুসলমান-নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া শাসকগণ সেই আন্দোলন দমন করিবার প্রয়াস পায়।

মুসলমান-জনসাধারণের এই জাগরণ ও বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবের বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ হইল মধ্য-প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র। মুসলিম রাষ্ট্র তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটিশের 'ক্রিমিয়ার যুদ্ধ'-এর সময় হইতে সমগ্র বিশ্বের মুসলমান-সম্প্রদায়ের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব দেখা দিতে শুরু করে এবং ইহা সারা বিশ্বের মুসলমান-সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-বোধ জাগাইয়া তোলে। এই ভ্রাতৃত্ববোধ আরও বাড়িয়া যায় 'তুরস্ক-ইতালী যুদ্ধ'-এর সময় এবং ইহা চরম আকার ধারণ করে ১৯১২ খৃস্টাব্দের 'বলকান-যুদ্ধ'-এর সময় হইতে। সারা দুনিয়ার মুসলমানগণ বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বক্ষণে পারস্য সম্পর্কে রুশিয়ার সহিত বৃটিশের দুষ্ট উদ্দেশ্যমূলক সন্ধি মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধিতায় ইন্ধন যোগায়। সর্বশেষে ১৯১৪ খৃস্টাব্দের প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক বৃটিশের চরম শত্রু জার্মাণীর পক্ষ অবলম্বন করায় সারা পৃথিবীর মুসলমানদের মত ভারতের মুসলমান-জনসাধারণও বৃটিশ-শক্তিকে চরম শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে। এইভাবে সারা বিশ্বের মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী ভ্রাতৃত্ববোধ ও নূতন বৃটিশ-বিরোধী জাতীয়তাবোধ একত্রে মিলিত হইয়া ভারতের মুসলমান-জনসাধারণকে বৃটিশ-শাসনের শত্রু করিয়া তোলে। মহাযুদ্ধ ভারতের বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ-প্রচেষ্টার সুযোগ আনিয়া দেয়। শিক্ষিত হিন্দুদের মত শিক্ষিত মুসলমানদেরও একাংশ বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুরু

করে। স্বভাবতঃই বৃটিশের শত্রু জার্মাণীও উহার পক্ষভুক্ত তুরস্কের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের মুসলমানদের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়।

ওয়াহাবী বিদ্রোহের লুপ্তধারা

ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের উত্তর-সীমান্তের ওপারের অঞ্চলটি বৃটিশ-শাসনের অন্তর্ভুক্ত নহে, উহা একটি স্বাধীন অঞ্চল। এই স্বাধীন অঞ্চলটির অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ একদিন ছিল এই ভারতবর্ষেরই মানুষ। তাহারা সৈয়দ আমেদ-এর প্রচারিত ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হইয়া সৈয়দ আমেদের আহ্বানে এই "শত্রু-রাজ্য" বৃটিশ-ভারত ত্যাগ করিয়া সৈয়দ আমেদের সহিত ঐ স্বাধীন অঞ্চলে গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তারপর সেখান হইতে ভারতবর্ষকে শত্রু-কবলমুক্ত করিয়া "ধর্মরাজ্য" স্থাপনের উদ্দেশ্যে শিখ-রাজ্য পাঞ্জাব ও বৃটিশ-রাজ্যের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল। তখন হইতে ঐ স্বাধীন অঞ্চলের অধিবাসীদের বলা হয় "মুজাহিড়" বা মুক্তিকামী মানুষ। একদিন তাহাদের প্রচারিত ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতবর্ষে দাবাগ্নির মত ছড়াইয়া পড়িয়া বৃটিশ-শত্রুর শাসন ভস্মসাৎ করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল। সেই ওয়াহাবী বিদ্রোহের আগুন ১৮২৪ হইতে ১৮৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত জ্বলিয়া নিবিয়া গেলেও উহার উত্তাপ কখনও ভারতের মুসলমান কৃষক-জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ঐ স্বাধীন অঞ্চলটির অধিবাসীদের মন হইতে লোপ পায় নাই। মহাযুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সংঘাতে সেই উত্তাপ হইতে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠে। "মুজাহিড়"গণ বা মুক্তিকামী মুসলমানরা আবার মুক্তির নেশায় মাতিয়া উঠে। ইহারা ভারতবাসী মুসলমানদের সহিত একত্রে মিলিয়া মহাযুদ্ধের সুযোগে ভারতের বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য বৈদেশিক সাহায্যে বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুরু করিয়া দেয়।

সংগ্রামের আহ্বান

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ঐ স্বাধীন অঞ্চলের অধিবাসী "মুজাহিড়"গণ ভারতের বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের সংগ্রাম শুরু করিবার জন্য ভারতের সর্বত্র

আবেদন প্রচার করে। ঐ স্বাধীন অঞ্চল হইতে দুইজন "মুজাহিড়" ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে এবং প্রদেশে প্রদেশে ঘুরিয়া প্রচার-কার্য চালায় ও সংগ্রামের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে। "মুজাহিড়"দের আহ্বানে প্রথম সাড়া দেয় লাহোর-কলেজের পনেরটি ছাত্র। তাহারা কলেজের পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া সীমান্ত অতিক্রম করে এবং "মুজাহিড়"দের স্বাধীন অঞ্চলে গিয়া উপস্থিত হয়। সেখান হইতে তাহারা বৈপ্লবিক কার্যে কাবুলে পৌছিলে কাবুলের পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া পরে নজর-বন্দী করিয়া রাখে। তাহাদের তিন জন পলাইয়া রুশিয়ায় উপস্থিত হইলে জারের পুলিশ তাহাদের গ্রেপ্তার করিয়া বৃটিশ-সরকারের হস্তে অর্পণ করে।

রংপুর জিলা হইতেও একদল মুসলমান "মুজাহিড়"দের সাহায্য করিবার জন্য ৮ হাজার টাকা লইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দিকে যাত্রা করে। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পুলিশ তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু "মুজাহিড়"গণ সংখ্যায় অল্প, তাই তাহাদের আহ্বানে খাস ভারতবর্ষের মধ্যেই সংগ্রামের আয়োজন শুরু হয়। "মুজাহিড়"দের মারফত বৈদেশিক সাহায্য লাভের সম্ভাবনাও দেখা দেয়। স্বাধীন অঞ্চল ও উহার অধিবাসী "মুজাহিড়"গণ হইল বৈদেশিক শক্তি ও দেশীয় মুসলমান বিপ্লবীদের সংযোগ-সূত্র।

ওবেদুল্লা নামক একজন মৌলবী সর্বপ্রথম পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক প্রচার শুরু করেন। তিনি ছিলেন যুক্তপ্রদেশের শাহারাণপুর জিলার এক স্কুলের শিক্ষক। তিনি এক দিকে শিক্ষকতা করিতেন অপর দিকে স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এবং বাহিরে বৈপ্লবিক প্রচার চালাইতেন। এইভাবে প্রচার চালাইয়া ওবেদুল্লা তাঁহার স্কুলের প্রধান মৌলবী মৌলানা মামুদ হাসানকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ইতিমধ্যে স্কুলের কর্তৃপক্ষ ওবেদুল্লার কার্য-কলাপ লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে স্কুল হইতে বিতাড়িত করে। ওবেদুল্লা মৌলানা মামুদ হাসান-এর মারফত স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রচার ও সংগঠন চালাইতে থাকেন। মামুদ হাসানের গৃহে গোপন সভা হইত এবং সেখানে সীমান্ত হইতে

মুজাহিড়দের প্রতিনিধিরাও আসিত। কিছু দিন পরে ওবেদুল্লা দিল্লীতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই স্কুলের ছাত্রদের বৃটিশ-বিরোধী ধর্মযুদ্ধ বা 'জেহাদ'-এর কথা শিক্ষা দেওয়া হইত।

এই মুসলিম বিপ্লবীরা তাঁহাদের এই দুইটি উদ্দেশ্য প্রচার করিতেন: (১) সকল মুসলমান-রাষ্ট্র একত্র হইয়া শত্রু-শাসিত ভারতবর্ষের উপর আক্রমণ করিবে, (২) সেই আক্রমণ শুরু হইবামাত্র ভারতের মুসলমানগণ হিন্দুদের সহিত মিলিত হইয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করিবে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপরেই প্রথম আক্রমণ করিবে। সুতরাং পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের অধিবাসীদের অবিলম্বে প্রস্তুত হইতে হইবে।

দেশের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনের ভার মৌলানা মামুদ হাসান প্রভৃতি সহকর্মীদের উপর অর্পণ করিয়া আবদুল্লা, ফতে মহম্মদ ও মহম্মদ আলি নামক তিন জন সঙ্গী লইয়া ওবেদুল্লা ১৯১৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করেন। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রকে ভারত-আক্রমণে উৎসাহিত করিয়া তোলাই ছিল ওবেদুল্লার এই বিদেশ-যাত্রার উদ্দেশ্য।

তুর্ক-জার্মান-হিন্দ্ ষড়যন্ত্র

ওবেদুল্লা তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া প্রথম আসিয়া উপস্থিত হইলেন 'মুজাহিড়'দের ক্ষুদ্র স্বাধীন অঞ্চলটিতে। 'মুজাহিড়'দের সহিত আলোচনা করিয়া তাঁহারা কাবুলে আসিয়া উপস্থিত হন। 'মুজাহিড়'দের আহ্বানে কাবুলে পূব হইতেই একটি তুর্ক-জার্মাণ দল অবস্থান করিতেছিল। কাবুলে ওবেদুল্লার দলের সহিত তুর্ক-জার্মাণ দলের সাক্ষাৎ হয়। তুর্ক-জার্মাণ সামরিক বিভাগ পূর্ব হইতেই ভারতের মুসলমান-প্রধান উত্তর-পশ্চিম কোনটিকে কেন্দ্র করিয়া এক বৃটিশ-বিরোধী বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের চেষ্টা শুরু করিয়াছিল। ইতিমধ্যেই হিন্দু-বিপ্লবীদের চেষ্টায় ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রের জাল ভারতের পূর্বাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

তুর্ক-জার্মাণদলের সহিত ওবেদুল্লার দলের আলোচনা চলিবার সময়ে ভারত হইতে ওবেদুল্লার সহকর্মী মৌলবী মহম্মদ মিঞা আনসারী ও মৌলানা মামুদ হাসান কাবুলে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। কিছুদিন পর আনসারী সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মামুদ হাসান অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরবের দিকে যাত্রা করেন। তিনি ঘুরিতে ঘুরিতে হেজ্জাজ্ শহরে তুরস্কের সামরিক শাসনকর্তা গালিব পাশার সহিত সাক্ষাৎ করেন। উভয়ের মধ্যে বৃটিশের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সকল নিপীড়িত মুসলমান-জনসাধারণের সশস্ত্র অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই আলোচনার পর পৃথিবীর মুসলমান-জনসাধারণের নিকট একটি 'সংগ্রামের আহ্বান' রচিত হয়। এই আহ্বান-পত্রে মুসলমান-জগতের প্রতিনিধি হিসাবে গালিব পাশা স্বাক্ষর করেন। এই আহ্বান-পত্রখানি বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাসে "গালিবনামা" নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। "গালিবনামা"য় পৃথিবীর সকল মুসলমান-জনসাধারণের প্রতি সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া বলা হয় :—

"এক দিন এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া আল্লার নামে 'জেহাদ'-এ (ধর্মযুদ্ধে) ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। আল্লার ইচ্ছায় তুরস্কের সামরিক বাহিনী ও 'মুজাহিড়'গণ ইস্লামের শত্রুদের পরাভূত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।...অতএব, হে মুসলমান ভাইগণ! যে অত্যাচারী খৃস্টান-শাসনের দাসত্ব-বন্ধনে তোমরা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, সেই অত্যাচারী খৃস্টান-শাসনের উপর আক্রমণ কর! তোমরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিলম্বে তোমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত কর। শত্রুকে পিষিয়া মার, শত্রুর প্রতি তোমাদের ঘৃণা ও ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠুক!

"তোমরা হয়ত শুনিয়াছ, (ভারতবর্ষের) মৌলবী মামুদ হাসান এফেন্দি সাহেব আমাদের কাছে আসিয়া আমাদের পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। আমরা সকলেই তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত একমত হইয়াছি এবং তাঁহাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়াছি। তিনি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলে তোমরা সকলে

তাঁহাকে বিশ্বাস করিবে; অর্থ প্রভৃতি যাহা কিছু তিনি চাহিবেন তাহা দিয়াই তোমরা তাঁহাকে সাহায্য করিবে।"(১)

"গালিবনামা" বহু সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়া সমগ্র মুসলিম জগতে প্রচারের ব্যবস্থা হয়। মামুদ হাসানের সঙ্গী আনসারী সাহেব ভারত-সীমান্তের সকল মুসলমান-উপজাতি ও সারা ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে ইহা প্রচারের ব্যবস্থা করেন। ভারতের সীমান্তের মুসলমানগণ ইহা পাঠ করিয়া বৃটিশের বিরুদ্ধে মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এদিকে কাবুলে ওবেদুল্লার সহিত আরও কয়েকজন প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী আসিয়া যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে মহেন্দ্রপ্রতাপ ও অধ্যাপক বরকতুল্লার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মহেন্দ্রপ্রতাপ ছিলেন হাতরাসের জমিদার-বংশের সন্তান; ১৯১৪ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে ইনি বিদেশ-যাত্রার অনুমতি লইয়া প্রথমে ইতালি, সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণ করিয়া পরে জেনেভায় উপস্থিত হন। জেনেভায় তাঁহার সহিত আমেরিকার গদর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হরদয়ালের সাক্ষাৎ হয়। হরদয়াল তাঁহাকে জেনেভার জার্মাণ-কন্সালের সহিত পরিচিত করাইয়া দেন। ইহার পর তিনি বার্লিনে গমন করেন। বার্লিনের সামরিক বিভাগ তাঁহাকে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ত্বরান্বিত করিবার ভার দিয়া কাবুলে প্রেরণ করে। তিনি কাবুলে আসিয়া ওবেদুল্লার সহিত মিলিত হন।

অধ্যাপক বরকতুল্লা ছিলেন দেশীয় রাজ্য ভূপালের একজন কর্মচারীর পুত্র। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। এই সময় বিখ্যাত বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মাদ্বারা তিনি বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। কিছু দিন পরে তিনি আমেরিকায় যাইয়া হরদয়ালের মারফত গদর সমিতিতে যোগদান করেন। ১৯১৫ খৃস্টাব্দে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সময় গদর সমিতির অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত ইনিও ব্যাটাভিয়ায় আগমন করেন। ইহার পর তিনি জাপানে গিয়া টকিও-বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী-ভাষার অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। জাপান থাকা-কালে 'ইস্লামিক' ফ্রেটারনিটি' (ঐস্লামিক ভ্রাতৃত্ব) নামে একখানি ইংরেজি-

(১) "Ghalibnama"—Quoted from 'Sedition Committee Report', P. 179.

সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালনা করেন। কিছু দিন পর জাপান-সরকার এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দেয় এবং বৈপ্লবিক কার্যের অপরাধে তিনি অধ্যাপকের পদ হইতে অপসারিত হন। ইহার পর তিনি আমেরিকা ঘুরিয়া বার্লিনে আসিয়া প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। বার্লিন হইতে তাঁহাকে কাবুলে প্রেরণ করা হয়। কাবুলে আসিয়া বরকতুল্লা রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ ও ওবেদুল্লার সহিত একযোগে বিপ্লবের আয়োজন করিতে থাকেন।

এই বিখ্যাত বিপ্লবীদের চেষ্টায় ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল জুড়িয়া এক ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠে। সেই সংগঠনের শাখা-প্রাশাখা চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। ইহার মারফত বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইবার জন্য চারিদিকে জোর প্রচার চলিতে থাকে। এই সংগঠনের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বর্ণনা করিয়া 'সিডিসন কমিটি'র রিপোর্টে বলা হয় :—

এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল : "প্রথমে রাজদ্রোহ প্রচার ও পরে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাঁহারা বৃটেনের শত্রুদের সহিত সহযোগিতা করিতে থাকেন। বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহারা গোপন ষড়যন্ত্র, প্রকাশ্যে রাজদ্রোহ প্রচার প্রভৃতি সবকিছুই করিতেন।"(১)

"অস্থায়ী স্বাধীন সরকার"

বিভিন্ন বৈদেশিক রাষ্ট্র যাহাতে ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্য করে এবং উহারা যাহাতে উহাদের সামরিক শক্তি লইয়া বৃটিশ-ভারতের উপর আক্রমণ করে সেই সম্পর্কে ঐ সকল রাষ্ট্রের সহিত সমান রাষ্ট্রীয় মর্যাদা লইয়া আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা ভারতবর্ষের জন্য এক "অস্থায়ী স্বাধীন সরকার" গঠনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনায় মহেন্দ্রপ্রতাপকে করা হয় ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারত-রাষ্ট্রের সভাপতি, অধ্যাক বরকতুল্লাকে করা হয়

(১) Sedition Committee Report, P. 179.

প্রধান মন্ত্রী, আর ওবেদুল্লা প্রভৃতিরা এক একজন বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী নির্বাচিত হন। ইহার পর বিপ্লবীরা আনুষ্ঠানিকভাবে "অস্থায়ী স্বাধীন সরকার" গঠন করেন। আপাততঃ কাবুল হইল এই "অস্থায়ী সরকার"-এর কর্মকেন্দ্র।

এবার "অস্থায়ী সরকার" কাজ শুরু করে। প্রথমে এই "অস্থায়ী সরকার"-এর নামে দুইখানি পত্র প্রেরিত হয়—একখানি রুশ সম্রাটের নিকট ও অপরখানি তুর্কিস্থানের রুশ শাসনকর্তার নিকট। এই দুইখানা পত্রেই মহেন্দ্রপ্রতাপ "স্বাধীন ভারত-সরকার"-এর "প্রেসিডেণ্ট" হিসাবে স্বাক্ষর করেন। রুশীয়ার সম্রাট জারের নিকট লিখিত পত্রখানি একটি সোণার পাতে খোদিত করিয়া প্রেরিত হইয়াছিল। এই পত্র দুইখানিতে রুশ সম্রাট ও তুর্কিস্থানের শাসনকর্তাকে বৃটিশের সহিত উহাদের মৈত্রী-চুক্তি বাতিল করিয়া ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে অনুরোধ করা হয়।

ইহার পর "অস্থায়ী সরকার" তুরস্ক-সরকারের সহিত একটি মৈত্রী-চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাব করে। এই সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ওবেদুল্লা মক্কায় মৌলানা মামুদ হাসানের উদ্দেশে একখানি পত্র রচনা করেন। এই পত্রখানি ও মহম্মদ মিঞা আনসারী-লিখিত অপর একখানি পত্র এক খণ্ড হলুদ রংয়ের রেশমী বস্ত্রের উপর লিখিত হয়। ওবেদুল্লা ইহার সহিত একটি ভূমিকা জুড়িয়া দেন। তারপর উক্ত দুইখানি পত্র ও ভূমিকা লিখিত রেশমী বস্ত্রখণ্ড মামুদ হাসানের হাতে পৌছাইবার জন্য সিন্ধুদেশের হায়দরাবাদ নামক স্থানের শেখ আব্দুর রহিমের নকট প্রেরিত হয়। ওবেদুল্লা আব্দুর রহিমকে অনুরোধ করিয়া পাঠান যে, আব্দুর রহিম নিজে অথবা অপর কোন হাজী(১) দ্বারা এই রেশমী চিঠিখানি যেন মক্কায় মামুদ হাসানের নিকট পৌছান হয়। এই দুইখানি চিঠির মধ্যেই ষড়যন্ত্রের বহু গোপন তথ্যের উল্লেখ ছিল বলিয়া এত সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। ওবেদুল্লার চিঠির মধ্যে

(১) মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা মক্কার তীর্থ বা 'হজ' করিয়া ফিরিয়াছেন তাঁহাদের "হাজী" বলা হয়।

ভারতবর্ষের বৈদেশিক আক্রমণের প্রস্তাব ছিল, আর মহম্মদ মিঞার চিঠির মধ্যে ষড়যন্ত্রের ব্যাপক আয়োজনের বহু গোপন সংবাদ উল্লেখ করা হইয়াছিল, যেমন :—জার্মাণ ও তুরস্কের সামরিক প্রতিনিধিদের কাবুলে আগমন, লাহোরের ছাত্রদের কাবুলে উপস্থিতি, "গালিবনামা"র প্রচার, "অস্থায়ী স্বাধীন সরকার" গঠন, ধর্মযুদ্ধের জন্য "আল্লার সৈন্যবাহিনী", ইত্যাদি।

রেশমী চিঠিখানি সিন্ধুদেশে পৌঁছিবার পর উহা পুলিশ হস্তগত করে। ১৯১৬ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বৈপ্লবিক আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মৌলানা মামুদ আনসারী, আবদুল্লা, ফতে মহম্মদ, মহম্মদ আলি এবং আরও এক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের লইয়া উক্ত রেশমী চিঠির ভিত্তিতে ভারত-সরকার এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু করে। এই ষড়যন্ত্রই ভারতের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ইতিহাসে "রেশমী চিঠির ষড়যন্ত্র" নামে বিখ্যাত। কিন্তু মামলার বিচারে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হইল না। বিপ্লবীরা বিচারে মুক্তি লাভ করিলেও তাঁহাদের ১৮১৮ খৃঃ-এর তিন আইন অনুসারে আটক করা হয়। তাঁহাদের গ্রেপ্তারের পর ভারত-সরকার সীমান্ত-অঞ্চলে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে এবং সীমান্ত-অঞ্চলের মুসলমানদের উপর কড়া নজর রাখে। মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতুল্লা, ওবেদুল্লা প্রভৃতি বিপ্লবীরাও আর আশা নাই বুঝিয়া আপাততঃ বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯০৭-১৯১৬)

১৯০৭ খৃস্টাব্দ

বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাষ্ট্র হইতে যে বিপ্লবের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিয়াছিল তাহা প্রথমে বাংলায় ও পরে পাঞ্জাবে বিরাট অগ্নি-প্রবাহ সৃষ্টি করে। বাংলার পরেই পাঞ্জাব ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করিয়াছে। কংগ্রেসের জন্মের পর নরমপন্থা ও চরমপন্থা নামে জাতীয় সংগ্রামের যে দুইটি স্পষ্ট ধারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট সংঘাতের সৃষ্টি করে সমগ্রভাবে পাঞ্জাব উহার দ্বিতীয় ধারাটিকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করে। সংগ্রামী পাঞ্জাব চরমপন্থার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠে। পাঞ্জাব-কেশরী লালা রাজপত রায় ছিলেন সেই অগ্নিমন্ত্রের পুরোহিত। মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পালের মতই লালা লাজপত রায় বৈপ্লবিক ভাবধারায় পাঞ্জাব ও পশ্চিম-ভারতকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তৎকালীন জাতীয় জাগরণের মুখে কংগ্রেস-নেতৃত্বের নরম বা আপসপন্থার বিরুদ্ধে ইঁহারা সমবেত চেষ্টায় ভারতের সংগ্রামী যুব-সম্প্রদায়কে সংগ্রামের যে পথ দেখাইয়াছিলেন সেই সংগ্রামই অবশেষে দেশব্যাপী বৈপ্লবিক সংগ্রামে পরিণত হয়। লাজপত রায়ের পাঞ্জাব সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামকেই একমাত্র জাতীয় সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করে।

লাজপত রায় জাতীয় কংগ্রেসের উচ্চ আসন হইতে পাঞ্জাবী জনগণের নিকট কেবল বৈপ্লবিক সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, ভারতের অন্যান্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের মত তিনিও এই আহ্বানকে সাংগঠনিক রূপে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সেই প্রয়াসের ফলেই মহারাষ্ট্র

ও বাংলার মত পাঞ্জাবেও একদল একনিষ্ঠ বৈপ্লবিক কর্মী গড়িয়া উঠিয়াছিল। তিনি তাঁহার বিরাট ব্যক্তিত্ব দিয়া সেই কর্মীদলের কর্ম-প্রচেষ্টাকে শাসকগণের শ্যেনদৃষ্টি হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তিলকের মতই শাসকগোষ্ঠীর প্রথম আঘাত নিজে বুক পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র ভারতের এ যুগের বিপ্লববাদের গুরু হইলেও বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গই সাক্ষাৎভাবে পাঞ্জাবে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে সাহায্য করে। ১৯০৬ খৃস্টাব্দে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে তিলকের সহিত লাজপত রায়ের বাংলা-ভ্রমণ ও বাংলার বিপ্লবী নায়কদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন মোটেই অর্থহীন নয়। বাংলাদেশ হইতে ফিরিয়া গিয়া তিনি পাঞ্জাবের জনগণের মধ্যে বিপ্লবের বীজ ছড়াইতে শুরু করেন, আর সেই বীজ হইতেই কালক্রমে বিপ্লব-প্রচেষ্টা অঙ্কুরিত হইয়া উঠে। পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টা বঙ্গ-ভঙ্গের প্রবল আন্দোলন ও বাংলার বৈপ্লবিক প্রভাবেরই সাক্ষাৎ পরিণতি। লাজপত রায়ের বঙ্গ-ভ্রমণের অল্প কিছু দিন পরেই পাঞ্জাবের আকাশে নূতন সংগ্রামের যে রাঙা মেঘ দেখা দেয় তাহা লক্ষ্য করিয়া পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোট-লাট আতঙ্কে অস্থির হইয়া বড় লাটকে লিখিয়া পাঠান যে, সর্বত্রই জনসাধারণের মধ্যে একটা নূতন পরিবর্তন দেখা যাইতেছে, তাহাদের মনে একটা "নূতন হাওয়া" লাগিয়াছে, তাহারা যেন কিছু-একটার অপেক্ষা করিতেছে।(১) শাসকগোষ্ঠীর এই আতঙ্ক অহেতুক নয়, পাঞ্জাবীদের বৈপ্লবিক ভাবধারা গ্রহণ ভারতের ইংরেজ-শাসনের পক্ষে এক ভয়ংকর বিপদের ইঙ্গিত ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কারণ "বহু বৎসর হইতেই পাঞ্জাব ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সৈন্য সংগ্রহের সর্বাপেক্ষা উর্বর-ভূমি, আর আজিও পাঞ্জাবের সেই সুনাম অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।"(২) পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক চাঞ্চল্যের উপর বাংলাদেশের সমসাময়িক বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করিয়া 'সিডিসন কমিটি' মন্তব্য করে :

(১) Punjab Provincial Record, 1907.

(২) 'Sedition Committee Report,' P, 141.

এই "নূতন হাওয়া" সম্পর্কে "মনে রাখা প্রয়োজন যে, এই সময়ে (বাংলাদেশের) 'যুগান্তর' পত্রিকা ও এই ধরণের অন্যান্য প্রচার-সাহিত্য প্রতিদিনই বাংলাদেশের হাজার হাজার লোকের মনে বিষ ঢালিয়া দিতেছিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আলিপুর ও ঢাকার ষড়যন্ত্রকারীরা তাহাদের ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিতেছিল, সভ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদের দল ভারী করিতেছিল এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত হইতেছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই নূতন ভাবধারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও যে ঝড় তুলিবে তাহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।"(১)

১৯০৭ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই পাঞ্জাবের আকাশে সংগ্রামের ঝড় উঠিতে শুরু করে। পাঞ্জাবের তৎকালীন ছোটলাট স্যার ডেনজিল ইবেট্‌সন সেই ঝড় লক্ষ্য করিয়া অবিলম্বে বড়লাটকে লিখিয়া পাঠান:

"প্রদেশের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে এই নূতন ভাবধারা কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের লোকেরা হইল উকিল, কেরানী ও ছাত্র। প্রদেশের কেন্দ্রস্থলের দিকে তাকাইলে দেখা যায় যে, শহরের লোকের মনোভাব ক্রমশঃ উত্তেজনাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ ও কর্মচাঞ্চল্যের লক্ষণও দেখা যাইতেছে। লাহোরের উত্তেজনা-সৃষ্টিকারীরা অমৃতসর ও ফিরোজপুর শহরে আসিয়া রাজদ্রোহের মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। ফিরোজপুরে তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ করা সম্ভব হইয়াছে, কিন্তু অমৃতসরে তাহা সম্ভব হয় নাই। রাওয়ালপিণ্ডি, শিয়ালকোট ও লায়ালপুর শহরে ইংরেজ-বিরোধী প্রচার প্রকাশ্যভাবেই বিশেষ জোরের সহিত চালান হইতেছে। প্রদেশের রাজধানী লাহোরের প্রচার-পদ্ধতি ভীষণ উগ্র এবং তাহার ফলে ঐ শহরে একটা বিক্ষোভের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।" ছোটলাটের রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, লাহোরে কয়েকজন ইংরেজ অপমানিত হইয়াছে, রাজদ্রোহ প্রচারের জন্য একটি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও প্রেসের মালিকের শাস্তি হইলে সরকার-বিরোধী দাঙ্গা

(১) 'Sedition Committee Report'. P. 141.

শুরু হইয়াছিল; শিক্ষিত চরমপন্থী প্রচারকগণ প্রকাশ্য জনসভায় রাজদ্রোহ প্রচার করিতেছে, ইত্যাদি।(১)

কিন্তু ছোটলাট সাহেবের আতঙ্কের ইহাই একমাত্র কারণ নহে, তাঁহার আতঙ্কের সর্বাপেক্ষা "বিপজ্জনক" কারণটি ছিল অন্যত্র—গ্রামাঞ্চলে ও শিল্প-কলকারখানায়। তখন চন্দ্রভাগা নদীর খালের জল-কর আদায়ের বিরুদ্ধে সারা পাঞ্জাবের কৃষকদের মধ্যে এক বিরাট বিক্ষোভের ঝড় উঠিতেছিল। এই আন্দোলনে কৃষকদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল পাঞ্জাবের কল-কারখানা ও উত্তর-পশ্চিম রেলপথের শ্রমিকগণ। প্রদেশব্যাপী এই কৃষক-শ্রমিক আন্দোলনের সহিত শিক্ষিত সম্প্রদায় উহার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা লইয়া যোগদান করে। 'সিডিসন কমিটি'র কথায়:

"চন্দ্রভাগা নদীর খাল-উপনিবেশের চাষীদের রাজস্ব সম্পর্কে প্রস্তাবিত আইন গ্রামবাসীদের মধ্যে তুমুল বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিয়াছিল। তাহার সহিত 'বড়ি দোয়াব' অঞ্চলের জল-কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধেও বিরাট বিক্ষোভ যুক্ত হয়। ছোটলাট সাহেব বলেন যে, এই বিক্ষোভ দমন করা খুবই কঠিন এবং শিখদের রাজদ্রোহমূলক মনোভাবও তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা দেশীয় পুলিশকে দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী বলিয়া গালি দিতেছিল, দেশীয় পুলিশকে অবিলম্বে সরকারী চাকুরি ত্যাগ করিবার জন্য উসকানি দেওয়া হইতেছিল এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর প্রতিও সেই আবেদন করা হইতেছিল। এই সময়ে আর একটি ঘটনার লক্ষণ দেখা যাইতেছিল যে, যখন উত্তর-পশ্চিম রেলপথের এক অংশের শ্রমিকগণ ধর্মঘট ঘোষণা করে তখন তাহাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্য বহু প্রকাশ্য জনসভা হয় এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য বহু টাকা চাঁদা উঠে। ছোটলাট সাহেব লক্ষ্য করেন যে, নেতৃবৃন্দের অনেকে হয় বল প্রয়োগের দ্বারা, না হয় সমগ্র জনসাধারণের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বৃটিশকে এদেশ হইতে, অন্ততঃ শাসন-ক্ষমতা হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা আরম্ভ করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সরকারের শাসন-যন্ত্র অচল করিয়া

(১) Punjab Provincial Records, 1907.

দিবার জন্য জনসাধারণের মধ্যে ভয়ংকর বৃটিশ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ছোটলাট সাহেব প্রদেশের সমগ্র অবস্থাকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন এবং ইহার আশু প্রতিকার দাবি করেন।"(১)

এই "বিপজ্জনক" আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নায়ক লালা লাজপত রায় বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রদেশব্যাপী কৃষক ও শ্রমিক-সংগ্রামের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ ও সদ্ব্যবহার করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার এই সময়ে লিখিত একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। পরবর্তীকালের বিখ্যাত বিপ্লবী ভাই পরমানন্দ তখন ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছিলেন। ভাই পরমানন্দের নিকট এই কৃষক-আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া লাজপত রায় ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১১ই এপ্রিল লিখিয়া পাঠান: "জনসাধারণ ক্রোধে ফাটিয়া পড়িতেছে। এমন কি কৃষিজীবী শ্রেণীর বিক্ষোভও চরমে উঠিয়াছে। আমার একমাত্র ভয় এই যে, হয়ত উপযুক্ত সুযোগ আসিবার পূর্বেই বিস্ফোরণ ঘটিবে।"(২) মহারাষ্ট্রের প্লেগ ও বাংলাদেশের বঙ্গভঙ্গ প্রভৃতি কার্জনী নীতির মতই পাঞ্জাবে খাল-উপনিবেশের করবৃদ্ধি ও চন্দ্রভাগা খালের জলকর-আইনকে উপলক্ষ করিয়া পাঞ্জাবের প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু হয়।

প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা

সারা প্রদেশের উপর দিয়া যখন গণ-আন্দোলনের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছিল তখন সেই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। যুবক-সহকর্মীদের সহিত লালাজী নিজেও এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। বৈপ্লবিক প্রচার ও সংগঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন বৈপ্লবিক সাহিত্য। কিন্তু বাংলাদেশে যেমন অরবিন্দ, বারীন্দ্র, ভূপেন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব, গণেশ দেউস্কর প্রভৃতি একদল খ্যাতনামা বিপ্লবী লেখক দেখা দিয়াছিলেন,

(১) Sedition Committee Report, P. 142.

(২) Sedition Committee Report, P. 143

পাঞ্জাবে তাহা ছিল না। পাঞ্জাবে এই অভাব পূরণের জন্য লালাজী ১৯০৭ খৃস্টাব্দে ভাই পরমানন্দের নিকট ইংলণ্ডে লিখিয়া পাঠান যে, দেশে "বৈপ্লবিক, রাজনৈতিক, অথবা ঐতিহাসিক উপন্যাস" প্রয়োজন, পরমানন্দ যেন ইংলণ্ডে কৃষ্ণ বর্মার নিকট ঐ সকল সাহিত্য ক্রয়ের জন্য অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করে। বৈপ্লবিক সংগঠন ও প্রচেষ্টার জন্য অর্থের প্রয়োজন। লণ্ডনে কৃষ্ণ বর্মা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে যে দশ হাজার টাকা দান করিবার কথা ঘোষণা করিয়াছিলেন তাহার একটা অংশ পাঞ্জাবের জন্য পাওয়ার চেষ্টা করিতে তিনি উক্ত পত্রে পরমানন্দকে অনুরোধ করেন। পাঞ্জাবের বৈপ্লবিক সংগঠন তৈরী করিবার কার্যে তাঁহার সহায় ছিলেন পাঞ্জাবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক অজিত সিং আর পাঞ্জাবের "প্রথম বিপ্লবী" বলিয়া খ্যাত সুফী অম্বাপ্রসাদ।

কিন্তু লালা লাজপত রায় ও অজিত সিং গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া সেই আন্দোলন পরিচালিত করিতেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে এই কার্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করা সম্ভব হইত না। তাই পাঞ্জাবে বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার প্রধান দায়িত্ব পড়ে সুফি অম্বাপ্রসাদের উপর। সুফি অম্বাপ্রসাদের সহকর্মীদের মধ্যে একজন ছিলেন ডাঃ হরিচরণ মুখার্জি নামক এক বাঙ্গালী বিপ্লবী। অম্বাপ্রসাদের পরিচালনায় পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লবীরা লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংয়ের পরিচালিত ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আড়ালে থাকিয়া বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে থাকেন। অম্বাপ্রসাদের অন্যতম সহকর্মী ডাঃ হরিচরণ মুখোপাধ্যায় ১৯০৭ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি একবার কলিকাতার যুগান্তর সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে আসিয়া পাঞ্জাবের সাংগঠনিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেন :

"পাঞ্জাবে তাঁহারা জনকতক বড় নেতার পশ্চাতে থাকিয়া কার্য আরম্ভ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের সেই সময়ের রাজনৈতিক গোলমালের নায়কেরা এই দলের লোক।......তিনি (অম্বাপ্রসাদ) পাঞ্জাবের সর্বপ্রথম বিপ্লবী।"(১)

(১) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬৫।

দমননীতির প্রকোপ

পাঞ্জাবের আন্দোলনের ব্যাপকতা ও বৈপ্লবিক লক্ষণসমূহ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারকে আতঙ্কিত করিয়া তোলে। এই আন্দোলনের আড়ালে বিপ্লববাদীদের নেতৃত্ব ও কর্মতৎপরতা সরকারের দৃষ্টি এড়ায় নাই। ইহাতে শাসকদের আতঙ্ক আরও বৃদ্ধি পায়। কাজেই তাহারা ইহাকে অবিলম্বে চূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। পাঞ্জাবের ছোটলাট প্রথম হইতেই প্রতিকারের দাবি জানাইতেছিলেন। বড়লাটের সম্মতিতে সেই প্রতিকার-ব্যবস্থা, অর্থাৎ সরকারী দমননীতির আক্রমণ শুরু হয়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে এই সমগ্র পাঞ্জাবের সর্বজনমান্য নায়ক লালা লাজপত রায় ও তাঁহার প্রধান সহকর্মী অজিত সিংহকে ১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন আইন অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। পাঞ্জাবে "রাজদ্রোহ"মূলক জন-সমাবেশ বেআইনী ঘোষণা করিবার জন্য ঐ বৎসরের ১লা নভেম্বর বড়লাটের শাসন-পরিষদে যে বিল উপস্থিত করা হয় তাহা সমর্থন করিয়া স্বয়ং বড়লাট দেশের সম্মুখে এই আতঙ্কের ছবি ফুটাইয়া তোলেন:

"এই বৎসরের গোড়ার দিকে যে সকল ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা আমরা বিস্মৃত হইতে পারি না। লাহোরের দাঙ্গা, ইংরেজ-সাহেবদের প্রতি অপমানকর আচরণ, পিণ্ডি নামক স্থানের দাঙ্গা, পাঞ্জাব প্রদেশের অবস্থা সম্পর্কে উহার ছোটলাটের দ্বারা বর্ণিত ভয়ংকর চিত্র, তাহার ফলস্বরূপ লালা লাজপত রায় ও অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তার এবং অর্ডিনান্স প্রয়োগ: আর এই অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বঙ্গে প্রতিদিনকার নরহত্যা, আক্রমণ, লুটপাট, বিদেশী বর্জন ও সব কিছু মিলিয়া একটা ভয়ংকর অরাজক অবস্থার সৃষ্টি, এই সকলের প্রতি "রাজদ্রোহ"-মূলক প্রকাশ্য বক্তৃতা, সংবাদপত্রে "রাজদ্রোহ"মূলক প্রবন্ধ, "রাজদ্রোহ"মূলক প্রচার-পত্র প্রভৃতিদ্বারা বেপরোয়া বিক্ষোভসৃষ্টিকারীদের উৎসাহ দান ও গুপ্ত দল-সমূহের ভয়ংকর ইংরেজ-বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার অবিরাম চেষ্টা—ইহাই হইল এই বৎসরের (১৯০৭ খৃস্টাব্দের) প্রথম দিকের সমগ্র অবস্থার চিত্র।"(১)

(১) Govt. of India Records, 1907.

ইহার পর হইতে সারা পাঞ্জাবের উপর দিয়া যে অত্যাচার ও গ্রেপ্তারের বন্যা বহিয়া যাইতে থাকে তাহার কোন তুলনা নাই। কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যশ্রেণীর শত শত লোক গ্রেপ্তার হয়, জেলের মধ্যে তাহাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে, গ্রামের কৃষকদের ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া, জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই অত্যাচারের ফলে পাঞ্জাবের সংগ্রাম-শক্তি সাময়িকভাবে দুর্বল হইয়া পড়ে এবং বৈপ্লবিক সংগঠন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। কিন্তু এই বর্বরসুলভ অত্যাচার সারা প্রদেশে এক অতলস্পর্শী বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে এবং শতগুণ শক্তিশালী গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া রাখে।

* * * *

১৯০৮—০৯ খৃস্টাব্দ

১৯০৭ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগের ও ১৯০৮ খৃস্টাব্দের দমননীতির প্রচণ্ড দাপটে পাঞ্জাবে বিপ্লবের প্রথম সাংগঠনিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়, এমন কি বহুক্ষেত্রে দুর্বল সংগঠন নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। কেবল কয়েকজন মাত্র নেতা বাহিরে থাকিয়া আবার বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে থাকেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯০৮ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে লালা লাজপত রায়ের প্রধান সহকর্মী অজিত সিং জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বাহিরে আসেন। অজিত সিং মুক্তি পাইয়া সুফি অম্বাপ্রসাদের সহিত মিলিত হন এবং তার ফলে বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার কাজ আবার দ্রুতগতিতে আগাইয়া চলে। তাঁহাদের চেষ্টায় প্রদেশের রাজধানী লাহোরে গুপ্ত সমিতির কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং লাহোরকে কেন্দ্র করিয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে, এমন কি গ্রামাঞ্চলেও বৈপ্লবিক সংগঠনের শাখা গড়িয়া উঠিতে থাকে। বিপ্লবী নেতারা এবার প্রদেশের বিক্ষুব্ধ জনগণের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইবার উপর বিশেষ জোর দেন। "গোটা ১৯০৯ খৃস্টাব্দ ব্যাপীয়া লাহোর হইতে 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রচার-সাহিত্যের স্রোত বহিতে থাকে।"(১) এই প্রচার-সাহিত্য লাহোর হইতে বিভিন্ন শহরে এবং শহর হইতে গ্রামাঞ্চলে গিয়া পৌছিতে থাকে।

---

(১) Sedition Committee Report, P. 142.

সরকার এত কষ্টে যে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে একবার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়াছেন সেই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার লক্ষণ আবার দেখা দিবামাত্র সরকার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ইংরেজ-সরকারের সৈন্যবাহিনীর "সৈন্য-সংগ্রহের উর্বর ক্ষেত্রটি"কে বিপ্লবের স্পর্শ হইতে মুক্ত রাখিবার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য ইংরেজ-সরকার উন্মত্ত হইয়া উঠে। সারা পাঞ্জাব ব্যাপীয়া গ্রেপ্তারের হিড়িক পড়িয়া যায়, দলে দলে লোক গ্রেপ্তার হইতে থাকে। বিপ্লব-প্রচেষ্টার নায়ক অজিত সিং ও সুফি অম্বাপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য সারা প্রদেশ জুড়িয়া পুলিশ-গোয়েন্দার জাল বিস্তৃত হয়। এই অবস্থায় আর বেশী দিন গ্রেপ্তার এড়ান অসম্ভব বুঝিয়া বৈপ্লবিক কর্মীদের পরামর্শে অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ বিদেশে পলায়নের সিদ্ধান্ত করেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি পাঞ্জাবের প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার এই দুই বিখ্যাত নেতা গোপনে জাহাজযোগে ইরানে পলায়ন করেন।(১) প্রথম যুগে পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যে সকল বাঙ্গালী অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন হৃষিকেশ নামক এক বাঙ্গালী যুবক তাঁহাদের অন্যতম। হৃষিকেশও অজিত সিং এবং অম্বাপ্রসাদের সহিত ইরানে পলাইয়া যান।(২)

প্রচণ্ড দমননীতির দাপটের মধ্যেও যে সকল বিপ্লবী পাঞ্জাবের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবার জন্য দেশে রহিলেন তাঁহাদের মধ্যে অজিত সিংয়ের ভ্রাতা ও লালচাঁদ ফালাক নামক এক ব্যক্তি পরে বৈপ্লবিক সাহিত্য ও বোমা তৈরীর নিয়মাবলীসহ গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার এই দুঃসময়ে বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ইংলণ্ড হইতে ভাই পরমানন্দ পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবামাত্র পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। তাঁহার

(১) অজিত সিং পরে ইরান হইতে আমেরিকায় গিয়া গদর সমিতিতে যোগ দান ও ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুফি অম্বাপ্রসাদ ইরানে থাকিয়াই ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করেন। শোনা যায়, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজেরা নাকি তাঁহাকে হত্যা করে।

(২) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : "দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম," পৃঃ ৬৫।

গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্য ও মাণিকতলার বাগানবাড়ীতে প্রাপ্ত বোমা তৈরীর নিয়মাবলীর অনুরূপ একটি নিয়মাবলী হস্তগত করে। এইজন্য তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়।

* * * *

১৯১০—১২ খৃস্টাব্দ

নূতন প্রচেষ্টা

১৯০৯ খৃস্টাব্দের দমননীতির দাপটে একদিকে যেমন পাঞ্জাবের নবগঠিত বৈপ্লবিক সংগঠন ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় তেমনি উহারই আড়ালে থাকিয়া নূতন বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। এই নূতন প্রচেষ্টাই বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ও বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করিয়া একদিন প্রবলপ্রতাপ ইংরেজ-শাসনকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল।

হরদয়াল নামে দিল্লীর অধিবাসী এক যুবক পাঞ্জাব-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি লইয়া ইংলণ্ডে যান। ইংলণ্ডে থাকাকালে তিনি বিখ্যাত ভারতীয় বিপ্লবী কৃষ্ণ বর্মার নিকট হইতে বিপ্লববাদে দীক্ষা লাভ করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ইহার পর ভারতবর্ষে ইংরেজ-সরকারের শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রতিবাদে সরকারী বৃত্তি ত্যাগ করিয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদানের উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে আগমন করেন। লাহোরে আসিয়া তিনি এক রাজনীতি শিক্ষার ক্লাস আরম্ভ করেন। এই ক্লাসের ছাত্র ছিলেন দুইজন —জে. এন. চাটার্জি নামে এক বাঙ্গালী ও দীননাথ নামে যুক্তপ্রদেশের এক যুবক। হরদয়াল তাঁহার ছাত্রদের সাধারণ বয়কট ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা ভারতের ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিবার উপায় শিক্ষা দিতেন। ইহার পর তিনি ১৯১০ খৃস্টাব্দে আবার ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া আমেরিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হরদয়ালের ভারত ত্যাগের পর দীননাথ ও চাটার্জি আমীরচাঁদ নামে

দিল্লীর এক স্কুল-শিক্ষকের সহিত পরিচিত হন। ইহার কিছু দিন পরেই চাটার্জি ব্যারিস্টারী পরীক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। ভারত ত্যাগ করিবার পূর্বে তিনি দীননাথকে রাসবিহারী বসু নামক এক বাঙ্গালী বিপ্লবীর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। রাসবিহারী তখন দেরাদুনে আরও কয়েক জন যুবককে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিতেছিলেন।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে রাসবিহারী বসু 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া অল্প কয়েকদিন পরেই প্রমাণাভাবে মুক্তি লাভ করেন। ইহার পর তিনি দেরাদুনে আসিয়া দেরাদুনের 'ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট'-এ হেড ক্লার্কের চাকুরি গ্রহণ করেন এবং কিছু দিন নিষ্ক্রিয় থাকিয়া পরে উত্তর-ভারতে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট হন। রাসবিহারী যাঁহাদের লইয়া কাজ শুরু করেন তাঁহাদের মধ্যে আমীরচাঁদ, দীননাথ, অবোধবিহারী ও বালমুকুন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন কলেজের ছাত্র। বসন্তকুমার বিশ্বাস নামক এক বাঙ্গালী বিপ্লবীও এই বিপ্লবীদলের অন্তর্ভুক্ত হন। তখন ইনি ছিলেন রাসবিহারীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ।

এই গুপ্ত সমিতির শাখা-প্রশাখা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। লাহোর ও দিল্লীর ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার চলিতে থাকে। ছাত্রদের মধ্যে নিয়মিত-ভাবে বৈপ্লবিক প্রচার-পত্র বিলি করার ব্যবস্থা হয়। এই সময়ে লাহোর ও দিল্লীর বহু ছাত্র এই গুপ্ত সমিতির সভ্য হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে রাসবিহারী সমিতির বিশিষ্ট সভ্যদের বোমা তৈরীর উপায় ও রিভলভার-বন্দুক ছোঁড়া শিক্ষা দেন। রাসবিহারী কলিকাতার যুগান্তর সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগা-যোগ রাখিয়াই কাজ চালাইতে থাকেন। এই সময়ে কলিকাতার যুগান্তর সমিতির বহু বৈপ্লবিক ইস্তাহার লাহোর ও দিল্লীর ছাত্রদেরে মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সকল আয়োজনে ১৯১২ খৃস্টাব্দ প্রায় শেষ হইয়া আসে। ইতিমধ্যে রাসবিহারীর নেতৃত্বে যুক্তপ্রদেশ ও লাহোরের বিপ্লবীরা একটা ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিকল্পনা লইয়া কাজ শুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হন।

বড়লাট হত্যার চেষ্টা

১৯১২ খৃস্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড হার্ডিংজ ভারত-ভ্রমণ শেষ করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিবেন। যথা সময়ে বিপ্লবীরা এই সংবাদ জানিয়া যায়। তাঁহারা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। বড়লাট সাহেব রেল-স্টেশন হইতে জুড়ি-গাড়ী.ত চড়িয়া দিল্লী প্রবেশ করিতে উদ্যত, এমন সময় তাঁহার গাড়ীর উপর বোমা পড়ে। বোমাটি ছিল 'পিন-বন্ধ'শ্রেণীর, অর্থাৎ বোমাটির মধ্যে বিস্ফোরক পদার্থের সহিত বহু ছোট পেরেক দেওয়া হইয়াছিল। বোমা বিস্ফোরণের ফলে বড়লাট সাংঘাতিকরূপে আহত হন এবং তাঁহার গাড়ীর পশ্চাৎ ভাগের এক জন গার্ড নিহত হয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান দর্শকশ্রেণীর উপর পুলিশের নির্মম অত্যাচার চলে, কিন্তু বোমা-নিক্ষেপকারী.ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

১৯১৩ খৃস্টাব্দ

দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা

এত চেষ্টা ও আয়োজন সত্ত্বেও বড়লাটকে হত্যা করা সম্ভব হইল না দেখিয়া বিপ্লবীরা মরিয়া হইয়া উঠে, তাহারা আবার নূতন পরিকল্পনা করে। এবারের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার ভার পড়ে লাহোর-সংগঠনের উপর। লাহোরের বিপ্লবীরা লক্ষ্য করিয়াছেন যে, লাহোরের 'লরেন্স গার্ডেন'-এর একটি রাস্তা দিয়া বহু ইংরেজ দল বাঁধিয়া সন্ধ্যাকালে যাতায়াত করে। বিপ্লবীরা এক সঙ্গে বহু ইংরেজ-সাহেবকে হত্যা করিয়া বড়লাট-বধের ব্যর্থতা পূরণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর বসন্ত বিশ্বাস সন্ধ্যার অন্ধকারে লুকাইয়া 'লরেন্স গার্ডেন'-এর উক্ত রাস্তার উপর একটি ভয়ংকর বিস্ফোরক বোমা পাতিয়া রাখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, কোন ইংরেজ-সাহেব ঐ পথে আসিবার পূর্বেই একজন ভারতীয় চাপরাশী ঐ পথে সাইকেলে

যাইবার সময় সাইকেলের চাকার ধাক্কা লাগিয়া বোমাটি ফাটিয়া যায় এবং চাপরাশীটি তৎক্ষণাৎ নিহত হয়।

এই সময়ে লাহোরে কতগুলি বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিতরণ করা হয়। সেই সকল ইস্তাহারের কতকগুলি পরবর্তীকালে কলিকাতার 'রাজাবাজার বোমার মামলা'য় অভিযুক্ত অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া পরে প্রমাণিত হয়। এই সকল ইস্তাহার বিতরণ করিবার সময় পুলিশ কয়েক জন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের মধ্যে দীননাথ অন্যতম। দীননাথ গ্রেপ্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গে এক স্বীকারোক্তি করিয়া রাজসাক্ষী হয়। তাহার স্বীকারোক্তির ফলে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাস গ্রেপ্তার হন। গুপ্ত সমিতির পরিচালক রাসবিহারী বসুকে ধরিবার জন্য পুলিশ পাঞ্জাব ও দিল্লী তোলপাড় করে। কিন্তু রাসবিহারী ততক্ষণে বহু দূরে চলিয়া গিয়াছেন।(১) এবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হয়। এই মামলাই 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে বিখ্যাত। মামলার বিচারে আমীরচাঁদ, অবোধবিহারী, বালমুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ষড়যন্ত্র ও 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম'-এর অপরাধে ফাঁসীর আদেশ হয়। সরকার রাসবিহারীকে 'পলাতক আসামী' বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য কয়েক সহস্র টাকার একটি পুরস্কার ঘোষণা করে।

হরদয়াল ও গদর সমিতি

১৯১১ খৃস্টাব্দে হরদয়াল মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে উপস্থিত হন। সানফ্রান্সিসকো পৌঁছিয়াই তিনি আমেরিকা-প্রবাসী শিখদের মধ্যে প্রায় দুই বৎসর কাল ধরিয়া বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালান। তাঁহার বৃটিশ-বিরোধী ও বৈপ্লবিক প্রচারে প্রবাসী শিখদের মধ্যে স্বাধীনতার প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিতে থাকে।

(১) রাসবিহারী বসুর পরবর্তী ক্রিয়া-কলাপ এই অধ্যায়ের শেষ দিকে এবং 'যুক্ত প্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য

হরদয়াল, বরকতুল্লা,(১) পরমানন্দ, রামচন্দ্র প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা আমেরিকা ও কানাডার বিভিন্ন শহরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে সভা করিতেন। সেই সকল সভায় ভারতের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লব ও সেই বিপ্লব পরিচালনার জন্য বৈপ্লবিক সমিতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হইত। 'গদর' পত্রিকা বাহির হইবার পূর্ব হইতেই বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের কাজ শুরু হইয়াছিল। ১৯১৩ খৃস্টাব্দের প্রথমার্ধেই মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ বৎসরের মধ্য ভাগে মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের এস্তোরিয়া প্রদেশের প্রধান শহর এস্তোরিয়ায় প্রবাসী শিখ ও অন্যান্য ভারতীয়দের এক সভা হয়। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন হরদয়াল। এই সভায় ভারতের বিপ্লব সম্পর্কে বহু আলোচনার পর 'প্রশান্ত মহাসাগর-উপকূলের হিন্দু-সঙ্ঘ' নামে একটি বৈপ্লবিক সমিতি ও স্থানীয় শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠা এবং 'গদর' অর্থাৎ 'বিদ্রোহ' নামে বৈপ্লবিক সমিতির একটি মুখপত্র বাহির করিবার সিদ্ধান্ত হয়। উপস্থিত সকলে এই পত্রিকার জন্য অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করে।

১৯১৩ খৃস্টাব্দের ১লা নভেম্বর সানফ্রান্সিস্কো শহর হইতে 'গদর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা বাহির হয়। বাংলার যুগান্তর সমিতি ও উহার মুখপত্র 'যুগান্তর'-এর নাম অনুসারে 'গদর' পত্রিকার ছাপাখানার নাম রাখা হয় 'যুগান্তর আশ্রম'। সংবাদপত্র সম্পাদনায় অভিজ্ঞ রামচন্দ্র 'গদর' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। 'গদর' পত্রিকাখানি বিভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত করিয়া মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সর্বত্র প্রবাসী ভারতীয়দের মধ্যে প্রচার করা হইত। ইহার বিভিন্ন ভাষার সংস্করণ ভারতের বিভিন্ন শহরে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে এবং ব্রহ্মদেশ ও শ্যামের ভারতীয়দের নিকট প্রেরিত হইত। 'গদর' পত্রিকার নাম অনুসারেই আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত এই ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান 'গদর সমিতি' নামে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। এইভাবে এক দিকে 'গদর' পত্রিকার

(১) প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইলে (অধ্যাপক) বরকতুল্লা আমেরিকা হইতে জার্মাণী ও জার্মাণী হইতে কাবুলে গমন করিয়া মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি প্রবাসী বিপ্লবীদের সহিত একত্রে 'ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র'-এ যোগ দান করেন। পূর্ববর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

বৈপ্লবিক প্রচার ও অপর দিকে হরদয়াল প্রভৃতি বিপ্লবীদের চেষ্টার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই মাকিন-যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার প্রবাসী ভারতীয়দের, বিশেষ করিয়া শিখদের লইয়া এক বিরাট বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া উঠে এবং সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো শহরের 'যুগান্তর আশ্রম'কে কেন্দ্র করিয়া সারা আমেরিকায় এই সমিতির শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হয়।

সমিতির মুখপত্র 'গদর' পত্রিকায় সমিতির উদ্দেশ্য ধারাবাহিকভাবে বাহির হইত। ইহাতে জ্বালাময়ী ভাষায় সমিতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হইত। বৈপ্লবিক উপায়ে বিদেশী বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে—ইহাই ছিল ইহার প্রচারের মূলকথা। কিন্তু বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের প্রয়োজন কি? এই প্রয়োজন ব্যাখ্যা করিবার জন্য "বৃটিশ-রাজের স্বরূপ" এই শিরোনামায় বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে চৌদ্দটি অভিযোগ পর পর প্রবন্ধাকারে বাহির হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিম্নে উল্লেখ করা হইল:

"(১) ইংরেজেরা প্রতিবৎসর ৫০ কোটি টাকা ভারত হইতে ইংলণ্ডে লইয়া যায়।...(৩) তাহারা ভারতের ২৪ কোটি লোকের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে ৭ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা মাত্র, স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করে ২ কোটি টাকা, আর সৈন্যবাহিনীর জন্য ব্যয় করে ২৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। (৪) দুর্ভিক্ষ প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতেছে এবং গত দশ বৎসরে ২ কোটি পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু অনাহারে মরিয়াছে।...(১১) ভারতের টাকায় ও ভারতীয় সৈন্যদের বলি দিয়া তাহারা আফগানিস্থান, ব্রহ্ম, ইজিপ্ট, পারস্য ও চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইয়াছে...(১৪) ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের পর সাতান্ন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এখন আর একটা বিদ্রোহ বিশেষ জরুরী হইয়া উঠিয়াছে।"*

সুতরাং ভারতবর্ষ হইতে বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইতে হইবে। তাহার জন্য সকল প্রবাসী ভারতীয়দের ভারতবর্ষে ফিরিয়া গিয়া "বিপ্লবের দ্বারা বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিতে হইবে।" এই বিপ্লবের আয়োজন করিবার জন্য সর্বত্র

* 'Sedition Committee Report', P. 168

গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভারতের বিপ্লবী শহীদগণ হইবে তাহাদের আদর্শ। উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য হরদয়াল ও তাঁহার সহকর্মীরা আমেরিকার সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া সভা করিতেন এবং বৈপ্লবিক কার্য পরিদর্শন করিতেন।

১৯১৩ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মাকিন-যুক্তরাষ্ট্রের সাক্রামেণ্টো নামক স্থানে গদর সমিতির উদ্যোগে শিখদের এক বিরাট সভা হয়। এই সভায় "ছায়াচিত্রের মারফত ভারতের বিখ্যাত রাজদ্রোহী ও (বৈপ্লবিক) হত্যাকারীদের চিত্র এবং বৈপ্লবিক ধ্বনি প্রদর্শন করা হয়। ইহার পর হরদয়াল তাঁহার শ্রোতাদের নিকট বক্তৃতায় বলেন যে, শীঘ্রই জার্মাণী ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে, আর তখন আসন্ন বিপ্লবে যোগ দান করিবার জন্য ভারতবর্ষে যাইবার আয়োজন করিতে হইবে।"(১) এই ধরণের আরও কয়েকটি জনসভায় হরদয়াল ভারতের আসন্ন বিপ্লবের জন্য প্রবাসী শিখদের প্রস্তুত হইতে বলেন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দ

হরদয়ালের এই সকল বক্তৃতা শীঘ্রই মাকিন-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ১৬ই মার্চ হরদয়াল গ্রেপ্তার হন। মাকিন-সরকার তাঁহাকে "অবাঞ্ছিত বিদেশী" হিসাবে যুক্তরাষ্ট্র হইতে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত করিয়া জামিনে মুক্তি দেয়। এই সুযোগে হরদয়াল য়ুরোপের সুইজারল্যাণ্ড দেশে পলাইয়া যান। রামচন্দ্র তাঁহার স্থান গ্রহণ করিয়া আমেরিকা ও কানাডার গদর সমিতি, 'গদর' পত্রিকা এবং উহার ছাপাখানা ও গদর সমিতির কেন্দ্র 'যুগান্তর-আশ্রম' পরিচালনা করিতে থাকেন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২৫শে মার্চ হরদয়ালের গ্রেপ্তারের সংবাদ 'গদর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার পর হইতেই যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার শিখ ও অন্যান্য ভারতীয়দের মধ্যে তীব্র বিক্ষোভ দেখা দেয়। তাহাদের প্রিয় নেতার প্রতি এই উৎপীড়ন বরদাস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহাদের নিকট বৃটিশ-সরকার,

(১) Juagment of the Lahore conspiracy case.

যুক্তরাষ্ট্র-সরকার, কানাডা-সরকার—সকল ইংরেজ-সরকারই এক, সকল ইংরেজ-সরকারই অত্যাচারী। তাহাদের এই বিক্ষোভ বিপ্লবের আগুন জ্বালাইতে উদ্যত হয়, ভারতে ফিরিয়া এক রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারা উৎপীড়ক ও শোষক বৃটিশ-সরকারের উচ্ছেদের জন্য তাহাদের মধ্যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ পাইতে থাকে।

এই সময়ে সারা আমেরিকায় ও কানাডায় একখানা বৈপ্লবিক পুস্তিকা প্রচার করা হয়। ইহার একটি কবিতায় তিলক, বরকতুল্লা, অজিত সিং, সাভারকর, অরবিন্দ ঘোষ, কৃষ্ণ বর্মা, হরদয়াল ও অন্যান্য বহু ভারতীয় বিপ্লবীদের নামে প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট আবেদন করিয়া বলা হয়ঃ "তাঁহারা সকলেই বিদ্রোহের পতাকা উড্ডীন করিয়া গিয়াছেন, সকল শিখ, সকল হিন্দু, সকল মুসলমান সেই পতাকার নীচে সমবেত হইয়াছে; চল, আমরাও আমাদের দেশে ফিরিয়া গিয়া সেই বিদ্রোহে যোগদান করি—ইহাই আমাদের অ নির্দেশ।" এবার হইতে সর্বত্র একই ধ্বনি উঠিতে থাকে—"চল, দেশে ফিরিয়া গিয়া বিদ্রোহে যোগদান করি।"

ইতিমধ্যে য়ুরোপে সমরানল জ্বলিয়া উঠিয়াছে, জার্মাণীর দুর্ধর্ষ সামরিক শক্তির নিকট বৃটিশ প্রভৃতি মিত্র-শক্তির ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে বিশেষ করিয়া ইংরেজরা চারি দিক হইতে ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইয়াছে। বিপ্লবীরাও এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। গদর সমিতির নেতৃবৃন্দ সকল স্বাধীনতা-কামী শিখ ও ভারতীয়কে অবিলম্বে ভারতে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দেন। 'গদর' পত্রিকায় জ্বালাময়ী ভাষায় লেখা হইতে থাকে:

"য়ুরোপে যুদ্ধ চলিতেছে, তোমরা এই সুযোগে প্রস্তুত হও! নির্ভীক বন্ধুগণ, অবিলম্বে প্রস্তুত হও, বিদ্রোহের দ্বারা তোমাদের প্রতি সকল অত্যাচারের অবসান ঘটাও! এই বিদ্রোহের জন্য চাই, ভারতবর্ষে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার জন্য নির্ভীক সৈন্য; তাহাদের বেতন—মৃত্যু; পুরস্কার—শহীদের সম্মান; অবসর জীবনের প্রাপ্য—মুক্তি; যুদ্ধক্ষেত্র—ভারতবর্ষ।

"উঠ, চোখ খোল। গদরের জন্য (বিদ্রোহের জন্য) অর্থ সংগ্রহ কর, ভারতে ফিরিয়া চল। মুক্তি লাভের জন্য জীবন উৎসর্গ কর।" "ভারতে ফিরিয়া

চল, ইংরেজকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে শাসন-ক্ষমতা কাড়িয়া লও।" ভারতে ফিরিয়া গিয়া গদর-কর্মীদের "গদর-সাহিত্য বিক্রয় করিতে হইবে: জনসাধারণকে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের জন্য উৎসাহিত করিতে হইবে; সর্বত্র রেলপথ তুলিয়া ফেলিতে হইবে; ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইবার জন্য জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে, শয়তান ফিরিঙ্গিদের নির্মূল করিবার জন্য দেশীয় সৈন্যবাহিনীকে উৎসাহিত করিতে হইবে।" "এইভাবে বিদ্রোহের দ্বারা বৃটিশ-রাজের কবল হইতে ভারতবর্ষকে মুক্ত করিতে হইবে, এইভাবে ইংরেজদের ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত করিয়া জনসাধারণের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।"(১)

যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বৃটিশ-কলম্বিয়ার প্রবাসী হাজার হাজার শিখ, হিন্দু, মুসলমান গদর-বিপ্লবীদের এই আহ্বানে সাড়া দেয়। দীর্ঘ প্রবাস-জীবনের শত অত্যাচার, উৎপীড়ন, শোষণ, দুঃখ-লাঞ্ছনা এই ভারতীয় মানুষগুলিকে প্রতিশোধের নেশায় উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদের এত দুঃখ-লাঞ্ছনার জন্য একমাত্র দায়ী ভারতের বিদেশী বৃটিশ-শাসন। আজ মহাযুদ্ধের সুযোগে সেই বিদেশী শত্রুর উপর চরম প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে তাহারা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া দলে দলে ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করে।

বজবজের যুদ্ধ

পাঞ্জাবের অমৃতসর জিলার গুরুদিৎ সিং নামক এক শিখ দীর্ঘ কাল ধরিয়া সিঙ্গাপুর ও মালয় ঠিকাদারী ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দের কোন এক সময়ে তিনি পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসেন এবং বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। ইহার পরে তিনি এক নূতন মতলব লইয়া হংকং-এ ফিরিয়া যান। এই সময়ে বহু পাঞ্জাবী শিখ জীবিকা অর্জনের জন্য দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার বিভিন্ন দেশে কুলি ও শ্রমিকের কার্যে নিযুক্ত ছিল। কিন্তু এই সকল স্থানে মজুরির হার অত্যন্ত নীচু

(১) Proceedings of the Lahore Conspiracy Case.

বলিয়া তাহারা বেশী মজুরির আশায় কানাডা গমনের সিদ্ধান্ত করে। তাহাদের কানাডা গমনের জন্য জাহাজ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করেন গুরুদিৎ সিং।

কলিকাতায় কোন জাহাজ সংগ্রহ করিতে না পারিয়া তিনি হংকং হইতে 'কোমাগাতামারু' নামে একখানি জাপানী জাহাজ ভাড়া করেন। জাহাজখানি হংকং, সাংহাই, মোজি ও ইয়োকোহামা হইতে শিখদের লইয়া ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল কানাডার ভাঙ্কুভার বন্দরের উদ্দেশে যাত্রা করে।

সম্ভবতঃ দুইটা উদ্দেশ্য লইয়া গুরুদিৎ সিং এই কার্য উদ্যোগী হন—প্রথমতঃ প্রাচ্য-প্রবাসী শিখদের জীবিকার্জনের ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়তঃ, কানাডা-সরকারের অত্যাচারমূলক 'বিদেশীদের প্রবেশাধিকার সম্পর্কিত আইন'-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। কানাডা-সরকারের এই আইন অনুসারে দুই শত ডলার জমা না দিলে এবং দেশ হইতে সরাসরি কানাডায় না আসিলে, বিদেশীরা কানাডায় প্রবেশ করিতে পারিত না। ইহা ব্যতীত, কানাডায় প্রবেশ করিবার পরেও বিদেশীদের বহু উৎপীড়নমূলক সরকারী আইন মানিয়া চলিতে হইত এবং এই সকল আইন বিশেষ করিয়া ভারতীয়দের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হইত। এই সকল আইনের বিরুদ্ধে কানাডার প্রবাসী ভারতীয়রা দীর্ঘ কাল হইতে আন্দোলন করিয়া আসিতেছিল। কানাডার প্রবাসী শিখদের এই আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলাই ছিল গুরুদিৎ সিং-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। শিখদের লইয়া 'কোমাগাতামারু' জাহাজ ভাঙ্কুভার পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গে কানাডার শিখদের এই আন্দোলন উগ্র আকার ধারণ করে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন বন্দর হইতে গদর সমিতির প্রচারকগণ 'কোমাগাতামারু' জাহাজের শিখদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইতে থাকে। জাহাজের শিখগণ প্রয়োজন হইলে যাহাতে পুলিশের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে তাহার জন্য বহু রিভলভার সংগ্রহ করা হয়। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২৩শে মে জাহাজখানি ভাঙ্কুভার বন্দরে প্রবেশ করে। কিন্তু যেহেতু জাহাজের সকল আরোহীর নিকট প্রয়োজনীয় অর্থ ছিল না এবং যেহেতু তাহারা সরাসরি ভারতবর্ষ হইতে আসে নাই সেই হেতু কানাডা-সরকার শিখদের বন্দরে নামিতে দিতে অস্বীকার

করে। আরোহীরা কানাডা-সরকারের নিকট তীব্র প্রতিবাদ করে। কিন্তু কোন ফল হইল না। কানাডার প্রবাসী ভারতীয়রা আরোহীদের বন্দরে নামিবার ব্যবস্থার জন্য বাইশ হাজার ডলার চাঁদা তুলিয়া দেয়। কিন্তু তাহাতেও বন্দরে নামিবার অনুমতি পাওয়া গেল না।

কানাডা-সরকারের এই অত্যাচারে কানাডা-প্রবাসী ভারতীয় ও জাহাজের আরোহী ভারতীয়দের মধ্যে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। গদর সমিতির প্রচারকদের প্রচারে এই বিক্ষোভ ক্রমশঃ বিদ্রোহের আকার ধারণ করে। 'গদর' পত্রিকা এবং বহু পুস্তিকা ও ইস্তাহারে কানাডা-সরকার তথা সকল দেশের ইংরেজ-সরকার, বিশেষ করিয়া ভারতের ইংরেজ-সরকারকে সকল পরাধীন মানুষের চরম শত্রু বলিয়া অভিহিত করিয়া ঐ সরকারের বিরুদ্ধে এই বলিয়া বিদ্রোহের আহ্বান জানান হইতে থাকে: সকল ইংরেজ-সরকারই এক এবং তাহাদের এই দুঃখ-লাঞ্ছনার জন্য ভারতের ইংরেজ-সরকারই প্রধানতঃ দায়ী। সুতরাং সকল ইংরেজ-সরকারকে, বিশেষ করিয়া ভারতের ইংরেজ-সরকারকে, সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা উচ্ছেদ করিতে হইবে।

কানাডার প্রবাসী শিখ ও 'কোমাগাতামারু' জাহাজের আরোহীদের মধ্যে এই বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিতে দেখিয়া কানাডা-সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। তাহারা জাহাজখানিকে অবিলম্বে কানাডা ত্যাগ করিবার নির্দেশ দেয়। নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার জন্য একটা বিরাট পুলিশবাহিনী জাহাজে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে আরোহীরা রিভলভার হইতে গুলি বর্ষণ করিয়া পুলিশবাহিনীকে বাধা দেয়। পুলিশবাহিনী পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। এই খণ্ডযুদ্ধে পুলিশবাহিনীর পরাজয়ের ফলে কানাডার শাসকগণ ভয় পাইয়া 'কোমাগাতামারু' জাহাজকে বন্দর ত্যাগে বাধ্য করিবার জন্য কয়েকখানি যুদ্ধ-জাহাজ প্রেরণ করে। অবশেষে যুদ্ধ-জাহাজের কামানের মুখে 'কোমাগাতামারু' নঙ্গর তুলিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু জাহাজের আরোহীদিগকে কানাডায় নামিতে না দিবার ফল হইল ভীষণ। কারণ, জাহাজের শিখগণ তাহাদের যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়াই

কানাডায় জীবিকার্জনের আশায় আসিয়াছিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, ভারতের ইংরেজ-সরকার তাহাদের সাহায্য করিবে। কিন্তু সাহায্য না করিয়া ইংরেজ-সরকার জাহাজখানাকে ভারতে ফেরৎ পাঠাইবার জন্য কানাডা-সরকারকে অনুরোধ করে। তাহাদের এই ব্যর্থতার ফলে জাহাজের শিখগণ এবার পথে বসে; তাহাদের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া ভারতের ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাহাদের উন্মাদ করিয়া তোলে। গদর-বিপ্লবীরা এই বিক্ষোভকে বিদ্রোহের আকারে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতে থাকে। জাহাজের আরোহীরা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ভারত অভিমুখে ফিরিয়া যায়।

ইতিমধ্যে য়ুরোপে যুদ্ধ শুরু হইয়া যায়। 'কোমাগাতামারু' বৃটিশের অধিকার-ভুক্ত হংকং পৌঁছিলে যুদ্ধের অজুহাতে আরোহীদের হংকং বন্দরে অবতরণ করিতে দেওয়া হইল না। আরোহীরা প্রাচ্যের পূর্ব কর্মস্থলে ফিরিয়া যাইবার আবেদন জানাইল, কিন্তু বৃটিশ-সরকার তাহাদের সেই আবেদনেও কর্ণপাত করিল না। আরোহীদের সিঙ্গাপুরে নামিবার চেষ্টাও ব্যর্থ হইল। ইতিমধ্যে ভারত-সরকার এই বিদ্রোহীদের ভারতবর্ষে লইয়া গিয়া ইহাদের শায়েস্তা করিবার মতলব আঁটিল। প্রকৃতপক্ষে ভারত-সরকারই জাহাজখানিকে ভারতবর্ষের দিকে লইয়া চলিল।

'কোমাগাতামারু' জাহাজখানি ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর বঙ্গোপ-সাগর পার হইয়া হুগলী নদীতে প্রবেশ করে এবং ২৯শে সেপ্টেম্বর বেলা ১১টার সময় বজবজ আসিয়া নঙ্গর ফেলে। পূর্ব হইতেই একখানি স্পেশাল ট্রেন বজবজে অপেক্ষা করিতেছিল। 'কোমাগাতামারু' জাহাজের যাত্রীদের সেই স্পেশাল ট্রেনে করিয়া পাঞ্জাব লইয়া যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু জাহাজের যাত্রীরা ততক্ষণে সরকারের চক্রান্ত বুঝিয়া ফেলে, তাহারা সরকারের এই চক্রান্তে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

শিখগণ ট্রেনে চড়িতে অস্বীকার করিয়া সকলে একত্রে পায়ে হাটিয়া কলিকাতার দিকে যাত্রা করে। ইহারা যে ট্রেনে চাপিতে অস্বীকার করিয়া

কলিকাতা পৌঁছিবার চেষ্টা করিবে তাহা শাসকগণ পূর্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল। সুতরাং তাহারা বিদ্রোহীদের জন্য একটি সৈন্যবাহিনীও প্রস্তুত রাখিয়াছিল। শিখগণ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র সৈন্যবাহিনী তাহাদের বাধা দেয়। সৈন্যরা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র সশস্ত্র শিখগণ রিভলভার হইতে গুলিবর্ষণ শুরু করে, দেখিতে না দেখিতে বজবজ এক রক্তাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়। উভয় পক্ষেই বহু লোক হতাহত হয়। শিখদের পক্ষে আঠার জন নিহত হয়। যুদ্ধ চলিবার সময় গুরুদিৎ সিং আটাশ জন অনুচরসহ পলায়ন করেন। বিদ্রোহীদের একত্রিশ জনকে জেলে আটক করিয়া রাখা হয় এবং অবশিষ্ট সকলকে বলপূর্বক ট্রেনে চাপাইয়া পাঞ্জাব লইয়া গিয়া নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়।

কিন্তু 'কোমাগাতামারু' ও বজবজ-এর ঘটনার এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটিল না। এই দুইটি সংবাদ দাবাগ্নির মত সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িয়া বিক্ষোভের আগুন জ্বালাইয়া দিল। সারা পাঞ্জাবে বিদ্রোহ শুরু হইয়া গেল। গদর সমিতির নেতারা অনেকেই ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। আর পাঞ্জাবেও পূর্ব হইতেই বিদ্রোহ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। এবার সেই ধূম অগ্নিশিখা রূপে দেখা দিল।

বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ

মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও বিভিন্ন প্রাচ্যদেশ হইতে শিখদের পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবার পূর্ব হইতেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে বিপ্লবের আয়োজন শুরু হইয়া গিয়াছিল। পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম ভাই পরমানন্দ ১৯১৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেরিকা হইতে পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিয়াই বিপ্লবের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে ইনি ইংলণ্ড হইতে পাঞ্জাবে ফিরিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেপ্তার হইয়া এক বৎসর অন্তরীণ থাকিবার পরেই আবার ইংলণ্ডে ফিরিয়া যান। তিনি ইংলণ্ড হইতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়া হরদয়ালের সহিত মিলিত হন এবং গদর সমিতি গঠনে সাহায্য করেন।

য়ুরোপে যুদ্ধ আসন্ন বুঝিয়া তিনি পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করিয়া বৈপ্লবিক আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন।

পরমানন্দ ও অন্যান্য বিপ্লবীরা একত্রে পাঞ্জাবে গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তুলিতে থাকেন। স্কুল ও কলেজগুলিতে বিপ্লবের শাখা-প্রশাখা স্থাপিত হয় এবং পাঞ্জাবের সর্বত্র 'গদর' অর্থাৎ বিদ্রোহের প্রচার-কার্য চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এবং প্রবাসী শিখগণ ফিরিয়া আসিতে থাকায় বিদ্রোহের আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হয়। বিদ্রোহের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টাও চলিতে থাকে।

১৯১৪ খৃস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর রাত্রিকালে ফিরোজপুর-লুধিয়ানা রেলপথের চৌকিমান স্টেশনে বিপ্লবীদের জন্য বহু অস্ত্রশস্ত্রের একটি বড় চালান আসিবার কথা ছিল। নির্দিষ্ট সময় পাঁচ জন শিখ-যুবক রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উক্ত স্টেশনে উপস্থিত হয়। তাহারা স্টেশনে অপেক্ষমান লোকদের চলিয়া যাইতে বলিয়া গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। গাড়ী আসিল, কিন্তু মাল আসিল না। ইতিমধ্যে স্টেশন-মাস্টারের সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় সে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিতে অগ্রসর হয়। বিপ্লবীরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি বর্ষণ করিলে স্টেশন-মাস্টার ও অপর এক ব্যক্তি নিহত হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা স্টেশনের সিন্দুক হইতে বহু টাকা সংগ্রহ করিয়া চলিয়া যায়।

২৯শে অক্টোবর আমেরিকা, ফিলিপাইন, সাংহাই ও হংকং হইতে ১৭৩ জন শিখযাত্রী লইয়া 'তোসামারু' নামক একখানি জাহাজ কলিকাতায় উপস্থিত হয়। এই যাত্রীরা প্রায় সকলেই ছিল গদর সমিতির সভ্য। তাহারা ভারতের আসন্ন বিদ্রোহে যোগদানের উদ্দেশ্যে পাঞ্জাবে যাইতেছিল। এই যাত্রীরা জাহাজে থাকিতেই বৈপ্লবিক সমিতির সংগঠনের অনুকরণে বহু ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া এক এক জন পরিচালকের অধীনে পাঞ্জাবের এক একটি অঞ্চলে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। জাহাজখানি কলিকাতা পৌঁছিবার পূর্বেই ভারত-সরকার এই সকল শিখদের পাঞ্জাবে যাইবার উদ্দেশ্য ও

বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ পাইয়াছিল এবং ভারতে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহাদের আটক করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। 'তোসামারু'র যাত্রীরা জাহাজ হইতে নামিবামাত্র তাহাদের বন্দী করিয়া পাঞ্জাব পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পাঞ্জাবে তাহাদের এক শত জনকে দীর্ঘ কালের জন্য জেলে আটক ও অবশিষ্ট সকলকে গ্রামে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই ৭৩ জন নজরবন্দী শিখদের প্রায় সকলেই নজরবন্দী অবস্থা হইতে পলায়ন করিয়া বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে যোগদান করে। তাহারা দল বাঁধিয়া প্রকাশ্যেই বিদ্রোহের জন্য প্রচার-কার্য চালাইতে থাকে।(১) পাঞ্জাবের অসংখ্য যুবক বৈপ্লবিক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া গুপ্ত সমিতিতে যোগ দেয়। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে গোপন বৈঠক চলিতে থাকে। বিপ্লবী নেতারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিদ্রোহের আয়োজনের তত্ত্বাবধান করেন।

নভেম্বর মাসে বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের কয়েকটি বড় রকমের সংঘর্ষ হয়। ইহাদের মধ্যে ফিরোজপুর জিলার এক গ্রামের একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ২৭শে নভেম্বর রাত্রিকালে পনের জন বিপ্লবী সশস্ত্র হইয়া মোগা মহকুমার সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন করিতে যাইতেছিল। এমন সময় একজন দারোগা একজন দফাদারকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের সম্মুখীন হয়। কিছুক্ষণ বচসার পর গুলি করিবার জন্য দারোগাটি তাহার রিভলভার বাহির করিবামাত্র বিপ্লবীরা দারোগা ও দফাদার উভয়কেই গুলি করিয়া হত্যা করে। বিপ্লবীরা আরও অগ্রসর হইলে পথে সশস্ত্র পুলিশের একটি বড় দলের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইবামাত্র পুলিশেরা বিপ্লবীদের ঘিরিয়া ফেলে। উভয় পক্ষ প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ করিতে থাকে এবং উভয় পক্ষে কয়েক জন হতাহত হয়। বিপ্লবীদের দুই জন নিহত ও সাত জন ভীষণ আহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে পলায়ন করে। ২৮শে নভেম্বর রাত্রিকালে বিপ্লবীদের একটি দল পুলিশ ও অশ্বারোহী সৈন্যদের একটি বড়

(১) পরে বিভিন্ন বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের জন্য নজরবন্দী শিখদের ছয় জনের ফাঁসী, ছয় জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

দলের মুখে পড়িয়া যায়। বিপ্লবীরা বন্দুক ও রিভলভার হইতে বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। আম্বালা জিলার বিপ্লবীদের পরিচালক ছিলেন 'পৃথ্বী সিং রাজপুত' নামক একজন গদর-বিপ্লবী। ৮ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে কয়েক জন পুলিশসহ এক দারোগা তাঁহার গোপন আশ্রয়স্থল ঘিরিয়া ফেলে। পৃথ্বী সিং কয়েকটি গুলি-ভরা রিভলভার লইয়া একাকী পুলিশদলের বিরুদ্ধে বহু ক্ষণ যুদ্ধ করেন। তাঁহার গুলি বর্ষণে দারোগাটি আহত হয় এবং তিনি পলায়ন করেন। ১৭ই ডিসেম্বর রাত্রিকালে হিসার জিলার পিপ্‌লী গ্রামের এক ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা নগদে ও অলঙ্কারে ২২ হাজার টাকা সংগ্রহ করে।

উপরোক্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ ব্যতীত "গত কয়েক মাসে আরও অনেকগুলি ভীষণ অপরাধ, 'মেল-ব্যাগ' লুণ্ঠন, ট্রেন ধ্বংসের চেষ্টা আমেরিকা-প্রত্যাগত ও স্থানীয় বিপ্লবীদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারের নিকট আরও যে সকল সংবাদ আসিয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে, এই বিপ্লবীরা সৈন্যবাহিনীকেও ক্ষেপাইয়া তুলিবার চেষ্টা এবং আরও ভয়ংকর সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়া-কলাপের পরিকল্পনা করিয়াছিল।" পাঞ্জাবের লাটসাহেবের আশঙ্কা এই যে, "যদি এই ব্যক্তিদের বৈপ্লবিক ক্রিয়-কলাপ অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে তবে ক্রমবর্ধমান দুর্ভিক্ষের অবস্থায়, ধন-সম্পত্তির উপর ব্যাপক আক্রমণের সম্ভাবনা আছে। তাহার ফলে সারা প্রদেশে একটা অরাজক অবস্থা ও ত্রাসের সৃষ্টি হইবে।" "সুতরাং ছোটলাট সাহেব 'অস্ত্র-আইন', বিস্ফোরক-আইন' ও অন্যান্য দমনমূলক আইনের সহিত কয়েকটি সম্পত্তি-রক্ষামূলক আইনও (নব-প্রবর্তিত) অর্ডিনান্স-এর অন্তর্ভুক্ত করেন।"(১) আসন্ন বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকারের পরামর্শে পাঞ্জাব-সরকার 'পাঞ্জাব-অর্ডিনান্স' নামক যে বিশেষ আইন প্রয়োগ করে সেই আইনটি ভারতের ইংরেজ-শাসনের অন্যতম কুকীর্তিস্বরূপ অতি ভয়ংকর 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা আইন'-এরই নামান্তর।

* * *

(১) 'Sedition Committee Report', P. 150-51.

১৯১৫-১৬ খৃস্টাব্দ

'গদর-ই-গঞ্জ'

অতি ভয়ংকর 'পাঞ্জাব-অর্ডিনান্স' এবং সরকারের শত্রু, চেষ্টা ও সতর্কতা উপেক্ষা করিয়া বিদ্রোহের আয়োজন আগাইয়া চলে। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে গদর-বিপ্লবীরা 'গদর-ই-গঞ্জ' নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাহাদ্বারা পাঞ্জাবের যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের নির্দেশ দেয়। বিপ্লবের জন্য অর্থের প্রয়োজন, কিন্তু ডাকাতি ব্যতীত অর্থ সংগ্রহের কোন উপায় নাই। সুতরাং সরকারী অর্থ ডাকাতিদ্বারা লুণ্ঠন করিতে হইবে এবং সরকার ও ইংরেজদের উপর এই ধরনের আক্রমণের দ্বারা জনসাধারণকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। সুতরাং পাঞ্জাবের যুব-সম্প্রদায়ের উপর গদর সমিতির নির্দেশ হইল :

"সরকারের উপর ডাকাতি করিয়া সারা পাঞ্জাবকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। ইংরেজের অর্থ লুণ্ঠন কর এবং সেই অর্থ বিপ্লবের কাজে ব্যবহার কর।"(১)

এই পুস্তিকায় ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানাইয়া বলা হয়: ইংরেজের শিক্ষা-ব্যবস্থা কেবল দাসত্বই শিক্ষা দেয়, সুতরাং এই শিক্ষা বর্জন করিয়া ছাত্রদের বিদ্রোহে যোগ দান করা কর্তব্য। যাহারা বিদ্রোহে যোগ দান করিবে তাহারা উপযুক্ত পুরস্কার লাভ করিবে। ইহাতে গ্রামবাসীদের আহ্বান করিয়া বলা হয়: বিদ্রোহে যোগদান করিয়া ইংরেজ-শাসনের অবসান ঘটাইলে তাহাদের সকল দুঃখ-যন্ত্রণা শেষ হইবে। ইতিপূর্বে দিল্লীতে সরকারী নির্দেশে শিখদের একটি ধর্ম-মন্দিরের প্রাচীর ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল। 'গদর-ই-গঞ্জ' পুস্তিকায় সেই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া বলা হয়: বৃটিশ-সরকার শিখদের ধর্মের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করিতেছে, ভারতবাসীদের ধর্ম আজ বিদেশী শাসকদের দ্বারা বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অতএব ধর্ম রক্ষার জন্য,

(১ Quoted from the 'Sedition Committee Report', P. 151,

জীবিকা রক্ষার জন্য, শিক্ষার জন্য সকলেরই বিদ্রোহে যোগ দান করা অবশ্য কর্তব্য। বিদ্রোহ শুরু হইবামাত্র নেতৃবৃন্দ এরোপ্লেনে চড়িয়া ভারতে আসিবেন এবং বিদ্রোহ পরিচালনা করিবেন। ভারত স্বাধীন হইলে তাহার পরিচালক হইবেন হরদয়াল। পাঞ্জাবের জনসাধারণের নিকট ভবিষ্যৎ-ভারতের উজ্জ্বল চিত্র বর্ণনা করিয়া বলা হয়: ভারতবর্ষ হইবে একটি গণতান্ত্রিক দেশ, এখানে আমেরিকার মত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। চির দুঃখের দেশ ভারতবর্ষ একটি সুখী দেশে পরিণত হইবে। এখানে বর্তমানের মত অসাম্য, প্লেগের মহামারী ও ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের চিহ্নও থাকিবে না। এই সুখী ভারতবর্ষ গড়িয়া তুলিতে হইলে সবার আগে এদেশ হইতে বৃটিশকে তাড়াইতে হইবে।

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন

মহাযুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলাদেশব্যাপী যে রকম বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু হইয়াছিল পাঞ্জাবেও ঠিক সেই প্রকার আয়োজন চলিতে থাকে। এই আয়োজনও অবশেষে "ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র'-এর অংশে পরিণত হয়। 'ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র'-এর পরিকল্পনা লইয়া ১৯১৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বার্লিন হইতে হরদয়াল ও অন্যান্য প্রবাসী বিপ্লবীদের দ্বারা সত্যেন্দ্রনাথ সেন নামক একজন বাঙ্গালী ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে নামক একজন মারাঠী যুবক কলিকাতায় প্রেরিত হন। বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সংবাদ দিয়া পিংলে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারী বসুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় (১৯০৮) রাসবিহারী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিত একযোগে যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতে থাকেন।

পিংলে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীকে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্রের সংবাদ ও সেই ষড়যন্ত্রে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের যোগ দানের সিদ্ধান্ত জ্ঞাপন করেন। এই সময় রাসবিহারী এবং শচীন্দ্রনাথও কাশীকে কেন্দ্র করিয়া যুক্তপ্রদেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু পাঞ্জাবে বিদ্রোহ আসন্ন বুঝিয়া

রাসবিহারী পিংলেকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং পাঞ্জাবের অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। প্রথমে শচীন্দ্রনাথ লাহোরে আসিয়া গদর সমিতির পরিচালকদের রাসবিহারীর আগমনের সংবাদ দেন এবং পরে ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে রাসবিহারী পিংলেকে সঙ্গে লইয়া লাহোরে উপস্থিত হন। পিংলে ছিলেন আমেরিকায় গদর সমিতির নেতৃবৃন্দের অন্যতম। সুতরাং তাঁহার চেষ্টায় গদর-বিপ্লবীরা রাসবিহারীর নেতৃত্ব মানিয়া লয়। রাস-বিহারী অমৃতসরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া পিংলে ও অন্যান্য বিপ্লবী নেতাদের সাহায্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন শুরু করেন।

প্রথমে তাঁহারা বিপ্লবী নেতাদের এক বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকে বিদ্রোহের কার্যসূচী স্থির করা হয়। সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন, ভারতীয় সৈন্যদের বিদ্রোহের পক্ষে আনয়ন করা, অস্ত্র সংগ্রহ, বোমা তৈরীর ব্যবস্থা, সরকার-সমর্থকদের গৃহে ডাকাতি, বিদ্রোহ শুরু হইবার ঠিক পূর্বক্ষণে রেল-লাইন ধ্বংস করা প্রভৃতিই হইল বিদ্রোহের কার্যসূচী। রাসবিহারী ও পিংলে পরামর্শ করিয়া বোমা ও বোমা তৈরী করিবার লোক সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশে লোক পাঠাইলেন। এদিকে নিজেরাও পাঞ্জাবে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা করেন। অভ্যুত্থানের তারিখ স্থির হয় ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারী, আর অভ্যুত্থানের প্রধান কেন্দ্র হইবে লাহোর। রাসবিহারী তাঁহার কর্মকেন্দ্র লাহোরে স্থানান্তরিত করেন।

২১শে ফেব্রুয়ারী যাহাতে সারা উত্তর-ভারতে একযোগে অভ্যুত্থান শুরু হয় তাহার জন্য উত্তর-ভারতের সকল সেনা-নিবাসে ও শহরে শহরে দূত প্রেরিত হয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের গুপ্ত সমিতির সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সময় বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতি এবং অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ করা হইয়াছিল। যাহাতে পাঞ্জাবের গ্রামবাসীরাও এই অভ্যুত্থানে যোগদান করে তাহার জন্য রাসবিহারি গ্রামাঞ্চলে প্রচারের জন্য বিপ্লবী কর্মীদের প্রেরণ করেন। ইহা ব্যতীত স্থির হয় যে, পাঞ্জাবের লাহোর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি, প্রভৃতি শহর হইতে একদিনে অভ্যুত্থান শুরু হইবে।

এই অভ্যুত্থান-প্রচেষ্টার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিবার একটি ঘোষণা-পত্র ও স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উদ্ভাবন। বিপ্লবের পরিচালকগণ স্থির করেন যে, ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইবে স্বাধীন ভারতের নামে। এই উদ্দেশ্যে স্বাধীন ভারতের একটি রাষ্ট্রীয় পতাকা ও একটি ঘোষণা-পত্র রচিত হয়।

অভ্যুত্থান সফল করিবার জন্য সৈন্যবাহিনীর সমর্থন অপরিহার্য। তাই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার গ্রহণ করেন স্বয়ং রাসবিহারী ও পিংলে। রাসবিহারীর নির্দেশে পিংলে সুচা সিং নামে লুধিয়ানার এক ছাত্র ও অপর কয়েক ব্যক্তির সহায়তায় উত্তর-ভারতের সকল ক্যান্টনমেন্টে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশীয় সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। এইভাবে মীরাট, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফৈজাবাদ, লাক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই উদ্দেশ্যে 'গদর' পত্রিকা ও অন্যান্য বৈপ্লবিক সাহিত্য দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে প্রচার করা হয়। এই সকল প্রচারে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েকটি দেশীয় সৈন্যদল অভ্যুত্থানে যোগদান করিতে সম্মত হয়।

বিপ্লবীরা বোমা তৈরীর জন্য বিরাট আয়োজন করে। এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ হইতে কয়েকজন দক্ষ বিপ্লবীকে পাঞ্জাবে লইয়া আসা হয়। অমৃতসরে বহু বোমা তৈরীর জন্য প্রচুর মালপত্র সংগৃহীত হয়। লুধিয়ানা জিলার 'ঝাবেওয়াল' নামক গ্রামে একটি বড় বোমার কারখানা স্থাপিত হয় এবং আর একটি বোমার কারখানা স্থাপিত হয় ঐ জিলার 'লোহাবাদী' নামক গ্রামে। এই সকল কারখানায় দিবারাত্র বোমা তৈরী হইতে থাকে।

ইহা ব্যতীত, অভ্যুত্থান শুরু হইলে যাহাতে সরকার চারিদিকে দ্রুত সংবাদ পাঠাইতে না পারে এবং সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিতে না পারে তাহার জন্য টেলিগ্রাফের তার কাটিবার ও রেলপথ ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা হয়। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানের রেল-কারখানা হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয় এবং কয়েকটী বিশেষ দল তৈরী করিয়া তাহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।

বিদ্রোহের দিন আসন্ন বুঝিয়া বিপ্লবীরা রেল চলাচল-ব্যবস্থা পূর্ব হইতেই বিপর্যস্ত করিয়া দিবার চেষ্টা করে। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ৩রা, ৬ই, ৭ই, ১৫ই, ১৮ই ও ২১শে তারিখে 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রেলপথ', 'লাহোর-লুধিয়ানা রেলপথ,' ও 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর গাড়ী লাইন-চ্যুত করিবার চেষ্টা হয়। ইহা ব্যতীত, অমৃতসর জিলায় একটি রেল-ব্রিজ উড়াইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা উক্ত ব্রিজের পাঁচজন রক্ষী পুলিশকে হত্যার চেষ্টা করে।

অন্যদিকে বিদ্রোহের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বিপ্লবীরা কয়েকটি ডাকাতি করে। ২৩শে জানুয়ারী লুধিয়ানা জিলার 'সানেওয়াল' নামক স্থানের একটি অলংকারের দোকানে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা প্রচুর অলংকার হস্তগত করে এবং তাহা বিক্রয় করিয়া সেই অর্থ বিদ্রোহের জন্য ব্যয় করে। ২৭শে জানুয়ারী উক্ত জিলার মনসুরণ নামক গ্রামের এক ডাকাতিতে নগদে ও অলংকারে বহু সহস্র টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়। এই ডাকাতির সময় বহু গ্রামবাসী বিপ্লবীদের বাধা দিতে আসিলে বিপ্লবীরা তাহাদের নিকট এই ভাবে অর্থ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তৃতা করিয়া বলে যে, এদেশ হইতে বৃটিশকে বিতাড়িত করিবার জন্যই তাহারা অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ইহাতে বহু গ্রামবাসী চলিয়া যায় এবং ইহার পরেও কিছু লোক বিপ্লবীদের বাধা দিলে বিপ্লবীরা বোমা ও রিভলভারের সাহায্যে তাহাদের নিরস্ত করে। ২৯শে জানুয়ারী 'মালের কোটলা' নামক দেশীয় রাজ্যে এক অত্যাচারী মহাজনের বাড়ী ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা বহু সহস্র টাকা সংগ্রহ করে। ২রা ফেব্রুয়ারী অমৃতসর জিলার 'কাক্কা' নামক গ্রামে এক ডাকাতিতে প্রচুর অর্থ পাওয়া যায়।

এই শেষোক্ত ডাকাতিতে গৃহস্বামী বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। এই ডাকাতিতে গ্রামের বহু যুবক বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। গ্রামের যুবকদের মধ্যে এক জন ছিল পুলিশের গোয়েন্দা। এই ডাকাতির পর হইতে উক্ত গোয়েন্দাটি বিপ্লবীদের দলে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় এবং বহু গোপন তথ্য জানিতে পারে। এই গোয়েন্দার মারফত পুলিশ আসন্ন অভ্যুত্থান সম্পর্কেও সকল সংবাদ পাইয়া যায়। এই সকল তথ্য হস্তগত করিয়া পাঞ্জাব-সরকার ও পাঞ্জাব-

পুলিশ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। ভারত-সরকারের পরামর্শে ও সাহায্যে পাঞ্জাব-সরকার বিদ্রোহের জন্য নির্দিষ্ট ২১শে ফেব্রুয়ারীর পূর্বেই বিপ্লবীদের উপর চরম আঘাত দিয়া অভ্যুত্থানের সকল আয়োজন পণ্ড করিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

গ্রেপ্তারের হিড়িক

২১শে ফেব্রুয়ারী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীর গোপন বাসস্থান ও প্রধান কেন্দ্র পুলিশ ঘিরিয়া ফেলে। রাসবিহারী কোন প্রকারে পলায়ন করিতে সক্ষম হন, কিন্তু সেখানে সাত জন বিপ্লবী নেতা পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন। এই স্থান খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কয়েকটি রিভলভার, কতকগুলি বোমা ও বোমার অংশ, চারিটি 'স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা,' হস্তগত করে। একই দিনে আরও চারিটি স্থানে খানাতল্লাসী হয় এবং মোট তের জন বিপ্লবী ১২টি বোমা ও কয়েকটি রিভলভারসহ ধরা পড়ে। এই সকল স্থানেও কয়েকটি 'জাতীয় পতাকা' পাওয়া যায়। লাহোরের এই সকল খানাতল্লাসীর ফলে পুলিশ পাঞ্জাবের অমৃতসর, ফিরোজপুর, রাওয়ালপিণ্ডি; যুক্ত প্রদেশের বেনারস ও জব্বলপুর এবং বিভিন্ন ক্যান্টনমেণ্ট-শহরের কর্মকেন্দ্রের সন্ধান পায়। সেই সকল কর্মকেন্দ্রেও সঙ্গে সঙ্গে খানাতল্লাসী হয় এবং বহু নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী বোমা-রিভলভার প্রভৃতিসহ পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। রাসবিহারী ও পিংলে তখন পলাইতে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু লাহোরের প্রধান কর্মকেন্দ্রে খানাতল্লাসীর এক মাস পর মীরাটের সৈন্য-ব্যারাকের লাইনে দুইটি বোমাসহ পিংলে গ্রেপ্তার হন।

এই প্রাথমিক সাফল্যে মত্ত হইয়া পুলিশ চারিদিকে বিপ্লবীদের খোঁজে হানা দিতে থাকে। ২০শে ফেব্রুয়ারী, অর্থাৎ প্রথম গ্রেপ্তারের পর দিন, পুলিশ বিপ্লবীদের এক আড্ডায় হানা দিলে বিপ্লবীরা পুলিশদলের উপর গুলি বর্ষণ করে। ইহার ফলে এক জন হেড কনেস্টবল নিহত ও এক জন দারোগা ভীষণ আহত হয়। গদর-বিপ্লবীদের অন্যতম নেতা কার্তার সিং দেশীয় রাজ্য বিদে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার নিকট বহু 'রাজদ্রোহ'মূলক কাগজপত্র পাওয়া

যায়। তাঁহার অনুচর বলিয়া কথিত পঁচিশ জন বিপ্লবী বৃটিশ-ভারতে গ্রেপ্তার হয়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৩রা এপ্রিল পুলিশ গুরুদাসপুর জিলার তিখাড়িওয়ালা নামক স্থানে বহু অস্ত্র ও 'রাজদ্রোহ'মূলক সাহিত্যের একটি গুদাম আবিষ্কার করে। পাঞ্জাব-সরকার এই সময়ে ভারত-সরকারের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করে তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১৩ই মার্চ পর্যন্ত আমেরিকা-প্রত্যাগত শিখদের ৮৯৩ জনকে অন্তরীণ ও নজরবন্দী করা হইয়াছিল।

গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ

এপ্রিল মাসের ২৫ তারিখে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিবার শাস্তিস্বরূপ হোসিয়ারপুর জিলায় চন্দ সিং নামে এক গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। এই হত্যার জন্য দুই জন বিপ্লবীর ফাঁসী হয়। বিপ্লবীদের পুলিশের হস্তে ধরাইয়া দিবার অপরাধে অমৃতসর জিলার সর্দার বাহাদুর আচার সিং ৪ঠা জুন বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। বিপ্লবীদের দুই জন ধরা পড়ে এবং বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ১২ই জুন বিপ্লবীরা একটি রেলব্রিজ-রক্ষী সামরিক দলের উপর আক্রমণ করে। দলের নায়ক বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ৩রা আগস্ট কাপুর সিং নামক এক ব্যক্তি 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'য় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়া বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেয়।

লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা

এইবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া ভাগে ভাগে বিচার আরম্ভ হয়। সর্বসমেত নয় ভাগে বিচার চলে। এই সকল মামলাই একত্রে দ্বিতীয় 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে। 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'র মোট নয় ভাগে আসামীর সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচ শত, এই মামলায় মোট ২৮ জনের ফাঁসী, এবং অবশিষ্টদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। সর্বসমেত মাত্র ২৯ জন লোক সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করে। এই মামলা শুরু হয় ১৯১৫ খৃস্টাব্দের শেষদিকে আর শেষ হয় ১৯১৬ খৃস্টাব্দের ১৩ই মে।

এই ইতিহাস-বিখ্যাত মামলার অভিযুক্তদের মধ্যে রাসবিহারী বসু, বিষ্ণুগণেশ পিংলে, ভাই পরমানন্দ, কার্তার সিং, হরনাম সিং, মনি সিং প্রভৃতি বিপ্লবীদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মামলা শুরু হইবার পূর্বেই সর্বপ্রধান আসামী রাসবিহারী বসু ভারতবর্ষ হইতে নিরাপদে পলায়ন করিয়া জাপানে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবর্তমানেই তাঁহার বিচার করা হয়।

মামলায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগের মধ্যে এইগুলি ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য :—'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম', বৈপ্লবিক প্রচার, সৈন্য-বাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের উসকানি, স্বদেশ ও বিদেশে বৈপ্লবিক প্রচার ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ, বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে নরহত্যা, ডাকাতি ও লুণ্ঠন ইত্যাদি। এই মামলায় আসামীদের বিরুদ্ধে সবসমেত প্রায় পাঁচ হাজার লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

এই মামলার বিচারে যাঁহাদের ফাঁসী হয় তাঁহাদের মধ্যে বিষ্ণুগণেশ পিংলে, কার্তার সিং ও মনি সিংয়ের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা ব্যতীত দুইটি দেশীয় সৈন্য-রেজিমেণ্টের কয়েকজন সৈন্যও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। ভাই পরমানন্দও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন, কিন্তু পরে তাঁহার প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

'ভারত-রক্ষা আইন'-এর নাগপাশ

'ভারত-রক্ষা আইন' অনুসারে ৩০ জনকে বিভিন্ন গ্রামে এবং ১১৩ জনকে নিজ গ্রামে আটক করা হয়। 'ভারত-প্রবেশ অর্ডিনান্স' অনুসারে মোট ৩৩১ জনকে আটক করা হয়, আর এই সকল আইনের বলে বিদেশ-প্রত্যাগত লোকদের মধ্যে মোট ২৫৭৬ জনকে জেলে ও বিভিন্ন গ্রামে আটক ও অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। দূর-প্রাচ্য হইতে যে সকল শিখ ভারতে প্রবেশ করে, তাহাদের মধ্যে আটক করা হয় মোট ৯১৪ জনকে। ইহা ব্যতীত জাফর আলি খাঁ দ্বারা পরিচালিত লাহোরের 'জমিন্দার' নামক

বিখ্যাত সংবাদ-পত্রখানির উপর নানা বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়া উহার কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করা হয়। এই পত্রিকাখানি সেই সময়ে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র ও ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সমর্থক ছিল এবং সরকারী দমননীতির বিরোধিতা করিতেছিল। এই জন্য সংবাদ ছাপিবার পূর্বে উহার প্রত্যেকটি লিখিত সংবাদ সরকারের দ্বারা অনুমোদিত করাইবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এই সময়ে বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল তাঁহাদের 'হোমরুল' আন্দোলনের পক্ষে প্রচার-কার্যের জন্য পাঞ্জাবে আসিতেছিলেন। তাঁহাদের আগমনের সংবাদে ভীত হইয়া পাঞ্জাব-সরকার তাঁহাদের পাঞ্জাব-প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। পাঞ্জাব প্রদেশকে কার্যতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বেড়াজালে ঘিরিয়া রাখা হয়। এই ভাবে পাঞ্জাব প্রদেশের এই দীর্ঘ প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

ব্রহ্মদেশে 'গদর'

ব্রহ্মদেশে অনুষ্ঠিত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানতঃ গদর সমিতির বিপ্লব-প্রচেষ্টার একটি বিশিষ্ট অংশ। 'গদর' পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হইবার সময় হইতেই ভারতবর্ষ ব্যতীত শ্যামদেশ, মালয়, সাংহাই প্রভৃতি যে সকল স্থানে ভারতবাসীরা বাস করিত সেই সকল স্থানে নিয়মিতভাবে প্রেরিত হইত। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ২২০ খানি 'গদর' পত্রিকা ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন লোকের নামে পাঠান হইত। 'গদর' পত্রিকার গুজরাটী সংস্করণের সম্পাদক কেমচাঁদ দামজি দীর্ঘ কাল রেঙ্গুনে থাকিয়া পরে সানফ্রান্সিস্কো শহরে যান এবং 'গদর' পত্রিকায় যোগদান করেন। কেমচাঁদ দামজির মারফতই গদর সমিতি বিভিন্ন লোকের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করে। দামজিই রেঙ্গুনে থাকাকালে সর্বপ্রথম ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সূত্রপাত করেন।

'জাহান-ই-ইসলাম'

ব্রহ্মদেশের বাহিরে প্রকাশিত আর একটি পত্রিকার মারফত ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রকাশের চেষ্টা চলে। এই পত্রিকাখানির নাম 'জাহান-ই-ইসলাম' এবং ইহা তুরস্কের কনস্টান্টিনোপ্‌ল শহর হইতে ১৯১৪ খৃস্টাব্দের মে মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহাতে উর্দু, আরবী, তুর্কি ও হিন্দি ভাষায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। পত্রিকাখানির উর্দু-বিভাগের সম্পাদক ছিলেন পাঞ্জাবের আবু সৈয়দ নামক একজন মুসলমান-বিপ্লবী। ইনিও বহু দিন পর্যন্ত ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুনে স্কুল-শিক্ষক ও কেরাণীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দে তুরস্কের সহিত ইতালির যুদ্ধের সময় ইনি ঈজিপ্টে গিয়াছিলেন। এই পত্রিকাখানির বহু সংখ্যা রেঙ্গুন ও ব্রহ্মদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রেরিত হইত। প্রথমে ইহা ভারতবর্ষের লাহোর ও কলিকাতা শহরেও প্রেরিত হইত। কিন্তু ইহার উগ্র খৃস্টান-বিরোধী, বিশেষ করিয়া বৃটিশ-বিরোধী প্রবন্ধাবলীর জন্য ভারত-সরকার ১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে ভারতবর্ষে ইহার প্রবেশ বন্ধ করে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গদর সমিতির প্রতিষ্ঠাতা হরদয়াল কনস্টান্টিনোপ্‌ল-এ আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এই পত্রিকার পরিচালকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ভারতের বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে প্রচার-কার্য চালাইবার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তোলেন। উর্দু-বিভাগের সম্পাদক আবু সৈয়দ হরদয়ালের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন এবং হরদয়ালই ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার জন্য এই দলটিকে পরিচালিত করেন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এই পত্রিকার একটি সংখ্যায় হরদয়ালের একটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যাতেই ঈজিপ্টের জাতীয়তাবাদী নেতা ফরিদ বে ও মনসুর আরিফৎ-এর রচিত দুইটি উগ্র বৃটিশ-বিরোধী প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর-সংখ্যায় ঈজিপ্টের জাতীয়তাবাদী নেতা এনভার পাশার একটি বক্তৃতা প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমানদের আহ্বান করিয়া বলেন :—

"ভারতবর্ষে 'গদর' (বিদ্রোহ) ঘোষণার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। ইংরেজদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন কর, তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লও আর সেই অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের হত্যা কর। ভারতবাসীর সংখ্যা ৩২ কোটি, আর ইংরেজেরা সংখ্যায় মাত্র দুই লক্ষ; তাহাদের সবগুলিকে হত্যা কর; তাহাদের কোন সৈন্যবলও নাই। শীঘ্রই তুর্কিরা সুয়েজখাল বন্ধ করিয়া দিবে। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য যে প্রাণ বিসর্জন দিবে, সে অমর হইয়া থাকিবে। ভারতের হিন্দু-মুসলমান! তোমরা উভয়েই এক সৈন্যবাহিনীর সৈন্য, তোমরা দুই ভাই, আর নীচ ও অধম ইংরেজগুলি তোমাদের উভয়ের শত্রু। তোমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করিয়া 'গাজী' (বীর) হও, তোমাদের সকল ভাইকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া ইংরেজ-শয়তানদের হত্যা কর এবং দেশের মুক্তি সাধন কর।"(১)

'জাহান-ই-ইসলাম' পত্রিকাখানি ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে বেআইনি ঘোষিত হইবার পর ইহা 'গদর' পত্রিকার বাণ্ডিলের মধ্যে ভরিয়া পাঠান হইত। ব্রহ্মদেশ-প্রবাসী ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে এই পত্রিকাটি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই প্রভাবকে ভিত্তি করিয়া এবার ব্রহ্মদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়। কনস্টাণ্টিনোপলে বসিয়া হরদয়াল এই প্রচেষ্টায় সাহায্য করেন।

বিপ্লবের আয়োজন

আবু সৈয়দের পরামর্শে তুরস্কের 'ইয়ং তুর্ক পার্টি'র(২) বিশিষ্ট নেতা তৌফিক বে ১৯১৩ খৃস্টাব্দে রেঙ্গুনে আগমন করেন। তিনি রেঙ্গুনের মুসলমান ব্যবসায়ী-সমাজের নেতা আহম্মদ মোল্লা দাউদকে রেঙ্গুনে তুরস্কের কন্‌সাল নিযুক্ত করেন। [illegible] সহজেই ব্রহ্মদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিতে পারিবেন—ইহা ভাবিয়াই তাঁহাকে কন্‌সাল-পদে নিযুক্ত করা হয়।

---

(১) 'Sedition Committee 'Report,' P. 169.

(২) এই পার্টি উগ্র বৃটিশ-বিরোধী বলিয়া খ্যাত ছিল।

মহাযুদ্ধের সময় তুরস্ক বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মাণীর পক্ষে যোগদান করিবার পর হাকিম ফৈম আলি ও আলী আহম্মদ সাদিকি নামে দুই জন ভারতীয় মুসলমান তুরস্ক হইতে আগমন করেন। 'বলকান-যুদ্ধ'এর সময় তুরস্ককে ঔষধপত্র দিয়া সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে 'রেড ক্রেসেণ্ট সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল। ইঁহারা সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে তুরস্ক গিয়াছিলেন। হাকিম ফৈম আলি রেঙ্গুনে আসেন তুরস্কের 'ইয়ং তুর্ক পার্টি'র প্রতিনিধিরূপে। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব হরদয়ালের প্রেরণায় বৈপ্লবিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।

'গদর' (বিদ্রোহ)

ব্রহ্মদেশে বৈষম্যমূলক সরকারী নীতির ফলে প্রবাসী ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী মনোভাব পূর্ব হইতেই তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর 'গদর' পত্রিকা ও 'জাহান-ই-ইসলাম' পত্রিকার প্রচারের ফলে তাহা বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বেলুচিস্থানের মুসলমানদের লইয়া গঠিত বেলুচি-সৈন্যদের ১৩০নং রেজিমেণ্টটিকে শাস্তি হিসাবে বোম্বাই হইতে রেঙ্গুনে স্থানান্তরিত করা হয়। বোম্বাই থাকাকালে এই সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের অত্যাচারী ইংরেজ-সেনাপতিকে হত্যা করিয়াছিল বলিয়াই এই দূরদেশে স্থানান্তরিত করিয়া তাহাদের শাস্তি দেওয়া হয়। এই সৈন্যগণ রেঙ্গুনে আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই রেঙ্গুনের বিক্ষুব্ধ মুসলমানগণ 'গদর'-এর (বিদ্রোহের) জন্য তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করে। 'গদর' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচারে উদ্বুদ্ধ হইয়া এই সৈন্যদলটিও বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। রেঙ্গুনের মুসলমানদের প্রতিনিধিগণ ও সৈন্যদলের প্রতিনিধিগণ পরামর্শ করিয়া জানুয়ারী মাসের শেষদিকে বিদ্রোহের সময় স্থির করে। বিদ্রোহের আয়োজন পূর্ণোদ্যমে আগাইয়া চলে। ইতিমধ্যে সামরিক কর্তৃপক্ষ কোন প্রকারে বিদ্রোহের আয়োজনের সংবাদ জানিয়া ফেলে এবং গোপনে বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার আয়োজন করে। ২১শে জানুয়ারী শেষ রাত্রে একটি ইংরেজ-সৈন্যদল বেলুচি-

সৈন্যদের সকল ব্যারাক ঘিরিয়া ফেলে। খানাতল্লাসীর ফলে 'গদর' পত্রিকার বহু সংখ্যা ইংরেজ-সৈন্যদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহের অভিযোগে দুই শত বেলুচি-সৈন্যকে সামরিক বিচারে দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া আন্দামান দ্বীপে আবদ্ধ করা হয়।

মহাযুদ্ধ শুরু হইবার ঠিক পরেই কয়েকজন বিশিষ্ট গদর-বিপ্লবী ব্যাঙ্কক ও ফিলিপাইন হইতে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। ইহাদের মধ্যে মুস্তাবা হোসেন ওরফে মুলচাঁদ অন্যতম। ইনি পূর্বে ছিলেন কানপুরের 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস'-এর এক জন কর্মচারী। 'গদর' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচারে অনুপ্রাণিত হইয়া ইনি বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগের সিদ্ধান্ত করেন এবং বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে সরকারী 'কোর্ট অফ ওয়ার্ডস্'-এর কয়েক হাজার টাকা লইয়া উধাও হন। পরে তিনি ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলা নগরীতে উপস্থিত হইয়া গদর সমিতিতে যোগদান করেন।

মহাযুদ্ধ শুরু হইবামাত্র মুস্তাবা হোসেন অপর কয়েকজন বিশিষ্ট গদর-বিপ্লবীকে সঙ্গে লইয়া সিঙ্গাপুরে অবস্থিত সৈন্যদলগুলির মধ্যে বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইয়া বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 'মালয় স্টেটস্ গাইডস্' ও 'পঞ্চম পদাতিক রেজিমেণ্ট' নামক দুইটি সৈন্যদলই ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্রস্তুত হয়। বিদ্রোহের সময় স্থির হয় ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি। ইতিমধ্যে বিদ্রোহের নায়কদের একখানি গোপন পত্র সরকারের হস্তগত হয়। কাশিম মনসুর নামক একজন গুজরাটী মুসলমান সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুনে তাঁহার পুত্রের নিকট এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই পত্রে সিঙ্গাপুরের 'মালয় স্টেটস্ গাইডস্' নামক রেজিমেণ্টের বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ দিয়া কয়েকটি যুদ্ধ-জাহাজ সিঙ্গাপুরে প্রেরণের জন্য তুরস্ক-সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল। এই পত্রখানি রেঙ্গুনে অবস্থিত তুরস্কের কন্সালের নিকট পৌঁছাইবার জন্যই কাশিম মনসুর রেঙ্গুনে তাঁহার পুত্রের নিকট এই পত্রখানি পাঠাইয়াছিলেন।

২৮শে ডিসেম্বর পত্রখানি ব্রহ্মের ইংরেজ-সরকারের হস্তগত হয়। ইংরেজ-সরকার অবিলম্বে 'মালয় স্টেটস্ গাইডস্' রেজিমেণ্টটিকে স্থানান্তরিত করিয়া বিদ্রোহের পরিকল্পনা ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে। উক্ত রেজিমেণ্টটি অপসারিত হইবামাত্র অপর রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মালয়ের কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া বসে। কয়েকদিন পর্যন্ত মালয় প্রকৃতপক্ষে এই সৈন্যদলের অধিকারে থাকে। ইতিমধ্যে ইংরেজ-সরকার রেঙ্গুন, হংকং প্রভৃতি স্থান হইতে কয়েকটি বড় সৈন্যদল লইয়া আসে এবং তাহাদের সাহায্যে মালয়ের বিদ্রোহী সৈন্যদের বন্দী করে। ইহার পর পঞ্চম পদাতিক রেজিমেণ্টটিকে কয়েকটি খণ্ডযুদ্ধে পরাজিত করিয়া সকল সৈন্যদের বন্দী করে। ইহার পর বন্দী সৈন্যদের সামরিক আদালতে বিচার হয়। প্রায় চারিশত সৈন্য বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে।

গুপ্ত সমিতি

এদিকে আলি আহ্‌ম্মদ ও ফৈম আলি তুরস্ক হইতে রেঙ্গুনে পৌছিবার পর তাঁহারা রেঙ্গুনের মুসলমানদের মধ্যে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া একটি গুপ্ত সমিতি গড়িয়া তোলেন। বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ সাধনই এই গুপ্ত সমিতির উদ্দেশ্য হিসাবে প্রচার করা হয়। রেঙ্গুনের মোমিন মুসলমান-সম্প্রদায়ের স্কুলের হেড মাস্টার মহাশয়ের সাহায্যে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে ১৫ হাজার টাকা চাঁদা সংগ্রহ করিয়া তাহাদ্বারা কয়েকটি রিভলভার ও পিস্তল ক্রয় করা হয়।

এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের গোড়ার দিকে, হাসান খাঁ ও শোহন-লাল পাঠক নামে গদর সমিতির দুইজন বিশিষ্ট সভ্য ব্যাঙ্কক হইতে গোপনে ব্রহ্মের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া রেঙ্গুনে উপস্থিত হন। তাঁহারা রেঙ্গুনে একখানি ঘর ভাড়া করিয়া সেখানে গদর সমিতির কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। চিঠিপত্র মারফত বাহিরের সহিত যোগাযোগ রাখিবার জন্য তাঁহারা রেঙ্গুনের একটি 'পোস্ট বক্স'ও ভাড়া করেন। ইতিপূর্বে মালয়ের সৈন্য-বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর মুজাবা হোসেন ওরফে মুলচাঁদ প্রভৃতি গদর-বিপ্লবীরাও রেঙ্গুনে আসিয়া

পৌঁছিয়াছিলেন। এবার তাঁহারাও হাসান খাঁ ও শোহনলালের সহিত মিলিত হন।

এদিকে রেঙ্গুন ও মালয়ের সৈন্য-বিদ্রোহের পর ব্রহ্ম ও মালয়ের ইংরেজ-সরকার বিশেষ সতর্ক হইয়া গিয়াছিল। আরও বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের আশঙ্কা করিয়া তাহারা সীমান্ত ও ডাক চলাচল প্রভৃতি যোগাযোগ-ব্যবস্থার উপর বিশেষ কড়া দৃষ্টি রাখিতে থাকে। দেখিতে না দেখিতে সারা ব্রহ্ম ও মালয় অসংখ্য গুপ্তচরে ভরিয়া যায়। এই সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থার ফলে কয়েকখানি গোপন চিঠি পুলিশের হস্তগত হয় এবং পুলিশ বিপ্লবীদের 'পোস্ট বক্স'-এর নম্বরটি জানিয়া ফেলে। এই সময়ে মালয়ের বিপ্লবীদের রেঙ্গুনের 'পোস্ট বক্স'-এর নম্বরটি জানাইবার জন্য উহা উল্লেখ করিয়া মুস্তাবা হোসেন মালয়ে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্রখানি মালয়-পুলিশের হস্তগত হয়। এই ঘটনাটি ঘটে ১৯১৫ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। জুন মাসে শ্যাম-ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট ব্যাঙ্কক হইতে প্রেরিত বহু গদর-সাহিত্যপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড বাক্স এবং আলি আহ্ম্মদ ও ফৈম আলির নিকট লিখিত দুইখানি পত্র পুলিশের হস্তগত হয়। এই সকল সূত্র হইতে গদর-বিপ্লবী ও রেঙ্গুনের মুসলমান বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ যোগ-সম্পর্ক পুলিশের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে।

ব্রহ্মদেশের কুখ্যাত সামরিক পুলিশ-বাহিনীতে ১৫ হাজার শিখ ও পাঞ্জাবী মুসলমান ছিল। বিপ্লবীরা পুলিশ-বাহিনীর শিখ ও মুসলমানদের নিকটে বিদ্রোহের প্রস্তাব করে। তাহারা এই বাহিনীর মধ্যে 'গদর' পত্রিকা ও 'জাহান-ই-ইসলাম'-এর বহু সংখ্যা এবং অনেক বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচার করিতে থাকে। 'সামরিক ভাইদের নিকট ভালবাসার বাণী' শীর্ষক একখানা ইস্তাহারে ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য গদর অর্থাৎ বিদ্রোহের আহ্বান জানান হয়।

১৯১৫ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে মেমিও শহরে অবস্থিত 'পার্বত্য গোলন্দাজ বাহিনী'র কয়েকজন সৈন্যের নিকট গদর-এর বাণী ব্যাখ্যা করিবার সময় ব্রহ্ম-দেশে গদর সমিতির প্রধান পরিচালক শোহনলাল পাঠক গোয়েন্দাদের হাতে গ্রেপ্তার হন। তাঁহার সঙ্গী নারায়ণ সিং পলায়ন করেন। গ্রেপ্তারের সময়

শোহনলালের দেহ তল্লাসী করিয়া তিনটি অটোম্যাটিক পিস্তল ও ২৭০টি কার্তুজ, হরদয়ালের রচিত একটি বৈপ্লবিক প্রবন্ধ, 'জাহান-ই-ইসলাম'-এর কয়েকটি সংখ্যা এবং বোমা তৈরীর একটি নিয়মাবলী পাওয়া যায়। শোহনলালের গ্রেপ্তারের পাঁচ দিন পরে তাঁহার সঙ্গী নারায়ণ সিংও মেমিও শহরে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় তিনি একটি অটোম্যাটিক পিস্তলদ্বারা গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু বহু সশস্ত্র পুলিশের বেড়াজালে পড়িয়া তাঁহার পলায়নের চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই সময়ে শ্যামদেশের উত্তরভাগে একটি রেলপথ তৈরী হইতেছিল। ইহার ইঞ্জিনিয়ারগণ সকলেই ছিল জার্মাণ। গদর-বিপ্লবীরা জার্মাণ-ইঞ্জিনিয়ারদের সাহায্যে গদর সমিতির বহু সভ্যকে এই রেলপথের কার্যে কুলী ও কর্মচারী হিসাবে প্রবেশ করাইতে সক্ষম হয়। এই সকল কুলী ও কর্মচারীরূপী বিপ্লবীদের জার্মাণ সামরিক অফিসারদের দ্বারা শিক্ষা দিয়া ইহাদের লইয়া একটি সৈন্যদল গঠন করাই ছিল গদর-বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য। স্থির হইয়াছিল যে, জার্মাণ সামরিক অফিসারদের পরিচালনায় এই সৈন্যদল ব্রহ্মদেশ আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিবে। এই পরিকল্পনাটি ছিল 'ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র'-এর একটি বিশিষ্ট অংশ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই শোহনলাল পাঠক রেঙ্গুনেআসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং নারায়ণ সিং শ্যামদেশের উক্ত রেলপথের কর্মচারী সাজিয়া তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন।(১)

শোহনলাল ও নারায়ণ সিংয়ের গ্রেপ্তারের পর রেঙ্গুনের গদর সমিতির কর্মকেন্দ্রে খানাতল্লাস হয় এবং বহু মালপত্রসহ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এবার ধৃত বিপ্লবীদের লইয়া 'প্রথম মান্দালয় ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয়। মামলার বিচারে শোহনলালের ফাঁসী, নারায়ণ সিংয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

ব্রহ্মদেশে বিদ্রোহের সর্বশেষ চেষ্টা হয় ১৯১৫ খৃস্টাব্দের শেষদিকে। এই চেষ্টা রেঙ্গুনের মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই প্রচেষ্টার উদ্যোক্তা

(১) 'ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ছিলেন ফৈম আলি ও আলি আহ্‌ম্মদ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত সমিতি ইহার আয়োজন করে। প্রথমে বিদ্রোহের তারিখ স্থির হয় অক্টোবর মাসের 'বকর-ইদ' পর্বের দিন। বিদ্রোহীরা ঘোষণা করে যে, মুসলমানদের উক্ত পর্বের প্রথানুযায়ী বকৃরি বা ছাগল ও গরু কোরবাণীর পরিবর্তে 'ইংরেজ-শয়তানদের' কোরবাণী করা হইবে। কিন্তু বিদ্রোহের আয়োজন সম্পূর্ণ না হওয়ায় বিদ্রোহের তারিখ স্থির হয় ২৫শে ডিসেম্বর। ব্রহ্মের সামরিক পুলিশের একটি মুসলমান-ব্যাটালিয়নও এই বিদ্রোহে যোগদান করিতে প্রস্তুত হয়। এই ব্যাটালিয়নটি অবস্থিত ছিল 'পিয়াবোয়া' নামক স্থানে। নভেম্বর মাসে বিদ্রোহের সকল পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ জানিয়া ফেলে এবং রিভলভার, ডিনামাইট ও অন্যান্য জিনিসপত্রের একটি গুদাম ধরা পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বহু বিদ্রোহী ও পুলিশ গ্রেপ্তার হয়। ইহাদের লইয়া 'দ্বিতীয় মান্দালয় ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয় এবং বিচারে বিদ্রোহীদের দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং পুলিশ ও সৈন্যদের অন্তরীণের আদেশ হয়। এইভাবে ব্রহ্মে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে।

সপ্তম অধ্যায়

যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

বৈপ্লবিক প্রচার

বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নিচ্ছটায় যুক্তপ্রদেশের রাজনৈতিক আকাশও লাল হইয়া উঠিতে থাকে। তখন একদিকে বোমা ও পিস্তলের গর্জনে বাংলাদেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে, অপর দিকে পাঞ্জাবের আকাশে বিপ্লবের ঝড় উঠিতেছে। এই দুই প্রদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ছোঁয়াচ লাগিয়া যুক্তপ্রদেশেও বিপ্লবের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতে থাকে।

যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য লইয়া ১৯০৭ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে এলাহাবাদে 'স্বরাজ্য' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পত্রিকা

প্রকাশের মূলে ছিলেন শান্তিনারায়ণ নামক এক ব্যক্তি। ইনি পূর্বে ছিলেন পাঞ্জাবের একখানি প্রগতিশীল রাজনৈতিক পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ১৮১৮ খৃস্টাব্দের তিন আইনে পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় এবং অজিত সিংয়ের গ্রেপ্তার ও আটকের প্রতিবাদে 'স্বরাজ্য' পত্রিকায় এক 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া শান্তিনারায়ণ যুক্তপ্রদেশের যুব-সম্প্রদায়কে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য আহ্বান জানান। ইহার পর হইতে এই পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বৈপ্লবিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক বোমা নিক্ষেপ উপলক্ষে এক সাংঘাতিক 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে শান্তিনারায়ণ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু ইহাতেও 'স্বরাজ্য' পত্রিকার বৈপ্লবিক প্রচার বন্ধ না হইয়া বরং তাহা আরও উগ্র হইয়া উঠে। শান্তিনারায়ণের পর একে একে আট জন সম্পাদক গ্রেপ্তার হইয়া রাজদ্রোহ প্রচারের অপরাধে কারা বরণ করেন। ১৯১০ খৃস্টাব্দে নূতন 'ভারতীয় প্রেস-আইন' পাশ হইবার পর যুক্তপ্রদেশের সরকার 'স্বরাজ্য' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেয়।

১৯০৯ খৃস্টাব্দে 'কর্মযোগী' নামক আর একখানি পত্রিকা এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হইয়া অনুরূপভাবে বৈপ্লবিক প্রচার শুরু করে। কিন্তু ইহাও ১৯১০ খৃস্টাব্দে নূতন প্রেস-আইনের কবলে পতিত হইয়া বন্ধ হয়।

১৯০৮ খৃস্টাব্দে হোতিলাল বর্মা নামক এক ভদ্রলোক আলিগড়-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিকট প্রকাশ্যেই ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিবার আবেদন জানান। ইনি ছিলেন জাঠ-সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রথমে পাঞ্জাবের কয়েকখানি রাজনৈতিক সংবাদপত্রে সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজ করিয়া পরে ইনি কিছুদিনের জন্য বাংলাদেশে অরবিন্দ ঘোষ কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজি 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার আলিগড়ের প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। ইহার পূর্বে ইনি দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার কয়েকটি দেশ ঘুরিয়া য়ুরোপে গিয়াছিলেন এবং ফরাসী দেশে যাইয়া ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ১৯০৮

খৃস্টাব্দে হোতিলাল আলিগড়ের ছাত্রদের লইয়া এক বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রচার-কার্য শুরু করেন। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি যুক্তপ্রদেশ-সরকারের রোষ-দৃষ্টিতে পতিত হইয়া গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় তাঁহার গৃহ খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি বৈপ্লবিক সাহিত্য ও বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতি কর্তৃক রচিত একটি বোমা তৈরীর নিয়মাবলী হস্তগত করে। 'রাজদ্রোহ' প্রচার ও বৈপ্লবিক সাহিত্য রাখিবার অপরাধে তিনি দশ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বৈপ্লবিক সমিতি

১৯০৮ খৃস্টাব্দে কাশীর বাঙ্গালীটোলা উচ্চ ইংরেজি-বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্র শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার স্কুলের অপর কয়েকটি ছাত্রের সহিত একত্রে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। ইহার নাম রাখা হয় 'অনুশীলন সমিতি'। এই সময়ে শচীন্দ্রনাথ ঢাকা 'অনুশীলন সমিতি'র কোন সভ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। সেই সভ্যের নিকট হইতেই শচীন্দ্রনাথ বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে শচীন্দ্রনাথ এই সমিতির নাম 'অনুশীলন সমিতি' রাখিয়াছিলেন। কিন্তু অনুশীলন সমিতির ক্রিয়া-কলাপ ও আলোচনা শীঘ্রই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সমিতির সভ্যদের উপর পুলিশের উৎপীড়ন শুরু হয়। ইহার ফলে এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া রাখা হয় 'যুব-সঙ্ঘ' ('ইয়ং মেনস্ এসোসিয়েশন')। এই সমিতির সভ্যদের চেষ্টায় কাশীর ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রকাশ্য সংগঠন গড়িয়া উঠে। ইহার নাম রাখা হয় 'স্টুডেণ্টস্ য়ুনিয়ন লীগ'।

অনুশীলন সমিতি বা যুব-সঙ্ঘের গঠনতন্ত্রের মধ্যে ইহার উদ্দেশ্য হিসাবে উল্লেখ করা হয় যে, সমিতির সভ্যদের নৈতিক, শারীরিক ও মানসিক উন্নতি-সাধন করাই ইহার উদ্দেশ্য। শচীন্দ্রনাথের চেষ্টার ফলেই এই সমিতি একটি বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানরূপে গড়িয়া উঠিতে থাকে। তিনি সমিতির সভ্যদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাহাদের কানে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র দান করিতেন। ইহার

ফলে শীঘ্রই সমিতির মধ্যে অন্যান্য সভ্যদের অলক্ষ্যে একটি বিপ্লবীদল গড়িয়া উঠে। শচীন্দ্রনাথ ইহাদের লইয়া আলোচনা-বৈঠক করিতেন। সেই সকল বৈঠকে কিশোর-বিপ্লবীদের মনে বৈপ্লবিক চেতনা ও সাহস জন্মাইবার জন্য তিনি ভাগবৎ গীতার বৈপ্লবিক ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইতেন। বৈপ্লবিক সংগঠন সৃষ্টির নিয়ম-কানুন ও রাজনৈতিক হত্যা প্রভৃতির বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য শিখাইবার জন্য তিনি ইতালীর সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী নেতা ম্যাৎসিনির জীবন-কাহিনী পড়িয়া শুনাইতেন। সভ্যদের জন্য তিনি ম্যাৎসিনির জীবনীর একটি টীকাও রচনা করিয়াছিলেন। "বাৎসরিক কালিপূজায় ইহারা প্রতি বৎসর একটি শাদা লাউ বলি দিতেন। অবশ্য শাদা লাউ বলি দেওয়াটা কোন অন্যায় কাজ নয়। কিন্তু ইহারা শাসক শ্বেত জাতির লোক হত্যার প্রতীক হিসাবেই ইহা করিতেন। ইহা ব্যতীত ইংরেজদের বিতাড়িত করিবার শক্তি কামনা করিয়া কালীর নিকট প্রার্থনাও করা হইত।"(১)

শচীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার বিপ্লবী দল গঠন করিতে ব্যস্ত তখন যুব-সঙ্ঘের পরিচালনা-ভার কাশীর কয়েকটি ভীরু লোকের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইহারা কেবল বিপ্লবের গরম বুলি কপ্‌চাইয়াই নিজেদের কর্তব্য শেষ করিত এবং নিজেদের মস্ত বড় বিপ্লবী বলিয়া জাহির করিত। এই নেতাদের বিরুদ্ধে দুইটি বিরোধী দল দেখা দেয়। প্রথম দল হইল সমিতির সাধারণ সভ্যগণ। তাহারা সঙ্ঘের পরিচালকদের প্রকাশ্য বৈপ্লবিক আলাপ-আলোচনায় ভয় পাইয়া সমিতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করে। অপরটি হইল শচীন্দ্রনাথের দল। তাঁহারা পরিচালকদের নিষ্ক্রিয় বাগাড়ম্বরে বিরক্ত হইয়া যুব-সঙ্ঘের সহিত সম্পর্ক ছেদ করেন। এইবার শচীন্দ্র নিজেই একটি গোপন বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতি শচীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কাজ শুরু করে।

প্রথমদিকে শচীন্দ্রনাথের সংগঠনটি ছিল বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতিরই একটি শাখাবিশেষ। অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখিয়াই শচীন্দ্র তাঁহার সংগঠনের কার্য পরিচালনা করিতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ঘন

(১) Judgment of the Beneras Conspiracy case.

ঘন কলিকাতায় আসিতে হইত। বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতি শচীন্দ্রের সহিত শশাঙ্কমোহন হাজরা ওরফে অমৃত হাজরার(১) মারফত যোগাযোগ রক্ষা করিত। শশাঙ্কমোহন শচীন্দ্রকে বহু টাকা ও বোমা দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন।

শচীন্দ্র তাঁহার দলের সহিত প্রায়ই গ্রামাঞ্চলে গিয়া গ্রামবাসীদের লইয়া সভা করিতেন। এই সকল সভায় বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করিয়া গ্রামের চাষীদের বুঝাইতেন যে, এদেশ হইতে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে না পারিলে দেশের কোন উন্নতি সম্ভব নয়, আর দেশ হইতে ইংরেজ-বিতাড়নের একমাত্র উপায় হইল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। এই উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া ১৯১৩ খৃস্টাব্দের শেষদিকে বিপ্লবীরা কয়েকটি ইস্তাহার বাহির করে। ইস্তাহারগুলি কাশীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে, প্রতি পল্লীতে এবং গ্রামাঞ্চলে বিলি করা হয়। ডাক মারফতও বিভিন্ন স্থানে বহু ইস্তাহার পাঠান হয়।

বিপ্লবের আয়োজন

কাশীর বৈপ্লবিক সমিতি এইভাবে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কার্য পরিচালনা করে। ঐ বৎসরের ফেব্রুয়ারী মাসে রাসবিহারী বসু লাহোর হইতে পলাইয়া আসিয়া কাশীতে শচীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন। ইতিপূর্বে তিনি লাহোরকে কেন্দ্র করিয়া পাঞ্জাব ও দিল্লীতে বিপ্লবের আয়োজন করিতেছিলেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট-হত্যার চেষ্টা প্রভৃতির পর প্রথম 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হইলে ভারত-সরকার রাসবিহারীকেই প্রধান আসামী বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার গ্রেপ্তারের জন্য একটি লোভনীয় পুরস্কার ঘোষণা করে। রাসবিহারী কোনক্রমে পুলিশের ব্যাপক বেড়াজাল এড়াইয়া লাহোর হইতে পলায়ন করেন এবং ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কাশীতে আসিয়া শচীন্দ্রনাথের সহিত মিলিত হন।

---

(১) শশাঙ্ক ওরফে অমৃত হাজরা কলিকাতার রাজাবাজার অঞ্চলের 'বোমা-ফ্যাক্টরি'তে ১৯১৪ খৃস্টাব্দে গ্রেপ্তার হইয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন। এই সম্পর্কে 'বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায়ের '১৯১৪ খৃস্টাব্দ' অনুচ্ছেদটি দ্রষ্টব্য।

শচীন্দ্রনাথ রাসবিহারীকে পাইয়া তাঁহার দলের পরিচালনা-ভার রাসবিহারীর হস্তেই অর্পণ করেন। রাসবিহারী কাশীতে থাকিয়াই শচীন্দ্রনাথের দলটিকে পুনর্গঠিত করিয়া উহার সাহায্যে সারা যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন বিস্তারের চেষ্টা শুরু করেন। সারা প্রদেশের নেতৃস্থানীয় কর্মীরা কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। রাসবিহারী তাঁহাদের লইয়া আলোচনা-বৈঠক করিতেন এবং বিপ্লবের উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইতেন। তিনি তাঁহাদের বোমা ও রিভলভার ছুঁড়িবার কৌশলও শিখাইতেন। ১৯১৪ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি একবার একটি বোমা লইয়া কর্মীদের উহা ছুঁড়িবার কৌশল শিখাইতে গিয়া হঠাৎ বোমাটি ফাটিয়া যাওয়ায় তিনি ও শচীন্দ্র গুরুতররূপে আহত হন। এই বোমা বিস্ফোরণের শব্দে তিনি যে পাড়ায় থাকিতেন সেই পাড়ার অধিবাসীদের মনে সন্দেহ দেখা দেয়। তাহার ফলে রাসবিহারী আশ্রয় পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন।

১৯১৪ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র ও গদর-বিপ্লবের সংবাদ লইয়া সত্যেন্দ্রনাথ সেন ও বিষ্ণুগণেশ পিংলে বার্লিন হইতে ভারতে উপস্থিত হন এবং নভেম্বর মাসের শেষ দিকে কাশীতে আসিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। পিংলে রাসবিহারীকে পাঞ্জাবে ফিরিয়া গিয়া আসন্ন বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। পিংলের এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও রাসবিহারীর গোপন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিবার জন্য রাসবিহারী পিংলে ও শচীন্দ্রনাথকে পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। পিংলে ও শচীন্দ্রনাথ সকল ব্যবস্থা করিয়া কাশীতে ফিরিয়া আসেন।

পাঞ্জাব যাত্রা করিবার পূর্বে রাসবিহারী যুক্তপ্রদেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের এক সভা করেন। এই সভায় ভারতের আসন্ন বিপ্লব ও বিপ্লবীদের আশু কর্তব্য ব্যাখ্যা করিয়া তিনি সকলকে "দেশের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে মরিবার জন্য" প্রস্তুত হইতে বলেন। এই সভায় স্থির হয় যে, পিংলে ও শচীন্দ্রনাথ উভয়েই রাসবিহারীর সহিত পাঞ্জাব গমন করিবেন এবং দামোদর স্বরূপ নামে এক বিপ্লবী এলাহাবাদে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া দলের পরিচালক হিসাবে বিপ্লবের আয়োজন করিবেন।

রাসবিহারী ও শচীন্দ্রনাথ পরামর্শ করিয়া বাংলাদেশ হইতে কতকগুলি বোমা আনাইবার জন্ম দুই ব্যক্তিকে কলিকাতায় প্রেরণ করেন এবং বাংলাদেশ হইতে সংগৃহীত বোমা লাহোরে পৌঁছাইবার জন্য বিনায়ক রাও কপিলকে নিযুক্ত করেন। বেনারস ক্যান্টনমেণ্টের সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন ও বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময় তাহাদের সাহায্য লাভের চেষ্টার ভার পড়ে বিভূতি ও প্রিয়নাথ নামক দুইজন সভ্যের উপর। ইহা ব্যতীত, নলিনী মুখোপাধ্যায়(১) নামে একজন বাঙ্গালী বিপ্লবীকে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে অবস্থিত সৈন্যদের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য প্রেরণ করা হয়। এই সকল ব্যবস্থা করিয়া পিংলে ও শচীন্দ্রনাথের সহিত রাসবিহারী লাহোর যাত্রা করেন। কিন্তু কয়েক দিন পরেই শচীন্দ্রনাথ নিজে কাশীর বৈপ্লবিক আয়োজনের ভার গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে কাশীতে ফিরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ হইতে পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের জন্য বহু বোমা আসিয়া পড়ে। শচীন্দ্রনাথ বিনায়ক রাও কপিল(২) ও মনিলাল(৩) নামক দুই জন সভ্যের মারফত লাহোরে রাসবিহারীর নিকট আঠারটি বোমা প্রেরণ করেন। মনিলাল লাহোরে পৌঁছিয়া রাসবিহারীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে রাসবিহারী তাঁহাকে জানাইয়া দেন যে, সারা উত্তর-ভারতে একই দিনে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হইবে এবং ইহার তারিখ স্থির হইয়াছে ২১শে ফেব্রুয়ারী। তিনি মনিলালের মারফত শচীন্দ্রনাথকে সেই অনুযায়ী আয়োজন করিবার নির্দেশ দেন।

পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা এই তারিখ পরে কয়েকটি কারণে পরিবর্তন করিতে বাধ্য হন। প্রথমতঃ, তাঁহারা সন্দেহ করেন যে, দলের মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা প্রবেশ করিয়া সকল গোপন ব্যবস্থা জানিয়া ফেলিয়াছে; দ্বিতীয়তঃ, ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার শুরু হইয়া গিয়াছে। এই সকল কারণে

---

(১) নলিনী মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কে "মধ্যপ্রদেশে 'বিপ্লব-প্রচেষ্টা" শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য (২) বৈপ্লবিক সমিতির বিরুদ্ধে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করার শাস্তি স্বরূপ কপিল পরে বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হয়। (৩) মনিলাল পরে 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র রাজসাক্ষী হয়।

অভ্যুত্থানের তারিখ পরিবর্তন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু গোলমালের মধ্যে রাসবিহারী এই সংবাদ শচীন্দ্রনাথকে জানাইতে পারিলেন না।

এদিকে শচীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা তারিখ পরিবর্তন ও পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারের সংবাদ জানিতে না পারিয়া পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহারা ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা কাশীর সামরিক কুচকাওয়াজের ময়দানে অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু অভ্যুত্থান শুরু করিবার শেষ নির্দেশ না পাইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাঁহারা চলিয়া যান।

এদিকে রাসবিহারী ও পিংলে কোন প্রকারে লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই দশটি বোমা লইয়া পিংলে(১) চলিয়া যান এবং ২৩শে মার্চ মীরাটে সৈন্যদের ব্যারাকের লাইনে বোমাসহ গ্রেপ্তার হন।

রাসবিহারীর পলায়ন

লাহোরের গ্রেপ্তারের পর সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া পুলিশের তাণ্ডব শুরু হয়। অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ লাহোর হইতে শুরু করিয়া কাশী পর্যন্ত তোলপাড় করিতে থাকে। শচীন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাকে অবিলম্বে কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। রাসবিহারীও গ্রেপ্তার এড়াইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। ইহার পরও যুক্তপ্রদেশের প্রধান বিপ্লবী কর্মীরা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে রাসবিহারীর ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে বহু আলোচনার পর স্থির হয় যে, রাসবিহারী অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার অন্য কোন দেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেখান হইতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিতভাবে ভারতের

(১) পরে পিংলের ফাঁসী হয়।

বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবেন। এই সময়ে ব্যাঙ্কক, ব্যাটাভিয়া ও সাংহাই হইতে বিপ্লবীরা ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র সফল করিয়া তুলিবার জন্ম সচেষ্ট ছিলেন। রাসবিহারীও অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত করেন।

এই বৈঠকে যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্থির হয় যে, শচীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু একত্রে যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠন পরিচালনা করিবেন এবং ঐ প্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবেন। নগেন্দ্রনাথ ওরফে গিরিজাবাবু রাসবিহারী ও শচীন্দ্রনাথেরই সুযোগ্য সহকর্মী। ইহার পূর্বে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে যখন 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র বিখ্যাত পরিচালক পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হইয়া আটক ছিলেন তখন গিরিজাবাবুই সেই বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা বলিয়া পরিচিত হন। এই জন্য মহাযুদ্ধ শুরু হইবামাত্র 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' যুক্ত-প্রদেশের বৈপ্লবিক আয়োজনে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করে।

'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'

এই সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার কয়েকদিন পরেই ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১২ই মে পূর্বগামী একখানা জাহাজে চড়িয়া রাসবিহারী সাংহাই নগরীতে উপস্থিত হন এবং অবনী মুখার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন। ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র ও ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তিনি সাংহাই হইতে পলায়ন করিয়া জাপানে উপস্থিত হন। সেই সময় হইতে তিনি জাপানে থাকিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার-কার্য চালাইয়া যান।

অন্য দিকে শচীন্দ্র ও গিরিজাবাবু যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করিবার কয়েকদিন পরেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত উভয়ে গ্রেপ্তার হন। তারপর ইঁহাদের লইয়া এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হয়। এই মামলাই 'বেনারস

অভ্যুত্থানের তারিখ পরিবর্তন করা ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না, কিন্তু গোলমালের মধ্যে রাসবিহারী এই সংবাদ শচীন্দ্রনাথকে জানাইতে পারিলেন না।

এদিকে শচীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীরা তারিখ পরিবর্তন ও পাঞ্জাবের গ্রেপ্তারের সংবাদ জানিতে না পারিয়া পূর্ব-ব্যবস্থা অনুসারে অভ্যুত্থানের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহারা ২১শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যাবেলা কাশীর সামরিক কুচকাওয়াজের ময়দানে অস্ত্র-সজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু অভ্যুত্থান শুরু করিবার শেষ নির্দেশ না পাইয়া বহুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর তাঁহারা চলিয়া যান।

এদিকে রাসবিহারী ও পিংলে কোন প্রকারে লাহোর হইতে পলায়ন করিয়া কাশীতে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই দশটি বোমা লইয়া পিংলে(১) চলিয়া যান এবং ২৩শে মার্চ মীরাটে সৈন্যদের ব্যারাকের লাইনে বোমাসহ গ্রেপ্তার হন।

রাসবিহারীর পলায়ন

লাহোরের গ্রেপ্তারের পর সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া পুলিশের তাণ্ডব শুরু হয়। অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক রাসবিহারীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ লাহোর হইতে শুরু করিয়া কাশী পর্যন্ত তোলপাড় করিতে থাকে। শচীন্দ্র প্রভৃতি তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাকে অবিলম্বে কাশী ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। রাসবিহারীও গ্রেপ্তার এড়াইবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া কলিকাতায় চলিয়া যান। ইহার পরও যুক্তপ্রদেশের প্রধান বিপ্লবী কর্মীরা কলিকাতায় গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। এই সময়ে কলিকাতায় একটি বৈঠক হয়। এই বৈঠকে রাসবিহারীর ভবিষ্যৎ কর্তব্য ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে বহু আলোচনার পর স্থির হয় যে, রাসবিহারী অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার অন্য কোন দেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিবেন এবং সেখান হইতে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিতভাবে ভারতের

(১) পরে পিংলের ফাঁসী হয়।

বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবেন। এই সময়ে ব্যাঙ্কক, ব্যাটাভিয়া ও সাংহাই হইতে বিপ্লবীরা ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র সফল করিয়া তুলিবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। রাসবিহারীও অবিলম্বে ভারত ত্যাগ করিয়া ইঁহাদের সহিত মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত করেন।

এই বৈঠকে যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে স্থির হয় যে, শচীন্দ্রনাথ ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবু একত্রে যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠন পরিচালনা করিবেন এবং ঐ প্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখিবেন। নগেন্দ্রনাথ ওরফে গিরিজাবাবু রাসবিহারী ও শচীন্দ্রনাথেরই সুযোগ্য সহকর্মী। ইহার পূর্বে, ১৯০৮ খৃস্টাব্দে যখন 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র বিখ্যাত পরিচালক পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হইয়া আটক ছিলেন তখন গিরিজাবাবুই সেই বিরাট বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন এবং যথেষ্ট বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া বিপ্লবীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নেতা বলিয়া পরিচিত হন। এই জন্য মহাযুদ্ধ শুরু হইবামাত্র 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' যুক্ত-প্রদেশের বৈপ্লবিক আয়োজনে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করে।

'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'

এই সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার কয়েকদিন পরেই ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ১২ই মে পূর্বগামী একখানা জাহাজে চড়িয়া রাসবিহারী সাংহাই নগরীতে উপস্থিত হন এবং অবনী মুখার্জি প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হইয়া ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় সাহায্য করিবার চেষ্টা করেন। ভারত-জার্মাণ ষড়যন্ত্র ও ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য তিনি সাংহাই হইতে পলায়ন করিয়া জাপানে উপস্থিত হন। সেই সময় হইতে তিনি জাপানে থাকিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার-কার্য চালাইয়া যান।

অন্য দিকে শচীন্দ্র ও গিরিজাবাবু যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করিবার কয়েকদিন পরেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত উভয়ে গ্রেপ্তার হন। তারপর ইঁহাদের লইয়া এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হয়। এই মামলাই 'বেনারস

ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত। রাসবিহারীকেই এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ও শচীন্দ্রনাথকে তাঁহার প্রধান সহকারী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইঁহাদের বিরুদ্ধে (১) বোমা প্রস্তুত ও অস্ত্র সংগ্রহ, (২) বিদ্রোহের জন্য সৈন্যদের উত্তেজিত করা, (৩) 'রাজদ্রোহ'মূলক সাহিত্য প্রচার ও বক্তৃতা, এবং (৪) 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম' প্রভৃতির অভিযোগ উপস্থিত করা হয়।

প্রায় দুই মাস ধরিয়া মামলার বিচার চলে। মামলার বিচারে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও নগেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে গিরিজাবাবুর যাবজ্জীবন দীপান্তর; গণেশলাল, লক্ষ্মীনারায়ণ, নলিনী মুখোপাধ্যায়, দামোদর স্বরূপ ও প্রতাপ সিংহ—প্রত্যেকের পাঁচ বৎসর; আনন্দ ভট্টাচার্য, কালীপদ, বঙ্কিম মিত্র—প্রত্যেকের তিন বৎসর; এবং শচীন্দ্রনাথের ভাই জিতেন্দ্রনাথের দুই বৎসর কারাদণ্ড হয়। সুরেন মুখার্জি ও রবীন্দ্র নামে দুইজন মুক্তি লাভ করেন। নগেন্দ্রনাথ ওরফে গিরিজাবাবু কারাগারেই প্রাণ ত্যাগ করেন এবং শচীন্দ্রনাথ ১৯২০ খৃস্টাব্দে সম্রাটের ঘোষণা অনুসারে মুক্তিলাভ করেন।

কাশীর বিপ্লবীদের এই বিপ্লব-প্রচেষ্টা ছিল বঙ্গীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টারই একটি অংশবিশেষ। ইঁহারা বাংলাদেশের বিপ্লবীদের নিকট হইতেই বৈপ্লবিক প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন এবং ভারত-জোড়া একটি বিরাট বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে সরকারী অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে বলা হয়:

"এই মামলার সকল দিক বিচার করিয়া বলা যায় যে, এই বিপ্লবীরা বাংলাদেশ হইতে মূল প্রেরণা লাভ করিয়া ক্রমশঃ বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয় এবং অবশেষে রাসবিহারীর পরিচালনায় এক বিরাট বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের যোগসূত্রে পরিণত হয়।......"(১)

'এলান-ই-জঙ্গ'

তখন একদিকে শুরু হইয়াছে 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' অপর দিকে চলিতেছে 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচার। বাহির হইতে মনে হইল যেন উত্তর-

(১) 'Sedition Committe Report', P. 135.

ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা শেষ হইয়াছে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিপ্লবীদের কর্ম-প্রচেষ্টা আবার নূতন করিয়া শুরু হয়। এই প্রচেষ্টার কেন্দ্ররূপে কাজ করিতেছিলেন হরনাম সিং নামে পাঞ্জাবের জাঠ-সম্প্রদায়ভুক্ত এক শিখ। হরনাম সিং পূর্বে ছিলেন '৯নং ভূপাল পদাতিক বাহিনী'র একজন হাবিলদার। পরে তিনি 'রেজিমেণ্ট-বাজার'-এ 'চৌধুরী'রূপে কাজ করিতেছিলেন। তাঁহার কর্মস্থান ছিল অযোধ্যার ফৈজাবাদ শহরে। বাজারের 'চৌধুরী' হিসাবে কাজ করিবার সময়েই তিনি গদর-বিপ্লবীদের দ্বারা বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন। লাহোর গিয়া রাসবিহারী উত্তর-ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কর্ণধাররূপে কাজ শুরু করিবার পর তিনি হরনাম সিংহের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া তাঁহার মারফত ফৈজাবাদের সৈন্যদের মধ্যে প্রচার-কার্য চালাইতেন। লুধিয়ানার বিপ্লবী ছাত্র-নেতা সুচা সিং রাসবিহারী ও হরনাম সিং-এর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করিতেন।

হরনাম সিং রাসবিহারীর নিকট হইতে বিপ্লবী স্বাধীন ভারতের প্রতীক-স্বরূপ একটি জাতীয় পতাকা ও 'এলান-ই-জঙ্গ' (বিপ্লবী ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ ঘোষণা) নামক বহু পুস্তিকা লাভ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, ফৈজাবাদের দেশীয় সৈন্যদের লইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিবামাত্র হরনাম সিং এই জাতীয় পতাকাটি উড়াইবেন এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ঘোষণা-পত্র হিসাবে 'এলান-ই-জঙ্গ' পুস্তিকাটি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিবেন।

লাহোর ও বেনারসের বিপ্লবের আয়োজন ব্যর্থ হইলেও হরনাম সিং নিরুৎসাহ না হইয়া তাঁহার উপর ন্যস্ত বৈপ্লবিক কর্তব্য সম্পাদনের আয়োজন করিতে থাকেন। তিনি পূর্ব-পরিচিত সৈন্যদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইয়া যান। তাহাদের সাহায্যে সৈন্যদের ব্যারাকে ব্যারাকে প্রচার-কার্য চলিতে থাকে, 'এলান-ই-জঙ্গ'এর বৈপ্লবিক বাণী—"ভারতের দস্যু শাসকদের বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জিয়া উঠ, ইংরেজ-শয়তানগুলিকে হত্যা কর, দেশ হইতে তাহাদের তাড়াইয়া দাও"—দেশীয় সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহের চাঞ্চল্য

জাগাইয়া তোলে। যেদিন ফৈজাবাদের আকাশে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকাখানি উড্ডীন হইবে হরনাম সিং সেই দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

এদিকে গোয়েন্দা-পুলিশের দল হরনাম সিংয়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের সন্ধান পায়। তাহারা হরনাম সিংকে গ্রেপ্তার করিয়া আসন্ন সৈন্য-বিদ্রোহ ব্যর্থ করিবার আয়োজন করে। হরনাম সিং পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হন। পুলিশ খানাতল্লাসী করিয়া হরনাম সিংয়ের গৃহ হইতে রাসবিহারীর দেওয়া স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকাটি ও 'এলানই-জঙ্গ'এর কয়েকটি কপি হস্তগত করে। হরনাম সিংয়ের সহকর্মীদের নাম বাহির করিবার জন্য পুলিশ তাঁহার উপর অমানুষিক অত্যাচার করিয়াও ব্যর্থ হয়। অবশেষে সৈন্যদের মধ্যে "রাজদ্রোহ প্রচার ও ষড়যন্ত্র" এবং "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম"-এর অভিযোগে তাঁহার বিচার হয়। এই বিচারে তিনি দশ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

শেষ প্রচেষ্টা

'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচারে কাশীর বিখ্যাত বিপ্লবীরা কারগারে আবদ্ধ হইয়াছেন, বিপ্লবের আগুন জ্বালিবার পূর্বেই উহার সকল সম্ভাবনাই যেন শেষ হইয়া গিয়াছে। ইহা দেখিয়া কাশীর কয়েকজন বিপ্লবী আবার কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সুরনাথ ভাদুড়ী নামে কাশীর এক অভিজ্ঞ বিপ্লবী ইঁহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনের চরম দুর্দশা দেখিয়া বাংলার বিপ্লবীরা তাহাদের সাহায্যে অগ্রসর হন। ১৯১৬ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বাংলা-দেশের যুগান্তর সমিতি কাশীর বিপ্লবীদের নিকট কয়েকখানি বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রেরণ করে। ঐ মাসেই উক্ত ইস্তাহারগুলি কাশী শহরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিলি করা হয়। এই ইস্তাহার বিলি করিবার অভিযোগে দুই জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হন। তাঁহাদের একজন ছিলেন নারায়ণচন্দ্র দে। নারায়ণচন্দ্র ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির একজন বিশিষ্ট সভ্য। বাংলাদেশে থাকাকালে তিনি বোমাদ্বারা একটি ট্রেণ ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সম্পর্কে পুলিশ তাঁহাকে খুঁজিতে থাকিলে তিনি সমিতির পরিচালকদের নির্দেশে কাশীতে

পলাইয়া যান এবং আত্মগোপন করিয়া একটি স্কুল-শিক্ষকের চাকুরি গ্রহণ করেন। চাকুরি গ্রহণের পর হইতেই তিনি কাশীর বৈপ্লবিক সংগঠনে থাকিয়া কাজ শুরু করেন। 'রাজদ্রোহ'মূলক ইস্তাহার বিলি করিবার অপরাধে তাঁহারও দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

কিন্তু দুইজনের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড সত্ত্বেও প্রায়ই কাশীর পল্লীতে পল্লীতে বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতির বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিলি করা হইতে থাকে, সর্বত্র বাড়ীর প্রাচীরগাত্রে এই সকল রাজদ্রোহমূলক ইস্তাহার লাগাইয়া দেওয়া হইত। কাশী-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই এই সকল কাজ করিত। তাহারা বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতিগুলির নিকট হইতে সাহায্য লইয়া কাশীতে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ চালাইয়া যায়।

যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সমিতির যখন চরম দুর্দশা চলিতেছে তখন রাসবিহারী ও শচীন্দ্রনাথের এক পুরাতন সহকর্মী ও 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র পলাতক আসামী বিনায়করাও কপিল গোপনে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে পুলিশকে সংবাদ দিতে থাকে। নারায়ণচন্দ্র দে-কে কপিলই নাকি ধরাইয়া দিয়াছিল। কপিলের এই বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদ পাইয়া কাশীর বিপ্লবীরা ইহার প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে লাক্ষ্ণৌ শহরে বিপ্লবীদের গুলিতে কপিল নিহত হয়। কপিলকে হত্যা করিবার জন্য কাশীর বিপ্লবীরা বাংলাদেশ হইতে একটি মশার-পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিল। এই হত্যার সহিত লিপ্ত থাকিবার সন্দেহে পুলিশ কাশীর এক বাঙ্গালী যুবককে গ্রেপ্তার করে। খানাতল্লাসীর সময় সেই যুবকের গৃহে সিগারেট-টিনের বোমা তৈরীর একটি ফরমূলা, দুইটি রিভলভার, মশার-পিস্তলের ২১৯ রাউণ্ড গুলি এবং বহু পরিমাণে পিক্রিক এসিড ও গান কটন(১) পাওয়া যায়। বিচারে এই যুবকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। কিন্তু ইহার পরেও কাশী শহরে নিয়মিতভাবে বৈপ্লবিক ইস্তাহার বিলি করা হইত।

---

(১) পিক্রিক্ এসিড ও গান কটন বোমা তৈরীর পক্ষে অপরিহার্য। এই রাসায়নিক দ্রব্যগুলি ভয়ংকর বিস্ফোরক শক্তিবিশিষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়

মাদ্রাজ প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯০৭-১৯১২)

ঝড়ের হাওয়া

১৯০৭ খৃস্টাব্দে মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা পূর্ণোদ্যমে শুরু হইয়া গিয়াছে, বাংলা ও পাঞ্জাবে বিদেশী-বর্জন প্রভৃতি গণ-আন্দোলন ও বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ সারা ভারতকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান প্রদেশ মাদ্রাজে তখনও কোন চাঞ্চল্য দেখা দেয় নাই। এই সময়ে এক দিকে বাংলার বিপ্লবীরা ও অপর দিকে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা মাদ্রাজ প্রদেশেও বৈপ্লবিক সংগ্রামের আগুন ছড়াইয়া দিবার জন্য সচেষ্ট হন। বাংলাদেশের চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পরামর্শ করিয়া ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পালকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসব্যাপী মাদ্রাজের পূর্ব উপকূলবর্তী শহরগুলিতে বহু বৈপ্লবিক বক্তৃতা করিয়া বিপিনচন্দ্র ১লা মে তারিখে মাদ্রাজ শহরে উপস্থিত হন। তিনি মাদ্রাজ শহরে 'স্বরাজ' (পূর্ণ স্বাধীনতা), 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' সম্পর্কে তিনটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়া মাদ্রাজের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তোলেন। রাজমুন্দ্রী শহরে তাঁহার বক্তৃতার ফলে স্থানীয় সরকারী কলেজে হরতাল হয়। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সংগ্রামের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে।

ঐ বৎসর ১০ই মে মাদ্রাজের একটি জনসভায় তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। লালা লাজপত রায়ের গ্রেপ্তারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌছিবামাত্র সভার উদ্যোক্তারা সভা বন্ধ করিয়া বিপিনচন্দ্রকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। কারণ, মাদ্রাজের বক্তৃতার জন্য তাঁহারও গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কা ছিল। বিপিনচন্দ্র কলিকাতায় পৌছিয়া কালীপূজা উপলক্ষে এক জনসভায় মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করিয়া এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার এই বক্তৃতায়

সারমর্ম তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামক ইংরেজি-সংবাদপত্র মারফত মাদ্রাজ প্রদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। তিনি এই বক্তৃতায় প্রতি গ্রামে প্রতি অমাবস্যায় কালীপূজা (শক্তির আরাধনা) করিবার উপদেশ দেন। তিনি বলেন যে, এই কালী সাধারণ কালী নহেন, ইহা হইবে রক্ষাকালী ; কারণ প্রত্যেক মানুষ বিপদের সময় রক্ষাকালীকেই ডাকে ; সুতরাং আমাদের এই জাতীয় বিপদেও রক্ষাকালীর (শক্তির) আরাধনা করাই সকলের কর্তব্য ; রক্ষাকালীর রং কালো নহে, শাদা, আর এই শাদা রং হইল আলোর প্রতীক ; রক্ষাকালীর সম্মুখে যে ছাগল বলি দেওয়া হইবে তাহারও রং হইবে শাদা (শাদা ছাগলকে শ্বেতকায় ইংরেজের প্রতীক বলিয়া ধরিতে হইবে)। বিপিনচন্দ্র ১০৮টা শাদা ছাগল (শ্বেতকায় ইংরেজ) বলি দিয়া রক্ষাকালীর (দেশমাতৃকার) পূজা করিবার পরামর্শ দান করেন।

বিপিনচন্দ্রের সহিত "জনৈক মাদ্রাজী ভদ্রলোক"(১) কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি মাদ্রাজে ফিরিয়া গিয়া এক বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতবাসীদের বিদেশে গিয়া বোমা ও অন্যান্য ধ্বংসকারী অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করিবার প্রণালী শিক্ষা করা কর্তব্য ; বিশেষ করিয়া বোমা তৈরীর প্রণালীটা শিক্ষা করা উচিত, কারণ বোমার ভয়ে রুশিয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত জারেরও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয় ; তাহারা দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রতি অমাবস্যায় ১০৮টা শ্বেতকায়কে (ছাগল নহে, যাহারা দেশের শত্রু তাহাদিগকে) বলিদান করুক ; তাহা হইলেই দেশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

বিপিনচন্দ্রের বৈপ্লবিক আহ্বানে মাদ্রাজের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে রুশিয়ার 'নিহিলিস্ট'-দের অনুকরণে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার আহ্বান জানাইয়া ছাত্রদের

(১) এই "মাদ্রাজী ভদ্রলোক" হইলেন মাদ্রাজের চরমপন্থী নেতা চিদম্বরম পিল্লাই। যুগান্তর সমিতির তারকনাথ দাস ১৯০৬ খৃস্টাব্দে গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য জাপানে পলায়নের উদ্দেশ্যে চিদম্বরম পিল্লাই মহাশয়ের গৃহে 'তারক ব্রহ্মচারী' নামে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তখন তারকনাথ পিল্লাই মহাশয়কে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

মধ্যে একখানি পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এই পুস্তিকায় 'নিহিলিস্ট'দের সংগঠন-পদ্ধতিও ব্যাখ্যা করা হয়। ইহার পর হইতে যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিতে থাকে।

বিদ্রোহ

মাদ্রাজের চরমপন্থী নেতা চিদম্বরম পিল্লাই ও সুব্রহ্মনীয় শিব উভয়ে একত্রে বিভিন্ন জিলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া যুব-সম্প্রদায়কে বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকেন। তাঁহারা ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২৩শে ও ২৫শে ফেব্রুয়ারী এবং ৫ই মার্চ তারিখে তুতিকোরিণ শহরে তিনটি বক্তৃতা করেন। এই সকল বক্তৃতায় তাঁহারা "পূর্ণ স্বরাজ" (স্বাধীনতা) লাভের জন্য সংগ্রামের আহ্বান জানান। শেষের সভাটিতে চিদম্বরম পিল্লাই তাঁহার বক্তৃতায় বিপিনচন্দ্র পালকে "স্বাধীনতার সিংহ" বলিয়া বর্ণনা করিয়া সকলকে তাঁহার নির্দেশ অনুসরণ করিতে বলেন। ইতিপূর্বে অরবিন্দ ঘোষের মামলায় সাক্ষী হইবার সরকারী নির্দেশ অমান্য করিবার অপরাধে বিপিনচন্দ্রের ছয় মাস কারাদণ্ড হইয়াছিল। ৯ই মার্চ ছিল তাঁহার জেল হইতে মুক্তির দিন। চিদম্বরম পিল্লাই ঐ দিন সকলকে স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিবার নির্দেশ দেন। ৯ই মার্চ তারিখে চিদম্বরম তিনেভেলি শহরের এক জনসভায় বিপিনচন্দ্র পালের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া সকলকে তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিবার আবেদন জানাইয়া বলেন যে, যাহা কিছু বিদেশী তাহাই বর্জন করিতে হইবে এবং এইভাবে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব হইবে। চিদম্বরমের বক্তৃতা চারিদিকে আগুন জ্বালাইয়া দিতে থাকে। মাদ্রাজ-সরকার শঙ্কিত হইয়া ১২ই মার্চ তাঁহাকে ও সুব্রহ্মনীয় শিবকে গ্রেপ্তার করে।

মাদ্রাজের এই সর্বজনমান্য নেতৃদ্বয়ের গ্রেপ্তারের ফলে জনগণের ধূমায়িত ক্রোধ বিদ্রোহের আগুনে পরিণত হয়। গ্রেপ্তারের পরদিন, ১৩ই মার্চ তিনেভেলি জিলার সর্বত্র জনসাধারণ সরকারের উপর আক্রমণ শুরু করে। জনসাধারণ সর্বত্র সরকারী সম্পত্তি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ করিয়া ফেলে।

তিনেভিলি শহরে অবস্থিত তুতিকরিণ জিলার ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট, মুন্সেফের কাছারী, পুলিশ-ব্যারাক, থানা প্রভৃতি প্রত্যেকটি সরকারী দপ্তরখানা লুট করিয়া দপ্তরগুলির আসবাব ও কাগজপত্র জ্বালাইয়া এবং দালানগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া দেওয়া হয়। শহরের মিউনিসিপ্যালিটির দপ্তরটি আগুন দিয়া ভস্মীভূত করা হয়। ১৩ই মার্চ সারাদিন ধরিয়া এই ধ্বংস-কার্য চলিতে থাকে। অবশেষে সন্ধ্যার দিকে বাহির হইতে সৈন্যবাহিনী আসিয়া বিদ্রোহ দমন করিতে সক্ষম হয়। এই বিদ্রোহ উপলক্ষে প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ২৭ জনের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

১৭ই মার্চ কৃষ্ণস্বামী নামে কোয়েম্বাটোর জিলার এক বিপ্লবী ঐ জিলার কারুর শহরের এক বিরাট জনসভায় তিনেভেলি-বিদ্রোহের সংবাদ ঘোষণা করিয়া বলেন যে, তিনেভেলির জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা এত বেশী যে, তাহারা "পরদেশী" (বিদেশী) কালেক্টরের কোর্ট, মুন্সেফের কাছারী, পুলিশের ব্যারাক ও দপ্তর প্রভৃতি সবকিছু নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিয়াছে; এই সকল কাজ কারুর-এর জনসাধারণ কেন করিতে পারিবে না? এখানে যে সৈন্য-রেজিমেণ্ট রহিয়াছে তাহাদের বেতন খুবই কম, স্বাধীনতার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা যাইতে পারে, তাহারা তাহাদের বন্দুকগুলি দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিতে পারে এবং দেশের লোকেরা সেই বন্দুক দিয়া "শাদা মুখোদের" (ইংরেজদের) গুলি কবিয়া হত্যা করিতে পারে। এইভাবেই দেশের স্বাধীনতা লাভ হইবে। শাসকগণ এখন খুবই সতর্ক হইয়া গিয়াছে, তাহারা অবিলম্বে কৃষ্ণস্বামীকে গ্রেপ্তার ও "রাজদ্রোহ" প্রচারের অভিযোগে বিচার করিয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে।

'স্বরাজ' পত্রিকা

১৯০৮ খৃস্টাব্দের ৯ই মার্চ বাংলাদেশে বিপিনচন্দ্র পালের জেল হইতে মুক্তি লাভ উপলক্ষে কৃষ্ণা জিলার বেজোয়াদা শহরে "স্বরাজ' নামে তেলেগু ভাষায় একখানি চরমপন্থী জাতীয়বাদী পত্রিকা বাহির হয়। চিদম্বরম পিল্লাই-এর

গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২৬শে মার্চ এই পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে লেখা হয়: "ওরে ফিরিঙ্গি, হিংস্র ব্যাঘ্রের দল! তোরা বিনা দোষে একবারে তিন জন নির্দোষ ভারতবাসীকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিস্। তোরা তোদের নিজেদের আইন-কানুন পর্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়াছিস্। তোরা ভয়ে মরিতেছিস্; তোদের মত যারা ঔদ্ধত্যে অন্ধ হইয়া নীচ মনোভাব গ্রহণ করে তাদের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। তোরা তোদের আচরণের দ্বারা ইহাই জাহির করিয়াছিস্ যে, ভারতের জাগ্রত জাতীয়তাবাদের বাতাস লাগিবামাত্র তোদের স্বেচ্ছাচারী ফিরিঙ্গি-রাজত্ব শুকাইয়া যাইবে!"(১) এই প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রেসের স্বত্বাধিকারী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

'ভারত' পত্রিকা

মাদ্রাজ শহরে 'ভারত' নামে একখানি তামিল পত্রিকাও বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য শুরু করে। ১৯০৮ খৃস্টাব্দের মে ও জুন মাসে পর পর তিন-চারিটি 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই অপরাধে পত্রিকার মুদ্রাকর ও প্রকাশক শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। ইহার পর 'ভারত' পত্রিকার ছাপাখানাটি মাদ্রাজ হইতে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত পণ্ডিচেরীতে স্থানান্তরিত করা হয় এবং পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ বেশী 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ বাহির হইতে থাকে। এক জন সম্পাদক ছিলেন তিরুমল আচার্য নামে এক যুবক। তিরুমল ১৯০৮ খৃস্টাব্দের শেষদিকে পণ্ডিচেরী হইতে লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া বিনায়ক দামোদর সাভারকরদ্বারা পরিচালিত 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ যোগদান করেন। ১৯০৯ খৃস্টাব্দে তিরুমল লণ্ডন হইতে প্যারী নগরীতে যাইয়া সেখানকার প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের সহিত মিলিত হন। ১৯১০ খৃস্টাব্দে তিনি প্যারী হইতে পণ্ডিচেরীর 'ভারত' অফিসে পত্র মারফত অবিলম্বে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করিবার নির্দেশ পাঠান।

(১) Quoted from the 'Sedition Committee Report,' P. 163.

'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা

১৯১০ খৃস্টাব্দের মে মাসে বিখ্যাত প্রবাসী মাদ্রাজী বিপ্লববাদী মাদাম কামা প্যারী নগরী হইতে 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি সংবাদপত্র বাহির করেন। এই পত্রিকার মারফত তিনি মাদ্রাজের বৈপ্লবিক সংগ্রামে প্রেরণা যোগাইতে থাকেন। এই পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধে ইংরেজ-হত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৯১১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল-সংখ্যায় মাদাম কামা লিখেন :

"সভায়, বাঙ্গলোতে, রেলপথে, রেলগাড়ীতে, দোকানে, গির্জায়, বাগানে অথবা কোন মেলায়—যেখানে পার, যেখানে সুবিধা হইবে সেই খানেই ইংরেজদের হত্যা কর। অফিসার ও সাধারণ লোকের মধ্যে কোন বাদ-বিচার করিও না। মহামতি নানা সাহেব এই সত্যটি বুঝিয়াছিলেন, আর আমাদের বাংলাদেশের বন্ধুরাও ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক, তাঁহাদের হস্ত প্রসারিত হউক। এখন আমরা ইংরেজদের বলিতে পারি, 'এই জঙ্গল হইতে যতদিনে তোমাদের না তাড়াই ততদিন চুপ করিয়া থাক'।"(১)

১৯১১ খৃস্টাব্দের জুন মাসে তিনেভেলি জিলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের হত্যা উপলক্ষে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার জুলাই-সংখ্যায় লেখা হয় : "যখন জমকালো পোষাকপরা হিন্দুস্থানের ক্রীতদাসের দল রাজকীয় সার্কাসের মত লণ্ডনের রাস্তায় কুচ-কাওয়াজ করিতেছে এবং (রাজা পঞ্চম জর্জের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে) কতগুলি গরুর মত ইংলণ্ডের রাজার পদতলে লুটাইয়া পড়িতেছে, ঠিক তখনই তিনেভেলি ও ময়মনসিংহ জিলায় আমাদের দুই জন দেশবাসী তাঁহাদের সাহসিকতাপূর্ণ কার্যের (২) দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুস্থান ঘুমাইয়া নাই।"(৩) মাদাম কামা ইহাকে শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতার নির্দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন।

(১) Quoted from 'Sedition Committee Report', P. 165.

(২) ১৯১১ খৃস্টাব্দের ১৯শে জুন ময়মনসিংহ জিলায় রাজকুমার চক্রবর্তী নামক জনৈক দারোগা হত্যা সম্পর্কে এখানে বলা হইয়াছে।

(৩) Quoted from the 'Sedition Committee Report', P. 163.

'ফিরিঙ্গি- ধ্বংসকারী প্রেস'

তিনেভেলি শহরে ব্যাপক খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ কতকগুলি বৈপ্লবিক পুস্তিকা ও ইস্তাহার হস্তগত করে। এই সকল পুস্তিকা ও ইস্তাহার 'ফিরিঙ্গি ধ্বংসকারী প্রেস'-এ মুদ্রিত। প্রথম হইতেই বিপ্লবীরা তিনেভেলি শহরে এই প্রেসটি স্থাপন করিয়া বহু পুস্তিকা ও ইস্তাহার মুদ্রিত করে। 'আর্যদের প্রতি একটি পরামর্শ' শীর্ষক একটি পুস্তিকায় বলা হয়ঃ

"ভগবানের নামে শপথ গ্রহণ কর, তুমি আমাদের দেশ হইতে ফিরিঙ্গি-পাপীদের দূর করিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিবে। শপথ লও, যতদিন এই ভারতের মাটিতে ফিরিঙ্গিরা আধিপত্য করিবে ততদিন তুমি তোমার জীবন বৃথা বলিয়া মনে করিবে। শাদামুখো ফিরিঙ্গিগুলিকে ধরিয়া কুকুরের মত প্রহার কর, তারপর ছুরি, লাঠি, ইটপাটকেল অথবা ভগবানের দেওয়া হাত দিয়াই ঐ ফিরিঙ্গিদের হত্যা কর।" (১)

এই বিপ্লবীরা 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘের সভ্যপদের শপথ' শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিল। সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রের বিনায়ক ও গণেশ সাভারকরের প্রতিষ্ঠিত 'অভিনব ভারত-সঙ্ঘ'-এর সভ্যপদের নিয়মাবলী মাদ্রাজের বিপ্লবী সমিতিতেও প্রচলন করিবার জন্য ইহা করা হইয়াছিল। তিনেভেলি-সংগঠনের এই সকল পুস্তিকা ও ইস্তাহার মাদ্রাজের বিভিন্ন জিলা ব্যতীত পণ্ডিচেরী প্রভৃতি স্থানেও যথেষ্ট সংখ্যায় প্রেরিত হইত।

ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে হত্যা

মাদ্রাজের অপর দুই জন বিপ্লবী নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী ও শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার, প্রথম হইতেই মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৈপ্লবিক প্রচার-কার্য চালাইতেছিলেন। তাঁহাদের প্রচারে ও প্রেরণায় মাদ্রাজ প্রদেশে বহু যুবক বৈপ্লবিক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯১০ খৃস্টাব্দের জুন মাসে শঙ্করকৃষ্ণ ও নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারীর সহিত শঙ্করের শ্যালক বাঁচি আয়ার নামক আর একজন বিপ্লবী

(১) Quoted from the same, P. 165.

যোগদান করেন। ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ভি.ভি. এস. আয়ার নামক আর একজন বিপ্লবী প্যারী হইতে পণ্ডিচেরীতে আসিয়া উপস্থিত হন।

ভি. ভি. এস. আয়ার এতদিন লণ্ডনের 'ইণ্ডিয়া হাউস'-এ বিনায়ক সাভারকরের সহকারীরূপে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় নানাভাবে সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন। পরে তিনি লণ্ডন হইতে প্যারী নগরীতে গিয়া শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, মাদাম কামা প্রভৃতি প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লববাদীদের সহিত মিলিত হন। মাদ্রাজের বিপ্লব-প্রচেষ্টার সংবাদ পাইয়া আয়ার পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইয়া বৈপ্লবিক আয়োজনে যোগদান করেন। পণ্ডিচেরীতে তিনি কয়েকজন যুবককে বৈপ্লবিক শিক্ষা দিতে থাকেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য গুপ্ত হত্যার আবশ্যকতার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতেন। আয়ার এই উদ্দেশ্যে যুবকদের রিভলভার ছোঁড়া শিখাইতে আরম্ভ করেন।

১৯১১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বাঁচি আয়ার পণ্ডিচেরী আসিয়া ভি.ভি.এস. আয়ারের সহিত মিলিত হন। বাঁচিও ভি. ভি. এস-এর নিকট রিভলভার ছোঁড়া শিক্ষা করেন। ইঁহারা উভয়ে মিলিয়া তিনেভেলি জিলার অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে সাহেবকে হত্যা করিবার পরিকল্পনা করেন। ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসেই ১৯০৮ খৃস্টাব্দের তিনেভেলি-বিদ্রোহের পর অত্যাচারের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিলেন। অ্যাসে সাহেবের সেই কুকীর্তি বিপ্লবীরা কখনও ভুলিয়া যায় নাই। তাই এই অ্যাসেই বিপ্লবের প্রথম বলিরূপে নির্দিষ্ট হইলেন। ইহার পর বাঁচি তিনেভেলি শহরে ফিরিয়া আসেন। প্রথমে স্থির হইয়াছিল যে, ১৯১১ খৃস্টাব্দের ১১ই জুন সম্রাট পঞ্চম জর্জ-এর রাজ্যাভিষেকের দিন অ্যাসেকে হত্যা করা হইবে। কিন্তু ঐ দিন বিপ্লবীরা বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষা করিতে থাকে।

১৯১১ খৃস্টাব্দের ১৭ই জুন রাত্রিকালে তিনেভেলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে স্থানান্তর গমনের উদ্দেশ্যে রেলগাড়ীর একখানি কামরায় আরোহণ করেন। বাঁচি এবং শঙ্করকৃষ্ণ আয়ারও তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ঐ গাড়ীতে উঠিয়া বসেন। ট্রেনখানি তিনেভেলি শহরের বাহিরে রেল-জংসনে আসিয়া

থামিয়া পড়ে। ট্রেন থামিবামাত্র বাঁচি ও শঙ্কর ম্যাজিস্ট্রেটের কামরার দিকে দ্রুত অগ্রসর হইলেন। তখন ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসে কামরার মধ্যে বসিয়া বাহিরের দৃশ্য দেখিতেছিলেন। বাঁচি মুহূর্ত বিলম্ব না করিয়া অ্যাসের কামারায় উঠিয়া রিভলভার হইতে গুলি করিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের দেহ লুটাইয়া পড়িল। শঙ্কর নীচে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছিলেন। কার্যসিদ্ধি করিয়া বাঁচি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃতদেহের উপর একখানি পত্র রাখিয়া শঙ্করকে লইয়া অন্ধকারে সরিয়া পড়িলেন।

বাঁচি ম্যাজিস্ট্রেটের মৃতদেহের উপর যে পত্রখানি স্থাপন করেন তাহা ছিল তামিল ভাষায় লিখিত। ইহাতে লেখা ছিল যে, প্রত্যেক ভারতবাসীই এইভাবে ইংরেজদের তাড়াইয়া ভারতের স্বাধীনতা ও সনাতন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের এই পুণ্যভূমিতে একদিন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ ও অর্জুন প্রজাপালন ও ধর্মরক্ষা করিয়াছেন, আর আজ ইংরেজেরা ভারতের এই পুণ্যভূমিতে পঞ্চমজর্জ নামক এক গোমাংস-ভোজী ম্লেচ্ছের রাজ্যাভিষেক করিতেছে; তিন হাজার মাদ্রাজী শপথ গ্রহণ করিয়াছে যে, যে মুহূর্তে পঞ্চমজর্জ এই পুণ্যভূমিতে পদার্পণ করিবে সেই মুহূর্তে তাহারা পঞ্চম জর্জকে হত্যা করিবে এবং অ্যাসের হত্যা তাহার পূর্বাভাস মাত্র।

তিনেভেলি ষড়যন্ত্র-মামলা

ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের হত্যাকারীকে খুঁজিয়া না পাইয়া পুলিশ পরিচিত বিপ্লবীদের লইয়া এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু করিয়া প্রতিহিংসা গ্রহণ করিবার মতলব করে। অতঃপর নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শঙ্করকৃষ্ণ আয়ার, বাঁচি আয়ার প্রভৃতি বিপ্লবীরা একে একে গ্রেপ্তার হন। তারপর "রাজদ্রোহ", "বৈপ্লবিক প্রচার", "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যম", "নরহত্যা", প্রভৃতির অভিযোগে এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হয়। নীলকণ্ঠ ব্রহ্মচারী হইলেন সেই ষড়যন্ত্র-মামলার প্রধান আসামী। এই মামলাই 'তিনেভেলি ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত।

মামলার বিচারে "রাজদ্রোহ", "বৈপ্লবিক প্রচার" প্রভৃতি কয়েকটি অভিযোগ সপ্রমাণ হইলেও ম্যাজিস্ট্রেট অ্যাসের হত্যাকারী অথবা ঐ সম্পর্কে কোন প্রমাণ বা সাক্ষ্য না পাওয়ায় সরকারের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। মামলার বিচারে নয় জন বিপ্লবীর কারাদণ্ড হয়। ইহার পর এযুগে মাদ্রাজ প্রদেশে আর কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের সন্ধান পাওয়া যায় না।

নবম অধ্যায়

মধ্য প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৯০৭—০৮ খৃস্টাব্দ

১৯০৬ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় কলিকাতা নগরীতে। এই সময়ে কংগ্রেসের নরমপন্থীদের সহিত চরমপন্থীদের বিরোধ চরমে উঠে, কিন্তু দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতির চেষ্টায় আপাতত দুই দলের মধ্যে আপস স্থাপিত হয়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় পশ্চিম-ভারতের চরমপন্থী রাজনীতির প্রধান কেন্দ্র নাগপুর শহরে। নাগপুরে কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব হইতে নাগপুরের ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সারা বৎসর ধরিয়া স্থানীয় নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। নাগপুরে চরমপন্থীদের একচ্ছত্র প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১লা মে চরমপন্থী বৈপ্লবিক সংগ্রামের ধ্বনি লইয়া নাগপুরের বিখ্যাত জাতীয়তাবাদী পত্রিকা হিন্দি 'কেশরী' প্রথম প্রকাশিত হয়। তিলকের মারাঠী পত্রিকা 'কেশরী'র মত হিন্দি 'কেশরী'ও হিন্দিভাষা-ভাষী ছাত্র ও যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিতে থাকে। 'হিন্দি কেশরী' এত জনপ্রিয় হইয়া উঠে যে, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইহার প্রচার-সংখ্যা বাড়িয়া তিন হাজারে পরিণত হয়। সরকারী রিপোর্টেই

দেখা যায় যে, ইহার ব্যাপক জনপ্রিয়তার ফলে সরকার ইহার প্রকাশ বন্ধ করিতে না পারিয়া দেশীয় সৈন্যদের ইহার বৈপ্লবিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিবার জন্য সৈন্যদের পক্ষে ইহা ক্রয়করা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করে। এই সময়ে 'দেশ সেবক' নামে আর একখানা পত্রিকাও বৈপ্লবিক প্রচারে যোগদান করে।

এই সময়ে নাগপুরের ছাত্র ও যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চরমপন্থী আন্দোলন দেখা দিয়াছিল তাহা মধ্যপ্রদেশের ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল-এর নিকট লিখিত নাগপুরের চীফ কমিশনারের একখানি পত্র হইতে বুঝিতে পারা যায়। চীফ কমিশনার তাঁহার পত্রে বলেন :—

"নাগপুর-পুলিশের ছাত্র-হাঙ্গামা দমনের চেষ্টা মোটেই সন্তোষজনক নহে। বর্তমান অবস্থা চলিতে থাকিলে নাগপুরের ভদ্রলোকেরা ভয় পাইয়া নাগপুর হইতে পলাইতে শুরু করিবে। এই হাঙ্গামা দমন করিতে আমি দৃঢ়সংকল্প।......কলেজগুলির প্রিন্সিপালদের ও স্কুলের হেডমাস্টারদের এক সভা আহ্বান করিবার জন্য আমি কমিশনারকে নির্দেশ দিয়াছি। সেই সভায় শৃংখলা স্থাপনের সমস্যা লইয়া আলোচনা করা হইবে। কিন্তু ছাত্রদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পুলিশকে ছাত্র-হাঙ্গামাকারীদের গ্রেপ্তার করিতেই হইবে। নাগপুরের সংবাদপত্রগুলি এই সকল ঘটনায় ইন্ধন যোগাইতেছে। ইহা বন্ধ করিতেই হইবে। নাগপুরকে কিছুতেই 'রাজদ্রোহী'দের দ্বারা অনুপ্রাণিত ছাত্র-হাঙ্গামাকারীদের আড্ডায় পরিণত হইতে দেওয়া যায় না।"(১)

চীফ-কমিশনার সাহেবের শত চেষ্টা সত্ত্বেও নাগপুরে আন্দোলনের ঝড় বহিতে থাকে। বাংলার চরমপন্থী বিপ্লবী নায়ক অরবিন্দ ঘোষ সুরাট-কংগ্রেসে যোগদান করিতে যাইবার পথে ২২শে ডিসেম্বর নাগপুর শহরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি এক বিরাট ছাত্র-সভায় বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার ফলে নাগপুরের আন্দোলন চরমে উঠে। সুরাট-কংগ্রেসে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিচ্ছেদ এবং চরম-

(১) 'Sedition Committee Report', P. 137-38.

পন্থীদের দ্বারা কংগ্রেস-বর্জনের ফলে এই আন্দোলন বৈপ্লবিক রূপ গ্রহণ করিতে থাকে।

কংগ্রেসের অধিবেশনের শেষে বাংলাদেশে ফিরিবার পথে অরবিন্দ আবার নাগপুরে উপস্থিত হন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে নাগপুরে এক বিরাট জনসভা হয়। এই সভাতেও তিনি বিলাতী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন আরও জোরের সহিত চালাইবার নির্দেশ দেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সুরাট-অধিবেশনে তিলক ও চরমপন্থীদের আচরণ সমর্থন করিয়া বলেন যে, বাঙ্গালী ও মারাঠিরা উভয়েই এক পিতামাতার সন্তান, সুতরাং উভয়ের সুখদুঃখ সমানভাবে ভাগ করিয়া লওয়া উচিত; স্বদেশী বর্জন ও আন্দোলন সর্বাপেক্ষা বেশী সফলতা লাভ করিয়াছে বাংলাদেশে; সম্প্রতি বাঙ্গালীরা যেভাবে সাহসের সহিত সকল যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে তাঁহার তুলনা নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকার নাম উল্লেখ করেন।

১৯০৮ খৃস্টাব্দের ১১ই মে মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণের পর নাগপুরের 'দেশ সেবক' পত্রিকায় বোমার প্রশস্তি গাহিয়া সকল ভারতবাসীকে বোমা-তৈরী শিক্ষা করিবার পরামর্শ দেয়। একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, ইংরেজদের সংস্পর্শে আসিয়া ভারতবাসীদের মধ্যে যে সকল দুর্বলতা প্রবেশ করিয়াছে তাহার মধ্যে একটি হইল বোমা-তৈরী সম্বন্ধে অজ্ঞতা; উচিত কথা বলিতে গেলে সকল প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার এবং বোমা-তৈরী ও বোমার ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সঞ্চয় করা ভারতের প্রত্যেকটি সম্ভ্রান্ত নাগরিকের অবশ্য কর্তব্য। ১৬ই মে তারিখে নাগপুরের হিন্দি 'কেশরী' পত্রিকার একটি প্রবন্ধে বলা হয় যে, যদিও (বাংলাদেশের) 'যুগান্তর' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এখন বিচারাধীন রহিয়াছেন, যদিও 'মানিকতলা ষড়যন্ত্র-মামলা' উপলক্ষে বহু লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে, তথাপি এখনও 'যুগান্তর' পত্রিকা বাহির হইতেছে। ঐ প্রবন্ধে 'আলিপুর বোমার মামলা' সম্পর্কে বলা হয় যে, 'যুগান্তর' পত্রিকার কথায় ইহা হইল স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা; কিন্তু ইংরেজরা কি ভারতবর্ষের রাজা যে তাহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে হইবে? ডাকাত, চোর, গুণ্ডা, বদমাসদের দমন করিবার চেষ্টাকে ষড়যন্ত্র বলা চলে না।

মধ্যপ্রদেশে বৈপ্লবিক আলোড়নের লক্ষণ দেখা দিবামাত্র প্রাদেশিক সরকার সারা প্রদেশে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে। সকল বিপ্লব-প্রচেষ্টা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য সরকার এক প্রচণ্ড দমননীতির খড়্গ উদ্যত করে। বাহির হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া নাগপুর ও অন্যান্য শহরগুলি ছাইয়া ফেলে, নাগপুর এক বিরাট সৈন্য-শিবিরে পরিণত হয়। তাহার ফলে ১৮ই জুলাই তিলকের জন্মদিবসে 'শান্তি' অব্যাহত থাকে। ঐ দিবস নাগপুরে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। সেই সমাবেশে বক্তৃতা করেন দিল্লীর চরমপন্থী মুসলমান-নেতা হায়দর রাজা সাহেব। রাজা সাহেব তাহার বক্তৃতায় মহারাষ্ট্র-কেশরী বালগঙ্গাধর তিলককে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক দীক্ষাগুরু বলিয়া অভিহিত করেন।

ইহার পর তিলকের কারাদণ্ড উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন অংশে হাঙ্গামা শুরু হইবামাত্র পুলিশ ও সৈন্যদল তাহা কঠোর হস্তে দমন করে। ঐ উপলক্ষে বহু লোক গ্রেপ্তার হয়। তিলকের গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-সভা নিষিদ্ধ করা হয়। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিবার অপরাধে ছয় জনের কারাদণ্ড ও বহু লোকের অর্থদণ্ড হয়। 'রাজদ্রোহ'মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অপরাধে হিন্দি 'কেশরী' ও 'দেশ-সেবক' পত্রিকার সম্পাদকগণ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন, স্থানীয় সরকারের নির্দেশে বহু "সন্দেহভাজন" ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে আটক করা হয়। নাগপুর ও অন্যান্য সহরে এক ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থায়ী-ভাবে কায়েম হইয়া বসে। এই অত্যাচারের প্রতিবাদস্বরূপ নাগপুরের যুবকগণ ১৯০৮ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রস্তর-মূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাতে আলকাত্‌রা লেপিয়া দেয়।

১৯১৫ খৃস্টাব্দ

দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী দমননীতি অব্যাহত থাকিয়া মধ্যপ্রদেশের সকল বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলে। ইহার পর ১৯১৫ খৃস্টাব্দে আবার বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯১৫ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে যখন রাসবিহারী বসুর পরিচালনায় উত্তর-ভারতে গদর-বিপ্লবের প্রচেষ্টা চলে, তখন রাসবিহারী বেনারসের গুপ্ত সমিতির বিশিষ্ট সভ্য নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়কে মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর শহরে অবস্থিত দেশীয় সৈন্যদলকে বিপ্লবের পক্ষে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করা হয়। কিন্তু নলিনীমোহন অকৃতকার্য হইয়া বেনারসে ফিরিয়া যান।

ইহার পর ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট সভ্য নলিনীকান্ত ঘোষ(১) মধ্যপ্রদেশের বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের উদ্দেশ্যে নাগপুর প্রভৃতি শহরে আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার সেই চেষ্টাও সফল হয় নাই। ইহার পর বেনারস গুপ্ত সমিতির বিনায়করাও কপিল ১৯১৫ খৃস্টাব্দের শেষদিকে জব্বলপুর শহরে আসিয়া গুপ্ত সমিতির একটি শাখা প্রতিষ্ঠা ও পলাতক বিপ্লবী-দের জন্য একটি আশ্রয়স্থল সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে কপিলের চেষ্টায় সাত জন লোক লইয়া একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সাত জনের মধ্যে দুই জন ছিল ছাত্র, দুই জন শিক্ষক, একজন উকিল, একজন অফিসের কেরাণী ও অপর জন দর্জি। কিছুদিন পরে ইহাদের সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া দুই জন মুক্তি পায় এবং অবশিষ্ট সকলকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। ইহার পর পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিবার শাস্তিস্বরূপ কপিল বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়।

(১) ইনি পরে আসামের গৌহাটি শহরে আত্মগোপন করিয়া থাকার সময়ে পুলিশের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষের পর আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন।

দশম অধ্যায়

উড়িষ্যা প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

১৯০৬ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দেবব্রত বসু উড়িষ্যায় গিয়া সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক সমিতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। ইহার পর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী নেতা উড়িষ্যায় বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার কার্যে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও তিন বার উড়িষ্যায় গিয়াছিলেন। সেই যুগের আর একজন বিপ্লবী নেতা গণেশ ঘোষ মহাশয়ও উড়িষ্যায় থাকিয়া সমিতি গঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল বিপ্লবী নেতাদের সমবেত চেষ্টার ফলে—"উড়িষ্যায় দলে দলে বাঙ্গালী (উড়িষ্যাবাসী বাঙ্গালী), উড়িয়াভাষা-ভাষী যুবকের দল, মাস্টার, উকিল, লেখক, ডাক্তার, জমিদার, বড় বড় মঠের মোহান্ত ও উচ্চপদস্থ প্রবীন ব্যক্তিরা আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিলেন বা সহানুভূতি দেখাইতেন। কটকের ব্যায়াম-সমিতি আমাদের দলের একটি বড় ব্যায়াম-সমিতি ছিল। এক সময়ে কটক, পুরী, বালেশ্বর ও অন্যান্য স্থানসমূহ আমাদের সমিতির কার্যের ফলে স্বদেশী আন্দোলন ও বিপ্লববাদে মুখরিত হইত। উড়িষ্যার যাকিছু স্বদেশী আন্দোলন তাহা আমাদের দলের লোকের দ্বারাই সংঘটিত হইত। উড়িষ্যাবাসীদের এত বৈপ্লবিক উৎসাহ ও উদ্যম দেখিয়া আমরা আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। ইহার কারণ এই যে, পূর্ববঙ্গ ও উড়িষ্যা—এই দুই জায়গায় আমাদের বিশেষ কর্মক্ষেত্র ছিল।……উড়িষ্যাতে আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম যে, উড়িষ্যার লোক স্বাধীনতাবাদকে বাংলার লোকের চেয়ে শীঘ্র গ্রহণ করিয়াছিল। যে কারণেই হউক, উড়িষ্যায় আমাদের কার্য খুব বিস্তৃতি লাভ করে।"(১)

(১) ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬০—৬১।

পুরীর গোবর্ধন-মঠের জগৎগুরু শঙ্করাচার্য নাকি বিপ্লবীদের ক্রিয়া-কলাপে আকৃষ্ট হইয়া বিপ্লববাদে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত যতীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, কুলকর্ণী প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা করিতেন। বাংলার বিপ্লবীরা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে 'ভবানী-মন্দির' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করিতেছিলেন শুনিয়া তিনি নাকি তাঁহার মঠ বিপ্লবীদের ব্যবহার করিতে দিতে চাহিয়াছিলেন।

উড়িষ্যার বিখ্যাত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও বিপ্লবীদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিল। এমন কি, এই সম্প্রদায়ের কিছু লোক প্রথম যুগের বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগদান করিয়াছিল। 'মালিকা' নামক পুরাতন বৈষ্ণব-সম্প্রদায়টি তাহাদের বৈষ্ণব-ধর্মের সহিত বৈপ্লবিক মতবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া বহু 'রাজদ্রোহ'-মূলক প্রচার ও ক্রিয়া-কলাপ আরম্ভ করে। উড়িষ্যা-সরকার ইহাদের বৈপ্লবিক প্রচার ও ক্রিয়া-কলাপে ভীত হইয়া বহু নির্যাতন করিয়া এই সম্প্রদায়টিকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা ইহাদের সহিত যোগাযোগ করিবার পূর্বেই ইহারা পুলিশের দমননীতির ফলে ছত্রভঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে।

কিন্তু প্রথম যুগের এত চেষ্টা, উৎসাহ ও সম্ভাবনা সত্ত্বেও সেই সময়ে উড়িষ্যায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে নাই। বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার অন্যতম নায়ক ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই ব্যর্থতার নিম্নোক্ত কারণসমূহ উল্লেখ করিয়াছেন :

"...একদল যুবক যাঁহারা স্বাধীনতা-পন্থার পাণ্ডাগিরি করিতেন তাঁহারা সরকারী চাকুরি লইয়া দল হইতে অন্তর্হিত হইলেন বা এই মতবাদ ভুলিয়া গেলেন। (১) আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে ইহাই মনে হয় যে, উত্তর-পশ্চিম ও উড়িষ্যা তৎকালে চিন্তার ক্রম-বিকাশের ক্ষেত্রে বঙ্গ হইতে পঞ্চাশ বৎসর পশ্চাতে ছিল। তৎকালে এইসব প্রদেশে ধর্ম ও সামাজিক সংস্কারের

(১) "উড়িষ্যাবাসীদের মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম বলিয়া "গভর্ণমেণ্ট উড়িষ্যাবাসী domiciled বাঙালীদের ডেপুটি ও সাব-ডেপুটিগিরি দেন।"—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃঃ ৬১।

হুজুগ ছিল। বৃদ্ধেরা সংস্কারকের দলে ছিলেন; কিন্তু যুবকদের মন কোন প্রকারের সংস্কারদ্বারা আবদ্ধ না থাকায় তাহারা স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়া স্বাধীনতাবাদের বাণী শ্রবণ করে। কিন্তু তাহাদের চিন্তাশক্তির স্থায়িত্ব ও দৃঢ়তা না থাকায় সেই মতবাদ দৃঢ়ীভূত হইতে পারে নাই,—তাহা হুজুগে পরিণত হইয়াছিল, এবং যখন প্রধান প্রধান কর্মীরা ডেপুটি-সাবডেপুটি হইল, তখন বালকের দল আর কি করিবে? প্রধান কর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই বোধ হয় শেষে কর্মক্ষেত্রে ভাঁটা পড়িয়াছিল।"(১)

ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত উড়িষ্যায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা অথবা কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না। ১৯১৪ খৃস্টাব্দে মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর উড়িষ্যায় দুইটি বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে এবং দুইটি ঘটনাই বাংলাদেশের বিপ্লবীদের দ্বারা সংঘটিত হয়। প্রথম ঘটনাটি হইল একটি রাজনৈতিক ডাকাতি ৮ বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতির কয়েকজন সভ্য একজন স্থানীয় উড়িয়া-ছাত্রের সাহায্যে ১৯১৪ খৃস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কটক জিলার এক ধনী জমিদারের বাড়ী ডাকাতি করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। অপর ঘটনাটি হইল বালেশ্বর জিলার বুড়ীবালাম নদীর তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইংরেজ-বাহিনীর সহিত সম্মুখ-যুদ্ধ। এই যুদ্ধের স্মৃতি বুকে লইয়া উড়িষ্যা প্রদেশের বালেশ্বর জিলা ও বুড়ীবালাম নদী ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

(১) ডাঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত: "ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম", পৃঃ ৬১-৬২।

একাদশ অধ্যায়

বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

প্রথম চেষ্টা

বাংলাদেশের যুগান্তর সমিতির উদ্যোগেই বিহারে প্রথম বৈপ্লবিক সমিতি স্থাপনের চেষ্টা শুরু হয়। এই প্রথম উদ্যোগ সম্পর্কে যুগান্তর সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁহার গ্রন্থে নিম্নোক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

"স্বদেশী আন্দোলনের আগে (অর্থাৎ ১৯০৫ খৃস্টাব্দের আগে) ইন্দ্রনাথ নন্দী প্রভৃতি আমাদের দলের কতিপয় যুবক ম্যাজিক-লণ্ঠন সঙ্গে লইয়া বিহার প্রদেশে প্রচার করিতে যান। তাঁহারা গ্রামে গ্রামে ম্যাজিক-লণ্ঠনদ্বারা স্বাধীনতাবাদ প্রচার করিতেন। ইঁহাদের সহিত বিহারের একটা পুরাতন ছত্রভঙ্গ বৈপ্লবিক দলের এক পাণ্ডার (১) সহিত আলাপ-পরিচয় হয়। তৎপরে 'ভবানী-মন্দির' স্থাপনা উপলক্ষে আমাদের জনকতকের বিহারে গমনের ফলে আরা, বাঁকিপুর প্রভৃতি স্থানের সহানুভূতিসম্পন্ন উকিল, মাস্টার ও ছাত্রদলের সহিত পরিচয় হয়। ইঁহারা স্বদেশী আন্দোলন করিতেন এবং আমাদের কার্যের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেন। পরে মন্দিরের জন্য নগরের মাতব্বর লোক-দের নিকট হইতে সহানুভূতি পাওয়া যায়। পশ্চিমে (বিহারে) এই প্রকারে কার্যক্ষেত্র বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিমের বিভিন্ন শহরে আমাদের লোক মাস্টারি করিতে গিয়া এক একটি ছোটখাট কেন্দ্র স্থাপন করেন ও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতাবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, বিপ্লববাদ হিন্দি বা হিন্দুস্থানী-ভাষীদের মধ্যে বিশেষভাবে স্ফূর্তিলাভ করে নাই। কারণ জানিনা, হয়ত স্থানীয় লোকদ্বারা প্রচার করান হয় নাই বলিয়া

---

(১) এই পাণ্ডা হইলেন পাটনার বাবু পুনিত লাল। তৎকালে তিনি S. K. Lahiri কোম্পানির এজেন্ট ছিলেন।

ছাত্রবৃন্দের মধ্যে বিশেষ ফল লাভ হয় নাই অথবা তৎস্থানীয় ছাত্রবৃন্দের মানসিক চিন্তা তৎকালে বিপ্লববাদ গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হয় নাই।...... চাঁইবাসার (সিংহভূম) কোন ঘটনা হইতে এই অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি যে, কোন কোন হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক নিজে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীনতাবাদী হইলেও বাঙ্গালীকে একর্মে বিশ্বাস করিতে রাজি হইতেন না। ইহার কারণ, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে বাংলাদেশ ইংরেজকে সাহায্য করিয়াছিল।......সিপাহীদের সহিত কথা বলিলে তাঁহারা বলিতেন, 'আমরা সর্বদাই প্রস্তুত, কিন্তু ভদ্রশ্রেণীকে অগ্রে জাগিতে হইবে ও আমাদের সাহায্য করিতে হইবে!' তাঁহারা বলিতেন, 'আমরা কুমার সিংহের দেশের লোক, আমাদের কাছে একথা নূতন নহে, তবে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের 'মিউটিনি'র মতন আবার অকৃতকার্য যেন না হয়।' ......কথাটা সত্য। বৃথা রক্তপাত এবং নৃশংস হত্যা ও জুলুমের ফলে উত্তর-পশ্চিমের জনসাধারণ ভয়ে দমিয়া গিয়াছে।

"উত্তর-পশ্চিমে (বিহারে) আমরা যে প্রকার কৃতকার্য হই নাই, ছোটনাগপুরে তৎবিপরীত হইয়াছিল। রাঁচি ও চাঁইবাসার বাঙ্গালী ও বিহারী ছাত্রদের মধ্যে অনেককেই পাওয়া যায়। রাঁচি আমাদের বড় একটি কেন্দ্র হইয়াছিল।(১) রাঁচিতে একটি হিন্দুস্থানী পল্টনের এক অংশ আমাদের দলের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করে। ছোটনাগপুর-বিদ্রোহের নায়ক বীরশা ভগবান-এর (২) দলের তৎকালীন নেতা জোহান সর্দারের সন্ধান করিয়াছিলাম, কিন্তু সাক্ষাৎ লাভ করিতে কৃতকার্য হই নাই।......সন্ধান করিয়া শুনিয়াছিলাম যে, নেতা জোহান সর্দার জঙ্গলের মধ্যে থাকেন। তাঁহার সহিত আলাপ করা সম্ভব নয়। এই প্রকারে কোলদের মধ্যে কার্য করা সম্ভব হয় নাই বটে, তবু দরকার হইলে কোলদের ক্ষেপাইবার আশা রাখিতাম!

---

(১) যুগান্তর সমিতির অন্যতম প্রধান কর্মী গণেশচন্দ্র ঘোষের চেষ্টায় রাঁচি-কেন্দ্রটি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(২) কোল উপজাতি স্বাধীনতা লাভের জন্য বীরশার নেতৃত্বে তিনবার বিদ্রোহ করিয়াছিল। শেষে ধৃত হইয়া তিনি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কোলরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া মনে করিত।

"হিন্দুস্থানী-ভাষীদের সহিত ঘনিষ্ঠতার ফলে কলিকাতায় জনকতক বিহারী ছাত্রের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়। ইঁহারা উৎসাহিত হইয়া হিন্দি ভাষায় 'যুগান্তর'-এর এক হিন্দি-সংস্করণ বাহির করিবার পরামর্শ আমাদের সহিত করিয়াছিলেন এবং টাকাও উঠাইয়াছিলেন। এই জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে মনে পড়ে না কি কারণে এই উদ্যোগ কার্যে পরিণত হয় নাই। হয়ত পুলিশের হাঙ্গামার জন্যই এই চেষ্টা স্থগিত হয়।"(১)

বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালী

বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বাঙ্গালীদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সেই বিপ্লব-প্রচেষ্টায় বিহার-প্রবাসী বাঙ্গালীদের দান সর্বাগ্রগণ্য। বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার দুই প্রধান নায়ক অরবিন্দ ও বারীন্দ্রকুমার বিহারের দেওঘরেই বাল্যজীবন যাপন করেন এবং সেখানে তাঁহাদের পিতামহ রাজনারায়ণ বসুর নিকট হইতে সর্বপ্রথম বৈপ্লবিক শিক্ষা ও ঐতিহ্য গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন বাংলা দেশে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রথম প্রবর্তকদের অন্যতম। তিনি দেওঘরে কর্মজীবন অতিবাহিত করিয়া সেইখানেই বনবাস করিতেন। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র সেই বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। দেওঘরে শিক্ষাকালেই বারীন্দ্রকুমার দেওঘরে 'গোল্ডেন লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে এই সংগঠন বিহারে 'স্বদেশী আন্দোলন' প্রথম আরম্ভ করে।

'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে দেখা যায় যে, এই প্রথম বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী বিহারের প্রবাসী বাঙ্গালী-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এই বিপ্লবীরা দেওঘরে 'শীল লজ' নামে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে বোমা তৈরী ও বোমা মজুদ করিবার জন্য একটি কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এই বাড়ীতে রক্ষিত একটি বোমা 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র বহু পরে, ১৯১৫ খৃস্টাব্দে পুলিশের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়।

(১) 'ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম', পৃ: ৬৩-৬৫।

বিহারের মজঃফরপুরে বোমা-বিস্ফোরণও বাংলাদেশের বিপ্লবীদেরই কীর্তি। ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী কর্তৃক মজঃফরপুরে বোমা নিক্ষেপের ফলে তখন সারা ভারতের যুবকদের মনে বৈপ্লবিক চাঞ্চল্য জাগাইয়া তুলিয়াছিল।

মোহান্ত হত্যা

১৯১৩ খৃস্টাব্দের ২০শে মার্চ পশ্চিম-ভারতের কয়েকজন বিপ্লবী বিহারের 'নিমেজ' নামক স্থানের একটি মন্দিরে ডাকাতি করিতে গিয়া ভুলবশতঃ মন্দিরের মোহান্তকে হত্যা করে। প্রায় এক বৎসর পরে পুলিশ এই বিপ্লবীদের সন্ধান পায়।

এই হত্যা-মামলার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে, বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর জিলার মতিচাঁদ ও মানিকচাঁদ নামে দুই জন ছাত্র প্রথমে কোন বিপ্লবীর নিকট হইতে বৈপ্লবিক প্রেরণা লাভ করে। পরে তাহারা নিজেদের চেষ্টায় 'ম্যাৎসিনির জীবনী', 'তিলকের প্রথম আট বৎসর' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং 'কাল', 'ভোলা', 'কেশরী' প্রভৃতি সংবাদপত্রের বৈপ্লবিক প্রচারে অনুপ্রাণিত হয়। এই সময়ে জয়পুর দেশীয়রাজ্যে অর্জুনলাল শেঠি নামক একটি লোক একটি স্কুল চালাইতেছিলেন। মতিচাঁদ ও মানিকচাঁদ এই স্কুলে যোগদান করে। এই স্কুলে অর্জুনলাল ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন আর বিষণ দত্ত নামক এক ব্যক্তি রাজনীতি শিখাইতেন। বিষণ দত্ত তাঁহার বক্তৃতায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য ডাকাতি, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেন। তিনি দেশের দুরবস্থার জন্য ইংরেজদের দায়ী করিয়া তাহাদের এদেশ হইতে বিতাড়িত করিবার প্রচেষ্টা শুরু করিতে বলিতেন। এই উপলক্ষে তিনি বাংলার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম, কানাইলাল প্রভৃতির কাহিনী বলিতেন।

কিছুদিন পরে বিষণ দত্ত ছাত্রদের মধ্য হইতে মতিচাঁদ, মানিকচাঁদ ও জয়চাঁদ নামে তিনটি ছাত্রকে বাছিয়া লন এবং তাহাদের কাজ শুরু করিতে বলেন। তিনি একটি ডাকাতির পরিকল্পনা করিয়া উক্ত তিন জনকে লইয়া বিহারে উপস্থিত হন। পথে জোরাভর সিং নামক এক ব্যক্তি তাঁহাদের সহিত যোগদান করে। বিহারে উপস্থিত হইয়া বিষণ দত্ত তাহাদের ডাকাতির স্থান বলিয়া দিয়া ঐ উদ্দেশ্যে তাহাদের চারিজনকে সেই স্থানে প্রেরণ করেন।

মতিচাঁদ, মানিকচাঁদ প্রভৃতি চারিজন ছাত্র রাত্রিকালে নিমেজ-এর মন্দিরে উপস্থিত হইয়া মোহান্তের নিকট সিন্দুকের চাবি বাহির করিয়া দিতে বলে। ইহাতে মোহান্তের সহিত বিপ্লবীদের তুমুল বচসা হয়, মোহান্তও তাহাদের পুলিশে ধরাইয়া দিবার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় মোহান্ত ও তাহার চাকর এই বিপ্লবীদের হস্তে নিহত হয়।

প্রায় এক বৎসর পর সিউ নারায়ণ নামে ঐ স্কুলের অপর একজন ছাত্র বৈপ্লবিক কাগজপত্রসহ গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট এই হত্যার কথা ফাঁস করিয়া দেয়। পুলিশ বহু অনুসন্ধান করিয়া মতিচাঁদ, মানিকচাঁদ ও বিষণ দত্তকে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের লইয়া হত্যার অভিযোগে মামলা শুরু হয়। মামলার বিচারে মতিচাঁদের ফাঁসী হয় ও বিষণ দত্ত দশ বৎসরের দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

বেনারস-সমিতি প্রচেষ্টা

১৯১৩ খৃস্টাব্দে 'বেনারস-সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা শচীন্দ্রনাথ সান্যালের উদ্যোগে বিহারে বৈপ্লবিক সমিতি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়। শচীন্দ্রনাথ স্বয়ং বহু চেষ্টা করিয়া বিহারের তৎকালীন রাজধানী বাঁকিপুর শহরে 'বেনারস-সমিতি'র একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। বাঁকিপুর-কলেজের কয়েকজন ছাত্র এই শাখা-সমিতির সভ্য হইয়াছিল। পরে 'বেনারস-সমিতি'র অপর একজন সভ্য বঙ্কিমচন্দ্র মিত্রের উপর বাঁকিপুরের শাখা-সমিতির পরিচালনার ভার পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন ছিলেন 'বিহার ন্যাশনাল কলেজ'-এর ছাত্র। কলেজে পড়িবার সময় তিনি রঘুবীর সিং নামক একজন বিহারী ছাত্রকে বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য করেন। রঘুবীর সিং ক্রমশঃ বঙ্কিমের প্রধান সহকারীর পদ লাভ করে। 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র বিচারকালে বঙ্কিমচন্দ্রের জনৈক সহপাঠী ছাত্র তাহার সাক্ষ্যে বঙ্কিমের কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবৃতি দেয়ঃ—

"বঙ্কিমচন্দ্র অধ্যয়নের জন্য 'বিহার ন্যাশনাল কলেজ'-এ প্রবেশ করে। কলেজের কয়েকজন ছাত্র লইয়া বঙ্কিম একটি সমিতি স্থাপন করে। সমিতির বৈঠকে সে বিবেকানন্দের রচনাবলী ব্যাখ্যা করিয়া শুনাইত। আমি (সাক্ষী)

নিজেও একজন শিক্ষক ছিলাম। সমিতিতে প্রবেশ করিবার সময় কোন বাহিরের লোকের নিকট সমিতির গোপন কথা প্রকাশ না করিবার জন্য প্রত্যেক সভ্যকে ভগবান ও পুরোহিতের নামে শপথ গ্রহণ করান হইত। এদেশ হইতে বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য বঙ্কিম আমাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিত। সে আমাদের এমনভাবে প্রস্তুত হইতে বলিত যাহাতে আমরা বৃটিশকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিতে সক্ষম হই।"(১)

কিছুদিন পর রঘুবীর সিং এলাহাবাদে চলিয়া যায় এবং সেখানে একটি পদাতিক সৈন্যবাহিনীর অফিসে কেরানীর চাকুরি গ্রহণ করে। চাকুরি করিবার সময়েই একবার রাজদ্রোহ-মূলক ইস্তাহার বিলি করিতে যাইয়া রঘুবীর পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয় এবং দুই বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করে। ইহার পর 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় গ্রেপ্তার হইয়া বঙ্কিম দশ বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ঢাকার অনুশীলন সমিতির প্রচেষ্টা

'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র পর ঢাকার অনুশীলন সমিতি সরাসরি বিহারে সংগঠন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করে। এই উদ্দেশ্যে ঢাকা হইতে কয়েকজন সভ্যকে পর পর বিহারে পাঠান হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে রেবতী নাগ ব্যতীত অপর কাহারও চেষ্টা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

রেবতী ছিলেন একজন পলাতক আসামী। বাংলাদেশে কয়েকটি বৈপ্লবিক ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ তাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিল। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে রেবতী ভাগলপুরকে কেন্দ্র করিয়া একটি বৈপ্লবিক সমিতি গঠনের চেষ্টা শুরু করেন। তিনি ভাগলপুর-কলেজের ও ভাগলপুরের 'বাররী উচ্চ ইংরেজি-বিদ্যালয়'-এর কয়েকটি ছাত্রের সহিত পরিচয় করিয়া তাহাদের সহিত রাজনৈতিক আলোচনা চালাইতে থাকেন। রেবতী তাহাদের সামনে বাংলার বিপ্লবীদের সাহসিকতাপূর্ণ [illegible] দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিয়া

(১) 'Sedition Committee Report', P. 168.

তুলিতেন এবং ইংরেজ-শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নের নগ্ন চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের মনে ক্রোধের আগুন জ্বালাইয়া দিতেন।

এইভাবে রেবতী কয়েকটি ছাত্র সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন এবং তাহাদের লইয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য শহরেও সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। যাহাতে বাংলাদেশের বিপ্লবীরা প্রয়োজন হইলে পলাইয়া আসিয়া ভাগলপুরে আশ্রয় লইতে পারে তাহার জন্য রেবতী একটি গোপন আশ্রয়স্থলও সংগ্রহ করেন। এই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১৭ খৃস্টাব্দের শেষদিকে রেবতীর সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বাংলাদেশ হইতে একজন গোয়েন্দা-অফিসার ভাগলপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলে রেবতী গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য পলায়ন করেন। ইহার কিছুদিন পর পুলিশের সহিত সহ-যোগিতার সন্দেহে রেবতী বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হন। রেবতীর পলায়নের কিছুদিন পরে ভাগলপুর-সমিতির সকল সভ্য পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইহাদের বিচার হয়। বিচারে ইহাদের কয়েকজনকে সতর্ক করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়, আর কয়েকজনকে কিছুকাল নজরবন্দী করিয়া রাখা হয়। এইভাবে এই সময়ে বিহার প্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। এই বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা কঠোর হস্তে দমনের উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার কুখ্যাত 'রাউলাট কমিটি' বা 'সিডিসন কমিটি' গঠন করে।

তৃতীয় খণ্ড

লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস

১৯১৬ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের ঐতিহাসিক অধিবেশন হয়। ঠিক এই সময়ে লাক্ষ্ণৌ শহরেই মুশলিম লীগের বাৎসরিক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনে যে সকল ঘটনা ঘটে তাহাদ্বারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা হয়। ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের ভিত্তিতে প্রকাশ্যে হাত মিলাইলেন এবং কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও আবার চরমপন্থী দলের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইলেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে সুরাট-কংগ্রেসে বিচ্ছেদের পর কংগ্রেসের নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের ইহাই প্রথম মিলন। এই দুই অধিবেশনের ফলে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার পথ প্রস্তুত হয় এবং বেশান্ত ও তিলকের 'হোমরুল'-এর দাবি জাতীয় দাবি হিসাবে গৃহীত হইবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হইল।

কংগ্রেস-অধিবেশনের সভাপতি নরমপন্থী নেতা অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতির ভাষণে তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ভারতের বৃটিশ-শাসনের গুণগান করিলেও 'ভারত-রক্ষা আইন' এবং বিপ্লবীদের বিনা বিচারে আটক ও অন্তরীণ করিয়া রাখিবার সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা করিয়া ঘোষণা করেন:

"ভারতের বর্তমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যেই 'এ্যানার্কিস্ট' মতবাদের (বিপ্লববাদের) বীজ নিহিত। ইহা কুশাসনেরই ফল এবং ইহা দূর করিবার একমাত্র উপায় হইল আপসনীতি। কেবল দমননীতি চালাইয়া কোন ফল হইবে না।"(১)

সভাপতির ভাষণে তিলক ও বেশান্তের উপর সরকারী উৎপীড়নের তীব্র নিন্দা করা হয়। তিলক ও বেশান্তের 'হোমরুল'-দাবির সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে সরকারের নিকট "যথাসম্ভব শীঘ্র ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন (হোমরুল) মঞ্জুর করিবার নীতি ঘোষণার দাবি" করেন। এই প্রস্তাব সমর্থন করেন তিলক ও বেশান্ত।

(১) Congress Presidential Speeches, P. 288.

অধিবেশনে লাক্ষ্ণৌ শহরের সর্বত্র তিলক ও বেশান্ত বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন। 'হোমরুল'-দাবির উপর তাঁহাদের ভাষণই লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হইয়াছিল। বেশান্ত 'হোমরুল'-দাবির সমর্থনে বলেন যে, ভারতবাসীরা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে থাকিতে আর প্রস্তুত নয়; বৃটিশ-পার্লামেণ্টকে অবিলম্বে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করিয়া আইন প্রণয়ন করিতে হইবে; ভারতবাসীরা ভারতের আমলাতান্ত্রিক সরকারের উপর কোন ভরসা রাখে না, তাহাদের ভরসা বৃটিশ-পার্লামেণ্টের উপর। অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের দাবি বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হয়। এখন হইতে 'হোমরুল'-এর দাবিই জাতীয় দাবিতে পরিণত হয়।

লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস হইতে বেশান্তের 'হোমরুল-লীগ'-এর সহিত সহযোগিতার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। মুসলিম লীগের অধিবেশনেও মুসলমান নেতৃবৃন্দ অনুরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মুশলিম লীগের অধিবেশনে মহম্মদআলি জিন্না তাঁহার বক্তৃতায় ঘোষণা করেন ঃ

"ভারতবাসীরা নিজেদের স্বায়ত্ব-শাসনের উপযুক্ত বলিয়া প্রমাণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঐক্যবদ্ধ ভারতের জন্মের সূচনা করিতেছে। কংগ্রেস যে শাসন-সংস্কারের পরিকল্পনা করিয়াছে তাহা মানিয়া লইতেই হইবে এবং ইহা বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য বৃটিশ-পার্লামেণ্টকে আইন পাশ করিতে হইবে।"(১)

'হোমরুল'-দাবির সমর্থনে মুসলিম লীগের অধিবেশনেও কংগ্রেসের প্রস্তাবের অনুরূপ প্রস্তাব গৃহীত হয়। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নিদর্শন হিসাবে বিপিনচন্দ্র পাল লীগের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের সভাপতির অনুরোধে তিনি 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বাংলার বিপ্লবীদের স্বদেশ-ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, বাংলাদেশে 'এনার্কিস্ট' বলিয়া

(১) Speech summarised by V. Lovett in his book, P. 122.

কেহ নাই, বাংলার বিপ্লবীরা স্বদেশভক্ত বীর ; যদি স্বদেশভক্তির ক্রমবিকাশকে গলা টিপিয়া হত্যা করা না হইত তবে কখনই বৈপ্লবিক স্বদেশপ্রেমের জন্ম হইত না।(১)

সরকারী আক্রমণ

এদিকে মহাযুদ্ধের ফলে ব্যাপক গণ-বিক্ষোভ দ্রুত আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। যুদ্ধের ট্যাক্সের বোঝা, ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য ও অবাধ মুনাফা লুণ্ঠনের চাপে পিষ্ট হইয়া দেশের দরিদ্র জনসাধারণ মরিয়া হইয়া বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে যে-কোন আন্দোলনে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ইহার উপরে দেশের মধ্যে ম্যালেরিয়ার মহামারীতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে থাকে। ইহার ফলে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণও সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের দ্বারা স্বায়ত্ব-শাসনের (হোমরুল-এর) দাবি লইয়া আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে ভারতের ক্রমবর্ধমান গণ-বিক্ষোভ ও জনগণের সংগ্রামের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়। যে গণ-বিক্ষোভ মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে স্পষ্ট রূপ লাভ করিতে পারে নাই, তাহা এবার 'হোমরুল'-আন্দোলনের মধ্যে ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে। বেশান্ত ও তিলকের নেতৃত্বে এই আন্দোলন দ্রুত সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। মাদ্রাজ হইতে বেসান্তের 'নিউ ইণ্ডিয়া' ও 'কমন উইল' পত্রিকা এবং পুণা হইতে তিলকের 'কেশরী' ও 'মারাঠা' পত্রিকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে অনুষ্ঠিত অসংখ্য সভা-সমিতির বক্তৃতার মারফত 'হোমরুল'-এর দাবি বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠে। এই আন্দোলনের ফলে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলি ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। এই আন্দোলনকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবার জন্য ইংরেজ-সরকার আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দের উপর আক্রমণ শুরু করে। এ্যানি বেশান্ত হইলেন এই আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য।

---

(১) Speech summarised by V. Lovett in his book, P. 122.

কারণ, ভারতের বিপ্লবীদের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ও তাঁহার রচনায় সাম্রাজ্য-বাদী শোষণের তীব্র সমালোচনা ভারতের ইংরেজ-শাসকদের শঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছিল।

১৯১৭ খৃস্টাব্দের ২রা মে তারিখের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় 'জঘন্য বিশ্বাস-ঘাতকতা' শীর্ষক বিখ্যাত প্রবন্ধে তিনি ভারতে বিশেষ সুবিধাভোগী বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের শোষণের বীভৎস চিত্র জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। এই সময় ইংলণ্ডের যুদ্ধ পরিচালনার জন্য আহূত 'ইম্পিরিয়াল ওয়ার কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে বিকানীর দেশীয় রাজ্যের মহারাজা, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর স্যার জেম্‌স মেস্টন ও স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ভারতের জনসাধারণের "প্রতিনিধি"হিসাবে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বৃটিশ-ভক্তির জন্যই ইঁহারা শাসকদের পরম বিশ্বাসভাজন হন। ইঁহারাও এই অনুগ্রহের প্রতিদানস্বরূপ 'ওয়ার কনফারেন্স'-এর অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভারতবর্ষে বৃটিশের বিশেষ আর্থিক সুবিধালাভের প্রস্তাবের পক্ষে এবং 'হোমরুল'-দাবির বিরুদ্ধে ভোট দেন। বেশান্ত তাহার 'জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা' শীর্ষক প্রবন্ধে এই তিনটি প্রতিনিধিকে "ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক" আখ্যায় অভিহিত করিয়া ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেন।

২৩শে মে তারিখের 'নিউ ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া তিনি ভারতের নির্যাতিত বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বলেন:

বিপ্লবী যুবকেরা "আজ মরিয়া হইয়া বয়স্ক নেতৃবৃন্দের সকল বাধা-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের পথ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে; তাহাদের অনেকে এখনও সেই পথে চলিতেছে, তাহাদের অনেকে ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছে, অনেককে আন্দামান দ্বীপে মৃত্যুর মুখে পাঠান হইয়াছে, অনেককে এদেশের কারাগারে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। আজ ভারতের ছাত্র-যুবকেরা ইহা লক্ষ্য করিয়া কৌতুক বোধ করিতেছে যে, রুশিয়ার যুবক-যুবতীদের ঠিক একই ধরণের ক্রিয়াকলাপে বৃটিশ-প্রধানমন্ত্রী আজ আনন্দে আত্মহারা হইতেছেন, কিন্তু রুশিয়ার বিপ্লবীরাও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া ট্রেন উড়াইয়াছে,

একজন জারকে (রুশিয়ার সম্রাটকে) হত্যা করিয়াছে, অথচ তাহাদেরই আজ শহীদ বলিয়া প্রশংসা করা হইতেছে এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা এখনও জীবিত আছে তাহাদের বিজয়ীর সম্মান দিয়া রুশিয়ায় ফিরাইয়া আনা হইতেছে। কারণ, তাহাদের জন্যই রুশিয়ার মুক্তি সম্ভব হইয়াছে। একসময়ে যাহাদের নাম উচ্চারণ করাও পাপ বলিয়া মনে করা হইত, আজ তাহাদের নাম পরম পবিত্র বলিয়া স্মরণ করা হইতেছে। আজ সেই বিপ্লবীদের সকল দুঃখ ও আত্মত্যাগ জয়ের দ্বারা সার্থক হইয়াছে।"(১)

বেশান্তের প্রচারে শঙ্কিত হইয়া ইংরেজ-সরকার তাঁহার কণ্ঠরোধ ও কর্মক্ষমতা হরণ করিবার সিদ্ধান্ত করে। জুন মাসের মাঝামাঝি মাদ্রাজের গভর্ণর 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর বলে বেশান্ত ও তাঁহার দুই জন প্রধান সহকারীর উপর এক নির্দেশ জারি করেন। সংক্ষেপে, তাঁহাদের মাদ্রাজ হইতে দূরে কোথাও অন্তরীণ করিবার ব্যবস্থা হয়।

বেশান্ত একখানি পত্র প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার এই বিদায়-পত্রে ভারতীয় জনগণের উপর বিদেশী শাসকদের উৎপীড়নের স্বরূপ বর্ণনা ও তাহার 'হোমরুল'-দাবির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করিয়া বলেন:

"বিদেশী ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য ভারতীয় শ্রমিকদের টানিয়া নেওয়া হইতেছে। শাসকগণ যুদ্ধ-ঋণ হিসাবে ভারতীয় মূলধন লুটিয়া লইতেছে, কিন্তু কিন্তু ভারতবর্ষে যতদিন স্বেচ্ছাতন্ত্র বজায় থাকিবে ততদিন এই যুদ্ধ-ঋণের দ্বারা স্বাধীনতা আসিবে না। যুদ্ধ-ঋণের সুদ যোগাইবার জন্য ভারতবাসীরা ট্যাক্সের চাপে পিষ্ট হইবে। এইগুলি যখন একে একে ঘটিতে থাকিবে তখনই ভারতবাসীরা বুঝিতে পারিবে কেন আমি যুদ্ধের পর 'হোমরুল' প্রবর্তনের চেষ্টা করিয়াছি। কেবলমাত্র 'হোমরুল'-এর দ্বারাই ভারতবাসীরা অন্যের মুনাফার জন্য কুলির জাতিতে পরিণত হইবার হাত হইতে, ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারে।"

(১) Quoted from V. Lovett's 'History of the National Movement' P. 139.

তিনি এই বলিয়া পত্রখানি শেষ করেন যে, তিনি ভারতবাসীদের জাতীয় আত্মমর্যাদাবোধ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ।(১)

বেশান্তের উপর এই সরকারী নির্যাতনের ফলে সারা দেশময় প্রতিবাদের ঝড় উঠিতে থাকে। যাহারা এতদিন 'হোমরুল'-এর দাবি ও আন্দোলন সমর্থন করে নাই তাহারাও এই সরকারী নির্যাতনের প্রতিবাদে এই দাবি সমর্থন করিয়া আন্দোলনে যোগদান করিতে শুরু করে। দেশের সর্বত্র সভা-সমিতি করিয়া এই সরকারী উৎপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানান হয়। বড়লাটের কাউন্সিলের বেসরকারী সদস্যগণ কাউন্সিলের অধিবেশনে সরকারী কার্যের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু সরকারী দমননীতি এখানেই শেষ হইল না, বিভিন্ন প্রদেশের জাতীয় নেতাদের উপর 'ভারত-রক্ষা-আইন'-এর বলে নানাবিধ বাধা-নিষেধ আরোপিত হয়।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার

ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার লক্ষ্য করিয়া বৃটিশ-শাসকগণ শঙ্কিত হইলেন, তাহারা বুঝিলেন যে, কেবলমাত্র দমননীতি দ্বারা এই আন্দোলন দমন করা সম্ভব হইবে না। তাহারা মর্লে-মিণ্টো শাসন-সংস্কারের ধরনের আর একটি শাসন-সংস্কার ঘোষণা করিলেন। তৎকালীন ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবই এই শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব ঘোষণা করেন। ভারত-সচিবের ঘোষণায় বলা হয়ঃ

"বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতবর্ষে ক্রমশঃ দায়িত্বশীল সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি শাসন-বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর যোগদানের ব্যবস্থা ও স্বায়ত্ত-শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবিকাশ সাধনই বৃটিশ-সরকারের নীতি।"

"বৃটিশ-সরকার ও ভারত-সরকারের উপরে ভারতের জনগণের মঙ্গল ও

(১) V. Lovett', 'History of National Movement', P. 137.

উন্নতি বিধানের দায়িত্ব ন্যস্ত বলিয়া উহারাই হইবে ভারতীয় জনগণের শাসন-সংক্রান্ত অগ্রগতির সময় ও পরিমাণের বিচারক। ঐ দুই সরকারের সহিত যাঁহারা সহযোগিতা করিবেন উহারা তাঁহাদের সহযোগিতা দ্বারাই চালিত হইবে এবং তাঁহাদের হাতেই শাসন-কার্য পরিচালনার নূতন সুবিধা অর্পণ করা হইবে, আর ভারতীয়দের হস্তে দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা তাহা সেই সহযোগিতার পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারণ করা হইবে।"

একই ঘোষণায় একই সঙ্গে শাসন-সংস্কারের আশ্বাস ও অবাধ্যতার জন্য ভীতি প্রদর্শন হইতে ভারতের জনসাধারণ বুঝিতে পারিল যে, ইহাও মর্লে-মিণ্টো সংস্কারের মতই একটি ভূয়া শাসন-সংস্কার। বৃটিশ-সরকারের এই শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবটি যে উদ্দেশ্যমূলক তাহাও শীঘ্রই বোঝা গেল। এই প্রস্তাব ঘোষণার ঠিক পরেই ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবের ভারতে আগমনের সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইল এবং ভারতবর্ষের নরমপন্থী 'উদারনীতি'বাদীদের সরকারের পক্ষে টানিয়া আনাই যে এই আগমনের আসল উদ্দেশ্য তাহাও প্রকাশ্যেই ঘোষিত হইল।

ভারত-সচিব মণ্টেগু সাহেবের এই বিভেদ-প্রচেষ্টার সাফল্য স্পষ্ট হইয়া উঠে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে 'উদারনীতি'বাদীরা শেষবারের মত কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া ভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ মণ্টেগুর শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার ফলেই এই ভাঙ্গন দেখা দেয়। বৃটিশ-শাসকদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিলেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উহাদের শাসন-সংস্কারের দাবি পুনরায় জোরের সহিত পেশ করে। ইহার ফলেই এই ভাঙ্গন দেখা দেয়।

১৯১৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। তিলকের প্রস্তাব অনুসারে সদ্যমুক্ত এ্যানি বেশান্ত কংগ্রেসের সভানেত্রী নির্বাচিত হন। তিলক ও বেশান্ত উভয়েই নূতন শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করিয়া 'হোমরুল'-এর দাবিই ভারতের একমাত্র দাবি বলিয়া ঘোষণা করেন।

১৯১৭ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ভারত-সচিব মণ্টেগু ভারতে পদার্পণ করিয়া জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দিয়া তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করেন এবং নরমপন্থী নেতাদের সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হন। ইহার কিছু দিন পরেই নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করিয়া 'ইণ্ডিয়ান লিবারল ফেডারেশন' গঠন করেন।

১৮১৮ খৃস্টাব্দের ৮ই জুলাই মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব রিপোর্ট আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের শেষ দিকেই বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। এই অধিবেশনে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব নাকচ করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া উপস্থিত হন। রিপোর্ট প্রকাশিত হইবামাত্র এ্যানি বেশান্ত এই প্রস্তাবকে 'দানত্বের পরিকল্পনা' নামে অভিহিত করিয়া ঘোষণা করেন: "এই পরিকল্পনা যে নীতি হইতে প্রসূত ইহার রচয়িতাগণ সেই নীতির উর্ধ্বে কোন দিনই উঠিতে পারিবেন না, সেই নীতিকে কেবলমাত্র একটা বিপ্লবের দ্বারাই ধ্বংস করা সম্ভব।"(১) এই মনোভাব লইয়া চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বোম্বাই নগরীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত হন। এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ হাসান ইমাম। অধিবেশনে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের তীব্র সমালোচনা করিয়া ইহাকে "তুচ্ছ, বিরক্তিকর ও নৈরাশ্যজনক" বলিয়া অগ্রাহ্য করা হয়। মুসলিম লীগের অধিবেশনেও এই শাসন-সংস্কারের বদলে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসনের দাবির উপর জোর দেওয়া হয়।

(২)

'রাউলাট-আইন' ও জাতীয় সংগ্রাম

গণ-সংগ্রামের নূতন জোয়ার

১৯১৭ ও ১৯১৮ খৃস্টাব্দে গণ-বিক্ষোভ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ১৯১৮ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ও ১৯১৯ খৃস্টাব্দের প্রথমদিকে ভয়ংকর আকার ধারণ করে। মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কারের প্রস্তাবে জনগণের মধ্যে যে হতাশা দেখা

(১) Quoted from V. Lovett's "History of National Movement', P. 168.

দেখা দেয় তাহা এই গণ-বিক্ষোভকে আরও বাড়াইয়া তোলে। জনসাধারণ এতদিন আশা পোষণ করিত যে, যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দান করা হইবে। নূতন শাসন-সংস্কারের প্রস্তাব তাহাদের সেই আশা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করে এবং তাহার ফলে জনগণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়।

যুদ্ধের ফলে এতদিন জনসাধারণ চূড়ান্ত দুর্দশা ভোগ করিয়াছে, ক্রমবর্ধমান দ্রব্য-মূল্য বহু পূর্বেই জনসাধারণের ক্রয়-শক্তি ছাড়াইয়া গিয়াছে। ইহার উপর দেশব্যাপী মহামারীর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়াছে। ১৯১৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে ভয়ংকর ইনফ্লুয়েঞ্জা-মহামারীতে সারা ভারতবর্ষে দেড় কোটিরও অধিক লোক প্রাণ হারায় এবং ততোধিক লোক প্রায় অকর্মণ্য হইয়া পড়ে।(১) জনসাধারণ ইংরেজ-শাসনকে ক্ষমাহীন শত্রু বলিয়া উহার উচ্ছেদের জন্য মরিয়া হইয়া উঠে। তখন দেশের মধ্যে এমন কোন জাতীয় নেতৃত্ব ছিলনা যে নেতৃত্ব সকল শ্রেণীর মানুষের এই ধূমায়িত বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিয়া দেশব্যাপী বিরাট গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করে। কংগ্রেস এখনও দেশের বিপুল জন-সংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, বিভিন্ন মধ্যবর্তী শ্রেণী, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি বিপুল জনগণের সহিত সম্পর্কহীন। সুতরাং উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে দেশের বিভিন্ন শ্রেণী নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসারে সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়।

১৯১৭ খৃস্টাব্দের শেষদিকে বিহারের গয়া ও সাহাবাদ জিলার কৃষকগণ বাংলাদেশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদের জন্য এক ব্যাপক অভ্যুত্থানের আয়োজন করিয়া ব্যর্থ হয়।(২) পাঞ্জাবের কৃষক-জনগণের বিদ্রোহ 'গদর সমিতির' বিপ্লব-প্রচেষ্টার মধ্যে আংশিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। বিহারের চাম্পারণ জিলার নীলচাষীরা নীলকরদের শতাধিক বৎসরের পুরাতন শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা

---

(১) V. Lovett : 'History of Nationalist Movement', P. 181.

(২) L. S. S, O' Malley : 'History of Bengal, Behar & Orissa Under British Rule', P. 145—61.

করে এবং মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে নীলের চাষ বন্ধ করিতে সক্ষম হয়। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে আমেদাবাদের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিয়া দাবি আদায় করে। মাদ্রাজে য়ুরোপীয় মালিকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ কুড়ি দিন ধর্মঘট চালাইয়া জয়লাভ করে। বোম্বাইয়ের এক লক্ষ পঁচিশ হাজার সুতাকল-শ্রমিকের ধর্মঘট দেশের মধ্যে এক নূতন গণ-সংগ্রামের সূচনা করে। দেশব্যাপী গণ-সংগ্রামের দুর্নিবার আঘাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য শাসকগণ যুদ্ধকালীন 'ভারত-রক্ষা আইন' অপেক্ষা শতগুণ ভয়ংকর এক আইনের নাগপাশে ভারতের জনসাধারণকে আবদ্ধ করিবার আয়োজন করে। এই আইনই 'রাউলাট-আইন' নামে কুখ্যাত।

'রাউলাট-আইন'

মহাযুদ্ধের সময় ভারতের বিপ্লবীদের ও জনসাধারণের ক্রোধবহ্নি হইতে ভারতের ইংরেজ-শাসনকে রক্ষা করিবার জন্য ১৯১৫ খৃস্টাব্দে 'ভারত-রক্ষা আইন' পাশ হয়। তখন হইতে এই আইনের বলে শাসকগণ বিভিন্ন অজুহাতে ভারতবর্ষের বুকের উপর অত্যাচারের বন্যা বহাইয়াছে, হাজার হাজার ভারত-বাসীকে বিনা বিচারে আটক রাখিয়া স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি অক্ষত রাখিয়াছে। ১৯১৫ খৃস্টাব্দ হইতে 'ভারত-রক্ষা আইন' ও উহার অংশ বিশেষ 'ভারত প্রবেশ সংক্রান্ত আইন' (Ingress into India Act) অনুসারে প্রায় আট হাজার লোককে জেলে, বিভিন্ন গ্রামে ও স্বগ্রামে আটক রাখা হয়, বহু লোকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয় এবং বহু প্রকারে সভা-সমিতি ও সংবাদপত্র প্রচারে বাধা সৃষ্টি করিয়া জনমতের কণ্ঠরোধ করা হয়। এইভাবে 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া আসে এবং জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

শাসকগণ মহাযুদ্ধের জরুরী অবস্থার অজুহাতে দমননীতির মোক্ষম অস্ত্র হিসাবে 'ভারত-রক্ষা আইন' পাশ করাইয়াছিলেন, তাই যুদ্ধ শেষ হইবার পর

আর ইহাকে জিয়াইয়া রাখিবার কোন অজুহাত রহিল না। অথচ ভারত-বাসীর স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রতিদিন নূতন শক্তি সঞ্চয় করিতেছে, ইহা ক্রমশঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ক্ষুদ্র গণ্ডি পার হইয়া জনসাধারণের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতেছে। শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ স্তরের মানুষের যোগদানের ফলে জাতীয় সংগ্রাম ক্রমশঃ নূতন রূপ গ্রহণ করিতেছে; বিদেশ হইতে ভারতীয় সৈন্যগণ নূতন জাতীয় চেতনা লাভ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহারা জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া ইহাকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিতেছে; ইহা ব্যতীত 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা মুক্ত হইবে। সুতরাং শাসকগণ বুঝিতে পারিলেন যে, অস্থায়ী 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর মেয়াদ শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ইহা অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী আইনের অস্ত্র পূর্ব হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে না পারিলে ইংরেজ-শাসনের সম্মুখে এক ভয়ংকর বিপদ দেখা দিবে।

এই সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে শাসকগণ বহু পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছিলেন। এবার 'ভারত-রক্ষা আইন' অপেক্ষা বহুগুণ শক্তিশালী এক আইন স্থায়ীভাবে তৈরী করিয়া রাখিবার জন্য যুদ্ধ শেষ হইবার বহু পূর্বে, ১৯১৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিচারপতি রাওলাটকে সভাপতি ও পাঁচজন সরকারী কর্মচারীকে সভ্য করিয়া একটি অনুসন্ধান-কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির চারিজন সভ্য হইলেন ইংরেজ এবং দুই জন সভ্য হইলেন ভারতীয়। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে কয়েক সহস্র মাত্র বিপ্লবীর বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ও বিপ্লব-প্রচেষ্টাই হইল 'অনু-সন্ধান-কমিটি'র অনুসন্ধানের প্রধান বিষয়বস্তু এবং এই নগণ্য সংখ্যক বিপ্লবীরাই হইল নূতন আইনের বহু-ঘোষিত উপলক্ষ। কিন্তু সমগ্রভাবে ভারতের ক্রমবর্ধ-মান স্বাধীনতা-সংগ্রাম চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলাই ছিল এই আইনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। কারণ, শাসকগণ সহজেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, গণ-সংগ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন বিপ্লবীরা ভারতের ইংরেজ-শাসনের পক্ষে যতখানি ভয়ের কারণ, তাহা অপেক্ষা বহু গুণ বেশী ভয়ের কারণ হইল যুদ্ধের ফলে নব জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণের স্বাধীনতা লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কা

হইতেই যে কুখ্যাত 'রাউলাট-আইনের' সৃষ্টি তাহা উক্ত অনুসন্ধান-কমিটির নিম্নোক্ত মন্তব্য হইতেই বুঝিতে পারা যায়ঃ—

"(ভবিষ্যতের) ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা আমাদের কর্তব্য নহে। কিন্তু একথা অবশ্যই আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বর্তমান যুদ্ধ একদিন শেষ হইবে, আমরা জানি না তখনকার অবস্থা কি দাঁড়াইবে, তখনকার অবস্থায় আবার কোন্ নূতন আশঙ্কা দেখা দিবে। ইহা ব্যতীত, এখন যারা 'ভারত-রক্ষা আইন'-এ আটক আছে তাহারা মুক্তি পাবে এবং বহু বিপজ্জনক আসামীর কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হইবে। ইহার উপর, সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবার পর, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের বহু সৈন্য দেশে ফিরিয়া যাইবে, তাহাদের মধ্যে বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলা খুব সহজেই সম্ভব হইবে। তথাপি 'ভারত-রক্ষা আইন'-এর প্রয়োগের দ্বারা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা এমন ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হইয়াছে যে তাহা আর কোনদিন দেখা দিবার সম্ভাবনা নাই বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু এসব আমাদের বিচার্য বিষয় নহে। সেই প্রচেষ্টা আবার শুরু হইতে পারে—ইহার ভিত্তিতেই আমরা এই রিপোর্ট তৈরী করিয়াছি।"(১)

বহু অনুসন্ধানের পর 'রাউলাট-কমিটি' গণ-সংগ্রাম ও বিপ্লব-প্রচেষ্টা দমনের জন্য দুই প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করেঃ—(১) অপরাধের জন্য অপরাধীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা (punitive) এবং (২) অপরাধ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বেই তাহা নিবারণের ব্যবস্থা (preventive)। প্রথম ব্যবস্থাটি সাধারণ আদালতের বিচারের পরিবর্তে 'ট্রাইবুনাল' প্রভৃতি দ্বারা সরাসরি বিচারের পদ্ধতির সুপারিশ করা হয়। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি সর্বাপেক্ষা বেশী ভয়ংকর। ইহা দ্বারা জনসাধারণের সকল নাগরিক অধিকার হরণের সুযোগ দেওয়া হয় এবং সরকার চরম স্বেচ্ছাচারী শাসন পরিচালনার আইনগত অধিকার লাভ করে। অনুসন্ধান-কমিটি এই নির্লজ্জ উক্তি দ্বারা এই অবৈধ ও মানবতা-বিরোধী ব্যবস্থার সাফাই গাহিবার চেষ্টা করেঃ—

"...আমরা অপরাধীদের শাস্তির ব্যবস্থা দ্বারা বিশেষ কোন সুফল আশা

(১) 'Sedition Committee Report', P. 195.

করি না। গোড়াতেই যদি সকল নেতাকে কারারুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করা না হয় তবে বাংলাদেশে যে ধরনের আন্দোলন দেখা দিয়াছিল সেই ধরনের আন্দোলন কেবলমাত্র অপরাধীদের শাস্তি দানের ব্যবস্থা দ্বারা দমন করা সম্ভব নয়। ইহা ব্যতীত, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করা বিভিন্ন কারণে বিশেষ অসুবিধা-জনক হইয়া পড়ে, আর যে সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করা খুবই কঠিন। শেষের অসুবিধাটি একটি মৌলিক অসুবিধা, ইহার কোন প্রতিকার নাই।"(১) অতএব বিনা বিচারে আটক রাখার ব্যবস্থাই সর্বাপেক্ষা বেশী সুবিধাজনক ও একমাত্র প্রতিকার হিসাবে গৃহীত হয়।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে 'রাউলাট-কমিটি' উহার অনুসন্ধানের ভিত্তিতে এই আইন প্রণয়নের সুপারিশ করে। ভারত-সরকার অবিলম্বে এই আইনের খসড়াটি ব্যবস্থা-পরিষদে উপস্থিত করিয়া উহা পাশ করাইবার চেষ্টা করে। খসড়াটি ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করিবামাত্র সারা ভারতবর্ষে ভীষণ প্রতিবাদ উঠিতে থাকে, কিন্তু ভারতের জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ১৯১৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে সরকারী সদস্যদের ভোটাধিক্যের জোরে ভারত-সরকার এই আইন পাশ করাইয়া লয়। ব্যবস্থা-পরিষদের প্রত্যেকটি নির্বাচিত ও মনোনীত ভারতীয় সদস্য এই আইনের তীব্র বিরোধিতা করিয়া এবং ইহার বিরুদ্ধে ভোট দিয়া স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণের ক্রোধ-বহ্নি হইতে ভারতের ইংরেজ-শাসনকে বাঁচাইবার জন্য এই ভারত-বিরোধী আইন পাশ হইয়া যায়। ইহার প্রতিবাদে ব্যবস্থা-পরিষদের সদস্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না, পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ পরিষদের সদস্যপদ ত্যাগ করেন।

আইনের খসড়াটি ব্যবস্থা-পরিষদে তুলিবার পূর্ব হইতেই সারা ভারতে প্রতিবাদ-আন্দোলনের ঝড় উঠিতেছিল। চরম ও নরম এই উভয়পন্থী নেতৃবৃন্দ সমস্বরে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করেন। এমন কি বোম্বাই-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি স্যার নারায়ণ চন্দ্রভারকার এই আইনকে

(১) 'Sedition Committee Report', P. 197.

"অনাবশ্যক" ও "অসঙ্গত" বলিয়া ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিলকের 'কেশরী' পত্রিকা ইহাকে "অত্যাচার-উৎপীড়নের দানবীয় যন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করে। লালা লাজপত রায় এই উপলক্ষে ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া বলেন যে, এই আইনের ফলেই আবার নূতন করিয়া বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুরু হইবে। মাদ্রাজের একটি সংবাদপত্রে লেখা হয় যে, যদি 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার' সন্তোষজনক না হয় তবে এই আইনের ফলে ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের বিদ্রোহের মতই আর একটা বিরাট বিদ্রোহ দেখা দিবে। নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তনে শাসকদের সহিত সকল প্রকার সহযোগিতার ঘোষণা সত্ত্বেও এই ভয়ংকর বিপদে গান্ধীজী নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার কয়েকজন সহযোগীর সহিত একত্রে সংবাদপত্র মারফত এক কঠিন শপথ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বলা হয় যে, যদি এই আইন পাশ করিয়া লওয়া হয় তবে তাঁহারা এই আইন এবং অন্য কোন কমিটি দ্বারা রচিত এই ধরনের অন্য আইন বৈধ উপায়ে অমান্য করিবেন।" উক্ত ঘোষণায় এই আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয়।(১)

'রাউলাট-আইন' পাশ হইবার ফলে জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। যে গণ-বিক্ষোভের আগুন এতদিন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল তাহাই এবার লক্ষ শিখা বিস্তার করিয়া সারা ভারতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। ভারতের জনগণ এবার নূতন শক্তিতে এক নূতন সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল। সেই সংগ্রামের আগুনে শাসকগোষ্ঠীর সহিত কংগ্রেসের সহযোগিতার ভিত্তি পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল এবং নেতৃবৃন্দ সহযোগিতার বাসনা ত্যাগ করিয়া সংগ্রাম পরিচালনার জন্য জনগণের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিলেন। সেই সংগ্রামের মধ্যে দেখা দিল এক নূতন নেতৃত্ব। সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়াই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নূতন নেতৃত্ব ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রথম দেখা দিল।

---

(১) Sir V. Lovett : 'History of Nationalist Movement', P. 201-202.

গান্ধীজীর নেতৃত্ব

১৯১৯ খৃস্টাব্দ ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বৎসর। একদিকে যুদ্ধ-জয়ের গর্বে গর্বিত ইংরেজ-রাজ 'রাউলাট-আইন' প্রভৃতি পাশবিক আইনে বলীয়ান হইয়া পূর্বাপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী জনগণের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রচণ্ড আঘাত হইতে স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ-শাসনকে সুরক্ষিত করিবার জন্য রুদ্র মূর্তিতে দেখা দেয়, অপর দিকে ভারতের সর্বশ্রেণীর জনগণ স্বেচ্ছাচারী ইংরেজ-রাজের শাসন ও শোষণের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রবেশ করে এবং সেই গণ-সংগ্রামকে সংগঠিত ও পরিচালিত করিবার জন্য গান্ধীজী এই প্রথম সেই সংগ্রামের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করেন। এতদিন কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল দেশের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ, গান্ধীজী গণ-সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের সেই ক্ষেত্রকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্ত করিয়া সর্বপ্রথম জনগণের মধ্যে প্রসারিত করেন।

গান্ধীজী ১৯১৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকায় গণ-সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং উক্ত বৎসর ভারতে পদার্পণ করেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের লইয়া স্থানীয় সরকারের জাতি-বৈষম্য ও বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া ইতি-পূর্বেই প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া তিনি প্রথমে ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতীয় জনগণ ও তাহাদের বিভিন্ন সমস্যার সহিত পরিচিত হন। এই সময়ে তিনি শান্তিনিকেতনে আসিলে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'মহাত্মা' আখ্যা দান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণের ফলে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেন তাহা হইতে তিনি উপলব্ধি করেন যে, কংগ্রেসকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডি হইতে মুক্ত করিয়া প্রকৃত গণ-প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে না পারিলে এবং জনগণের সংগ্রামে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলে কংগ্রেসের আন্দোলন জয়যুক্ত হইবে না। জাতীয়

সংগ্রামের নেতৃবৃন্দের মধ্যে তিনিই প্রথম শহর-কেন্দ্র হইতে গ্রামাঞ্চলের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেন এবং কেবলমাত্র শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পরিবর্তে গ্রামাঞ্চলের রোগ-দুঃখ-দুর্দশা-প্রপীড়িত কোটি কোটি মানুষকে জাতীয় সংগ্রামের প্রধান শক্তি বলিয়া গ্রহণ করেন।

১৯১৭ খৃস্টাব্দে বিহারের চাম্পারণ জিলার নীল-চাষীরা শত বৎসরের পুরাতন নীলকরদের অসহনীয় উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলে গান্ধীজী অবিলম্বে বিহারে উপস্থিত হন এবং নীল-চাষীদের বিদ্রোহের পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া নিজস্ব পন্থায় অহিংস সত্যাগ্রহের মারফত বিহার-সরকারকে দিয়া নীল-চাষ সম্পর্কে একটি তদন্ত-কমিটি বসাইতে সক্ষম হন। সেই তদন্ত-কমিটির সুপারিশের ফলে চাম্পারণ জিলার নীল-চাষ উঠিয়া যায়। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে আমেদাবাদের মিল-মালিকদের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে শ্রমিকগণ ধর্মঘট করিলে গান্ধীজী সেই ধর্মঘটও নিজস্ব পন্থায় পরিচালনা করিয়া শ্রমিক-সংগ্রামকে জয়যুক্ত করেন। ইহার পর তিনি গুজরাটের কৃষক-সংগ্রাম সত্যাগ্রহের পথে পরিচালনা করিয়া কৃষক-সমস্যা সম্পর্কেও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এই সত্যাগ্রহের ফলে কৃষকদের খাজনা মকুব হয়। এই সকল সংগ্রামের মধ্য দিয়া গান্ধীজীর প্রবর্তিত সত্যগ্রহের পন্থা ও তাঁহার নেতৃত্ব ক্রমশঃ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'রাউলাট-আইন'-এর খসড়া প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী ইহার বিরুদ্ধে তাঁহার নিজস্ব পন্থায় সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম শুরু করিবার সংকল্প ঘোষণা করেন।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের গণ-বিদ্রোহ

ভারতের সকল প্রদেশের জনসাধারণের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ভারত-সরকার 'রাউলাট-আইন' পাশ করাইবার চেষ্টা করে। এবার গান্ধীজী তাঁহার পূর্ব-ঘোষিত প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য অগ্রসর হন। আইন অমান্য করিয়া ভারতের পক্ষে চরম অবমাননাকর 'রাউলাট-আইন' প্রতিরোধ

করিবার সঙ্কল্প লইয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ-আফ্রিকার সত্যাগ্রহ-সংগ্রামের অভিজ্ঞতা অনুসারে ভারতব্যাপী গণ-সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯১৯ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'সত্যাগ্রহ লীগ' গঠন করেন। তাঁহার সংগ্রামের আহ্বান শহরে-শহরে, এমনকি গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ঘোষিত হয়। দেশের সমগ্র জনসাধারণ যেন পূর্ব হইতেই এই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। এই সর্বজনমান্য নেতার আহ্বানে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে এক অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দেয়। ইহার পূর্বে আর কোন জাতীয় নেতা তাহাদের নিকট এমন করিয়া সংগ্রামের আহ্বান জানায় নাই, ইহা তাহাদের নিকট অভিনব।

গান্ধীজীর আহ্বানে দলে দলে লোক সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর দিয়া আইন অমান্য করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। গান্ধীজী বুঝিলেন, এবার কাজ আরম্ভ করিবার সময় আসিয়াছে। তিনি ৬ই এপ্রিল ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালন করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ঐ দিন সারা ভারতে সাধারণ ধর্মঘট সফল করিয়া তুলিবার জন্য সর্বত্র জনসাধারণ উদ্যোগী হইয়া আয়োজন করিতে থাকে।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের এই দেশব্যাপী সংগ্রামের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। মহাযুদ্ধের সময়ের চরম আর্থিক দুর্দশার ফলে দেশের সকল শ্রেণী ও সকল সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল। তাহা সত্ত্বেও মহাযুদ্ধের পর স্বাধীনতা লাভের আশায় এতদিন জনসাধারণ কোনরূপে ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু বিজয়-গর্বে উদ্ধত শাসকশ্রেণীর নূতন নূতন উৎপীড়ন-ব্যবস্থায় তাহাদের আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পরাজিত তুরস্কের প্রতি বিজয়ী জাতিসমূহ, বিশেষ করিয়া ইংরেজ-শক্তির আচরণ মুসলিম জনসাধারণের বিক্ষোভ বহু গুণ বাড়াইয়া তোলে। গান্ধীজীর সংগ্রামের আহ্বান তাহাদের মধ্যেও বিদ্রোহের চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সাধারণ শত্রু ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। এত দিন যে শাসক-

গোষ্ঠী দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া নিজেদের অত্যাচারী শাসন অব্যাহত রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে, আজ তাহারা ইহা দেখিয়া আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়িল যে, "হিন্দু-মুসলমানের অভূতপূর্ব ঐক্য সংগ্রামের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের মিলন দীর্ঘ কালের জন্য জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে। এই সময়ের সাধারণ উত্তেজনার মধ্যে এমনকি নিম্নশ্রেণীর লোকেরাও পরস্পরের সহিত বাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া যাইতেছে। চারিদিকে মিলনের অভূতপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখা যাইতেছে। হিন্দু-মুসলমানেরা প্রকাশ্যে পরস্পরের হাত হইতে জল গ্রহণ করিতেছে। শোভাযাত্রার ধ্বনি, পতাকা ও প্রচার-পত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ঘোষিত হইতেছে। মুসলমানদের মসজিদের বেদী হইতে হিন্দু-নেতাদের প্রচার করিতে দেওয়া হইতেছে।"(১)

গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের তারিখ ঘোষণা করিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই 'রাউলাট-আইন' ব্যবস্থা-পরিষদে পাশ হইবার ফলে দিল্লীর জনসাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়। হাকিম আজমল খাঁ ও স্বামী শ্রদ্ধানন্দের নেতৃত্বে দিল্লীর জনসাধারণ ৩০শে মার্চ শহরে সাধারণ ধর্মঘট পালন করে। স্বেচ্ছাসেবকগণ শহরময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া দোকান-পাট বন্ধ করিবার সময় দুই জন স্বেচ্ছাসেবক পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইবামাত্র বিক্ষুব্ধ জনগণ ইহাদের মুক্ত করিবার জন্য দিল্লীর স্টেশনে সমবেত হইলে তাহাদের সহিত পুলিশ ও সৈন্যদলের সংঘর্ষ হয়। উন্মত্ত পুলিশ ও সৈন্যদল বেপরোয়াভাবে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে এবং দুই জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয়। জনতা কেবলমাত্র ইষ্টকখণ্ড সম্বল করিয়া বীরত্বের সহিত পুলিশ ও সৈন্যদলের সহিত যুদ্ধ করে। পুলিশ ও সৈন্যদল শহরের বিভিন্ন অংশে উন্মত্তের মত গুলি চালাইয়া এই গণ-বিক্ষোভ দমন করিবার চেষ্টা করে। ঐ দিনের এই সংঘর্ষে আট জন লোক নিহত ও প্রায় একশত জন আহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সাত দিন পর্যন্ত দিল্লীর সকল দোকানপাট, এমন কি

(১) 'India in 1919' (official publication).

রেল-চলাচলও বন্ধ থাকে। দিল্লীর এই বর্বরসুলভ হত্যাকাণ্ড সারা ভারতে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দেয়।

৩০শে মার্চ কেবল দিল্লীতেই নহে, পাঞ্জাবের অমৃতসর, মুলতান প্রভৃতি স্থানেও সাফল্যের সহিত ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। পাঞ্জাবের এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মুসলমান-নেতা ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচ্‌লু ও হিন্দু-নেতা ডাঃ সত্যপাল। ৪ঠা এপ্রিল পাঞ্জাব-সরকার এই দুই নেতার উপর কোন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা না দিবার আদেশ জারি করিয়া পাঞ্জাবের গণ-বিক্ষোভ শতগুণ বৃদ্ধি করে।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। ঐ দিন মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সারা ভারতবর্ষে সাধারণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ইহার পূর্বে কখনও একটি নির্দিষ্ট দিনে সারা ভারতবর্ষব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট হয় নাই। গান্ধীজীর সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বানে সারা ভারতের জনগণ যে অভূতপূর্ব সাড়া দেয় তাহাতে এমনকি এই আন্দোলনের নেতৃবৃন্দও বিস্ময়ে অভিভূত হন। আর শাসকগোষ্ঠী ইহা হইতে এক ভয়ংকর বিপদের সংকেত পাইয়া নূতন শক্তিতে বলীয়ান গণশক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য পশু-শক্তি লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়ে।

এদিকে দিল্লীর ৩০শে মার্চের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া গান্ধীজী ৮ই এপ্রিল বোম্বাই হইতে দিল্লী যাত্রা করেন। গান্ধীজীর আগমনের সংবাদে আতঙ্কিত হইয়া শাসকগণ পথিমধ্যে তাঁহার উপর দিল্লী ও পাঞ্জাবে প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া এক নোটিশ জারি করে। তিনি এই হুকুম মানিতে অস্বীকার করায় তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া একখানি স্পেশাল ট্রেনযোগে বোম্বাই শহরে লইয়া যাওয়া যায়। এই সর্বজনমান্য নেতার গ্রেপ্তার জনগণের বিদ্রোহের আগুনে ঘৃতাহুতিস্বরূপ হয়। সারা ভারতবর্ষের সকল শ্রেণীর মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশের সর্বত্র প্রবল উত্তেজনা দ্রুত বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গেই আমেদাবাদের মিল-

শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়ে। তাহারা আমেদাবাদের সরকারী দপ্তরগুলি আগুন দিয়া ভস্মীভূত করে। তাহাদের একদল টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ও টেলিগ্রাফ-অফিস ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইংরেজ-সাহেবগণ তাহাদের হাতে প্রহৃত হয় এবং প্রহারের ফলে একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ-সার্জেণ্ট নিহত হয়। ইহার পর শ্রমিকগণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসাধারণের সহিত মিলিত হইয়া রেলপথ তুলিয়া ফেলে ও দুইটি সৈন্যবাহী ট্রেন লাইন-চ্যুত করে। বিরামগাও নামক শহরে একজন উদ্ধত ভারতীয় সরকারী কর্মচারী উত্তেজিত জনতা দ্বারা অগ্নিদগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বোম্বাই শহরে গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ লীগ' নিষিদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ দেয়। শহরের রাস্তায় প্রকাশ্যে নিষিদ্ধ পুস্তক-পুস্তিকা বিক্রয় করা হইতে থাকে। কলিকাতার বহু স্থানে পুলিশের সহিত জনসাধারণের প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় ও তাহাতে কয়েক ব্যক্তি গুলির আঘাতে প্রাণ দেয়। জনতার আক্রমণে বহু পুলিশ-কর্মচারী গুরুতররূপে আহত হয়।

পাঞ্জাবের অবস্থা সর্বাপেক্ষা উগ্র আকার ধারণ করে। ১০ই এপ্রিল অমৃতসরে পাঞ্জাবের দুই জন শ্রেষ্ঠ নেতা ডাঃ কিচ্‌লু ও ডাঃ সত্যপালকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। এই দুই জনপ্রিয় নেতার গ্রেপ্তারের সংবাদে উত্তেজিত হইয়া তাঁহাদের মুক্ত করিবার জন্য জনসাধারণ দলে দলে ছুটিয়া আসে। এক বিরাট জনতা নেতাদের মুক্তির দাবি লইয়া ডেপুটি কমিশনারের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইলে পুলিশ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ইহার ফলে কুড়ি জন লোক নিহত ও প্রায় দেড়শত লোক আহত হয়। জনতা ক্রোধের বশে সরকারী দপ্তরগুলি ও ইংরেজ-সাহেবদের বাসস্থান আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে এবং টেলিগ্রাফ-অফিসটি ধ্বংস করিয়া ফেলে। পুলিশ আক্রমণরত জনতার উপর গুলি বর্ষণ করিয়া কয়েকজনকে হত্যা করে। জনতার একাংশ কয়েকটি রেলওয়ে-গুদামের উপর আক্রমণ করিয়া দুই জন ইংরেজ-গার্ডকে হত্যা করে এবং গুদামের সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। অমৃতসরের রেল-স্টেশনটিও তাহাদের আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। শহরের মধ্যে

উত্তেজিত জনতা ইংরেজদের 'ন্যাশনাল ব্যাংক'-এর উপর আক্রমণ করিয়া ব্যাঙ্কের সাহেব-কর্মচারীদের হত্যা ও ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করে। টাউন হল ও ভারতীয় খৃস্টানদের গীর্জাটি অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করা হয়। শহরের সর্বত্র ইংরেজ-সাহেবদের উপর আক্রমণ চলিতে থাকে। এই সকল ঘটনাস্থলেও পুলিশ বহুবার গুলিবর্ষণ করে এবং তাহার ফলে জনতার উত্তেজনা আরও বাড়িয়া যায়। তাহারা শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের টেলিগ্রাফের তার ও দীর্ঘ রেলপথ ধ্বংস করিয়া দেয় এবং কয়েকটি রেল-স্টেশন ভস্মীভূত করে। ১২ই এপ্রিল অমৃতসরের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্তভাব ধারণ করে।

অমৃতসরের এই বিদ্রোহ পাঞ্জাবের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক কেন্দ্র লাহোরের অবস্থাও অমৃতসরের মতই ভয়ংকর আকার ধারণ করে। ৬ই এপ্রিল লাহোরে ভীষণ উত্তেজনার মধ্যে পূর্ণ ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ৯ই তারিখ অন্যান্য বৎসরের মত এবারেও 'রাম-নবমী'র উৎসব-উপলক্ষে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। কিন্তু ইহাতে ধর্মের পরিবর্তে রাজনৈতিক প্রচারই প্রাধান্য লাভ করে। 'হিন্দু-মুসলমান ঐক্য' ও 'প্রত্যক্ষ-সংগ্রামের' ধ্বনি সহকারে শোভাযাত্রা সারা শহর পরিভ্রমণ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চার করে। ১০ই এপ্রিল গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও অমৃতসরের ঘটনার সংবাদ আসিয়া পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে শহরবাসীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেখিতে না দেখিতে সারা শহরের দোকানপাট ও কাজকর্ম বন্ধ হইয়া যায়। জনসাধারণ নিরবচ্ছিন্ন ধর্মঘটের দাবি জানাইতে থাকে। সন্ধ্যার দিকে এক বিরাট জনতা ইংরেজ-সাহেবদের বাসস্থান আক্রমণ করে এবং টেলিগ্রাফ-অফিস ও অন্য কয়েকটি সরকারী অফিস ধ্বংস করিয়া ফেলে। পুলিশ উন্মত্তের মত জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। ইহার ফলে বারো জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয়।

১২ই এপ্রিল সকালবেলা লাহোরের বিখ্যাত মসজিদে হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সভায় এই হত্যা, গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও অমৃতসরের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্ত গৃহীত

হয়। সভার পরে জনতা বিভিন্ন অংশে ভাগ হইয়া শহরের বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও সরকারী সম্পত্তির উপর আক্রমণ চালাইতে থাকে। শহরের সর্বত্র সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর প্রতিকৃতি এবং ইংরেজ-শাসনের সকল প্রতীক-চিহ্ন ভস্মীভূত করে। ১২ই হইতে ১৪ই পর্যন্ত শহরের সর্বত্র সৈন্যদলের সহিত জনতার বহু সংঘর্ষ ঘটে এবং গুলিবর্ষণের ফলে বহু লোক হতাহত হয়। ১৫ই এপ্রিল লাহোরে 'সামরিক আইন' জারি হয়।

অমৃতসরের নিকটবর্তী কাসুর নামক শহরের অবস্থাও অমৃতসর ও লাহোরের মতই ভয়ংকর আকার ধারণ করে। গান্ধীজীর গ্রেপ্তার এবং দিল্লী, অমৃতসর ও লাহোরের হত্যাকাণ্ডের সংবাদে উত্তেজিত হইয়া শহরের জনসাধারণ শহরতলীর রেল-স্টেশনটি সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া ফেলে। ঐ সময় একখানি ট্রেন আসিয়া পৌছিলে উত্তেজিত জনতা দুই জন পুলিশ-কর্মচারী ও দুই জন ইংরেজ অফিসারকে ট্রেন হইতে টানিয়া নামাইয়া হত্যা করে। তাহাদের প্রহারে এক জন ইংরেজ রেল-কর্মচারী ও অন্যান্য বহু ইংরেজ-আরোহী গুরুতররূপে আহত হয়। ইহার পর শহরের পোস্ট-অফিস ও আদালত-ভবনটি অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করা হয়। পুলিশের সহিত জনতার বহু খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং বহুলোক গুলির আঘাতে নিহত হয়।(১)

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড

পূর্ব হইতেই অমৃতসর একটি রীতিমত যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ১১ই এপ্রিল হইতে সৈন্যদলের উপর অমৃতসরের শান্তিরক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং জেনারেল ডায়ার একটি সৈন্যদল লইয়া অমৃতসরে উপস্থিত হন। ১৩ই এপ্রিল এক সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে সভা-সমিতির অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করা হয়, কিন্তু সেই বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের মধ্যে যথোচিত প্রচারের কোন ব্যবস্থাই হইল না। ঐ

---

(১) All these accounts of the 'disturbances' have been taken from the semi-official publication 'History of the Nationalist Movements in India' by Verney Lovett.

দিবস অপরাহ্নে জালিয়ানওয়ালাবাগে লালা কানাইয়ালালের সভাপতিত্বে এক জনসভার আয়োজন হয়। এই সংবাদ শুনিয়াও জেনারেল ডায়ার এই জনসভা বন্ধ করিবার কোন চেষ্টাই করিলেন না, বরং ইহাকে "অবাধ্য ভারতীয়দের" শাস্তিদানের সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করিবার সিদ্ধান্ত করেন।

১৩ই এপ্রিল ছিল বৈশাখী মেলার দিন। এই মেলা উপলক্ষে অমৃতসর-অঞ্চলের গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে বহু চাষী অমৃতসরে মেলা দেখিবার জন্য আসিয়াছিল। তাহারা বহু সংখ্যায় জালিয়ানওয়ালাবাগের জনসভায় উপস্থিত হয়। সভা আরম্ভ হইবার সময় অন্ততঃ দশ হাজার লোক বাগের মধ্যে সমবেত হইয়াছিল। এই জনসমাবেশে বহু বৃদ্ধ, নারী, বালক, এমনকি শিশুও ছিল।

যথারীতি সভা সুরু হইবামাত্র প্রায় ৫০ জন সৈন্যসহ জেনারেল ডায়ার বাগের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাগের প্রবেশ-নির্গমনের প্রধান পথটি অবরোধ করিয়া সৈন্যেরা একটি উচ্চস্থানে সামরিক পদ্ধতিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইবামাত্র সেনাপতি ডায়ার জনতার উপর গুলি চালনার আদেশ দেন। প্রায় দশ মিনিট কাল বৃষ্টিধারার মত গুলি বর্ষিত হয়। সৈন্যেরা যে স্থানে জনতার ভিড় দেখিয়াছে সেইখানেই বেশী গুলি ছুড়িয়াছে। লোকেরা শুইয়া পড়িয়াও নিস্তার পায় নাই, সৈন্যেরা উচ্চস্থান হইতে তাহাদের উপর তাক করিয়া গুলি ছোঁড়ে। অবিশ্রান্তভাবে ষোল শত রাউণ্ড গুলি বর্ষণ করা হয়। শত শত যুবক, বৃদ্ধ, নারী, বালক ও শিশু গুলিবিদ্ধ হইয়া ভূমিশয্যা গ্রহণ করে। বহু লোক ভিড়ের চাপে পদতলে পিষ্ট হইয়াও প্রাণ হারায়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহার বিবৃতিতে এই হত্যাকাণ্ডের যে ভয়ংকর দৃশ্য বর্ণনা করেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল:—

"মৃতদেহগুলি বিভিন্ন স্থানে গাদা হইয়া পড়িয়াছিল। বহু লোক আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজে সেইগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। মৃতদেহগুলির মধ্যে বহু বৃদ্ধ, যুবক, বালক ও শিশুর মৃতদেহ ছিল। বাগের ছোট গেটগুলির দুইদিকে বহু মৃতদেহ পড়িয়াছিল, মৃতদেহগুলি ছিল বাগের সর্বত্র ছড়ান। অনেকের মাথায় গুলি লাগিয়াছে, অনেকের চক্ষু বিদ্ধ হইয়াছে,

কাহারও নাসিকা, কাহারও বক্ষ ভেদ করিয়া গুলি বাহির হইয়াছে। বাগের দৃশ্য অতি ভয়ংকর।...মনে হইল, মৃতদেহের সংখ্যা হাজারের উপর হইবে।" (১) সরকারী হিসাবে ৩১৯ জন ও বে-সরকারী হিসাবে প্রায় একহাজার লোক গুলির মুখে প্রাণ দেয়। সরকারী হিসাবেই আহতের সংখ্যা ছিল দেড় হাজার।

এইভাবে প্রায় দশ মিনিটকাল অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণের দ্বারা জালিয়ানওয়ালা-বাগের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড সুসম্পন্ন করিয়া ইংরেজ-সেনাপতি ডায়ার সদর্পে সসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন, এমনকি আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তাবোধও তাহার হইল না। এদিকে সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই 'সান্ধ্য আইন' জারি হইল, রাত্রি ৮টার পর কাহারও ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই। বাগের মধ্যে পতিত হতভাগ্য আহত ব্যক্তিদের দেখিতে আসা তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের পক্ষে সম্ভব হইল না। বৈশাখের দারুণ গ্রীষ্মে এক ফোটা জলের অভাবে বহু আহত লোক তৃষ্ণায় ছটফট করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল।

ইহার পর পাঞ্জাবে যে বিভীষিকার রাজত্ব শুরু হয় তাহাও জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের মতই সমান পৈশাচিক। ১৫ই এপ্রিল লাহোর ও অমৃতসরে সামরিক আইন জারি হয়। ১৬ই তারিখ গুজরানওয়ালা শহরও সামরিক আইনের কবলে চলিয়া যায় এবং ১৯শে ও ২৪শে এপ্রিল আরও কয়েকটি শহরে এই বর্বরসুলভ আইন চালু করা হয়।

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার সকল উপায়ে এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। এমনকি কংগ্রেস-কমিটির নেতৃবৃন্দও দীর্ঘ চারি মাস পরে এই সংবাদ কেবলমাত্র লোকমুখে গুজব হিসাবে শুনিতে পান। আট মাস পর্যন্ত এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ বৃটিশ-পার্লামেণ্ট ও বৃটিশ-জনসাধারণকে সরকারীভাবে জানান হয় নাই। পাঞ্জাবের গুরুতর অবস্থার সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া 'দীনবন্ধু' এণ্ডরুজ পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টা করিবামাত্র তাঁহাকে গ্রেপ্তার

(১) Lala Giridharilal's statement to the Hunter Committee'.

করা হয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও পাঞ্জাব প্রবেশের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন।

এদিকে পাঞ্জাবের বিভিন্ন শহরে অমানুষিক উৎপীড়ন ও হত্যাকাণ্ড সমান ভাবেই চলিতে থাকে। পাঞ্জাবের নেতাদের দলে দলে নির্বাসিত ও আটক করা হয়, ছাত্র ও শিক্ষকগণ দলে দলে কারারুদ্ধ হয়; অমৃতসরের একটি রাস্তায় জনসাধারণকে বুকে হাঁটিতে বাধ্য করা হয়; জনসাধারণকে প্রকাশ্যে নগ্ন করিয়া বেত্রাঘাত, বদ্ধ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রৌদ্রে দাঁড় করিয়া রাখা প্রভৃতি বর্বর-সুলভ উৎপীড়ন চলিতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতি ব্যঙ্গ করিবার জন্য একজন হিন্দুর সহিত একজন মুসলমানকে হাতকড়ি দিয়া আবদ্ধ রাখা হয়। (১)

পরে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পরিচালিত মামলার রেকর্ড হইতে জানা যায় যে, গোলযোগের সহিত জড়িত বলিয়া সন্দেহ হইবামাত্র সাধারণ লোকদের গ্রেপ্তার করিয়া দলবদ্ধভাবে গুলি করিয়া হত্যা, নির্বিচারে ফাঁসী, আকাশ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া ব্যাপক নরহত্যা ও ধ্বংসকার্য চালান হয় এবং অভিযুক্ত সকল ব্যক্তিকে পাইকারীভাবে "অস্বাভাবিকরূপে" দীর্ঘ কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কেবলমাত্র অমৃতসরের সামরিক আদালতে ২৯৮ জনকে অভিযুক্ত করা হয় এবং নামমাত্র বিচারের পর ৫১ জনের ফাঁসী, ৪৬ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, দুই জনের ১০ বৎসর, ৭৯ জনের ৭ বৎসর, ১০ জনের ৫ বৎসর এবং ১৩ জনের ৩ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়।

পরে যখন সকল সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়ে তখন সারা ভারতের মানুষ ক্ষোভে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। এই বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়ন সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত করিয়া অত্যাচারীদের বিচারের জন্য দেশব্যাপী দাবি উঠিতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ নিজেরাই উদ্যোগী হইয়া একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করেন। অবশেষে দেশব্যাপী আন্দোলন ও কংগ্রেস তদন্ত-কমিটির প্রচারের ভয়ে ভারত-সরকারও একটি তদন্ত-কমিটি বসাইতে বাধ্য হয়। এই

(১) Facts taken from the statements to the 'Hunter-Committee'.

কমিটিই উহার প্রেসিডেণ্ট লর্ড হাণ্টারের নামানুসারে 'হাণ্টার-কমিটি' নামে পরিচিত। সরকারী তদন্ত-কমিটির নিকট প্রদত্ত বিভিন্ন বিবৃতি হইতে পাঞ্জাবে সামরিক উৎপীড়নের লোমহর্ষক ঘটনাবলী প্রকাশ হইয়া পড়ে। কিন্তু সরকারী তদন্ত-কমিটি পাঞ্জাব-সরকার ও সামরিক কর্মচারীদের অপরাধ ছোট করিয়া দেখাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। বিলাতের লর্ড-সভার সদস্যগণ ও ভারতের ইংরেজ-সাহেবগণ জেনারেল ডায়ারের সাহসিকতার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে ২০ হাজার পাউণ্ড চাঁদা তুলিয়া দেয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও সর্বত্র পাঞ্জাবের অনুষ্ঠিত পাশবিক উৎপীড়নের সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার সরকারী 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করিয়া ইহার প্রতিবাদ করেন। ইহার প্রতিবাদে এমন কি মাদ্রাজ-হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি সুব্রাহ্মনীয় আয়ার তাঁহার সরকারী 'কে-সি-এস-আই' খেতাব ত্যাগ করেন এবং উদারনীতিবাদী স্যার শঙ্করণ নায়ার বড়লাটের 'একজিকিউটিভ কাউন্সিল' হইতে পদত্যাগ করিয়া প্রতিবাদ জানান।

(৩)

জাতীয় সংগ্রামের নূতন রূপ

সংগ্রাম বন্ধের সিদ্ধান্ত

সারা পাঞ্জাবে যখন একদিকে ইংরেজ-রাজের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়ন এবং অপরদিকে তাহার বিরুদ্ধে জনগণের প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছিল তখন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের জনসাধারণ ৬ই এপ্রিলের অভূতপূর্ব সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া নূতন সংগ্রাম শুরু করিতে উদ্যত হয়। পাঞ্জাবের ঘটনাবলী অপ্রকাশিত থাকিলেও ইতিমধ্যে দিল্লী, আমেদাবাদ, বোম্বাই ও কলিকাতার জনসাধারণের নূতন সংগ্রাম-পদ্ধতি ও বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপ সারা ভারতের

জনসাধারণকে নূতন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণ নূতন শক্তিতে বলীয়ান হইয়া ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায়। ইংরেজ-শাসকগোষ্ঠির মুখপাত্র ইংরেজ-ঐতিহাসিক ভ্যালেন্টাইন চিরোল পাঞ্জাব ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের এই গণ-সংগ্রামকে "সংগঠিত বিদ্রোহ" আখ্যা দিয়া বলিয়াছেন: "এই আন্দোলন বৃটিশ-রাজের বিরুদ্ধে সংগঠিত বিদ্রোহের অনস্বীকার্যরূপ গ্রহণ করিয়াছিল।"(১) আর ঐতিহাসিক গারাট ও টমসনের মতে "অমৃতসর (অমৃতসরের ঘটনা) ভারত-বৃটিশ সম্পর্কের ইতিহাসে সিপাহী-বিদ্রোহের সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি যুগ-সন্ধিক্ষণ নির্দেশকারী ঘটনা হইয়া থাকে।"(২)

এদিকে আন্দোলনের "অনস্বীকার্য রূপ" দেখিয়া ইহার পরিচালকগণ ইহাকে আর অগ্রসর হইতে না দিয়া অবিলম্বে বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই আন্দোলনের প্রধান পরিচালক স্বয়ং গান্ধীজী ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে গণ-সংগ্রামের প্রথম ও প্রধান পথপ্রদর্শক হইলেও তিনি নিজেও গণ-সংগ্রামের এই বৈপ্লবিক চরিত্র গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি চাহিয়াছিলেন, জনগণকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া তাহাদের সংগ্রামকে অহিংস সত্যাগ্রহের পথে পরিচালিত করিতে। ইহাই তাঁহার নিজস্ব সংগ্রাম-পদ্ধতি।

এই দুইটি উদ্দেশ্যের প্রথমটিতে গান্ধীজী অভাবনীয় সাফল্য লাভ করেন। গান্ধীজীর আহ্বানে ভারতের লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দেয়। কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। গান্ধীজী তাঁহার সংগ্রামের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ জনগণের ক্রিয়াকলাপ তাঁহার পরিকল্পিত অহিংস সত্যাগ্রহের সুনির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারেন নাই। ইংরেজ-শাসকদের শোষণ ও উৎপীড়নে উন্মত্ত জনগণ

(১) Sir Valentine Chirol : 'India, Old & New,' P. 207.

(২) Garrat & Thomson ; 'Rise & Fulfilment of British Rule in India.' P. 609.

সংগ্রামের আহ্বান শুনিবামাত্র সত্যাগ্রহের কঠোর নিয়মের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া বাঁধা-ভাঙ্গা প্রবল জলস্রোতের মত বিদ্রোহের পথে ধাবিত হয়।

দিল্লী, কলিকাতা, আমেদাবাদ, বোম্বাই ও অন্যান্য স্থানের ঘটনাবলী গান্ধীজীকে শঙ্কিত করিয়া তোলে। তিনি ১৩ই এপ্রিল, অর্থাৎ সাধারণ ধর্মঘটের মাত্র এক সপ্তাহ পর, সত্যাগ্রহ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া উহার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, সত্যাগ্রহীদের উপযুক্ত শিক্ষার পরিবর্তে কেবলমাত্র তাহাদের শুভ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া তিনি "হিমালয় পর্বতের মত বিরাট এক ভুল করিয়াছেন। এই ভুলের জন্যই প্রতিহিংসাপ্রবণ ব্যক্তিরা যাহারা কোন ক্রমেই প্রকৃত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধকারী নহে তাহারা সর্বত্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে।"(১) অকস্মাৎ সংগ্রাম বন্ধের সিদ্ধান্তের ফলে সারা ভারতের জনগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। তাহারা প্রধান নেতার সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান সাফল্যমণ্ডিত করিয়া সবেমাত্র নূতন পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু করিতে উদ্যত হইয়াছিল। অকস্মাৎ সংগ্রাম বন্ধের সিদ্ধান্তের ফলে তাহাদের মধ্যে হতাশা দেখা দেয়। কিন্তু যে কারণেই হউক, তখনকার মত সত্যাগ্রহ বন্ধ করা হইলেও, পর বৎসর, অর্থাৎ ১৯২০ খৃস্টাব্দে এবং তাহার পরেও কয়েকবার জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধাররূপে গান্ধীজীকেই এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম শুরু করিতে হইয়াছিল।

১৯১৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। যে অমৃতসর ভারতে বৃটিশ-শাসনের বর্বরতার জ্বলন্ত প্রমাণ ও জনসাধারণের চির-বিক্ষোভের কারণ হইয়া আছে, কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের সেই বিক্ষোভের স্বীকৃতি হিসাবে সেই অমৃতসরকেই অধিবেশনের স্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করেন। এই অধিবেশনে কংগ্রেসের প্রায় সকল নেতা সংগ্রাম বন্ধ রাখিয়া 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার' কার্যকরী করিবার জন্য শাসকদের সহিত সহ-যোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করেন। গান্ধীজী এই উদ্দেশ্যে "শান্তি বজায় রাখিয়া কাজ করিবার" পরামর্শ দান করেন। একমাত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস এই

(১) Quoted from R. P. Dutt's 'India Today', P. 316

প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করিয়া অব্যাহত ভাবে গণ-সংগ্রাম চালাইবার প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু প্রায় সকল নেতা শাসন-সংস্কার কার্যকরী করিবার প্রস্তাব সমর্থন করায় সেই প্রস্তাবই গৃহীত হয় এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হয়।

নব জাগরণ

কিন্তু "শান্তি বজায় রাখিয়া" শাসন-সংস্কার কার্যকরী করা নেতাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। ইতিমধ্যেই ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া ১৯১৯ খৃস্টাব্দের সংগ্রাম অপেক্ষা আরও একটা বিরাট গণ-সংগ্রামের ঝড় উঠিতে শুরু করিয়াছে, ইতিমধ্যেই সেই ঝড়ের প্রচণ্ড ঝাপ্টায় কংগ্রেস-নেতাদের "শান্তি বজায় রাখিয়া কাজ করিবার" স্বপ্ন ধূলিসাৎ হইয়া যাইতেছে। নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করিয়া গণ-সংগ্রামের পথ-প্রদর্শক গান্ধীজী শাসন-সংস্কার কার্যকরী করিবার প্রস্তাব স্থগিত রাখিয়া দেশবন্ধু দাস, মতিলাল নেহেরু, লাজপত রায় এবং মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি প্রভৃতি খিলাফৎ-আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সহিত সেই গণ-সংগ্রামের পুরোভাগে স্থান গ্রহণ করিলেন।

১৯১৯ খৃস্টাব্দে যে গণ-সংগ্রামের জোয়ার বহিয়াছিল তাহা ১৯২০ ও ১৯২১ খৃস্টাব্দে আরও উদ্দাম বেগে অগ্রসর হইয়া নেতৃবৃন্দের সকল দ্বিধা ও অনিচ্ছা ভাসাইয়া লইয়া যায়। ১৯২০ খৃস্টাব্দের শেষদিকে এক প্রচণ্ড আর্থিক সংকট শুরু হয়, সেই আর্থিক সংকটের চাপে অস্থির হইয়া ভারতের প্রত্যেকটি শ্রেণী আরও অধিক সংখ্যায় সেই গণ-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ১৯২০ খৃস্টাব্দের প্রথম ছয় মাসে দুই শতাধিক শ্রমিক-ধর্মঘটে পনের লক্ষাধিক শ্রমিক অংশ গ্রহণ করিয়া সেই গণ-সংগ্রামের তীব্রতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

খিলাফৎ আন্দোলন

এবারের এই নূতন গণ-জাগরণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দেশব্যাপী মুসলমান-জনসাধারণের অংশ গ্রহণ। একদিকে গভীর আর্থিক সংকট আর অপর

দিকে তুরস্কের প্রতি বৃটিশের অবিচার ও আক্রোশমূলক ক্রিয়াকলাপ ভারতের শহর ও গ্রামাঞ্চলের বিপুল মুসলিম জনসংখ্যার মধ্যে তীব্র বৃটিশ-বিরোধী মনোভাব জাগাইয়া তোলে। মহাযুদ্ধে জার্মানদের পক্ষে তুরস্কের যোগদানের প্রতিশোধ গ্রহণ ও মধ্যপ্রাচ্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ফরাসী-বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধের পর বিশাল তুর্ক-সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা করিয়া নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লয় এবং তুর্কী-সম্রাট খলিফার ক্ষমতা বিশেষভাবে খর্ব করে। মহাযুদ্ধের সময় হইতেই বৃটিশ-শক্তি সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লইয়া মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম-রাষ্ট্রগুলির প্রতি উৎপীড়ন শুরু করে। ইহার ফলে যুদ্ধের সময় হইতে সমগ্র মুসলিম-জগৎ বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন চালাইতে থাকে এবং ভারতবর্ষের মুসলমানরাও ইহাতে যোগদান করে। যুদ্ধের পর তুর্ক-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড করিয়া আত্মসাৎ ও খলিফার ক্ষমতার খর্ব করিবার সঙ্গে সঙ্গে সারা দুনিয়ার মুসলমানদের সহিত একযোগে ভারতের মুসলমানরাও এক প্রচণ্ড বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু করিয়া দেয়। এই আন্দোলনই 'খিলাফৎ-আন্দোলন' নামে প্রসিদ্ধ। বিদেশী শাসনের বন্ধন ছিন্ন করিয়া মুসলমানদের নিজস্ব শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ছিল খিলাফৎ-আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। ভারতবর্ষে এই খিলাফৎ-আন্দোলন এবার জাতীয় আন্দোলনের সহিত মিলিত হইয়া দেশব্যাপী এক দুর্বার বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রাম গড়িয়া তোলে। ১৯১৯ খৃস্টাব্দের শেষভাগে সর্বজনমান্য মুসলমান-জননায়ক মহম্মদ আলি ও সৌকৎ আলি জেল হইতে মুক্তি পাইয়া এই খিলাফৎ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস-পরিচালিত জাতীয় সংগ্রামের সহিত খিলাফৎ-আন্দোলনকে সংযুক্ত করেন।

মহম্মদ আলির যোগ্য নেতৃত্বে খিলাফৎ-আন্দোলন একটা বিরাট শক্তিশালী আন্দোলনরূপে গড়িয়া উঠে। মহম্মদ আলি ও অন্যান্য মুসলিম নেতৃবৃন্দ সারা ভারতের মুসলমান-জনসাধারণকে এই আন্দোলনের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাহাদের এক নূতন জঙ্গী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলেন। ১৯২০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে এক আপসহীন সংগ্রামের ঘোষণা লইয়া 'খিলাফৎ মেনিফেস্টো' বাহির হয় এবং বৃটিশ-শাসকগণ অবিলম্বে মুসলিম স্বার্থ-

বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বন্ধ না করিলে কি ভীষণ পরিণতি হইবে তাহা বৃটিশ-জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য একদল মুসলিম-প্রতিনিধি লইয়া ফেব্রুয়ারী মাসে মহম্মদ আলি ইংলণ্ডে গমন করেন।

মুসলমান-জনসাধারণ তাহাদের এই মুক্তি-সংগ্রামে একক নহে, তাহারা হিন্দু-জনসাধারণের নিকট হইতে পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করিতে থাকে। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ খিলাফৎ-নেতাদের পাশে দাঁড়াইয়া হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়া তুলিতে শুরু করেন। গান্ধীজী তাঁহার বিপুল অভিজ্ঞতা লইয়া মুসলিম-জনসাধারণের এই সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াইলেন। মুসলমানদের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম সহানুভূতি ও সহযোগিতার জন্য তিনি মুসলমান-জনসাধারণের নিকট হইতে অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা লাভ করেন। মহাত্মা গান্ধী এখন আর কেবল কংগ্রেস ও হিন্দু-জনসাধারণের নেতা নহেন, এখন তিনি মুসলমান-জনসাধারণ এবং খিলাফৎ-আন্দোলনেরও নেতা। গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই আন্দোলনের মধ্যে দেখিতেছেন "হিন্দু মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করিবার এমন একটা সুযোগ যাহা একশত বৎসরের মধ্যেও হয়ত পাওয়া যাইবে না।"(১) গান্ধীজী অবিলম্বে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অগ্রসর হইলেন।

১৯২০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে একখানি ঘোষণা-পত্র বাহির করিয়া গান্ধীজী মুসলমানদের খিলাফৎ-আন্দোলনের দাবির ন্যায্যতা ঘোষণা করেন। তিনি মুসলমানদের দাবি ও সংগ্রাম সমর্থন করিবার জন্য হিন্দুদের আহ্বান করিয়া বলেন যে, খিলাফতের প্রশ্ন আজ শাসন-সংস্কার এবং অন্যান্য সকল সমস্যাকে পিছনে ফেলিয়াছে, খিলাফতের প্রশ্নের সমাধান ব্যতীত অন্য কোন সমস্যারই সমাধান সম্ভব হইবে না। এই সময় মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অবিলম্বে খিলাফৎ ও জাতীয় আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন।

(১) W. C. Smith: 'Modern Islam in India', P. 229.

১৯২০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী ও মৌলানা আজাদ একত্রে মিলিয়া অসহযোগ-আন্দোলনের কর্মসূচী তৈরী করেন এবং ঐ মাসেই ইহা কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটি দ্বারা গৃহীত হয়। মে মাসে খিলাফৎ কমিটিও এই কর্মসূচী গ্রহণ করে। জুন মাসে এলাহাবাদ শহরে কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতারা এক বৈঠকে মিলিত হইয়া এই কর্মসূচী অনুমোদন করেন। আগস্ট মাসে তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করিবার জন্য বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি 'সেভার্স-এর চুক্তি' সম্পন্ন করে। ইহার ফলে ভারতের মুসলমানদের বৃটিশ-বিরোধী সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা দৃঢ়তর হইয়া উঠে। সারা ভারত জুড়িয়া এক বিরাট গণ-সংগ্রাম আসন্ন বুঝিয়া সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর পূর্বোক্ত ঘোষণা-পত্রের ভিত্তিতে এক নূতন সংগ্রামের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে পাশ হইয়া যায়। এই প্রস্তাবে সংগ্রামের যে নীতি ঘোষণা করা হয় সেই নীতি হইবে "যে পর্যন্ত অবিচারমূলক বিষয়গুলির (খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের উপর অত্যাচারের) সুবিচার এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইবে সেই পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত পর্যায়ক্রমিক অহিংস অসহযোগ"-এর নীতি। খিলাফৎ-কমিটিও পূর্বেই মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং "এইভাবে ভারতের 'জাতীয়তাবাদ' ও 'খিলাফৎবাদ' অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হইল এবং এখন 'জাতীয়তাবাদ' ও 'খিলাফৎবাদ' সমগ্র দেশের যুগ্ম আদর্শ বলিয়া সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হইল।" অক্টোবর মাসে প্রতিনিধিদলসহ মহম্মদ আলি ইংলণ্ড হইতে হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি সমগ্র মুসলমান-জনসাধারণের নিকট আবেদন করিয়া বলেন, "ভারতের মুক্তির জন্য হিন্দুদের সহিত মুসলমানদের হাত মিলাইতে হইবে, কারণ ভারতবর্ষ বিদেশী শাসনের কবল হইতে মুক্ত না হইলে খিলাফৎ-স্বাধীনতা অসম্ভব।"(১)

(১) All quotations taken from W. C. Smith's 'Modern Islam in India', P. 229-31.

এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। এই অভূতপূর্ব সংগ্রামে হিন্দু-মুসলমান জনগণ সমান অংশ গ্রহণ করিতে থাকে এই সময়ে খিলাফৎ-এর মুক্তির বাণীদ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের প্রায় পাঁচ লক্ষ মুসলমান তাহাদের ভয়ংকর দারিদ্র্য ও বৃটিশ-উৎপীড়নের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী মুসলমান-রাজ্য আফগানিস্থানে পলায়নের চেষ্টা করে। কেবলমাত্র আঠার হাজার মুসলমান 'মুজাহিড়' (মুক্তিকামী) হিসাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থানে উপস্থিত হইতে সক্ষম হয়। সীমান্ত অতিক্রম করিবার সময় সীমান্ত-রক্ষী সৈন্যদলের সহিত ভীষণ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের বহু লোক হতাহত হয়। আফগান-সরকার ভারত-সরকারের চাপে তাহাদের আফগানিস্থান প্রবেশ বন্ধ করিলে তাহাদের একটা অংশ সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েৎ যুনিয়নে প্রবেশ করে এবং বেশীরভাগ 'মুজাহিড়' ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসে।

নূতন সংগ্রামের আয়োজন

১৯১৯ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গণ-সংগ্রাম হঠাৎ বন্ধ হইবার ফলে সারা দেশময় যে হতাশা দেখা দিয়াছিল তাহা দেশব্যাপী আর্থিক সংকট ও সরকারী উৎপীড়নের চাপে দ্রুত কাটিয়া যায় এবং আবার সারা দেশে সংগ্রামের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতে থাকে। ইতিমধ্যে ভয়ংকর আর্থিক সংকট ও মহামারীতে দেশের মধ্যে হাহাকার উঠে, পাঞ্জাবের অমানুষিক হত্যাকাণ্ড ও উৎপীড়নের কোন প্রতিকার এখনও হয় নাই, সারা দুনিয়ার মুসলমানদের কেন্দ্রস্বরূপ তুরস্কের দখলভুক্ত অঞ্চলসমূহ সাম্রাজ্যবাদীরা গ্রাস করিয়া লইয়াছে এবং মুসলমান-জনসাধারণ বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তে ভয়ংকর উৎপীড়ন সহ্য করিতেছে। ভারতের বৃটিশ-শাসনের অবসান ও 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা দ্বারাই কেবল এই সকল অনাচার দূর করা সম্ভব। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ সেই

উদ্দেশ্য লইয়া এক চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইল। "হিন্দু-মুসলমান কি জয়" ধ্বনিতে ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল।

সর্বজনমান্য নায়ক মহাত্মা গান্ধী এই অভূতপূর্ব গণ-জাগরণে চঞ্চল হইয়া ইতিমধ্যেই শাসন-সংস্কার কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন, এই মহানায়ক আবার গণ-সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া সমগ্র দেশের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। ১৯২০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই তিনি হিন্দু-জনগণের 'স্বরাজ'-এর দাবি ও মুসলমান-জনগণের 'খিলাফৎ'-এর দাবি এবং এই দুই সংগ্রামের উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এইভাবে সমগ্র দেশ জুড়িয়া এক বিরাট সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিল, "হিন্দু-মুসলমান কি জয়" ধ্বনি সেই সংগ্রামকে শতগুণ শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

১৯২০ খৃস্টাব্দের ২২শে জুন খিলাফৎ-কমিটি বড়লাটের নিকট এক চরমপত্র প্রেরণ করে। সেই চরমপত্রে বলা হয় যে, ১লা আগস্টের মধ্যে তুরস্কের প্রতি সুবিচারের ব্যবস্থা না হইলে সারা ভারতের মুসলমানগণ অসহযোগ-আন্দোলন শুরু করিবে। ঐ তারিখে গান্ধীজীও বড়লাটের নিকট এক পত্রদ্বারা খিলাফৎ-আন্দোলনের ন্যায্যতা এবং তিনি কেন এই আন্দোলন সমর্থন করিতেছেন তাহার কারণ ব্যাখ্যা করেন। ১লা জুলাই গান্ধীজী স্বয়ং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে বড়লাটের নিকট এক চরমপত্র দান করেন। ৩১শে আগস্ট খিলাফতীরা অসহযোগ আন্দোলন-শুরু করেন। এই আন্দোলনের উদ্বোধন করেন গান্ধীজী, তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় থাকাকালে বৃটিশ-শাসকদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সামরিক সম্মান 'কাইজার-ই-হিন্দ' স্বর্ণপদক বড়লাটের নিকট ফিরাইয়া দিয়া খিলাফৎ-আন্দোলনের সূচনা করেন। এই মহান নেতার ইঙ্গিতে সারা ভারতবর্ষে আগুন জ্বলিয়া উঠে, কোটি কোটি হিন্দু-মুসলমান এক বৈপ্লবিক উন্মাদনা লইয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে।

এই বৈপ্লবিক পরিবেশের মধ্যে সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। অধিবেশনের সভাপতি লালা লাজপত রায় তাঁহার ভাষণে দেশের বৈপ্লবিক অবস্থার প্রতি স্বাগত জানাইয়া বলেন :

"আমরা যে একটা বৈপ্লবিক যুগের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতেছি তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই।...সত্য বটে, চরিত্র ও ঐতিহ্যের দিক হইতে আমরা বিপ্লব-বিরোধী। সত্য বটে, ধীরে চলাই আমাদের ঐতিহ্য। কিন্তু একবার যখন আমরা অগ্রসর হইবার সিদ্ধান্ত করি, তখন আমরা অতি শীঘ্র ও দ্রুত পদ-বিক্ষেপে অগ্রসর হই। জীবন্ত কোন কিছুই উহার জীবিত কালে বিপ্লব সম্পূর্ণ এড়াইয়া চলিতে পারে না।"(১)

এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে গান্ধীজী তাঁহার পর্যায়ক্রমিক অহিংস অসহযোগের-এর নূতন পরিকল্পনা প্রস্তাব আকারে উপস্থিত করেন। ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচ্‌লু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, চিত্তরঞ্জন দাস, মহম্মদ আলি, সৌকৎ আলি প্রভৃতি দেশবরেণ্য নেতৃবৃন্দের সমর্থনে বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাব পাশ হইয়া যায়। "খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের সুবিচার ও 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠাই" হইল গান্ধীজীর এই নূতন অহিংস অসহযোগ-সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্য। প্রস্তাবে সকল সরকারী সম্মান ও উপাধি প্রত্যাখ্যান এবং আইন-সভা, আদালত ও স্কুল-কলেজ বয়কট করিবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করা হয়। ঘরে ঘরে চরকায় সূতাকাটা ও তাঁতে কাপড় বুনিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়। ইহা হইল গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ-সংগ্রামের প্রথম পর্যায়। এই পর্যায়ের প্রধান সংগ্রাম কেবল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হইল, আর জনসাধারণের জন্য স্থির হইল সূতাকাটা ও তাঁতে কাপড় বোনা। ইহাতেও যদি বৃটিশ-শাসকগণ মাথা নত না করে, তবে শুরু হইবে অসহযোগ-সংগ্রামের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সংগ্রাম হইবে সমগ্র দেশবাসীর দ্বারা সকল প্রকার সরকারী ট্যাক্স বন্ধ করা। গান্ধীজীর প্রস্তাবে সুস্পষ্ট ভাষায় সরকারী ট্যাক্স বন্ধের সংগ্রাম ভবিষ্যতের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইল এবং প্রথম পর্যায়ে ইহা আরম্ভ না করিবার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হইল।

---

(১) Lajpat Roy—Presidential Address to the Calcu ta Special Session of the National Congress in Sept. 1920. (Congress Presidential Speeches, Vol. 1—G. A. Netesson & Co.)

গান্ধীজীর এই প্রস্তাবে সংগ্রামেচ্ছু জনগণের মধ্যে হতাশা দেখা দিলেও তাহারা তাহাদের প্রিয়তম নেতা ও কংগ্রেসের নির্দেশ শিরোধার্য করিয়া আসন্ন ভবিষ্যতের অপেক্ষায় রহিল। গান্ধীজীর নির্দেশে প্রথম পর্যায়ের সংগ্রাম শুরু হয়। নভেম্বর মাসে আইন-সভার নির্বাচন সাফল্যের সহিত বয়কট করা হয়, ভোটদাতাদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটদান হইতে বিরত থাকে। ছাত্রগণ নূতন উৎসাহে স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া অসহযোগ-আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়ে। উকিল-ব্যারিস্টারদের দ্বারা আদালত বয়কট বিশেষ সফল হইল না বটে, কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাস ব্যারিস্টারী ত্যাগ করিয়া দেশবাসীর সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

এইভাবে যখন দেশব্যাপী আন্দোলনের ঝড় উঠিতে থাকে তখন, ১৯২০ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, নাগপুর শহরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয়। বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বাইশ হাজার 'ডেলিগেট' নূতন সংগ্রামের উদ্দীপনা লইয়া এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে উপস্থিত হয়। অধিবেশনে কলিকাতা-কংগ্রেসে গৃহীত নূতন সংগ্রামের পরিকল্পনা প্রস্তাব আকারে উপস্থিত করা হইলে এই বাইশ হাজার 'ডেলিগেট' একবাক্যে উহা সমর্থন করে।

এই ঐতিহাসিক অধিবেশনে কংগ্রেসের পুরাতন মূল উদ্দেশ্যের বদলে নূতন মূল উদ্দেশ্য স্থির হয়। কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য এখন আর গণতান্ত্রিক উপায়ে লভ্য "সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন" নহে, এখন উহার স্থান গ্রহণ করিল "শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়ে 'স্বরাজ' লাভ।" কংগ্রেসের সংগঠনিক বিশৃঙ্খলা এখন দূর হইয়াছে, এখন কংগ্রেস গান্ধীজীর যোগ্যতম নেতৃত্বের স্পর্শে একটা সুশৃঙ্খলাযুক্ত আধুনিক রাজনৈতিক পার্টির রূপ ও চরিত্র গ্রহণ করিয়াছে, "শ্রেষ্ঠ নেতাদের পনের জনকে লইয়া গঠিত উচ্চতম সংগঠন কার্যকারী কমিটি হইতে শুরু করিয়া প্রতি প্রদেশ, প্রতি জিলা, প্রতি শহর, প্রতি মহকুমা ও প্রতি গ্রামে কংগ্রেসের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত হইয়াছে। কংগ্রেস এখন পূর্ব যুগের আভিজাত্য বিসর্জন দিয়া জাতীয় স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিস্তৃত জনগণের সংগ্রাম পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছে।

ইহার মধ্যে এখন সমগ্র দেশের ঐক্যবদ্ধ ও জঙ্গী সংগ্রাম প্রতিফলিত হইতেছে। ......জনগণের হৃদয়ের মধ্যে কংগ্রেসের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন ইহার কর্ণধাররূপে যিনি দণ্ডায়মান তিনি জনগণের সুপরিচিত বন্ধু, তাহাদের আশা-আকাঙ্খার যোগ্য প্রতিনিধি"(১)—মহাত্মা গান্ধী।

নাগপুর-অধিবেশনে গান্ধীজী ভারতের এই আসন্ন গণ-সংগ্রামের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বৃটিশ-জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া বলেন: "বৃটিশ-জনসাধারণ জানিয়া রাখুক যে, তাহারা যদি তাহাদের কৃত অবিচারের প্রতিকার না করে তবে বৃটিশ-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া ফেলাই হইবে প্রত্যেকটি ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য।" মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁহার ভাষণে ঘোষণা করিলেন, পূর্বেই বৃটিশ-সাম্রাজ্যের মৃত্যু হইয়াছে, উহা এখন কবরস্থ করিতে হইবে। বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠীর অমানুষিক অত্যাচার ও হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের সমগ্র জনগণের তীব্র বিক্ষোভ ধ্বনিত করিয়া গান্ধীজী ঘোষণা করিলেন:

"ভারতবর্ষ তাহার সকল শক্তি দিয়া বিনা শর্তে বৃটিশের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিতে না চাহিলেও বৃটিশের সহিত সম্পর্ক চিরকাল যে-কোন প্রকারে অব্যাহত রাখিবার কথা চিন্তা করাও জাতীয় মর্যাদার পক্ষে হানিকর এবং বৃটিশ-সরকার যে সকল গুরুতর অবিচার করিয়াছে এবং যেভাবে ইহাদের দায়িত্ব অস্বীকার ও প্রতিকারের দাবি অগ্রাহ্য করিতেছে তাহাতে এখন বৃটিশ-সম্পর্ক মানিয়া চলা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।"(২)

গান্ধীজীর এই ঘোষণার মধ্য দিয়া ভারতের ত্রিশ কোটি হিন্দু-মুসলমানের দাবিই প্রতিধ্বনিত হয়। তাহারাও আর বৃটিশ-সম্পর্ক মানিয়া চলিতে প্রস্তুত নয় এবং বৃটিশ-সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিয়া বিদেশী শাসকদের অত্যাচার-অবিচারের অবসান ঘটাইবার জন্য অধীর হইয়া উঠে। গান্ধীজীর এই ঘোষণাকে তাহারা সেই চূড়ান্ত সংগ্রামের ইঙ্গিত বলিয়াই গ্রহণ করে।

---

(১) Hirendra Nath Mukherjee: 'India Struggles for Freedom', P. 166 & R. P. Dutt's 'India Today', P. 318. (২) Quotations taken from Valentine Chirol's 'India Old and New', P. 190-91.

ঐতিহাসিক গণ-অভ্যুত্থান

নাগপুরের কংগ্রেস-অধিবেশন হইতে সমগ্র দেশের জনসাধারণ তাহাদের বহু প্রতীক্ষিত সংগ্রামের ইঙ্গিত পাইয়া গেল। কংগ্রেস ও খিলাফৎ-কমিটির প্রস্তাবে পর্যায়ক্রমিক অসহযোগ-আন্দোলনের ঘোষণা দ্বারা প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামকে কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবী মধ্যবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবার সিদ্ধান্ত থাকিলেও তাহা দেশের অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণ হয় বুঝিল না বা মানিতে চাহিল না। তাহারা গান্ধীজীর উদাত্ত ঘোষণাকে সর্বশ্রেণীর সংগ্রামের ইঙ্গিত বলিয়া ধরিয়া লইয়া প্রত্যেকটি শ্রেণী নিজস্ব পন্থায় সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়।

নাগপুরের কংগ্রেস-অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বেই, ৩১শে ডিসেম্বর গান্ধীজী নাগপুরে বসিয়া ভবিষ্যৎ-বাণী করিয়া বলেন যে, মাত্র বারো মাসের মধ্যে, অর্থাৎ, ১৯২১ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে, স্বরাজ লাভ অবশ্যম্ভাবী। স্বরাজ লাভ সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না বলিয়াই তিনি এমনকি স্বরাজ লাভের তারিখ ঘোষণা করিতেও ইতস্তত করেন নাই। এমন কি ১৯২১ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসেও "বৎসর শেষ হইবার পূর্বেই স্বরাজ লাভ করা সম্বন্ধে গান্ধীজী এতই নিশ্চিত ছিলেন যে স্বরাজ লাভ না করিয়া ৩১শে ডিসেম্বরের পরেও যে তিনি জীবিত থাকিবেন একথা তিনি কল্পনা করিতেও পারেন নাই।"(১)

গান্ধীজীর এই নিশ্চিত ঘোষণায় সমগ্র দেশের জনসাধারণের মধ্যে এক নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনার জোয়ার বহিতে থাকে। বিদেশী শাসনের অবসান ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মহান নেতার ঘোষণা সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য তাহারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ১৯২১ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই সারা দেশের ছাত্রগণ নূতন উৎসাহে স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করে। উকিল-ব্যারিস্টারদের দ্বারা আদালত বয়কট বিশেষ সফল না হইলেও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাস

---

(১) Subhas Chandra Bose: 'The Indian Struggle, 1920-34', P. 84.

ব্যারিস্টারী ত্যাগ করিয়া দেশের জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাবকে আরও শক্তিশালী করিয়া তোলেন।

১৯২১ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা-সংগ্রাম কেবল শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও অহিংস অসহযোগের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রহিল না। গান্ধীজীর নেতৃত্বের যাদুস্পর্শে ও তাঁহার সংগ্রামের আহ্বানে যে বিরাট গণশক্তি দীর্ঘকালের নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে তাহা অহিংস অসহযোগের কঠোর বাধা-নিষেধের গণ্ডি অগ্রাহ্য করিয়া নিজস্ব পন্থায় বৃটিশ-শাসনের বনিয়াদ ধূলিসাৎ করিয়া দিতে উদ্যত হইল। বিরাট গণশক্তিকে সংগ্রামের আহ্বানে জাগাইয়া তুলিয়া এবং সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিয়া গান্ধীজী তাঁহার ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করিয়াছেন। এবার সেই জাগ্রত গণশক্তি তাহাদের ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করিতে অগ্রসর হইল।

১৯২১ খৃস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী যুক্তপ্রদেশের রায় বেরিলী নামক স্থানে তিনজন কৃষক-নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ৬ই জানুয়ারী কৃষকদের এক বিশাল শোভাযাত্রা বাহির হইলে পুলিশ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া শোভাযাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এই গুলি চালনার ফলে সাত জন কৃষক নিহত ও প্রায় পঞ্চাশ জন আহত হয়। যুক্তপ্রদেশের কৃষকগণ এক অভিনব উপায়ে এই গুলি-চালনার জবাব দেয়। ফেব্রুয়ারী মাসে সত্তর হাজার কৃষক অসহযোগ-আন্দোলনের প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে।

ফেব্রুয়ারী মাসে পাঞ্জাবের শিখ-কৃষকগণ হাজারে হাজারে আন্দোলনে যোগদান করিয়া পাঞ্জাবের আন্দোলনকে শক্তিশালী করিয়া তোলে। পাঞ্জাবের শিখ-কৃষকদের আন্দোলনে যোগদানের ফলে পাঞ্জাব-সরকার ও শিখ-প্রতিক্রিয়াশীলরা আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া অত্যাচারের দ্বারা ইহাদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করিবার জন্য শিখদের ধর্ম-মন্দিরের প্রতিক্রিয়াশীল মোহান্তদের সহিত এক পৈশাচিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। বহু পূর্ব হইতেই শিখ-চাষীরা তাহাদের ধর্ম-মন্দিরগুলিকে মোহান্তদের নানাবিধ অনাচার-অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য এবং ঐগুলিকে জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্য আন্দোলন

করিয়া আসিতেছিল। তাহাদের সেই আন্দোলন যে নিছক ধর্ম-মন্দিরের সংস্কারের আন্দোলন ছিল না, তাহা যে জাতীয় আন্দোলনেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল তাহা এমনকি সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিক ভ্যালেণ্টাইন চিরোলও স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই আন্দোলনের "সন্দেহাতীতরূপে একটা জাতীয়তা-বাদী দিক"ও(১) ছিল। মোহান্তদের বিরুদ্ধে শিখ-চাষীদের সেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবার দেশব্যাপী স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত মিলিত হইল। ফেব্রুয়ারী মাসে শিখ-চাষীদের আন্দোলনের ফলে অমৃতসরের স্বর্ণমন্দিরের মোহান্ত তাহার গদি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। শিখ-চাষীরা এই জয়লাভে উৎসাহিত হইয়া তাহাদের আর একটি বিখ্যাত ধর্ম-মন্দির 'নানকানা সাহেব'-এর মোহান্তের অত্যাচার-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। ৫ই মার্চ এই কুখ্যাত মোহান্তের পদত্যাগ দাবি করিয়া শিখ-চাষীদের এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রার পর হাজার হাজার শিখ-চাষী মন্দির ঘিরিয়া অবস্থান করিতে থাকে। মন্দিরের মোহান্ত ভয় পাইয়া পাঞ্জাব-সরকারের সম্মতি লইয়া আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। পরের দিন ভোরবেলা একশত পঞ্চাশ জন শিখ প্রার্থনার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করিবা-মাত্র তাহাদের নৃশংসভাবে হত্যা করিয়া পেট্রল ঢালিয়া মৃতদেহগুলি জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। এই পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের সংবাদে সারা পাঞ্জাবে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। মোহান্তের পদত্যাগ ও তাহার শাস্তির দাবি লইয়া এক বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। বলা বাহুল্য, পাঞ্জাব-সরকার মোহান্তের পক্ষ সমর্থন করে এবং সশস্ত্র পুলিশবাহিনী পাঠাইয়া শিখদের মন্দির-প্রবেশে বাধা দিতে থাকে। সারা পাঞ্জাবের শিখগণ প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়। কিন্তু গান্ধীজী ও অন্যান্য কংগ্রেস-নেতাদের প্রভাবে তাহারা হিংসার পথ ত্যাগ করিয়া অহিংস উপায়ে মন্দির-প্রবেশ আন্দোলন শুরু করে। প্রত্যহ শিখগণ দলে দলে মন্দিরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়া পুলিশের লাঠি ও গুলিতে প্রাণ বিসর্জন করিতে থাকে। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত শিখগণ অভাবনীয়

---

(১) Valentine Chirol: 'India, Old & New', P. 193.

ধৈর্য সহকারে এই শহীদ-ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া পৃথিবীতে এক অভিনব দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অবশেষে ১৯২২ খৃস্টাব্দের শেষদিকে সরকার শিখদের দাবি মানিয়া লওয়ায় এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের অবসান হয়।

ভারতের অন্যান্য অংশে গণ-সংগ্রামের ঝড় সমানভাবেই বহিতে থাকে। ১৯২১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'তিলক স্বরাজ্য-ফণ্ড' নামে একটি সংগ্রাম-তহবিল গঠিত হয়। আন্দোলনের একটি অংশ হিসাবে দেশের সর্বত্র সংগ্রাম-তহবিলে অর্থ সংগ্রহ চলিতে থাকে। জুন মাসের মধ্যেই এই তহবিলে এক কোটিরও অধিক টাকা সংগৃহীত হয়। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য এই তহবিলে তাহাদের মুখের গ্রাস তুলিয়া দেয়, নারীরা তাহাদের গাত্র হইতে অলংকার খুলিয়া তহবিলে দান করে। দেশের সর্বত্র বৃটিশ-পণ্য বয়কট করা হয়; বোম্বাই, কলিকাতা, লাহোর, প্রভৃতি শহরে বিলাতী বস্ত্র অগ্নিসাৎ করা হইতে থাকে; বিলাতী বস্ত্র পোড়ান বৃটিশ-শাসনের ধ্বংসের প্রতীক বলিয়া গৃহীত হয়।

দেশব্যাপী এই বিরাট গণ-অভ্যুত্থানে শাসকগোষ্ঠী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উন্মত্তের মত চারিদিকে দমননীতি শুরু করে এবং তাহার ফলে প্রায় সকল প্রদেশে ক্রুদ্ধ জনসাধারণের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। বিভিন্ন প্রদেশে নিরস্ত্র জনতার উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে, সহস্র সহস্র লোক গ্রেপ্তার হয়। সরকারের দমননীতি যতই উগ্র আকার ধারণ করে, গণ-সংগ্রামের শক্তি এবং ব্যাপকতাও ততই বৃদ্ধি পায়। এপ্রিল মাসে দক্ষিণ-ভারতের কালিকট শহরে একটি বক্তৃতার অপরাধে সর্বজনমান্য মুসলিম-নেতা ইয়াকুব হাসানকে গ্রেপ্তার করিয়া বোম্বাই শহরে আনা হইলে সত্তর হাজার লোক সমবেত হইয়া তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। মে মাসে কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি মদনমোহন মালব্য ভারত-সরকার ও কংগ্রেসের মধ্যে আপস-রক্ষার প্রস্তাব তোলেন। তাঁহার চেষ্টায় বড়লাট লর্ড রিডিং ও গান্ধীজীর মধ্যে আলোচনা চলে, কিন্তু শাসক-গোষ্ঠীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য আলোচনা ব্যর্থ হয়। সারা দেশে গণ-সংগ্রামের ঝড় পূর্বাপেক্ষাও বেশী জোরে বহিতে থাকে।

১৯২১ মে মাসে ভারতের পূর্বকোণ আসামে এক নূতন ঝড়ের সূচনা হয় এবং দেখিতে না দেখিতে সেই ঝড় ভারতবর্ষকে কাঁপাইয়া তোলে। পূর্বের কয়েক বৎসর ধরিয়া আসামের চা-বাগানের শ্বেতাঙ্গ মালিকগণ বিপুল মুনাফা লুটিয়া লইয়াও ঐ মাসে ব্যবসা-মন্দার অজুহাতে কয়েক সহস্র শ্রমিককে বরখাস্ত করে। বরখাস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রমিকগণ আসাম ত্যাগ করিয়া তাহাদের দেশ পশ্চিম-ভারতের দিকে যাত্রা করে। তাহারা দেশে গেলে মালিকদের বিরুদ্ধে ভীষণ আন্দোলন শুরু হইবে—এই ভয়ে সরকার শ্রমিকদের দেশে ফিরিতে বাধা দেয়। চারি হাজার শ্রমিক চাঁদপুরে উপস্থিত হইয়া ট্রেনে আরোহণ করিবার চেষ্টা করিলে রেলকর্তৃপক্ষ তাহাদের বাধা দিবার জন্য বল প্রয়োগ করে। শ্রমিকগণ স্টিমারে আরোহণ করিলে তাহাদের সহিত পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে। পুলিশের লাঠি ও গুলির ঘায়ে শত শত শ্রমিক আহত হয়, এমনকি কয়েক শত নারী-শ্রমিক স্টিমারে আরোহণ করিবামাত্র শিশু-সন্তানসহ তাহাদের নদীর জলে নিক্ষেপ করা হয়। এই অমানুষিক অত্যাচারের সংবাদ প্রচার হইবামাত্র সারা দেশব্যাপী বিক্ষোভের ঝড় উঠে। সারা দেশের জনসাধারণ ইহার প্রতিকারের জন্য এক প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করে। সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেন। যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে এই আন্দোলন গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত দেশ-ব্যাপী অসহযোগ-সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। শ্রমিকদের উপর এই অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে আসাম-বেঙ্গল রেলপথ ও স্টিমার-কোম্পানির সকল ভারতীয় শ্রমিক ও কর্মচারী ধর্মঘট করিয়া পূর্ববঙ্গের রেল ও স্টিমার চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেয়। এই বিরাট ধর্মঘট ও দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করে এবং বেকার চা-শ্রমিকদের দেশে পৌছিবার ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হয়।

ঐ বৎসর আগস্ট মাসে দক্ষিণ-ভারতের মালাবার-উপকূলের দুইটি তালুকে ইতিহাস-বিখ্যাত মোপলা-বিদ্রোহ শুরু হয়। দক্ষিণ-ভারতের দরিদ্রতম মানুষ এই মুসলমান-চাষী মোপলা-সম্প্রদায়। সুদূর অতীতকাল হইতেই

ইহারা শাসকগোষ্ঠীর সৃষ্ট বহুবিধ শোষণ-ব্যবস্থার নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের জন্য বারবার বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়াছে। ভয়ংকর দারিদ্র ইহাদের চরিত্রও করিয়া তুলিয়াছে ভয়ংকর। মোপলারা প্রথম বড় রকমের বিদ্রোহ করে ১৮৭৩ খৃস্টাব্দে। সেই বিদ্রোহের পর হইতেই তাহাদের দাবাইয়া রাখিবার জন্য ঐ অঞ্চলে একটা বড় সৈন্যবাহিনী বসান হয়। ইহার পরেও তাহারা ১৮৮৫, ১৮৯৪ এবং ১৮৯৬ খৃস্টাব্দে বিদ্রোহ করে। তাহাদের সর্বশেষ বিদ্রোহ শুরু হয় ১৯২১ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে।(১)

১৯২১ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই অসহযোগ ও খিলাফৎ-সংগ্রামের ঢেউ দক্ষিণ-ভারতের মালাবার-উপকূলের মোপলা-চাষীদের মধ্যে নূতন বিদ্রোহের চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে। এই নূতন বিদ্রোহের চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া মাদ্রাজ-সরকার মালাবার-অঞ্চলে জনসভা, বাহির হইতে কোন সংবাদ ও সংবাদপত্রের প্রবেশ বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু গোপনে মোপলা-চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের প্রচার চলিতে থাকে। চির-বিদ্রোহী মোপলা-চাষীরা আর একটা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়। এবার তাহারা বিদ্রোহের আদর্শ ও নূতন প্রেরণা খুঁজিয়া পায় খিলাফৎ-সংগ্রামের মধ্যে। খিলাফতের মুক্তির বাণী তাহাদের মধ্যে নিজস্ব স্বাধীন মুসলিম-রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দান করে। আগস্ট মাসের শেষদিকে এরনাদ ও ওয়ালুভানাদ নামক দুইটি তালুক জুড়িয়া বিদ্রোহ শুরু হইয়া যায়।

"যে সকল পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীকে তাহাদের দমন করিবার জন্য বসান হইয়াছিল তাহাদের উপর মোপলা-চাষীরা আক্রমণ শুরু করে। তাহারা তাহাদের জমিদারদের আক্রমণ করে, মহাজনদের আক্রমণ করে, যাহাকে পায় তাহাকেই আক্রমণ করিতে থাকে। তাহারা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই বিরাট অঞ্চল (উক্ত দুইটি তালুক) সম্পূর্ণ দখল করিয়া ফেলে। হাট-বাজার-দোকান, মন্দির, নারী—কিছুই তাহাদের আক্রমণ হইতে বাদ যায় না। আর পুরুষেরা দলে দলে নিহত হয়। মোপলারা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে:

(১) W. C. Smith : 'Modern Islam in India', P. 235.

তাহারা ক্ষেপিয়াছে হিন্দুদের(১) উপর, ক্ষেপিয়াছে বৃটিশের উপর, তাহারা ক্ষেপিয়া গিয়াছে এই দুনিয়াটার উপর,—কারণ এই দুনিয়াটা তাহাদের দিয়াছে কেবল দুঃখ-যন্ত্রণা। একটা শ্রেণী চরম উৎপীড়নের ফলে যে ক্রোধ লইয়া উহার শত্রুর বিরুদ্ধে মরিয়া হইয়া রুখিয়া দাঁড়ায়, মোপলাদের ক্রোধ হইল সেই ক্রোধ—অসহনীয় পাপের ধ্বংস ও পুণ্যময় রাজ্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মান্ধতার ক্রোধ।"(২)

বিদ্রোহ শুরু হইবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই মোপলারা এরনাদ ও ওয়ালুভানাদ তালুক দুইটি সম্পূর্ণ দখল করিয়া সেখানে নিজেদের স্বাধীন স্থাপন করে এবং তাহাদের নেতাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করে। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইবামাত্র সারা ভারতের বিশেষ করিয়া মুসলমান-চাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের চাঞ্চল্য জাগিতে দেখি৷ গান্ধীজী এবং মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি মোপলাদের বুঝাইয়া শান্ত করিবার জন্য মালাবার গমনের উদ্যোগ করিলে শাসকগণ তাঁহাদের বাধা দেয়। ইহার পর মোপলাদের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ শুরু হয়। কয়েকটি বড় সৈন্যদল বহু ট্যাঙ্ক ও মেসিনগানসহ মালাবারে উপস্থিত হয়। এমন কি কয়েকখানি ছোট যুদ্ধ-জাহাজও মালাবারের উপকূল হইতে গোলা বর্ষণ করে। প্রায় নিরস্ত্র মোপলা-বিদ্রোহীরা জল-স্থল হইতে শক্তিশালী শত্রু-দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কয়েকটি সংঘর্ষের পর নিকটবর্তী পাহাড়ে পলায়ন করে এবং সেখান হইতে নভেম্বর মাস পর্যন্ত 'গেরিলা-যুদ্ধ' চালায়। অবশেষে নীচে ট্যাঙ্ক ও মেসিনগানের আক্রমণ এবং আকাশে উড়োজাহাজ হইতে বোমা বর্ষণের ফলে মোপলারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। এই বিদ্রোহে সৈন্যদের ট্যাঙ্ক

(১) মোপলাদের এই হিন্দু-বিদ্বেষ সাম্প্রদায়িকতা-প্রসূত নহে। উক্ত অঞ্চলের সকল জমিদার ও মহাজনগণ ছিল হিন্দু এবং তাহারা মোপলাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করিত বলিয়া মোপলারা সকল হিন্দুকেই অত্যাচারী ও শত্রু বলিয়া ধরিয়া লয়—B.P. Sitaramiya : 'Hisiory of Indian National Congress', P. 877. (২) W. C. Smith : 'Modern Islam in India,' P. 235.

ও মেসিনগানের আক্রমণে এবং যুদ্ধ-জাহাজ ও উড়োজাহাজ হইতে গোলা-বর্ষণের ফলে প্রায় ছয় হাজার মোপলা-চাষী নিহত হয়, তাহাদের বাসস্থান ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। মোপলা-বিদ্রোহের আশীজন শ্রেষ্ঠ নেতাকে বন্দী করিয়া রেলগাড়ীর বদ্ধ কামরায় মাদ্রাজের কালিকট জেলে প্রেরণ করা হয় এবং পথে গাড়ীর মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া ছেষট্টি জন প্রাণ হারায়। এই বর্বরসুলভ ঘটনা ভারতের সত্যিকার "অন্ধকূপ-হত্যা"র প্রমাণ হইয়া থাকে। যে সকল সামরিক অফিসার বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়া সর্বাপেক্ষা বেশী লোক হত্যা করিতে পারিয়াছিল তাহাদের ভারতের ইংরেজরা চাঁদা তুলিয়া পুরস্কৃত করে।(১)

শাসকগোষ্ঠী এই বিদ্রোহকে হিন্দু-বিরোধী বিদ্রোহ বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাকে হিন্দু-বিরোধী বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ-ঐতিহাসিক ভ্যালেটাইন চিরোল উল্লাসের সহিত ঘোষণা করিয়াছেন: "অত্যন্ত পশ্চাৎপদ ও উচ্ছৃঙ্খল মোপলারা হিন্দুদের উচিত শিক্ষা দিয়াছে। য়ুরোপীয়ানদের হত্যা, সরকারী অফিস পোড়ান ও লুণ্ঠন, রেলপথ ও টেলিগ্রাফ লাইন ধ্বংস করা—এসব মাত্র দুই বৎসর পূর্বে পাঞ্জাবে হিন্দু-জনতা দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ঘটনায় (মোপলা বিদ্রোহে) হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটে নাই।"(২) ডাঃ সীতারামিয়া তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থে ইহার জবাবে এই বিদ্রোহকে "ইংরেজ-জমিদার-মহাজন বিরোধী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।(৩) আর গান্ধীজী মোপলাদের হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপের সমর্থন না করিলেও তাহাদের "সাহসী ও ধর্মভীরু" আখ্যা দান করিয়াছেন।(৪) কংগ্রেস-ওয়ার্কিং কমিটি উহার প্রস্তাবে মোপলাদের হিংসাত্মক কার্য-কলাপ তীব্র নিন্দা করিলেও সঙ্গে সঙ্গে ইতস্ততঃ না করিয়া এই বিদ্রোহের জন্য সরকারী উৎপীড়নকে দায়ী করিয়া ঘোষণা করিয়াছে: বিভিন্ন প্রকারের "উৎপীড়ন দ্বারা

(১) C. Gopalan Nayar: 'Mopla Rebellion', P. 216-20.
(২) V. Chirol: 'India, Old & New', P. 297-98.
(৩) B. P. Sitaramiya: 'History of Indian National Congress', P. 377.
(৪) M. K. Gandhi: Speeches & Writings (Compiled by G. Natesson & Co.)

মোপলাদের এমনভাবে উত্তেজিত করা হইয়াছিল যে তাহাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং সরকারের পক্ষ হইতে ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে মোপলাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত অপরাধের একপক্ষীয় ও অতিরঞ্জিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। সরকার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে অনাবশ্যকভাবে যে অগণিত নরহত্যা করিয়াছে তাহা ঐ বিবরণে খুবই কম করিয়া দেখান হইয়াছে।"

মোপলা-বিদ্রোহ* দমন করা সম্ভব হইলেও সারা ভারতবর্ষের উপর দিয়া অসহযোগ ও খিলাফৎ-আন্দোলনের ঝড় বহিতে থাকে। সেই আন্দোলন প্রতিদিন নূতন নূতন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে, শত শত লোক গ্রেপ্তার হইয়া জেলগুলি পূর্ণ করিয়া ফেলে, শত শত নূতন লোক তাহাদের শূন্যস্থান পূরণ করে। হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ নিত্য নূতন সংগ্রাম-কৌশল বাহির করেন, নিত্য নূতন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ৮ই জুলাই হইতে নিখিল ভারত খিলাফৎ-কমিটি মুসলমানদের সরকারী সৈন্যবাহিনীতে যোগদান না করিতে এবং যাহারা যোগদান করিয়াছে তাহাদের পদত্যাগ করিতে নির্দেশ দেয়। ২৮শে জুলাই নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি বোম্বাই-অধিবেশনে ইংলণ্ডের যুবরাজের আসন্ন ভারত-ভ্রমণ বয়কট করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের সিদ্ধান্তও ঘোষণা করে। সেপ্টেম্বর মাসে আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ও অপর কয়েকজন মুসলিম-নেতা "রাজদ্রোহ"মূলক অপরাধে গ্রেপ্তার হন। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতে প্রতিবাদের ঝড় বহিতে থাকে, শত শত সভা ও শোভাযাত্রায় ইহার প্রতিবাদ জানান হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটি এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সকল ভারতীয় সরকারী কর্মচারী ও সৈন্যদের অবিলম্বে পদত্যাগ করিবার নির্দেশ দিয়া ঘোষণা করে: "যে সরকার ভারতের নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধঃপতনের জন্য দায়ী সেই সরকারের সেবা করা কোন ভারতবাসীর পক্ষেই উচিত নহে।"

* মোপলা-বিদ্রোহের ইতিহাস গ্রন্থকারের 'বিদ্রোহী ভারত' নামক পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

করাচীতে আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের বিচারের পর দুই বৎসরের কারাদণ্ড হয়। এই কারাদণ্ডে ভারতবর্ষ ক্রোধে ফাটিয়া পড়ে। আরও জোরের সহিত বিলাতী দ্রব্য বয়কট করিয়া ও বিলাতী বস্ত্র জ্বালাইয়া জনসাধারণ ইহার জবাব দেয়। নভেম্বর মাসের ৪ঠা তারিখে দিল্লী শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন শুরু হয়। আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাদণ্ডের জবাব হিসাবে কংগ্রেসকমিটি সকল প্রদেশকে আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবার ক্ষমতা দানকরে। অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন অহিংস "প্রতিরোধ"সংগ্রামে পরিণত হয় এবং ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নূতন পর্যায় শুরু হইয়া যায়।

১৭ই নভেম্বর ইংলণ্ডের যুবরাজ বোম্বাইয়ে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের পূর্ব ঘোষণা অনুসারে সারা ভারতবর্ষে ধর্মঘট হয়। বোম্বাই শহরে ধর্মঘট পণ্ড করিবার উদ্দেশ্যে সরকারপক্ষীয় লোকেরা দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান যুবকদের লইয়া গঠিত 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' অসীম ধৈর্য ও সাহসের সহিত সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে। ঐ দিন সাধারণ ধর্মঘটের ফলে কলিকাতা মহানগরীর সকল কাজকর্ম বন্ধ থাকে, বিরাট নগরীতে কবরের নিস্তব্ধতা নামিয়া আসে। পরদিন 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকায় সখেদে অভিযোগ করা হয় যে, সরকার যেন ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিয়াছিল, আর জাতীয় স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী যেন নগরী দখল করিয়া ফেলিয়াছিল। যুবরাজ যেখানেই পদার্পণ করেন সেইখানেই জনসাধারণ ধর্মঘট করিয়া শাসকগোষ্ঠীর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে।

আন্দোলনের গোড়ার দিকেই হিন্দু ও মুসলমান যুবকদের লইয়া 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠিত হইয়াছিল। যুবরাজের ভারত-ভ্রমণ বয়কট কার্যকরী করিবার আন্দোলনের মধ্য দিয়াই ইহা একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীরূপে গড়িয়া উঠে এবং প্রধানতঃ এই বাহিনীর চেষ্টাতেই বয়কট-আন্দোলন অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করে। এই সময় হইতেই বাহিনীর স্বেচ্ছা-সৈন্যগণ সামরিক পোষাক পরিধান ও সামরিক কায়দায় কুচকাওয়াজ করিতে থাকে। এই সময় হইতে দেশের সর্বত্র এই বাহিনী ধর্মঘট, বিলাতী বর্জন, পিকেটিং প্রভৃতি সংগঠিত

ও পরিচালিত করিতে থাকে। এবার সরকার ভীত হইয়া জাতীয় বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করে। সরকারী প্রচারে এবং স্টেটস্‌ম্যান, ইংলিশম্যান প্রভৃতি আধা-সরকারী সংবাদপত্রে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে একটি সশস্ত্র সামরিক বাহিনীরূপে কল্পনা করিয়া ইহাকে অবিলম্বে বেআইনি ঘোষণা করিবার দাবি জানান হয়। যুবরাজের ভারত-ভ্রমণের পরেই জাতীয় বাহিনী বেআইনি ঘোষিত হয় এবং উহার পরিচালকবৃন্দ ও সহস্র সহস্র স্বেচ্ছাসৈন্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। জাতীয় বাহিনীর উপর এই আক্রমণ সকল শ্রেণীর জনসাধারণের তীব্র ঘৃণা জাগাইয়া তোলে, সহস্র সহস্র ছাত্র ও শ্রমিক ইহাতে যোগদান করিয়া সরকারী আক্রমণের জবাব দেয়।

১৯২১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত কংগ্রেস ও খিলাফৎ-আন্দোলনের সকল শ্রেষ্ঠ নেতা কারারুদ্ধ হন। এই সময়ের মধ্যে বিশ হাজার লোক গ্রেপ্তার হয় এবং ১৯২২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে আন্দোলনের তীব্রতা যখন চরমে উঠে তখন রাজবন্দীর মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ত্রিশ হাজার। এই দেশজোড়া ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া জনসাধারণ যে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে তাহার ফলে তাহাদের জেলে যাওয়ার ভয় সম্পূর্ণ কাটিয়া যায়। তাহাদের নিকট জেলখানা এখন আর কোন ভয়ংকর স্থান নহে, রাজনৈতিক আন্দোলনে জেলে যাওয়া এখন দেশভক্তি ও বিশেষ সম্মানের কাজ বলিয়া গণ্য হয়। কারণ গান্ধীজীর শিক্ষা ও তাঁহার পরিচালিত আন্দোলন হইতে লব্ধ চেতনা দ্বারা জনসাধারণ উপলব্ধি করে যে, "ইংরেজ-শাসনে গোটা ভারতবর্ষই একটা বিরাট জেলখানায় পরিণত হইয়াছে, আর সিপাহী-শান্ত্রী বেষ্টিত কারাগার সেই বিরাট জেলখানার একটা ক্ষুদ্র কুঠরি মাত্র।"

সংগ্রামের সন্ধিক্ষণ

১৯২১ খৃস্টাব্দের ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রামের আঘাতে ভারতের বৃটিশ-শাসকগণ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়ে। ত্রিশ হাজার লোকসহ সকল

নেতাদের গ্রেপ্তার করিয়াও আন্দোলনকে দমন করা সম্ভব হইল না। ইহার উপর কংগ্রেসের সর্বশেষ সিদ্ধান্তের ফলে শাসকদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। নভেম্বর মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দিল্লী-অধিবেশনে সকল প্রদেশকে ব্যাপক আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবার ক্ষমতা দান করা হয়। এই দুই আন্দোলন যদি একই সময়ে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে শুরু হইয়া যায়, তাহা হইলে সহরের বিক্ষুব্ধ মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণের সহিত গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি চিরবিক্ষুব্ধ কৃষক-জনগণ এই সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং কৃষকদের সেই সংগ্রাম অবিলম্বে খাজনা বন্ধের সংগ্রামে পরিণত হইবে। এই মিলিত সংগ্রাম ভারতের বৃটিশ-শাসনের মূল পর্যন্ত কাঁপাইয়া তুলিবে। সেই ভয়ংকর সংগ্রাম ত্রিশ কোটি মানুষের বিদ্রোহের আকার ধারণ করিবে, আর সেই অভাবনীয় গণ-বিদ্রোহ দমন করিবার শক্তি বৃটিশের নাই, তাহাদের সকল কামান-ট্যাঙ্ক-উড়োজাহাজ একত্র করিয়াও সেই বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইবে না। শাসকগণ ব্যস্ত হইয়া আপস-রফা দ্বারা এই আসন্ন বিপদ এড়াইবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। কিন্তু যে মানুষটি এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের স্রষ্টা, যিনি পর্বতের মত অটল দৃঢ়তা লইয়া এই সংগ্রাম পরিচালনায় নিযুক্ত, তাঁহার নিকট এখন আপস-আলোচনার প্রস্তাব তুলিবার সাহস বৃটিশ-শাসকদের নাই। আর সেই মহান নায়ক গান্ধীজীর নির্দেশ ব্যতীত এই আসন্ন বিদ্রোহ বন্ধ করিবার শক্তিও অন্য কাহারও নাই।

এই আসন্ন বিদ্রোহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর উপর চাপ আনিবার জন্য স্বয়ং বড়লাট উদারপন্থী পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে মধ্যস্থ করিয়া কারাগারে বন্দী নেতাদের সহিত আলোচনা শুরু করেন। বড়লাট সাহেব মালব্যের মারফত প্রস্তাব করেন যে, আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করিলে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার ও সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান করা হইবে। কিন্তু আপস-আলোচনায় কোন ফল হইল না। বন্দী নেতারা বড়লাট সাহেবকে জানাইয়া দিলেন, স্বরাজের দাবি পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন বন্ধ হইবে না।

১৯২১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে আমেদাবাদে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন শুরু হয়। নির্বাচিত সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস কারাগারে আবদ্ধ থাকায় সর্বজনমান্য মুসলিম-নেতা হাকিম আজমল খাঁ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অধিবেশনে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়ঃ—

"যে পর্যন্ত দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হইবে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা ভারতীয় জনগণের দখলে না আসিবে ততদিন পর্যন্ত আরও জোরের সহিত অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন চালাইয়া যাইতে কংগ্রেস দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।" ইহা ব্যতীত প্রস্তাবে "ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধ, আক্রমণাত্মক বা আত্মরক্ষামূলক আইন অমান্য আন্দোলনের উপর সকল শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার দৃঢ় সংকল্প লইয়া" আঠার বা তদূর্ধ বয়স্ক লোকদের বেআইনি ঘোষিত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করা হয় এবং সেই সঙ্গে "কংগ্রেসের কার্য পরিচালনার সর্বময় কর্তা হিসাবে মহাত্মা গান্ধীর উপর" পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।(১)

কিন্তু আমেদাবাদ-অধিবেশনের মধ্যেই এই ঐতিহাসিক জাতীয় সংগ্রামের ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উৎসাহ-চঞ্চল জনসাধারণ আশা করিয়াছিল যে, আমেদাবাদ-অধিবেশন হইতে দেশব্যাপী সাধারণ আইন-অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবার নির্দেশ দেওয়া হইবে, আর সেই দেশব্যাপী আন্দোলনের মধ্য দিয়া বহু-আকাঙ্খিত 'স্বরাজ' প্রতিষ্ঠিত হইবে। সারা দেশ সংগ্রামের নির্দেশের জন্য আমেদাবাদ-অধিবেশন ও কংগ্রেসের কর্ণধার মহাত্মা গান্ধীর দিকে ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে।

অন্যদিকে যখন কংগ্রেস-অধিবেশনে ও দেশের মধ্যে চূড়ান্ত সংগ্রামের চাঞ্চল্য প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, চারিদিকে সংগ্রামের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ উঠিতে শুরু করিতে ছিল, তখনই যিনি সেই সংগ্রামের নির্দেশ দিবেন ও উহা পরিচালনা করিবেন

(১) All Quotations in this paragraph taken from Pattavi Sitaramiya's 'History of Indian National Congress', P. 382.

তাঁহার মনে যেন কিসের আশঙ্কা দেখা দেয়। গত এক বৎসরের গণ-সংগ্রামের যে চিত্র গান্ধীজী দেখিয়াছেন তাহা হইতেই এই আশঙ্কা তাহার মনে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে। তিনি দেখিয়াছেন, গণ-সংগ্রামের প্রবল বন্যায় অহিংসার বাধা-নিষেধ কোথায় ভাসিয়া যায়, সরকারের প্রচণ্ড দমননীতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জনসাধারণ অহিংসার শর্ত ভুলিয়া গিয়া হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে। কাজেই আরও উচ্চস্তরের সংগ্রামে যখন জনসাধারণ ব্যাপকভাবে আইন অমান্য করিতে থাকিবে এবং দেশব্যাপী চিরবিক্ষুব্ধ কৃষকগণ ট্যাক্স বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবে তখন সারা ভারতবর্ষ এক বীভৎস রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হইবে, তখন সেই সংগ্রামকে ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রিত করিবার শক্তি কাহারও থাকিবে না। ভবিষ্যৎ-সংগ্রামের এই পরিণতির আশঙ্কায় গান্ধীজী অধির হইয়া উঠেন। তাঁহার এই আশঙ্কা ও অধীরতা আমেদাবাদ-অধিবেশনে আরও প্রবল হইয়া উঠে এবং অধিবেশনের প্রস্তাব ও ভবিষ্যৎ সংগ্রামের সিদ্ধান্তের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে।

ইহার পূর্বে ১৯১৯ খৃস্টাব্দের গণ-সংগ্রামের মধ্যেও গান্ধীজী বিদ্রোহী জনগণের হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপে অধীর হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সেই সংগ্রামে "অহিংসার আদর্শে জনগণের উপযুক্ত শিক্ষা ব্যতীত কেবল তাহাদের শুভবুদ্ধির উপর নির্ভর করাকে" "পর্বতপ্রমাণ ভুল" বলিয়া অনুশোচনা করিয়া তিনি সেই সংগ্রাম বন্ধ করিয়াছিলেন। এবারেও এই সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সময় এবং আরম্ভ হইবার পর তিনি এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আন্দোলনের গোড়ার দিকে মুসলিম-নেতৃবৃন্দের বক্তৃতায় অহিংসা-বিরোধী মনোভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি ১৯২১ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে আলি-ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট হইতে কোন প্রকার হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে উৎসাহ দান না করিবার প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বহুবার মুসলিম-নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস ও খিলাফৎ-কমিটির প্রস্তাব হইতে অহিংসার শর্ত তুলিয়া লইবার দাবি জানাইলে গান্ধীজী তাহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ১৭ই নভেম্বর বোম্বাই শহরের দাঙ্গায় যে সকল হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়

তাহাতে তিনি বিশেষ উদ্বেগ বোধ করেন। সেই সকল হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপের "প্রায়শ্চিত্ত"-স্বরূপ তিনি একদিন অনশন করেন এবং এক বিবৃতিতে বলেন যে, ঐ সকল হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে "তাঁহার নাসিকায় স্বরাজের পুতিগন্ধ লাগিতেছে"। আমেদাবাদ-অধিবেশনেও মুসলিম-নেতাদের নিকট হইতে অহিংসার শর্ত তুলিয়া লইবার দাবি এবং বাহিরের জনসাধারণের মধ্যে হিংসামূলক মনোভাব স্পষ্ট হইয়া উঠিতে দেখিয়া গান্ধীজীর আশঙ্কা চরমে উঠে। সেই আশঙ্কাই এবার ব্যাপক আইন অমান্য ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনের নির্দেশ দানের পক্ষে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়ায়।

আমেদাবাদ-অধিবেশনেই গান্ধীজী আন্দোলনের রাশ টানিতে শুরু করেন, কিন্তু তাহা তখনও জনসাধারণের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। বাহিরে কোটি কোটি মানুষ চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করিবার নির্দেশের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে। সেই নির্দেশ যে আমেদাবাদ-অধিবেশন হইতে ঘোষিত হইবে তাহাও তাহারা সুনিশ্চিত বলিয়া ধরিয়া লয়। কিন্তু আমেদাবাদ-অধিবেশন হইতে সংগ্রাম শুরু করিবার কোন স্পষ্ট নির্দেশ ঘোষিত হইল না। এমন কি মূল প্রস্তাবে ট্যাক্স বন্ধের কোন উল্লেখই দেখা গেল না, উহাতে দলবদ্ধ ভাবে আইন অমান্য করিবার কথা থাকিলেও ইহার উপর বহু শর্ত আরোপ করিয়া বলা হয় যে, এই আন্দোলন চালাইতে হইবে "উপযুক্ত বাধা-নিষেধ-এর মধ্যে" (under proper safe-guards), "যে সকল নির্দেশ দেওয়া হইবে সেই সকল নির্দেশ অনুসারে", আর "যখন জনসাধারণ অহিংসার পদ্ধতিতে যথেষ্ট শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে" কেবল তখনই ইহা আরম্ভ করা চলিবে।(১) অর্থাৎ আমেদাবাদ-কংগ্রেসের প্রস্তাবে আইন-অমান্য আন্দোলনের উপর এমন সকল শর্ত আরোপ করা হয় যাহার ফলে এই আন্দোলন কোন ক্রমেই অহিংসার গণ্ডি ছাড়াইয়া যাইতে না পারে।

(১) Quotations from Pattavi Sitaramiya's 'Indian National Congress', P. 382.

সংগ্রাম প্রত্যাহার

আমেদাবাদ-অধিবেশনের প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত অর্থ জনসাধারণ স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিল না, ইহার পরেও তাহারা চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশের জন্য গান্ধীজীর মুখের দিকে উন্মুখ হইয়া চাহিয়া রহিল। সেই সংগ্রামের কোন নির্দেশ ও পরিকল্পনা যখন কংগ্রেস-অধিবেশন হইতে ঘোষিত হইল না, তখন ইহা কেবল গান্ধীজীই দিতে পারেন। কারণ তিনিই এখন কংগ্রেসের সর্বময় কর্তা। কংগ্রেস-অধিবেশন হইতে আইন অমান্য ও ট্যাক্স্ বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল না দেখিয়া শাসকগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এবার তাহারা সকল শক্তি একত্র করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়। সরকারের আক্রমণে আন্দালনের শক্তি ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইতে থাকে। জনসাধারণ সকল আক্রমণ সহ্য করিয়া গান্ধীজীর নিকট হইতে চূড়ান্ত সংগ্রামের নির্দেশের জন্য তখনও উন্মুখ হইয়া থাকে।

গান্ধীজী একমাস কাল নীরব রহিলেন, তিনি যেন কোন একটা সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই এক মাসের মধ্যে জনসাধারণ সংগ্রামের নির্দেশের জন্য আরও অধীর হইয়া উঠে। বহু জিলা হইতে ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন অবিলম্বে শুরু করিবার জন্য গান্ধীজীর নিকট নির্দেশ চাহিয়া পাঠান হয় এবং জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে অন্ধ্রের গুণ্টুর জিলায় গান্ধীজীর নির্দেশ না লইয়াই ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন শুরু হইয়া যায়। ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন যে কত কার্যকরী, শাসন-ব্যবস্থা অচল করিয়া ফেলিবার পক্ষে এই আন্দোলনের শক্তি যে কতখানি তাহা একমাত্র গুণ্টুর জিলার আন্দোলন হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কারণ, শান্তির সময়ে এই জিলায় জানুয়ারী মাসে ট্যাক্স আদায় হইত পনর লক্ষ টাকা, আর এবার সরকার শত চেষ্টা করিয়াও চারি লক্ষ টাকার বেশী ট্যাক্স আদায় করিতে পারিল না। আন্দোলনের এই অভাবনীয় সাফল্যে জনসাধারণ উৎসাহে জ্বলিয়া উঠে, আর মাদ্রাজ-সরকার আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়ে। তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব

হইল না যে, যখন কেবল একটি জিলাতেই এই অবস্থা ঘটিয়াছে, তখন এই আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িলে ভারতের ইংরেজ-শাসন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িবে।

শাসকদের ভয় আরও শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া জনসাধারণ ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত সংগ্রামের পথে নামিয়া পড়িয়াছে। "শহরের নিম্নতম শ্রেণীগুলি অসহযোগ-আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে যোগদান করিয়াছে···কতকগুলি অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া আসাম-উপত্যকায়, যুক্তপ্রদেশে, বিহারে ও উড়িষ্যায় ব্যাপকভাবে কৃষকগণ সংগ্রাম শুরু করিয়াছে। পাঞ্জাবে আকালী-আন্দোলন গ্রামাঞ্চলে শিখ-কৃষকদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সারা ভারতের মুসলমান-জনসাধারণের একটা বিরাট অংশ ক্রুদ্ধ ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।···গুরুতর সম্ভাবনার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে।···সরকারকে পূর্বে যে সকল গুরুতর অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে এবার সরকার তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী গুরুতর অবস্থার জন্য তৈরী হইয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বর্তমান অবস্থার ফলে যে গভীর আতঙ্ক দেখা দিয়াছে তাহা গোপন করিয়া লাভ নাই"।(১)

কিন্তু গান্ধীজী সম্ভবতঃ তখনও এতদূর অগ্রসর হইতে প্রস্তুত ছিলেন না, হয়ত তিনি তখনও ইংরেজ-শাসকদের "শুভবুদ্ধি"র উপর নির্ভর করিতে চাহিয়াছিলেন। অন্যদিকে, সম্ভবতঃ তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিয়াছিল যে, ট্যাক্স-বন্ধের আন্দোলন কিছুতেই অহিংসার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না এবং ট্যাক্স বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে চিরবিক্ষুব্ধ কৃষকগণ জমিদারের খাজনাও বন্ধ করিয়া দিবে। তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, কৃষকগণ একবার একই সঙ্গে ট্যাক্স ও খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করিলে তাহাদের মধ্যে যে উৎসাহের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে তাহা অহিংসার শর্ত মানিয়া চলিবে না এবং তাহা তাঁহার ও কংগ্রেসের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া সর্বত্র রক্তাক্ত সংগ্রামের সৃষ্টি করিবে।

(১) Telegraphic Report from Viceroy to Secretary of States for India, February 9, 1922—Quoted from R. P. Dutt's 'India To-day', P. 327.

সুতরাং গুণ্টুরের ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন আরও উগ্র আকার ধারণ করিবার পূর্বেই গান্ধীজী রাশ টানিলেন। তিনি অবিলম্বে অন্ধ্র ও গুণ্টুরের কংগ্রেস-নেতাদের নিকট প্রেরিত এক পত্রে এই "অবাধ্যতা ও শৃংখলা ভঙ্গের জন্য" তাঁহাদের তিরস্কার করিয়া অবিলম্বে কড়ায়-গণ্ডায় হিসাব করিয়া সকল ট্যাক্স সরকারের হস্তে অর্পণ করিবার নির্দেশ দেন। উৎসাহ-চঞ্চল জনসাধারণ গান্ধীজীর এই নির্দেশে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত হতভম্ব হইয়া যায়।

১৯২২ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী বড়লাটকে এক চরম পত্র দিয়া জানাইয়া দেন যে, যদি অবিলম্বে রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া না হয় এবং দমন-নীতি বন্ধ করা না হয় তবে তিনি দলবদ্ধভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার নিজ প্রদেশ গুজরাটের বার্দৌলি নামক একটি ক্ষুদ্র জিলায় পরীক্ষামূলকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিভাবে অহিংসার আদর্শ অনুসারে আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা করা যায় তাহা ভারতের জনসাধারণকে দৃষ্টান্ত দ্বারা শিক্ষা দেওয়াই ছিল বার্দৌলি-সত্যাগ্রহের উদ্দেশ্য এবং ইহার জন্য গান্ধীজী বার্দৌলি জিলাকে আদর্শ সংগ্রাম-ক্ষেত্ররূপে নির্বাচিত করেন।

বার্দৌলি জিলায় অহিংস সত্যাগ্রহের পরীক্ষা সফল হইলে গান্ধীজী সম্ভবতঃ সারা ভারতবর্ষে এই ধরণের আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবার নির্দেশ দিতেন। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের চৌরিচৌরা গ্রামের কৃষকদের রক্তাক্ত সংগ্রামের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অবিলম্বে এই ঐতিহাসিক সংগ্রাম বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১লা ফেব্রুয়ারী গান্ধীজী বড়লাটকে যে চরম পত্র প্রেরণ করেন তাহা বড়লাটের হাতে পৌছিতে না পৌছিতে চৌরিচৌরার সংবাদ গান্ধীজী অবগত হন। যুক্তপ্রদেশের একটি ছোট গ্রাম চৌরিচৌরার কৃষকগণ গান্ধীজীর সংগ্রামের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হইয়া সরকারের ট্যাক্স ও জমিদারের খাজনা বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ এই সংবাদে ক্ষিপ্ত হইয়া গ্রামের কৃষক-জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে এবং তাহার ফলে বহু কৃষক হতাহত হয়। পুলিশদল তাহাদের শেষ গুলিটি পর্যন্ত

ছুঁড়িয়া থানায় ফিরিয়া যায়। কৃষকগণ এই অন্যায় অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষিপ্ত হইয়া থানা আক্রমণ করে এবং থানার দারোগাদের সহিত বাইশ জন পুলিশকে হত্যা করিয়া উহা আগুন দিয়া ভস্মীভূত করে।

এই সংবাদে গান্ধীজী এত আতঙ্কিত ও মর্মাহত হন যে, তিনি আর সারা ভারতব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করিবার কথা চিন্তাও করিতে পারেন নাই। তিনি চৌরিচৌরার ঘটনাকে "জঘন্যতম অধঃপতন" বলিয়া অভিহিত করিয়া বলেন যে, ইহা তাঁহার "পর্বত-প্রমাণ ভুল"-এর নিষ্ঠুরতম পরিণতি। সুতরাং তিনি "ঈশ্বর ও মানবতা"র নিকট মাথা নত করিয়া "অন্তরের বাণী"র নির্দেশ অনুসারে সংগ্রাম প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত করেন। গান্ধীজীর জরুরী আহ্বানে ১২ই ফেব্রুয়ারী বার্দৌলিতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান করা হয় এবং ওয়ার্কিং কমিটি কেবল আইন অমান্যই নয়ে; এমনকি সমগ্র আন্দোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত করেন এবং সংগ্রামের পরিবর্তে সুতাকাটা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, চিত্তশুদ্ধি ও শিক্ষা-প্রচারের একটি "গঠনমূলক কর্মসূচী" গ্রহণ করেন। আন্দোলন বন্ধের সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচীর ঘোষণা শুনিয়া ভারতের সংগ্রামেচ্ছু ও মহাত্মাজীর অহিংসার উচ্চ দার্শনিক তত্ত্বে অজ্ঞ জনসাধারণ বিস্ময়ে ও হতাশায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। গান্ধীজী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সংগ্রাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের পক্ষে যুক্তিযুক্ত হয় নাই এবং এই সিদ্ধান্তের ফলে সারা দেশ হতাশায় ভরিয়া যাইবে। তাই তিনি তাঁহার 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন:

"আমি জানি যে, সমগ্র আক্রমণাত্মক কর্মসূচী আকস্মিকভাবে নাকচ করা রাজনৈতিক দিক হইতে যুক্তিসঙ্গত ও বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই, কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে ধর্মের দিক হইতে উচিত হইয়াছে।"(১)

গান্ধীজীর এই ব্যাখ্যা সাধারণ লোক বুঝিল কিনা সন্দেহ। তাহাদের মনে হতাশা গভীরতর হইয়া উঠিল। গান্ধীজীর প্রধান সহকর্মী চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপত রায় জেল হইতে তাঁহার এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ

(১) 'Speeches and Writings',—Compiled by G. A. Natesson & Co.

করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু গান্ধীজী তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। ২৪শে ফেব্রুয়ারী দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে কয়েকজন সদস্য গান্ধীজীর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিলে তিনি শান্ত অথচ কঠোর ভাষায় বলিলেন :

"আমি কি একটা অর্থহীন পরীক্ষা-কার্য চালাইতেছি ?" "আজ দেশভক্তি অহিংসা ও সত্যের নীতির প্রতি অবিচল ও একনিষ্ঠ অনুরক্তি দাবি করিতেছে। ঐ সকল আদর্শে যাহাদের বিশ্বাস নাই তাহাদের পক্ষে কংগ্রেস-সংগঠন হইতে সরিয়া যাওয়া উচিত।"(১)

অহিংসার আদর্শে অজ্ঞ ও শিক্ষাহীন জনসাধারণ হতাশ হইয়া ধীরে ধীরে কংগ্রেসের সংগঠন হইতে সরিয়া দাঁড়াইতে থাকে, সারা দেশ এক অতলস্পর্শী হতাশায় নিমজ্জিত হয়। ১৯২১ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় এক কোটি, আর ১৯২৩ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে যখন হিসাব গ্রহণ করা হয় তখন দেখা যায় যে, সভ্য-সংখ্যা কমিয়া গিয়া মাত্র দুই লক্ষে দাঁড়াইয়াছে।

এদিকে আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার ফলে সরকারের আতঙ্ক কাটিয়া গেল, তাহারা যখন বুঝিল যে আর ভয়ের কারণ নাই, আপাততঃ জনসাধারণের আক্রমণ-শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা অবিলম্বে আক্রমণ আরম্ভ করিল। ১০ই মার্চ গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন এবং এক সপ্তাহ পরে তিনি ছয় বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। জনসাধারণের মধ্যে হতাশা এতই গভীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, যে জনসাধারণ ১৯২০ খৃস্টাব্দে তাহাদের প্রিয়তম নেতার গ্রেপ্তারের গুজব শুনিবামাত্র সরকারের উপর চরম আঘাত দিতে উদ্যত হইয়াছিল সেই জনসাধারণ এবার তাঁহার গ্রেপ্তার ও দীর্ঘ কারাদণ্ডের পরেও একটি অঙ্গুলিও তুলিল না।

ভারতের ঐতিহাসিক গণ-সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত হইবার ঠিক পূর্বক্ষণেই আকস্মিকভাবে প্রত্যাহৃত হইল। সেই ঐতিহাসিক সংগ্রামের মহানায়ক মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ কালের জন্য কারান্তরালে চলিয়া গেলেন। জনসাধারণ গান্ধীজীর

(১) 'Speeches and Writings'—Compiled by G. A. Natesson

রহস্যময় ক্রিয়াকলাপের গূঢ় অর্থ ও উহাদের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজিয়া না পাইয়া বিস্ময়ে ও হতাশায় মুহ্যমান হইল। সারা ভারতবর্ষে যেন শ্মশানের নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল, আর সেই শ্মশানের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত গান্ধীজীর এক তেজোদৃপ্ত উক্তি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সেই উক্তি হইল বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতের ক্ষান্তিহীন মুক্তি-সংগ্রামের ঘোষণা। সেই সংগ্রামের সাময়িক বিরতি আছে, ছেদ আছে, পলায়নও আছে, কিন্তু পূর্ণ মুক্তি-লাভের পূর্বে তাহার পরিসমাপ্তি নাই। মহাত্মা গান্ধী তাঁহার বিচারকালে বৃটিশ শাসকদের দাম্ভিক আস্ফালনের জবাবে যে ঘোষণা করিয়া যান সেই ঘোষণার ইহাই প্রকৃত তাৎপর্য। বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠীর দুই ধুরন্ধর লর্ড বার্কেনহেড ও মিঃ মণ্টেগু গান্ধীজীর সংগ্রাম প্রত্যাহারের সংবাদে সাহসী হইয়া এক টেলিগ্রাম মারফত ধৃষ্টতার সহিত ঘোষণা করেন: "পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা দৃঢ়সংকল্প জাতির (বৃটিশের) বিরোধিতা করিয়া ভারতবর্ষ কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।" এই দাম্ভিক আস্ফালনের জবাবে গান্ধীজী তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত-কঠিন ভঙ্গিতে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মূল রণধ্বনি ঘোষণা করিলেন—অত্যাচারী বৃটিশ শাসকদের সহিত আপস নাই। ২৩শে ফেব্রুয়ারী তিনি এক পত্র দ্বারা জবাব দিলেন:

"যতদিন বৃটিশ-সিংহ উহার রক্তাক্ত নখর আমাদের মুখের উপর উচাইয়া রাখিবে ততদিন তাহাদের সহিত আপস কিরূপে সম্ভব? ......এখন বৃটিশ জনসাধারণের উপলব্ধি করিবার সময় আসিয়াছে যে, ১৯২০ খৃস্টাব্দে যে সংগ্রাম শুরু হইয়াছে তাহা একমাস চলুক, এক বৎসর চলুক অথবা কয়েক মাস চলুক কিংবা কয়েক বৎসর চলুক, তাহাই চূড়ান্ত সংগ্রাম। আমি কেবল এই আশা ও প্রার্থনা করি, ভগবান ভারতবর্ষকে যথেষ্ট নম্রতা ও শক্তি দান করুন যেন ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত অহিংস থাকিতে পারে।"...(১)

গান্ধীজী সংগ্রাম প্রত্যাহার করিবার ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পর চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে

(১) Speeches and Writings'—Compiled by G. A. Natesson.

আসেন। তাঁহাদের অনেকে জেলে থাকিয়াই গান্ধীজীর সংগ্রাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিয়াছিলেন এবং গান্ধীজীর নেতৃত্বের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাহিরে আসিবার পর তাঁহাদের একটা বিরাট অংশ মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে "আইন-সভার নির্বাচনে যোগদান ও আইন-সভায় যাইয়া মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার বানচাল করিবার জন্য" আইন-সভার মধ্যে সংগ্রাম চালাইবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নূতন দল গঠন করেন। এই দলই 'স্বরাজ্য পার্টি' নামে খ্যাত।

বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ

এইভাবে যখন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস নূতন গণ-সংগ্রামের ঝড় তুলিয়া জয়ের পূর্বক্ষণে সেই সংগ্রাম আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করিল, সারা দেশ এক অতলস্পর্শী হতাশার অন্ধকারে ডুবিয়া গেল এবং কংগ্রেস-নেতৃত্বের এক বিরাট অংশ আপাততঃ আর গণ-সংগ্রামের সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া আইন-সভায় গিয়া সংগ্রাম চালাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এই চরম সংকটের সময় বিপ্লবের পথে স্বাধীনতা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার জন্য ভারতের শিক্ষিত যুব-সম্প্রদায় নূতন উদ্যোগ শুরু করিল।

আমরা দেখিয়াছি, বৃটিশ-শাসকদের সামগ্রিক আক্রমণে প্রথমবারের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরাজিত হইয়াছিল। মহাযুদ্ধের অবসানে বিপ্লবী নায়ক ও কর্মীদের অনেকেই দ্বীপান্তর ও দেশের কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত গণ-সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা তখন গান্ধীজীর প্রদর্শিত গণ-সংগ্রামের নূতন পথকে স্বাধীনতা লাভের পথ এবং এই সংগ্রামকে চূড়ান্ত সংগ্রাম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারপর সেই সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিয়া জয়ের নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অকস্মাৎ বন্ধ হইয়া গেল। বিপ্লবীরা গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সেই সংগ্রামের এই পরিণতিতে উপহাস করিয়া "পর্বতের মূষিক প্রসব" আখ্যা দিয়া পুনরায় আপসহীন, পলায়নহীন

বৈপ্লবিক সংগ্রামের পথে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তারপর শুরু হইল স্বাধীনতা-সংগ্রামের আর এক নূতন অধ্যায়—ভারতের দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা। বিপ্লবীদের সেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ্যে কংগ্রেসের "স্বরাজ"-এর (১) দাবির মত অস্পষ্টতা নাই, বিপ্লবীদের সংগ্রামের লক্ষ্য ধোঁয়াচ্ছন্ন নহে,—সেই সংগ্রামের লক্ষ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের সংগ্রামে এমনকি চূড়ান্ত পর্যায়েও দ্বিধা-ভয় আছে, জয়লাভের মুহূর্তে পলায়ন আছে, কিন্তু বিপ্লবীদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরাজয় থাকিলেও পলায়নের প্রশ্ন নাই, আছে শেষ পর্যন্ত সংগ্রামে নিঃশেষে আত্মদান। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ও সংগ্রাম-পদ্ধতিতে বিপ্লবীদের আস্থা ও ভরসা না থাকিলেও তিনি কারারুদ্ধ হইবার পূর্বে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের যে রণ-ধ্বনি ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন তাহা বিপ্লবীদেরও রণ-ধ্বনি; সেই রণ-ধ্বনিই এবার বৈপ্লবিক সংগ্রামের অগ্নিশিখারূপে হতাশার অন্ধকারে আচ্ছন্ন ভারতের আকাশ আলোকিত করিয়া তুলিল। হতাশাচ্ছন্ন ভারতবাসী সেই বৈপ্লবিক সংগ্রামের বজ্র-নিনাদ হইতে নূতন করিয়া শুনিল মহাত্মা গান্ধী দ্বারা ঘোষিত ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সেই রণ-ধ্বনি—"অত্যাচারী বৃটিশ-শাসকদের সহিত আপস নাই"।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯২০—২৮ খৃস্টাব্দ)

বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা

মহাযুদ্ধের অবসানে ১৯২০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে রাজকীয় ঘোষণা অনুসারে বিপ্লবীরা কারাগার প্রভৃতি হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসিলেন। তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে সারা ভারতবর্ষে এক বিরাট গণ-সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে। গান্ধীজীর অহিংসার নীতিতে বিপ্লবীদের কোন বিশ্বাস না থাকিলেও তাঁহারা এই গণ-সংগ্রামের নূতন পথ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া ইহাকে একবার পরীক্ষা করিবার জন্য ইহাতে সকল শক্তি লইয়া যোগদান করেন। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও তাঁহার আদর্শ সম্পূর্ণ নূতন, কাজেই গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও আদর্শ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সুযোগ পূর্বে তাঁহাদের ঘটে নাই। তাঁহার জন্যই বিপ্লবীরা এই সংগ্রামে যোগদান করেন। কিন্তু গান্ধীজীর অহিংসার নীতি তাঁহারা কোন দিনই গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা মনে করিতেন যে, গান্ধীজীর আদর্শ অনুযায়ী নৈতিক শক্তির নিকট পশু-শক্তি কোন দিন আপনা হইতে মাথা নত করিবে, "বৃটিশ-সিংহ তাঁহার রক্তাক্ত নখর" গুটাইয়া "অহিংস ভারতবাসীর পদতলে লুটাইয়া পড়িবে এবং ভারতবাসীদের হস্তে স্বেচ্ছায় স্বাধীনতা দান করিয়া ইংলণ্ডে প্রস্থান করিবে—ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব ও অবাস্তব।"(১) তবু একবার পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা গান্ধীজীর নূতন সংগ্রামে যোগদান করেন।

বহু বিপ্লবী নেতা অহিংস-নীতিতে বিশ্বাস না করিলেও গান্ধীজীর পরিচালিত সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত

---

(১) শচীন্দ্রনাথ সান্যাল: 'বন্দী-জীবন', ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।

করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারা তাঁহাদের অদম্য চেষ্টা ও অসাধারণ কর্মশক্তি-দ্বারা বিভিন্ন জিলার কংগ্রেস-সংগঠন সজীব ও সক্রিয় করিয়া তুলিতে সক্ষম হন এবং কংগ্রেস-নেতা হিসাবে জনসাধারণের শ্রদ্ধা লাভ করেন। বিপ্লবী নেতাদের অনেকে নিজ নিজ জিলার কংগ্রেস-সংগঠনের প্রধান পরিচালকের পদ লাভ করিতেও সক্ষম হন। প্রধানতঃ বিপ্লবীদের চেষ্টাতেই বাংলাদেশে 'জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠিত ও তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই বাহিনীর বহু স্বেচ্ছাসেবক বিপ্লবীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বৈপ্লবিক দলে যোগদান করিয়াছিল। এইভাবে বাংলাদেশের কংগ্রেস বিপ্লবীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং সেই প্রভাব শেষ পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকে।

১৯২১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত আমেদাবাদ-কংগ্রেসের পর হইতেই অসহযোগ-আন্দোলনের গতিবেগ মন্দীভূত হইয়া আসিতে থাকে এবং ১৯২২ খৃস্টাব্দের ১২ ফেব্রুয়ারী সমগ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। ইহার ফলে দেশ জুড়িয়া একটা অবসাদের ভাব দেখা দেয়। এত আশা, এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয়, এত দুঃখ-কষ্ট, এত আত্মত্যাগ সবই বৃথা বলিয়া মনে হয়। "মহাত্মা গান্ধীর এক ইঙ্গিতে আর ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কর্মের তড়িৎ-প্রবাহ খেলিয়া যায় না। পরাজয়ের গ্লানি মাথায় করিয়া একটা যুদ্ধ-ক্লান্ত জাতি অঘোরে ঘুমাইতেছে। আর কে তাহাকে জাগাইয়া তুলিবে? যুদ্ধের দামামা শুনিয়া যে সমস্ত তরুণ প্রাণ উৎসাহে বিদ্যালয় ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল তাহারা যুদ্ধ স্থগিত হওয়ায় আবার বিদ্যালয়ে ফিরিয়া গিয়াছে। আইন-ব্যবসায়ীরা......আদালতে ফিরিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ইতিপূর্বে সৈন্যধ্যক্ষ হইয়া বৃটির-শক্তির বিরুদ্ধে স্বরাজ-সৈন্য পরিচালনা করিতেছিলেন তাঁহারা কাউন্সিল-এসেম্ব্লির আরাম-কেদারায় যুদ্ধ-ক্লান্ত দেহকে বিশ্রাম করাইতেছিলেন। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে খাঁটি কর্মিগণও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। অসহযোগ-আন্দোলনের পুরোহিত 'পরাজিত ও নতশির' হইয়া সবরমতী আশ্রমে গঠনমূলক প্রচারে

আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। দেশ জুড়িয়া জড়তা, আর কে এই জড়তা ভাঙ্গিয়া জাতিকে জাগাইয়া তুলিবে?”(১)

দেশের ভাঙ্গাহাটে বিপ্লবীরা আগাইয়া আসিলেন তাঁহাদের অগ্নিমন্ত্র দিয়া দেশকে জাগাইয়া তুলিতে, দেশ-জোড়া হতাশা ও জড়তা কাটাইয়া তাঁহাদের নিজস্ব পন্থায় আবার স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু করিতে। পুরাতন বিপ্লবীরা আবার সমবেত হইতে থাকেন, আলাপ-আলোচনা শুরু হইয়া যায়, সারা বাংলাদেশ জুড়িয়া আবার ছত্রভঙ্গ বিপ্লবী সমিতিগুলিকে পুনর্গঠিত করিবার চেষ্টা চলিতে থাকে, সারা বাংলাদেশ ব্যাপিয়া আবার বৈপ্লবিক কর্মচাঞ্চল্য জাগিয়া উঠে।

* * * *

১৯২০-২১ খৃস্টাব্দ

সংগঠন ও প্রচার

কংগ্রেস-আন্দোলনের মধ্য দিয়া জনসাধারণ ও কংগ্রেস-সংগঠনের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছিল এবং বিপ্লবী নেতাদের অনেকেই ইতিমধ্যে বিভিন্ন জিলার কংগ্রেস-সংগঠনের পরিচালকের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এবার তাঁহাদের সেই প্রভাব কাজে লাগাইয়া বিপ্লবী-দলগুলিকে দ্রুত পুনর্গঠিত করিতে থাকেন। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে গঠিত ও নেতৃত্বে পরিচালিত ‘জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী’র বহু কর্মী বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিয়া বৈপ্লবিক দলে যোগদান করে। বিপ্লবীরা প্রথম বিপ্লব-প্রচেষ্টার সময় যে ভাবে ব্যায়াম-সমিতি, ‘আশ্রম’ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার মারফত বিপ্লবীদলের সভ্য সংগ্রহ করিতেন এবারেও সেইভাবে ব্যায়াম-সমিতি ও ‘আশ্রম’ গড়িয়া তোলা হয়। সারা বাংলাদেশে অল্প সময়ের মধ্যে শত শত ব্যায়াম-সমিতি ও আশ্রম গড়িয়া উঠে। পূর্বের মত এবারেও অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতি সুপরিকল্পিত ভাবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গোপন প্রচার-কার্য চালাইতে থাকে। এবারে যুবক ও ছাত্রগণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী

(১) মনীন্দ্র রায়: কাকোরী ষড়যন্ত্র’, পৃঃ ৫১-৫২।

সংখ্যায় বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদান করে, কারণ ইতিমধ্যে কয়েকটি ব্যাপক গণ-সংগ্রামের ফলে ছাত্র ও জনসাধারণের মধ্যে জাতীয় চেতনা বিশেষভাবে বিস্তার লাভ করিয়াছিল এবং কংগ্রেস কর্তৃক ১৯২১ খৃস্টাব্দের বিরাট গণ-সংগ্রাম আকস্মিকভাবে প্রত্যাহার করিবার ফলে যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে বৈপ্লবিক মতবাদের দিকে ঝোঁক বাড়িয়া গিয়াছিল।

এদিকে বৃটিশ-শাসকগণও ভারতীয়দের শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের সদিচ্ছার নমুনা হিসাবে কতকগুলি দমননীতিমূলক আইন প্রত্যাহার করিয়া লয়। ১৯২১ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে 'মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার' প্রবর্তিত হইবার পর শাসকগণ তাহাদের সদিচ্ছা জাহির করিবার উদ্দেশ্যে '১৯১১ খৃস্টাব্দের রাজদ্রোহমূলক সভা-সমিতি আইন' ও '১৯০৪ খৃস্টাব্দের ভারতীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন' ব্যতীত আর সকল আইন, এমনকি 'রাউলাট-আইন' পর্যন্ত তুলিয়া লওয়া হয়। ইহার ফলে সংবাদপত্রে প্রকাশ্য-ভাবে প্রচার-কার্য চালনার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়।

১৯২২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে গান্ধীজীর গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের পর হইতে বিপ্লবীদের প্রচার ও সংগঠনিক প্রচেষ্টা বিশেষভাবে বাড়িয়া যায়। ১৯২২ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বাৎসরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলার কংগ্রেসের পরিচালকরূপে বিপ্লবী নেতারা যোগদান করেন। কংগ্রেস-অধিবেশনের আড়ালে বিভিন্ন জিলার বিপ্লবীদেরও একটি সম্মেলন হয়। সেই সম্মেলনে অবিলম্বে গুপ্ত দলগুলি পুনর্গঠিত করিয়া বৈপ্লবিক সংগঠন শুরু করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সম্মেলনের পর হইতে বাংলাদেশের দুইটি প্রধান সমিতি—অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতি—পূর্ণোদ্যমে দলের পুনর্গঠন ও প্রচার-কার্য শুরু করে।

পূর্বের মত এবারেও যুগান্তর সমিতি বৈপ্লবিক প্রচার-কার্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেয়। সমিতির চেষ্টায় বহু নূতন নূতন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সকল পত্রিকায় বৈপ্লবিক প্রচারকার্য

চলিতে থাকে। ১৯২১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে 'ভারতীয় প্রেস-আইন' তুলিয়া লইবার পর মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে 'আত্মশক্তি', 'সারথী', 'মুক্তিকাম', 'বিজলী' প্রভৃতি বহু বৈপ্লবিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকায় অবিলম্বে ভারতের বৃটিশ-শাসকদের উচ্ছেদের উদ্দেশ্যে দেশের যুব-ছাত্র-শক্তিকে বৈপ্লবিক সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান জানাইয়া বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে থাকে। "সাধারণতঃ এই সকল রচনায় ভারতে বৃটিশ-রাজের আর্থিক শোষণের উচ্ছেদ, ধর্মীয় ও কাব্যিক ভাষায় স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের জয়গান এবং জ্বালাময়ী ভাষায় বিপ্লবীদের আদর্শ প্রচার করা হইত। এই শেষোক্ত বিষয়টি এবারের বৈপ্লবিক প্রচারের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ায়।..." (১)

১৯২৩ খৃস্টাব্দের সংবাদপত্র সংক্রান্ত একটি সরকারী রিপোর্ট হইতে এই সময়ের বৈপ্লবিক প্রচারের নমুনা পাওয়া যায়ঃ

"আলোচ্য বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল পুরাতন বিপ্লবীদের প্রকাশ্য প্রশংসা-মুখর অসংখ্য রচনা। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই বিপ্লবীদের 'আত্মত্যাগী' ও 'দৃঢ়সংকল্প' আখ্যায় ভূষিত করিয়া বলা হয় যে, ইঁহারাই একদিন নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়া দেশের মধ্যে প্রাণ-প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন। 'প্রবর্তক' পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে কানাইলাল দত্তকে (আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোস্বামীর হত্যাকারী) বাংলার আদর্শ বলিয়া প্রচার করে। এই রচনাগুলি ছিল বর্ণনামূলক। ইহা ব্যতীত (বালেশ্বরে পুলিশের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে নিহত) যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার চারি জন সঙ্গীর জীবন-কাহিনীও জ্বালাময়ী ভাষায় বর্ণনা করিয়া বহু পত্রিকায় প্রচার করা হয়। অবশ্য এই সকল প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বলা হইত যে, বিপ্লবীদের প্রশংসা করিবার অর্থ ইহা নহে যে তাহাদের পথ অনুসরণ করিতে হইবে। 'সারথী' পত্রিকায় লেখা হয়, 'বিপ্লবীদের সম্পর্কে জনসাধারণের

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Vol. II, Appendix A P. 326.

যে ভুল ধারণা রহিয়াছে তাহা দূর করিতেই হইবে, জনসাধারণকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার জন্য আত্মত্যাগী বীর দেশভক্তদের পুণ্য জীবন-কাহিনী জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরিতে হইবে। আমরা তাঁহাদের পথ অনুসরণ না করিতে পারি, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা তাঁহাদের আত্মত্যাগ, তাঁহাদের বীরত্ব, তাঁহাদের দেশভক্তির প্রতি শ্রদ্ধাও দেখাইতে পারি না' ?"(১)

চট্টগ্রাম সমিতি

এই সময় চট্টগ্রামে একটি নূতন বৈপ্লবিক গুপ্তদল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১৮—১৯ খৃস্টাব্দে সূর্য সেন নামে চট্টগ্রামের এক যুবক এই গুপ্ত দলটি স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ চট্টগ্রামে ইহাই প্রথম সুগঠিত বৈপ্লবিক দল। প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতেই ইহা যুগান্তর সমিতির সহিত যুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে কাজ করিতে থাকে। এই দল ১৯২৩ খৃস্টাব্দের মধ্যেই সারা চট্টগ্রাম জিলার বিভিন্ন স্থানে শাখা-প্রশাখা গড়িয়া তোলে এবং বহু ব্যায়াম-সমিতি স্থাপন করে। ১৯২৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এই দলের বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহরে অবস্থিত আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের প্রধান অফিসে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি করিয়া সর্বপ্রথম পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গুপ্ত দলটিই পরবর্তীকালে ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করে।*

বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ

১৯২৩ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই বিপ্লবী সমিতিগুলির ক্রিয়াকলাপ শুরু হইয়া যায়। ঐ বৎসরের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যুগান্তর সমিতির সভ্যগণ হাওড়া জিলার কোনা নামক স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া কয়েক সহস্র টাকা সংগ্রহ করে। এই ডাকাতিতে বিপ্লবীদের গুলিতে দুই ব্যক্তি নিহত হয়। মে মাসের মাঝামাঝি যুগান্তর সমিতি কলিকাতার উল্টাডাঙ্গা-পোস্টঅফিস

(১) Annual Report on the Indian Newspapers, 1923.

* 'বাংলাদেশে তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা' শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করে। উক্ত বিপ্লবীদল ৩০শে জুলাই তারিখে কলিকাতার গড়পার রোড়ের এক বাড়ীতে ডাকাতি করে। এই ডাকাতিতে এক ব্যক্তি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহার কয়েক দিন পরেই শাঁখারী-টোলা-পোস্টঅফিস লুণ্ঠিত এবং বিপ্লবীদের গুলিতে পোস্টমাস্টার নিহত হয়। এই সকল ডাকাতি সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া পুলিশ সাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে এবং তাহাদের লইয়া নূতন 'আলিপুর ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু করে। কিন্তু ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় সকলেই মুক্তি লাভ করে।

এই ঘটনাগুলি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইঙ্গিত মাত্র। ইহার পর হইতে সারা বাংলায় বিভিন্ন ধরণের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ চলিতে থাকে। বাংলা-সরকার এই সকল ঘটনার কোন কিনারা করিতে না পারিয়া আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া পড়ে। শাসকগণ এবার উন্মত্তের মত আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়। পুরাতন বিপ্লবী নেতাদের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করিয়া '১৮১৮ খৃস্টাব্দের (৩) আইন'-এ আটক রাখা হয়। ইঁহাদের মধ্যে একজন হইলেন তৎকালীন বিপ্লবী যুব-সম্প্রদায়ের মুখপাত্র ও কলিকাতা-কর্পোরেশনের চীফ একজিকিউটিভ অফিসার সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র তখন চিত্তরঞ্জন দাসের সহকারী ও চরমপন্থী নেতারূপে বৃটিশ-শাসকদের ত্রাসের কারণ হইয়া উঠিয়াছেন। কাজেই শাসকগণ সুভাষচন্দ্রকে বিপ্লবীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মনে করিয়া তাঁহাকে '১৮১৮ খৃস্টাব্দের (৩) তিন আইন'-এ আটক করে।

কিন্তু এই সকল গ্রেপ্তার ও আটকের ফলে কোন কাজ হইল না, বরং বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ জোরের সহিত চলিতে থাকে। তখন বাংলার বুকে আবার ১৯০৫ খৃস্টাব্দের মত বিপ্লবের জোয়ার বহিতে শুরু করিয়াছে, কয়েকজন মাত্র বিপ্লবী নেতাকে গ্রেপ্তার ও আটক করিয়া সেই জোয়ার বন্ধ করা সম্ভব নয়। বহু নূতন নেতা আসিয়া আটক নেতাদের শূন্য স্থান পূরণ করেন, বৈপ্লবিক প্রচারে উদ্বুদ্ধ যুবক ও ছাত্রগণ শাসকদের দমননীতির জবাবে বিপ্লবী সমিতিগুলির সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে থাকে।

১৯২৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আসাম-বেঙ্গল রেল-

কোম্পানির চট্টগ্রাম-অফিস হইতে ১৭ হাজার টাকা লুণ্ঠন করে। চারিজন বিপ্লবী রিভালভার-পিস্তলে সজ্জিত হইয়া দিনের বেলায় অফিসে প্রবেশ করিয়া কোষাগার হইতে ঐ টাকা কাড়িয়া লয় এবং দ্রুত অদৃশ্য হইয়া যায়। বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহরের নিকটবর্তী এক গ্রামে জনৈক গৃহস্থের বাড়ীতে আশ্রয় লয়। ঘটনার দশ দিন পর পুলিশ এই বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া কয়েকটি বিদেশী রিভলভার ও পিস্তল এবং বহু গুলি হস্তগত করে। খানাতল্লাসের পর পুলিশ বাড়ীর সকলকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে সশস্ত্র পুলিশের সহিত ঐ বাড়ীতে পলাতক বিপ্লবীদের সমানে গুলি বিনিময় হয় এবং পরে দুইজন যুবক রিভলভার-সহ গ্রেপ্তার হয়। এই ঘটনার পরদিন ডাকাতির প্রধান সাক্ষী বলিয়া কথিত এক ব্যক্তিকে পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য বিপ্লবীরা হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই চেষ্টার পরদিন সন্ধ্যাবেলা যে দারোগাটি একজন বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল তাহাকে চট্টগ্রাম শহরে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দারোগাটি গুলিবিদ্ধ হইয়াও জীবন লইয়া পলাইতে সক্ষম হয়।

এই সময়ে কলিকাতার বিপ্লবীরা কয়েকজন কুখ্যাত গোয়েন্দা-পুলিশ অফিসারকে হত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু গোয়েন্দাদের সতর্কতার জন্য বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় এবং কয়েকজন বিপ্লবী পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই কুখ্যাত পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করিয়া তাহার বহু কুকীর্তির প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে। এই কার্যের জন্য যুগান্তর সমিতি কয়েকজন বাছা বাছা কর্মীকে নিযুক্ত করে।

তাহারা হত্যার জন্য নির্দিষ্ট পুলিশ-কর্মচারীদের কোয়ার্টারের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া সুযোগ খুঁজিতে থাকে। কিন্তু সুচতুর গোয়েন্দারা ইহা বুঝিতে পারিয়া পাল্টা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দ্বারা ঐ বিপ্লবী কর্মীদের গ্রেপ্তার করে। এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত ষোল জন কর্মী পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয় এবং বিপ্লবীদের কয়েকটি গোপন স্থান পুলিশ আবিষ্কার করে।

টেগার্ট-বধের চেষ্টা

বিপ্লবীদের সকল শক্তি চূর্ণ করিবার জন্য বাংলার পুলিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করে। তাহাদের উৎপাতে, বিশেষ করিয়া কুখ্যাত পুলিশ-কমিশনার টেগার্ট সাহেবের চেষ্টায় কলিকাতার বিপ্লবীদের সকল পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা পণ্ড হইবার উপক্রম হয়। এই শয়তান-তুল্য টেগার্টকে হত্যা করিবার জন্য কলিকাতার বিপ্লবীরা বিশেষ চেষ্টা শুরু করে। নূতন কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিযুক্ত হয়। তাহারা টেগার্টের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকে। গোপীনাথ সাহা নামক এক যুবকও এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। গোপীনাথ কোন ক্রমে জানিতে পারেন যে টেগার্ট প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময়ে চৌরঙ্গির কোন পানালয়ে যায়। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী গোপীনাথ উক্তস্থানে যাইয়া টেগার্টের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে উক্ত-স্থানে একখানা মোটর গাড়ী হইতে একজন ইংরেজ সাহেব অবতরণ করিবামাত্র গোপীনাথ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন এবং ইংরেজ-সাহেবের মৃতদেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। গোপীনাথও ঘটনাস্থলেই পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। পরে যখন গোপীনাথ শুনিলেন যে নিহত ব্যক্তি টেগার্ট নহে, ডে নামক অপর একজন ইংরেজ-সাহেব, তখন এই ভুলের জন্য গোপীনাথের অনুশোচনার সীমা রহিল না।

ইহার পর বিচারে গোপীনাথের ফাঁসীর আদেশ হয়। ফাঁসীর আদেশ শুনিয়া গোপীনাথ দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন—"আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার বীজ ছড়িয়ে দিবে।" বিপ্লবী গোপীনাথ ইংরেজ-রাজের ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ বিসর্জন দিয়া বাংলার যুবসমাজের সম্মুখে স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগের এক জলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার জলন্ত ঘোষণা সারা বাংলা ও ভারতের স্বাধীনতাকামী যুবকদের প্রেরণার উৎস হইয়া রহিয়াছে।

গোপীনাথের আত্মত্যাগ ও ঘোষণা এমন কি কংগ্রেসের শ্রেষ্ঠ নেতাদেরও

শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছে। চিত্তরঞ্জন দাস নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে বাংলার এই বিপ্লবী বীরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া এক প্রস্তাব তুলিলে উপস্থিত সদস্যগণের প্রায় অর্দ্ধেক এই প্রস্তাবের স্বপক্ষে ভোট দেন। জুন মাসে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সিরাজগঞ্জ-অধিবেশনে বিপুল ভোটাধিক্যে বীর বিপ্লবী গোপীনাথের আদর্শ ও আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

নূতন ধরনের বোমা

১৯২৪ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে পুলিশ কলিকাতায় এক বিরাট বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এই কারখানায় বোমা তৈরীর আয়োজন ছিল বিরাট, বোমাগুলিও ছিল সম্পূর্ণ নূতন ও ইতিপূর্বে বাংলাদেশে যে সকল বোমা তৈরী হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বহুগুণ উন্নত ধরণের। সরকারী মতে :—

বোমার কারখানাটি ছিল "বহুসংখ্যক বোমা তৈরীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল যন্ত্রপাতি ও বিপুল পরিমাণ বারুদ এবং বহুসংখ্যক বোমার খোলে পরিপূর্ণ। কারখানার মধ্যে বহু বারুদ-পূর্ণ বোমা ও বহু বোমার শূন্য খোল পাওয়া যায়। এই সকল বোমা ইহাই প্রমাণ করে যে, বিপ্লবীরা বোমা তৈরীর ক্ষেত্রে পূর্বাপেক্ষা বহু দূর অগ্রসর হইয়াছে।"(১) এই সময়ে ফরিদপুর জিলার মাদারীপুর শহরে বোমা তৈরীর সময় একটি বোমা বিস্ফোরিত হইবার ফলে একজন বিপ্লবী নিহত হয়।

এই বৎসরের জুলাই মাস হইতে 'লাল বাংলা' শীর্ষক একটি বৈপ্লবিক ইস্তাহার নিয়মিতভাবে কলিকাতার রাস্তায় বিলি করা হইতে থাকে। ইস্তাহারখানি সারা শহরে নূতন চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে। ইহার প্রথম সংখ্যায় অত্যাচারী পুলিশ-অফিসারদের হত্যার উদ্দেশ্য ও সংকল্প ঘোষণা করা হয়। আগস্ট মাসে

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Appendix A, Vol. II, P. 328.

মির্জাপুর স্ট্রীটের একটি খদ্দরের দোকানে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। দোকানের মালিক পুলিশকে বিপ্লবীদের গোপন সংবাদ যোগাইত বলিয়া বিপ্লবীরা জানিতে পারিয়াছিল। তাই দোকানের মালিককে হত্যার জন্যই বোমা নিক্ষেপ করা হয়। বোমা নিক্ষেপকারী ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয় এবং দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ইহা ব্যতীত জুলাই ও অক্টোবরের মধ্যে পাঁচজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্মচারীকে হত্যার চেষ্টা হয়। কিন্তু গোয়েন্দা-পুলিশের বিশেষ সতর্কতার ফলে এই সকল চেষ্টা সফল হয় নাই।

দমন-আইন

বিপ্লবীদের ক্রিয়াকলাপের ফলে শাসকগণ কিরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহা সরকারী বিবরণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

"১৯২৪ খৃস্টাব্দের শেষদিকে অবস্থা বিশেষ উদ্বেগজনক হইয়া উঠে। তখন দেশের মধ্যে যে একটা ব্যাপক বৈপ্লবিক সংগ্রাম গড়িয়া উঠিতেছিল তাহাতে কোন সন্দেহ ছিল না। এমনকি স্বরাজ-দলের নেতা চিত্তরঞ্জন দাস স্বয়ং ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই সংগ্রামের শক্তি প্রতিদিনই বাড়িয়া যাইতে থাকে এবং ১৯১৬ খৃস্টাব্দের পূর্ব সময়ের মত এবারেও ইহা সাধারণ ব্যবস্থা দ্বারা দমন করা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং স্থানীয় সরকার বড়লাটের নিকট 'অর্ডিনান্স' (বিশেষ আইন) জারি করিবার ক্ষমতা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। এই 'অর্ডিনান্স'-এর দ্বারা সরকার যে বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে তাহা যুদ্ধকালীন 'ভারত-রক্ষা আইন'-এরই অনুরূপ।"(১)

অবিলম্বে 'অর্ডিনান্স' জারি করা হয়। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সরকার এই 'অর্ডিনান্স'কে সাধারণ আইনে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক আইন-সভায় একটি আইনের খসড়া উপস্থিত করে। কিন্তু আইন-সভায় উহা পাশ না হওয়ায় বাংলার গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা বলে ইহাকে

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Vol. II, Appendix A, P. 328.

পাঁচ বৎসরের জন্য স্থায়ী করা হয়। 'অর্ডিনান্স' জারি হইবার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকে গ্রেপ্তার শুরু হইয়া যায়। ১৯২৬ খৃস্টাব্দের মে মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের ১৮৭ জন বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে '১৮১৮ খৃস্টাব্দের (৩) তিন আইন' ও 'অর্ডিনান্স' অনুসারে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়। সুভাষচন্দ্র বসুকেও এই আইনে আটক রাখা হয়। ইহা ব্যতীত বহু লোককে গ্রামে গ্রামে অন্তরীণ এবং বহু লোকের গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই দমননীতির প্রয়োগের ফলে এই সময়ের বৈপ্লবিক সংগ্রাম একরূপ বন্ধ হইয়া যায়।

দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা

এই সময়ে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল দক্ষিণেশ্বরে একটি বিরাট বোমার কারখানা আবিষ্কার এবং দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা ও পুলিশের স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের হত্যা। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ১০ই নভেম্বর পুলিশ দক্ষিণেশ্বরের এক বাড়ীতে একটি বিরাট বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এখানে যুক্তপ্রদেশের 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এর রাজেন লাহিড়ী, অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজন বিপ্লবী কর্মী গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদের লইয়া বিখ্যাত 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা' শুরু হয় এবং নয় জন দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করেন। ইহার কিছুদিন পরেই এই মামলার প্রধান আসামী রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীকে যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত 'কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা'(১) উপলক্ষে যুক্তপ্রদেশে লইয়া যাওয়া হয় এবং বাকী সকলকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে রাখা হয়।

ভূপেন্দ্র চ্যাটার্জির হত্যা

রায়বাহাদুর ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তখন গোয়েন্দা-বিভাগের একজন বড়-কর্তা—স্পেশাল সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। ইনি 'দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলা'র আসামীদের নিকট ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে বাংলাদেশের

(১) 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান আর্মি' শীর্ষক অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

ও বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবীদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করাই ছিল এই গোয়েন্দা-পুঙ্গবের ঘন ঘন বন্দীদের সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্য। তাহার এই উদ্দেশ্য বুঝিতে বিপ্লবী বন্দীদের বিলম্ব হয় নাই। বন্দীরা তাহার এই ধৃষ্টতার উচিত শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু বিপ্লবীরা ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়িলেন, অস্ত্র কোথায় পাইবেন? পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিশ্চয়ই সশস্ত্র হইয়া আসেন। বিপ্লবীদের দুর্জয় সঙ্কল্পই হাতিয়ার যোগাড় করিয়া দিল। প্রমোদ ও অনন্তহরি বহু চেষ্টার পর জেলের মধ্যেই একটা লোহার ডাণ্ডা সংগ্রহ করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। ১৯২৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে একদিন ভূপেন চ্যাটার্জি আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে আসিয়া প্রবেশ করেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্দীদের ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাঁহাদের সহিত রসালাপে ব্যস্ত হন। এদিকে প্রমোদ ঘরে লুক্কায়িত ডাণ্ডা লইয়া পিছন হইতে ভূপেনের মস্তকে আঘাত করিলেন। তাহার দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। কুখ্যাত গোয়েন্দা রায়বাহাদুর ভূপেনের গোয়েন্দাগিরির সাধ জন্মের মত মিটিয়া গেল।

এই হত্যার অপরাধে বন্দী বিপ্লবীদের লইয়া নূতন মামলা শুরু হয়। বিচারে অনন্তহরি ও প্রমোদরঞ্জনের ফাঁসী এবং অপর তিন জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

সাময়িক বিরতি

সরকারের প্রচণ্ড আক্রমণে বৈপ্লবিক সংগ্রাম স্তিমিত হইয়া আসে। সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দ, এমনকি দেশের চরমপন্থী নেতারাও কারান্তরালে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু এত করিয়াও বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূলোচ্ছেদ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হইল না। সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইল মাত্র। বিপ্লবীরা সরকারী আঘাতে দুর্বল হইল, বিপ্লবের সংগঠন ছত্রভঙ্গ হইল, কিন্তু বিপ্লবীরা পলায়ন করিল না বা পরাজয় স্বীকার করিল না, কিংবা হতাশায় আচ্ছন্ন হইয়া শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপস ও সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হইল

না। পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্য যাহারা সর্বস্ব পণ করিয়াছে তাহাদের চিন্তায় পলায়ন, পরাজয় স্বীকার, আপস বা সহযোগিতার কোন স্থান নাই। বৈপ্লবিক সংগ্রাম যে সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইল তাহার কারণস্বরূপ "বিপ্লবী নেতারা স্বীকার করিয়াছেন যে, তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য উপযুক্ত আয়োজন করিতে সক্ষম হন নাই। ইহা দ্বারা একথা বুঝাইবে না যে, বৈপ্লবিক সংগ্রাম শেষ হইয়া গিয়াছে।"(১)

বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ইংরেজ-সরকারের কারাগারে বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেন না। তাঁহারা—বিভিন্ন দলের উদীয়মান নেতৃবৃন্দ—দলাদলি ভুলিয়া সকলে একযোগে বিদেশী শাসনকে শেষ আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে চূড়ান্ত-সংগ্রামের পরিকল্পনা করিতে ব্যস্ত হইলেন। সেই পরিকল্পনা হইল বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক নূতন ও উন্নততর পর্যায়ের পরিকল্পনা।

তৃতীয় অধ্যায়

যুক্তপ্রদেশে দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

('হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন')

(১৯২৩-১৯২৫)

বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠার আয়োজন

১৯২২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে আকস্মিকভাবে ভারতব্যাপী সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম প্রত্যাহৃত হইবার পর বাংলার বিপ্লবীরা তাহাদের নিজস্ব পন্থায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম অব্যাহত রাখিবার প্রচেষ্টা শুরু করে। বাংলার বিপ্লবীরা কেবল বাংলাদেশেই নহে, সারা ভারতবর্ষে বিপ্লবের আগুন জ্বালাইবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া একই সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে প্রচেষ্টা শুরু করিয়া দেয়।

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34. Vol II. P. 329.

বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী প্রদেশ যুক্তপ্রদেশ বহু পূর্বেই ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়ক শচীন্দ্রনাথ সান্যালের নেতৃত্বে মহাযুদ্ধের পূর্বেই বেনারস (কাশী) শহরে কেন্দ্র করিয়া সারা যুক্তপ্রদেশে ও উত্তর-ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে বিরাট বৈপ্লবিক সংগঠন সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা মহাযুদ্ধের সময়ের বিখ্যাত 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা' ও 'মৈনপুর ষড়যন্ত্র-মামলা'র পর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। তখন হইতে সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের প্রচণ্ড আঘাতে যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-ভারতের বিপ্লবীশক্তি ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, যে সকল বিপ্লবী নেতা গ্রেপ্তার এড়াইয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহারা ১৯১৯ ও ১৯২০-২১ খৃস্টাব্দের সত্যাগ্রহ সংগ্রামে যোগদান করিয়া এই সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সংগ্রাম চরম পর্যায়ে আরোহণ করিবার মূহূর্তে আকস্মিকভাবে প্রত্যাহৃত হওয়ায় তাঁহারা কংগ্রেস-নেতৃত্বের উপর সকল আস্থা হারাইয়া ফেলেন এবং পুনরায় আপস-পলায়নহীন বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করিবার উদ্যোগ শুরু করেন। ঠিক সেই সময়ে বাংলাদেশ হইতে দুইজন বিপ্লবী নায়ক যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। এই দুইজন বিপ্লবী নায়কদের একজন হইলেন যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর অপরজন হইলেন সতীশচন্দ্র সিংহ। ইঁহারা দুইজনেই ছিলেন বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় সভ্য।

১৯২৩ খৃস্টাব্দের শেষদিকে যোগেশচন্দ্র ও সতীশচন্দ্র কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হন। অল্পদিন পরেই শচীন্দ্রনাথ বক্সীও বাংলাদেশ হইতে আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন। এই সময়ে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল এলাহাবাদে কার্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার সহযোগিতায় যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, সতীশ সিংহ ও শচীন বক্সী একত্রে মিলিয়া যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র বিপ্লবীদলের শাখা-সমিতি স্থাপন করিবার চেষ্টা শুরু করেন।

যুক্তপ্রদেশে তখন ভাঙ্গাহাট, পুরাতন বিপ্লবীরা আবার বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতে থাকিলেও তাঁহারা ছিলেন পরস্পর হইতে

বিচ্ছিন্ন। কে তাঁহাদের ঐক্যবদ্ধ করিবে, কে তাঁহাদের লইয়া আবার সংগঠন গড়িয়া তুলিবে? যোগেশচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীরা তাহা জানিতেন। কিন্তু প্রকাশ্যে তাহাদের আহ্বান করিবার উপায় নাই, তাহা হইলে প্রথম হইতেই সাম্রাজ্যবাদী পুলিশ শ্যেন দৃষ্টি মেলিয়া তাহাদের পিছু তাড়া করিবে। ইহা ব্যতীত তখনও অনেক পুরাতন বিপ্লবী গা-ঢাকা দিয়া ফিরিতেছিলেন। তাই পুরাতন বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং নূতন লোকদের মনে বৈপ্লবিক প্রেরণা সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যোক্তাগণ এক অভিনব কৌশল অবলম্বন করেন।

যোগেশচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীরা জানিতেন যে, যুবকদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা সৃষ্টির জন্য বৈপ্লবিক সাহিত্য অপরিহার্য। তাই তাঁহারা সারা যুক্ত-প্রদেশে বৈপ্লবিক সাহিত্য ছড়াইবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যুক্তপ্রদেশে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ও তাঁহার বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ সকলের নিকট সুপরিচিত। শচীন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের স্রষ্টা। তাই বিপ্লবীরা শচীন্দ্রনাথের রচিত যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টার কাহিনী 'বন্দী জীবন' নামক পুস্তক জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের কৌশল অবলম্বন করেন। এমনকি যোগেশচন্দ্র নিজেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া শচীন্দ্রনাথ সান্যালের "বন্দী জীবন' বিক্রয় করিতেন। পুরাতন বিপ্লবীরা ও স্কুলকলেজের যুবকগণ এই পুস্তকখানি দেখিবামাত্র আগ্রহের সহিত ক্রয় করিত, আর বিক্রেতারা উৎসাহী ক্রেতাদের নাম-ধাম টুকিয়া রাখিতেন এবং পরে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আলাপ-আলোচনা দ্বারা তাহাদের বৈপ্লবিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতেন। (১)

যোগেশচন্দ্র এইভাবে বৈপ্লবিক সাহিত্য বিক্রয়ের মারফত এলাহাবাদে বানোয়ারীলাল নামক এক যুবককে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অতি অল্পকালের মধ্যেই বানোয়ারী নূতন বিপ্লবীদলের সভ্য হন এবং কয়েকটি দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া সাংগঠনিক যোগ্যতার প্রমাণ দেন। ইহাতে যোগেশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রতাপগড়ে এক শাখা-সমিতি স্থাপন

(১) মন্মথনাথ গুপ্ত: 'কাকোরী ষড়যন্ত্র', পৃঃ ১১৬

করিবার ভার দেন। বানোয়ারীলাল এই কাজটিও বিশেষ দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেন।

১৯২৪ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামে এক বাঙ্গালী বিপ্লবী কানপুর, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপন করেন। রাজেন্দ্রনাথ বেনারসে হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। অধ্যয়ন-কালেই তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন এবং ক্রমশঃ সমিতির মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ সংগঠক বলিয়া পরিচিত হন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রতাপগড়, কানপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থানের সংগঠনের ভার রাজেন্দ্রনাথের উপর অর্পণ করা হয়। বানোয়ারীলাল ও অন্যান্য সংগঠকগণ রাজেন্দ্রনাথের পরিচালনাধীনে থাকিয়া কাজ করিতে থাকেন।

ইহার পর যোগেশচন্দ্র ঝাঁসী ও শাহজাহানপুরে দুইটি শাখা-সমিতি স্থাপন করেন। শাহজাহানপুরে তিনি পুরাতন বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিস্মিল-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। রামপ্রসাদ তখন আত্মগোপন করিয়া অন্যান্য পুরাতন বিপ্লবীদের সন্ধানে ফিরিতেছিলেন। রামপ্রসাদ যোগেশচন্দ্রের নিকট হইতে নূতন প্রচেষ্টার সংবাদ শুনিবামাত্র নূতন বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করেন। "রামপ্রসাদের পূর্ব-জীবনের ইতিহাস ও বর্তমানের মনোভাব অবগত হইয়া যোগেশবাবু তাহাকেই সমস্ত যুক্তপ্রদেশের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করেন।" (১)

এই ভাবে যোগেশচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীদের চেষ্টায় যুক্তপ্রদেশের বেনারস (কাশী), শাহজাহানপুর, কানপুর, ঝাঁসী, এলাহাবাদ, আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, অটোয়া, মীরাট, জব্বলপুর, বেরিলী প্রভৃতি স্থানে শাখা-সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার পর অক্টোবর মাসে কানপুর শহরে সমিতির এক অধিবেশন হয়। বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরা এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে সমিতির নাম, গঠনতন্ত্র ও কর্মপদ্ধতি স্থির করা হয়।

(১) মনীন্দ্রনাথ রায়: 'কাকোরী ষড়যন্ত্র', পৃঃ ১১৭।

ইহা [illegible] উল্লেখযোগ্য যে, যোগেশচন্দ্র ও তাঁহার দুই জন সহকর্মী এক সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ভার লইয়াই যুক্তপ্রদেশে বৈপ্লবিক সংগঠন স্থাপনের জন্য আসিয়াছিলেন। সেই সর্ব-ভারতীয় বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র ছিল কলিকাতা শহরে এবং উহা বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল। ১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে কানপুরে গুপ্ত সমিতির যে অধিবেশন হয় তাহাতে সমিতি পুনর্গঠিত করিয়া ইহাকে শৃঙ্খলা ও বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যযুক্ত একটি সর্ব-ভারতীয় গুপ্ত প্রতিষ্ঠান-রূপে গড়িয়া তোলা হয়।

কানপুর-অধিবেশনে সকল বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই সমিতির নাম রাখা হয় 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সঙ্ঘ' (Hindusthan Republican Association)। ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত একটি কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির উপর এই সমিতির নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন পরিচালনার ভার ন্যস্ত হয়। নিয়ম করা হয় যে, কেন্দ্রীয় কমিটির সকল সভ্য একমত না হইলে কোন সিদ্ধান্তই গৃহীত হইতে পারিবে না এবং একবার সর্ব-সম্মতিক্রমে কোন প্রস্তাব গৃহীত হইলে উহার বিরোধিতা করিবার অধিকার কাহারও থাকিবে না। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান কাজ হইবে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কার্য পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণ করা। ইহা ব্যতীত ভারতের বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিবার ভারও কেন্দ্রীয় কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

কানপুর-অধিবেশনে নূতন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক কমিটি গঠন করিয়া বিভিন্ন সভ্যকে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সরকারী মতে, এই সমিতির পক্ষ হইতে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বহির্ভারতের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতেন। সরকারী রিপোর্টে বলা হয়ঃ "১৯২৫ খৃস্টাব্দে নিশ্চিতরূপে সংবাদ পাওয়া যায় যে, অনুশীলন সমিতির প্রসিদ্ধ বিপ্লবী শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, যিনি 'কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা'য় (১৯২৬) কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন তিনি, মানবেন্দ্রনাথ রায়ের

সহিত (জার্মানীতে) যোগাযোগ রক্ষা করিতেন এবং তাঁহার নিকট হইতে অর্থ পাইতেন।"(১)

প্রাদেশিক কার্যকরী কমিটির কর্ম-প্রচেষ্টা নিম্নলিখিত পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়: (ক) লোক সংগ্রহ, (খ) অর্থ সংগ্রহ, এবং য়ুরোপীয় ও দেশী সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, (গ) অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ, (ঘ) প্রচার-কার্য চালান এবং (ঙ) বৈদেশিক সংস্রব রক্ষা করা। প্রাদেশিক কমিটির অধীনে বিশেষভাবে পরীক্ষিত বিপ্লবীদের লইয়া জিলা-কমিটি গঠনেরও ব্যবস্থা করা হয়।

অধিবেশনে স্থির হয় যে, উপযুক্ত লোককে বিদেশে পাঠাইয়া যুদ্ধবিদ্যা এবং অস্ত্র তৈরী শিক্ষা করান হইবে; সমিতির সভ্যগণ যাহাতে 'য়ুনি-ভার্সিটি কোর' এবং সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত, "কংগ্রেসের অর্থ ও প্রতিপত্তি যাহাতে বিপ্লবের কার্যে ব্যবহার করা যায় তাহার জন্য উপযুক্ত কর্মীদিগকে কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করিবার জন্য সাহায্য করা" হইবে। কংগ্রেস সম্বন্ধে আরও স্থির হয় যে, "কংগ্রেসের যে সকল কাজ গুপ্ত সমিতির কার্য-প্রণালীর পক্ষে ক্ষতিকর তাহার সমালোচনা করিতে হইবে এবং প্রকাশ্যে ও গুপ্তভাবে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করিতে হইবে।"(২) সমিতির জন্য যে সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি স্থির হয় তাহা বহুলাংশে বাংলাদেশের অনুশীলন সমিতির সংগঠন ও কর্মপদ্ধতিরই অনুরূপ।

যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্রের পরিকল্পনা

এই সমিতির বিপ্লব-প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য সম্পর্কে যাহা স্থির হয় তাহা ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে সম্পূর্ণ অভিনব। এপর্যন্ত আমরা দেখিয়াছি যে

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Vol. II. Memorandum on Terrorism, P. 329.

(২) উপরোক্ত দুইটি উদ্ধৃতিই মন্মথনাথ গুপ্ত-রচিত 'কাকোরী ষড়যন্ত্র' নামক পুস্তকের যথাক্রমে ৫৬ ও ৫৮ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

বিপ্লবীরা ভারতের ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া কি ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠা. করিবেন সে সম্পর্কে তাঁহাদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বিপ্লবীদের বেশীর ভাগ এই যুক্তিই দিতেন যে, 'আগে তো বিপ্লব হউক, তারপর দেখা যাইবে।' কিন্তু এই সমিতি ভারতের ভবিষ্যৎ-শাসনতন্ত্র সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা স্থির করে, তাহা হইল "ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র" (Federal Republic of United States of India)। এই রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ-শাসনতন্ত্র সম্পর্কে বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক বিরাট অগ্রগতি সূচনা করে। এই সম্পর্কে সমিতির গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয় :—

"সুশৃঙ্খল ও সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই সঙ্ঘের লক্ষ্য। এই রাষ্ট্রের শাসন-প্রণালী ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষ কর্তৃক তৈরী হইবে না, সমগ্র ভারতের জনগণের প্রতিনিধিদের মত লইয়াই ইহা তৈরী করা হইবে। সর্বপ্রকার অন্যায় উৎপীড়ন ও অবিচারের উচ্ছেদ সাধন করিয়া সাম্যের ভিত্তির উপরেই এই যুক্তরাষ্ট্র-সাধারণতন্ত্রের মূলনীতি গঠন করা হইবে।"(১)

হিন্দুস্থানে (ভারতে) সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল বলিয়াই এই সমিতির নাম রাখা হয় 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সঙ্ঘ'।

যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠন

১৯২৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে অনুষ্ঠিত কানপুরের পুনর্গঠন-অধিবেশনে' কাজের সুবিধার জন্য গোটা যুক্তপ্রদেশকে সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা— কাশী (বেনারস), ঝাঁসী, কানপুর, আলিগড়, মীরাট, শাহজাহানপুর ও ফৈজাবাদ। কয়েকটি জিলা লইয়া এক একটি ভাগ হইল এবং প্রত্যেক ভাগের পরিচালনার ভার একজন নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীর উপর দেওয়া হইল। জিলা-সংগঠনের সম্পাদক এই পরিচালকদের নির্দেশে পরিচালিত হইত। কানপুর-অধিবেশনেই

(১) Quoted from the 'Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform' (1933-34), Vol. II, Memorandum on Terrorism, P. 320.

রামপ্রসাদ বিস্মিলকে সমগ্র যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক সংগঠনের প্রধান পরিচালক নিযুক্ত করা হয়। শাহজাহানপুর-অঞ্চলের ভারও রামপ্রসাদের হাতেই থাকে। রামপ্রসাদ এই সময়ে শাহজাহানপুর-অঞ্চল ও সমগ্র যুক্ত-প্রদেশের কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। অল্প কয়েকদিন পরেই আসফাক্ উল্লা নামে একজন বিপ্লবী রামপ্রসাদের প্রধান সহকারী নিযুক্ত হন। যোগেশ-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ হইতে যুক্তপ্রদেশের কাজ দেখা-শুনা করিতেন। অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সভ্য রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর উপর যুক্তপ্রদেশের ভার অর্পণ করিয়া যোগেশচন্দ্র বাংলাদেশে চলিয়া যান এবং ঐ মাসেই কলিকাতায় 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স' অনুসারে গ্রেপ্তার হন। ইহার পর হইতে রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নির্দেশ লইয়া রামপ্রসাদ ও আসফাক্ উল্লা যুক্তপ্রদেশের কার্য পরিচালনা করিতে থাকেন।

রামপ্রসাদের পূর্ব-কাহিনী

১৯১৫ খৃস্টাব্দের 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'র পর হইতে ১৯২১ খৃস্টাব্দের অসহযোগ-আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত যুক্তপ্রদেশের বিপ্লব-প্রচেষ্টা রামপ্রসাদ বিস্মিল-এরই নেতৃত্বে ও উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। 'বেনারস ষড়যন্ত্র-মামলা'য় প্রায় সকল পুরাতন বিপ্লবী কারাগারে আবদ্ধ হইবার পর রামপ্রসাদ বিপ্লবীদলে যোগদান করেন এবং অপূর্ব আন্তরিকতা, বিশ্বস্ততা ও বুদ্ধি দ্বারা যুক্তপ্রদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

১৯১৬ খৃস্টাব্দে লক্ষ্ণৌ শহরে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে চরমপন্থী নেতা বালগঙ্গাধর তিলকের অভ্যর্থনা উপলক্ষে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে রামপ্রসাদের নির্ভীকতা, প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্ব ও সংগঠন-শক্তির জোরে চরমপন্থীরা জয়লাভ করে। যুবক রাম-প্রসাদের ক্রিয়াকলাপ অধিবেশনে উপস্থিত বিপ্লবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁহারা রামপ্রসাদের নিকট বিপ্লবীদলে যোগদানের প্রস্তাব করিবামাত্র স্বভাব-বিপ্লবী রামপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গেই সম্মত হন। ইহার পর রামপ্রসাদের জীবনের

এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। রামপ্রসাদ অল্পকালের মধ্যেই যুক্তপ্রদেশের গুপ্ত সমিতির কার্যকরী সমিতির সভ্যপদ লাভ করেন।

এই সময় বিপ্লবীদের বিশেষ আর্থিক অনটন দেখা দেয়। এই অনটন দূর করিবার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও রামপ্রসাদ সহকর্মীদের লইয়া কয়েকটি ডাকাতি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু ডাকাতির পন্থা তিনি কখনই মনেপ্রাণে সমর্থন করেন নাই। তাই বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি অন্য উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব করেন। তাঁহারই পরামর্শে স্থির হয় যে, দেশ-প্রেমোদ্দীপক পুস্তক প্রকাশ করিয়া তাহার বিক্রয়লব্ধ অর্থে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও দলের অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে 'আমেরিকার স্বাধীনতা' নামক একখানি পুস্তক ও 'দেশবাসীর প্রতি আবেদন' শীর্ষক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই দুইখানি সাহিত্য বিক্রয় করিয়া বিপ্লবীরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু ইহা ইংরেজ-সরকারের সহ্য হইল না, শীঘ্রই পুস্তক দুইখানি সরকারী আদেশে বাজেয়াপ্ত হয়। ইহার পর ডাকাতি করা ব্যতীত বিপ্লবীদের অর্থ সংগ্রহের আর কোন উপায় রহিল না।

বিপ্লবীরা সাহিত্য বিক্রয়-লব্ধ অর্থে অস্ত্র সংগ্রহ করিবার সিদ্ধান্ত করে। রামপ্রসাদ কয়েকজন সহকর্মীর সহিত গোয়ালিয়র দেশীয় রাজ্যে গিয়া কয়েকটি রিভলভার সংগ্রহ করেন। বিপ্লবীদের এই সকল ক্রিয়াকলাপ শীঘ্রই পুলিশের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ইহাদের গোপন সংবাদ বাহির করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ কয়েকটি গুপ্তচরকে দলের মধ্যে প্রবেশ করায়।

এই সময়ে বিপ্লবীরা মৈনপুরার এক ধনী ব্যক্তির গৃহে ডাকাতি করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। দলের একজন নূতন সভ্য এই সংবাদ পুলিশকে জানাইয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে ধরপাকড় শুরু হইয়া যায়। এই সম্পর্কে পুলিশ রামপ্রসাদেরও সন্ধান পায়, কিন্তু রামপ্রসাদ পূর্বেই আত্মগোপন করিয়া গ্রেপ্তার এড়াইতে সক্ষম হন। রামপ্রসাদ গ্রেপ্তার এড়াইতে পারিলেও অন্য বহু নেতৃস্থানীয় ও সাধারণ কর্মী ধরা পড়েন। ইহাদের লইয়া পুলিশ এক ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু করে। এই মামলাই "মৈনপুরা ষড়যন্ত্র-মামলা" নামে খ্যাত।

রামপ্রসাদ ও তাঁহার কয়েকজন সহকর্মী আত্মগোপন করিলেও নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিলেন না। তাঁহারা আবার দল গঠন ও প্রচার-কার্য শুরু করেন। এই সময়ে রামপ্রসাদ গোপনে কংগ্রেসের দিল্লী-অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া বহু বাজেয়াপ্ত পুস্তক বিক্রয় করেন। এই সংবাদ পাইয়া পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিলে তিনি পলায়ন করিতে সক্ষম হন। ইহার পর রামপ্রসাদ শাহজাহান-পুরের নিকটবর্তী একটি ছোট শহরে উপস্থিত হইয়া দলের গোপন আড্ডা স্থাপন করেন। কিন্তু এই সংবাদও পুলিশ জানিতে পারে। একদিন রাত্রিকালে পুলিশ আসিয়া তাঁহার গোপন আড্ডাটি ঘিরিয়া ফেলিলে রামপ্রসাদ পুলিশের দৃষ্টি এড়াইয়া সরিয়া পড়িতে সক্ষম হন।

ইহার পর রামপ্রসাদ কয়েকজন সহকর্মীর সহিত শাহজাহানপুরে আসিয়া দলের গোপন আড্ডা স্থাপন করেন এবং এখানে থাকিয়া কাজ চালাইতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার একজন সহকর্মী নেতৃত্বের নেশায় মত্ত হইয়া উঠে। কিন্তু রামপ্রসাদ বাঁচিয়া থাকিতে তাহার দলের নেতৃত্ব লাভ করা অসম্ভব বুঝিয়া উক্ত সহকর্মী তিনবার রামপ্রসাদের জীবননাশের চেষ্টা করে। রাম-প্রসাদ দৈবক্রমে বাঁচিয়া যান এবং সহকর্মীটি দলত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। অতঃপর সহকর্মীদের পরামর্শে রামপ্রসাদ কিছুদিন গোয়ালিয়র রাজ্যে আত্ম-গোপন করিয়া থাকেন। সেখানে সন্দেহ এড়াইবার জন্য রামপ্রসাদ এক আত্মীয়ের বাড়ী থাকিয়া কৃষিকর্ম শুরু করেন। এই সময় যুক্তপ্রদেশের পুলিশ রামপ্রসাদকে গ্রেপ্তার করিতে না পারায় প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যুক্ত-প্রদেশের সরকার তাঁহার পিতার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। ইহার ফলে ছোট ছোট ভাই-ভগ্নিসহ তাঁহার পিতা-মাতা পথের ভিখারী হন। রামপ্রসাদ এই দারুণ সংবাদেও অবিচল থাকেন।

এই সময়ে পিতামাতাকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে রামপ্রসাদ একটি ছোট ব্যবসায় শুরু করেন। এই কার্যে সুশীল সেন নামক এক বাঙ্গালী যুবক তাঁহাকে সাহায্য করে। কিছুদিন পরে সুশীলের মৃত্যু হইলে রামপ্রসাদ তাঁহার বন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে বাংলাভাষা শিক্ষা করেন। ১৯২০

খৃষ্টাব্দে যখন সকল বিপ্লবী বন্দীকে মুক্তিদান করা হয় তখন যুক্তপ্রদেশ-সরকার রামপ্রসাদের উপর হইতেও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও মামলা তুলিয়া লয়। এই সময়ে তিনি ভয়ংকর আর্থিক দুর্দশায় পতিত হইয়া কিছুদিন চাকুরি করিতে বাধ্য হন। কিন্তু পুলিশের কৃপায় তাঁহার চাকুরি গেলে তিনি সাহিত্য-চর্চা করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করেন। এই সময় তিনি কয়েকখানি পুস্তক রচনা করিয়া সুসাহিত্যিক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

এই সময় ছোট একটি বিপ্লবীদলের অনুরোধে রামপ্রসাদ উহার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু দলের সভ্যদের আত্মকলহের ফলে তিনি ভীষণ বিরক্ত হইয়া উক্ত দলের সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কিছুদিন পর উক্ত দলের সকল সভ্য গ্রেপ্তার হয়। ইহার পর অসহযোগ-আন্দোলন আরম্ভ হইলে রামপ্রসাদ নূতন উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া এই আন্দোলনে যোগদান করেন। কিন্তু ১৯২২ খৃস্টাব্দে জয়লাভের পূর্বক্ষণে আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখায় কংগ্রেসের উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যখন তিনি পুনরায় রাজনীতি হইতে দূরে সরিয়া যাইতে উদ্যত হন ঠিক সেই মুহূর্তে শাহজাহানপুরে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। যোগেশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে নূতন প্রচেষ্টার সংবাদ শুনিবামাত্র রামপ্রসাদ এই বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। কানপুর-অধিবেশনের পর তিনি সারা যুক্তপ্রদেশের প্রধান পরিচালকরূপে সহকারী আসকাফ্ উল্লার সহায়তায় এবং সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির তরফ হইতে যুক্তপ্রদেশের ভারপ্রাপ্ত রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর পরিচালনায় যুক্তপ্রদেশের সমিতিকে একটা শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করেন।

কাকোরী ষড়যন্ত্র

রামপ্রসাদের প্ররিচালনায় যুক্তপ্রদেশের সমিতির লোক সংগ্রহের কাজ নিয়মিত ও সুশৃঙ্খলভাবেই চলিতে থাকে। শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে যুবসঙ্ঘ স্থাপন করিয়া বিপ্লবীরা যুক্তপ্রদেশের যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রেরণা

জাগাইয়া তোলে এবং বহু ছাত্র ও যুবক সমিতির সভ্য হয়। কিন্তু অর্থ-সমস্যা শীঘ্রই ভীষণ আকার ধারণ করে। অর্থের অভাবে সমিতির সকল কাজ প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হয়।

অর্থের অভাব দেখিয়া সমিতির মধ্যে ডাকাতির প্রস্তাব উঠিতে থাকে। কিন্তু রামপ্রসাদ ডাকাতি করিয়া অর্থ-সংগ্রহের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। রামপ্রসাদ বলেন যে, যদি লুণ্ঠনই করিতে হয় তবে সরকারী অর্থই লুণ্ঠন করা হউক। রামপ্রসাদ যুক্তি দেন যে, ভারতবাসীরা বৃটিশ-সরকারকে স্বীকার করে না; সুতরাং প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিবারও তাহাদের কোন অধিকার নাই; সাধারণের প্রদত্ত অর্থ সাধারণের মঙ্গলের জন্য লুটিয়া লওয়া কোনরূপ অন্যায় নয়। রামপ্রসাদের যুক্তির গুরুত্ব কেহই অস্বীকার করিতে পারিল না। কেমন করিয়া কবে কোথায় সরকারী অর্থ লুণ্ঠন করিতে হইবে তাহা ঠিক করিবার ভার রামপ্রসাদের উপর অর্পিত হইল।

একদিন রামপ্রসাদ ট্রেনে ভ্রমণ করিবার সময় দেখিতে পান যে, প্রায় প্রত্যেক স্টেশন হইতে গার্ডের কামরায় টাকার থলি তোলা হয়। তারপর গার্ডের কামরায় একটি লোহার সিন্দুকে ঐ টাকা রক্ষিত হয়। রামপ্রসাদ মনে মনে স্থির করেন যে, পথের মাঝখানে কোথাও গাড়ী দাঁড় করাইয়া গার্ডের কামরা হইতে টাকা লুটিয়া লওয়া যাইতে পারে। রামপ্রসাদ তাঁহার সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া ট্রেন-ডাকাতির আয়োজন সম্পূর্ণ করেন। রাজেন্দ্রনাথ তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করেন। সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার পর তারিখও নির্দিষ্ট হয়। এবার কাজের পালা।

"১৯২৫ খৃস্টাব্দের ৯ই আগস্ট। ঘনান্ধকারময়ী রজনী, তাহার উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগ। আকাশ জুড়িয়া ঘনঘটার সমারোহ, মাঝে মাঝে দুই-এক পশলা বৃষ্টি পড়িতেছে। বিদ্যুতালোকে যুক্তপ্রদেশের শালবনে ঝড়ের তাণ্ডব-নৃত্য ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল।

"এই দুর্যোগময়ী রাত্রিতে একখানি যাত্রীগাড়ী লক্ষ্ণৌ-সাহারাণপুর লাইনে

কাকোরী হইতে আলমনগরের দিকে পূর্ণবেগে অগ্রসর হইতেছিল। গাড়ী অনেকক্ষণ কাকোরী স্টেশন ছাড়িয়া আসিয়াছে, যাত্রিগণের অধিকাংশই তন্দ্রামগ্ন, বাহিরে জনপ্রাণীর সাড়া-শব্দ নাই। এমন সময়ে গাড়ীখানি হঠাৎ থামিয়া গেল, গাড়ীর ভিতর হইতে কে যেন চেন টানিয়া গার্ডকে সঙ্কেত করিয়াছে। গাড়ী থামিবামাত্র একদল যুবক,—সংখ্যায় দশ জনের অধিক নহে—তড়িৎবেগে নীচে নামিয়া পড়িল। সকলেই স্কুল-কলেজের ছাত্র—নবীন বয়স, সকলের মুখ-মণ্ডলই উৎসাহ, বীরত্ব এবং দৃঢ়তার রেখায় দেদীপ্যমান। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন অকম্পিত পদে গার্ডের গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই এই অসম্ভাবিত ঘটনায় বিস্মিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়িয়াছিল, গার্ডসাহেবও দেখিতে আসিতেছিল—কে কিসের জন্য সঙ্কেত করিয়া গাড়ী থামাইয়াছে, কিন্তু কেহ কিছু বুঝিয়া উঠিবার পূর্বেই যুবকদিগের মধ্যে একজন গম্ভীর কণ্ঠে আদেশের স্বরে বলিয়া উঠিল, 'আপনারা যে-যার কামরায় গিয়ে বসুন। যাত্রিগণের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা কেবল সরকারী অর্থ লুট করতে চাই।' গার্ড তখন কতকদূর অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। উক্ত যুবক তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তেমনই কর্তৃত্বের স্বরে বলিল, 'গাড়ীতে উঠ্‌বার চেষ্টা ক'রো না। সমস্ত কল-কব্জা তোমার হাতে। তুমি ইচ্ছা করিলেই গাড়ী চালিয়ে দিতে পার। তাই আমরা তোমায় গাড়ীতে উঠ্‌তে দিতে পারি না। তবে তোমার কোন ভয় নেই। আমরা টাকা চাই, মানুষের প্রাণ নিতে চাই না। তোমাকে মারলে আমাদের কোন লাভ নেই। কিন্তু তুমি যদি আমাদের কাজে বাঁধা দিতে চেষ্টা কর, তা'হলে—' বিদ্যুতালোকে সাহেব দেখিতে পাইল, বক্তার হাতে পিস্তল চক্‌চক্ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহার আর বাক্য-নিঃসরণ হইল না। সে এতক্ষণ দাঁড়াইয়া ছিল, এবার কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল।

"দলপতির পূর্ব আদেশও ইতিমধ্যেই প্রতিপালিত হইয়াছিল। আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে দুইজন যুবক গাড়ীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া গুলি ছুঁড়িতেছিল। যাহারা গাড়ীর মধ্যে ছিল, তাহারা

সকলেই শশব্যস্ত ও শঙ্কিত। কেহ ভাবিতে পারে নাই যে, মাত্র দশজন যুবক মিলিয়া এমন এক কার্যে ব্যাপৃত হইয়াছে। সকলেরই মনে হইতেছিল, হয়তো বা প্রত্যেক গাড়ীতেই ইহাদের লোক রহিয়াছে, একটি মাত্র কথা বলিলেই গুলি করিবে। গাড়ীর শ্বেতাঙ্গ ড্রাইভার ইঞ্জিনের পার্শ্বে চিৎ হইয়া পড়িয়া বোধ হয় মনে মনে 'Rule Britannia' গাহিতেছিল, ইঞ্জিনিয়ার পায়খানার মধ্যে আত্মগোপন করিয়া প্রাণরক্ষার প্রয়াস পাইল, যাত্রিগণের মধ্যে কেহ 'টু' শব্দ করিবারও সাহস পাইল না। ইতিমধ্যে কয়েকজন মেল-ভ্যানে চড়িয়া অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সহিত লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া টাকার থলি বাহির করিয়া লইল ; তারপর সকলে মিলিয়া নিতান্ত সহজভাবেই চলিতে চলিতে অতি অল্প কালের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। যাত্রিগণের মধ্যে যখন চৈতন্য ফিরিয়া আসিল তখন যুবকদল লক্ষ্ণৌ শহরে প্রবেশ করিয়াছে।"(১)

পরদিন দেশের সকল কাগজে বড় বড় হরফে এই ডাকাতির সংবাদ প্রকাশিত হইল। ইহা কোন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের ফল বুঝিতে পারিয়া সরকার হইতে গোয়েন্দা-বিভাগের বড় কর্তাদের উপর ইহার তদন্তের ভার দেওয়া হয়। এক মাসেরও অধিক কাল তদন্তের পর ট্রেন-ডাকাতির অস্বাভাবিকত্ব গুপ্তপুলিশের মনোযোগ আকর্ষণ করে। পুলিশের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই যে, ইহার পিছনে সুগঠিত কোন রাজনৈতিক দল রহিয়াছে। সুতরাং গুপ্ত-পুলিশের বিশেষ বিভাগ সকল শক্তি লইয়া এই ডাকাতির তদন্ত শুরু করে। কিছুদিন পরে ট্রেন হইতে লুণ্ঠিত টাকার নোটের কয়েকখানি শাহজাহানপুরে পুলিশের হস্তগত হয়। ইহার ফলে শাহজাহানপুরের বিপ্লবীদের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়ে এবং গোয়েন্দা-পুলিশ বিশেষ করিয়া রামপ্রসাদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখে। ইন্দুভূষণ বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তির মারফত রামপ্রসাদের চিঠি-পত্র আদান-প্রদান হইত। ইন্দুভূষণের সহিত রামপ্রসাদকে মেলামেশা করিতে দেখিয়া পুলিশ ইন্দুভূষণের উপরেও নজর রাখে। ইহার পর হইতে ইন্দুভূষণের নামে যে সকল চিঠি-পত্র আসিত তাহা পুলিশ চুরি করিতে থাকে। তাহারা এই সকল চিঠি-পত্র হইতে যুক্তপ্রদেশের বৈপ্লবিক সংগঠন ও ট্রেন-

(১) মণীন্দ্রনারায়ণ রায় : 'কাকোরী ষড়যন্ত্র', পৃঃ ২-৫।

ডাকাতি সম্পর্কে প্রায় সকল সংবাদ জানিয়া যায়। এইভাবে পুলিশ যুক্ত-প্রদেশের প্রধান কর্মীদের প্রায় পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয়।

চিঠি-পত্র হইতে পুলিশ আরও জানিতে পারে যে, বোমা তৈরীর প্রণালী শিক্ষার জন্য রামপ্রসাদের কলিকাতা যাইবার কথা ছিল। কিন্তু কোন কারণ-বশতঃ রামপ্রসাদ যাইতে না পারায় তাঁহার পরিবর্তে রাজেন লাহিড়ী কলিকাতায় গিয়া বোমা তৈরী শিখিবে।

পুলিশ একদিকে রামপ্রসাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া ও তাঁহার চিঠি-পত্র হস্তগত করিয়া বিপ্লবীদের সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিল, অপর দিকে পুরাদমে গ্রেপ্তার চলিতেছিল। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ ট্রেন-ডাকাতির প্রায় দেড় মাস পর, যুগপৎ ভারতের বিভিন্ন স্থানে খানাতল্লাসী হয়। তাহার পর হইতে প্রায় প্রত্যহই দুই-চারিজন লোক গ্রেপ্তার হইতে থাকে। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে বহু কংগ্রেস-কর্মীও ছিলেন। ইঁহাদের গ্রেপ্তারে সারা যুক্তপ্রদেশে দারুণ বিক্ষোভ দেখা দেয়। দেশীয় সংবাদপত্রে এই গ্রেপ্তারের তীব্র সমালোচনা চলিতে থাকে। ১৯২৫ খৃস্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর রামপ্রসাদ তাঁহার ঘরেই শেষ রাত্রে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের সময় খানাতল্লাসী করিয়া পুলিশ তাঁহার জামার পকেটে কয়েকখানি জরুরী চিঠি পায়। এই চিঠিগুলিই ছিল তাঁহার বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক প্রমাণ। প্রায় এক বৎসর আত্মগোপন করিয়া থাকিবার পর ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর আসফাকুউল্লা খাঁ গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে এলাহাবাদ হইতে শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, শাহজাহানপুর হইতে ঠাকুর রোশন সিং, কাশী হইতে শচীন্দ্রনাথ বক্সী এবং অন্যান্য নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীরাও গ্রেপ্তার হন। 'বেঙ্গল অর্ডিনান্স'-এ আটক যোগেশ চট্টোপাধ্যায়কেও বাংলা-দেশ হইতে যুক্তপ্রদেশে লইয়া আসা হয়।

দক্ষিণেশ্বর বোমার কারখানা

এদিকে রামপ্রসাদ যেদিন গ্রেপ্তার হন ঠিক সেই দিনই রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বোমা তৈরী শিক্ষার উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। এই জন্যই কাশীতে

রাজেন্দ্রনাথের বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়াও পুলিশ রাজেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌছিয়া দেখিলেন, প্রমোদ-রঞ্জন চৌধুরী, অনন্তহরি মিত্র প্রভৃতি কলিকাতার কয়েকজন বিপ্লবী সারা ভারতের বিপ্লবীদের বোমা সরবরাহ করিবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণেশ্বরে একটি বিরাট বোমার কারখানা চালাইতেছেন। রাজেন্দ্রনাথ ইঁহাদের সহিত কারখানার কাজে যোগদান করেন। যুক্তপ্রদেশের পুলিশ রামপ্রসাদের চিঠি-পত্র হইতে পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল যে, রাজেন্দ্রনাথ কলিকাতার কোথাও বসিয়া বোমা তৈরী করিতেছেন। তাহারা অনুসন্ধান করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরের এক বাড়ীতে বোমার কারখানাটি আবিষ্কার করে এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত রাজেন্দ্র-নাথও গ্রেপ্তার হইয়া কলিকাতায় দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ট্রেন-ডাকাতি সম্পর্কে বিচারের জন্য রাজেন্দ্রনাথকে যুক্তপ্রদেশে লইয়া আসা হয়।

‘কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা’

পুলিশ মোট ৪৪ জনকে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে গ্রেপ্তার করে। ইঁহাদের মধ্যে রামপ্রসাদ বিস্মিল, শেঠ দামোদর স্বরূপ, ঠাকুর রোশন সিং, মন্মথনাথ গুপ্ত, মোহনলাল গৌতম, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল, যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্র-নাথ লাহিড়ী, শচীন্দ্রনাথ বক্‌সী, আসফাকুউল্লা খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আসফাকুউল্লা ও শচীন বক্‌সী মামলা শুরু হইবার প্রায় এক বৎসর পরে ধরা পড়েন। অন্যতম প্রধান আসামী চন্দ্রশেখর আজাদ বিচার শেষ হইবার পরেও ধরা পড়েন নাই।

কিন্তু পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়াও ১৫ জনের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিতে না পারায় মামলার শুনানি আরম্ভ হইবার পূর্বেই তাহাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ইহার পর ১৯২৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী একজন স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে বাকী ২৯ জন আসামীর বিরুদ্ধে বিখ্যাত ‘কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা’র প্রথম পর্যায়ের শুনানি আরম্ভ হয়। ৬৫ দিন ধরিয়া প্রথম পর্যায়ের শুনানি চলে এবং ২৪৭ জন সরকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। এই

মামলায় বানারসীলাল কাকস্ ও ইন্দুভূষণ মিত্র নামে দুইজন আসামী রাজসাক্ষী হইয়া সরকারের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

প্রথম পর্যায়ের শুনানির পর সাক্ষ্য-প্রমাণের অভাবে জ্যোতিশঙ্কর দীক্ষিত ও বীরভদ্র তেওয়ারী নামক আরও দুইজন মুক্তি লাভ করে। ইহার পর একজন ইংরেজ স্পেশাল জজের দায়রা-আদালতে ২৭ জন বিপ্লবীর বিরুদ্ধে মামলার দ্বিতীয় পর্যায়ের শুনানি শুরু হয়। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া এই মামলা চলে। এই এক বৎসরের মধ্যে বিপ্লবীরা লক্ষ্মৌ-জেলের মধ্যে দুঃসহ অত্যাচার-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে ২১ দিন অনশন করিতে বাধ্য হন।

১৯২৭ খৃস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এই বিখ্যাত মামলার রায় বাহির হয়। জজসাহেব তাঁহার রায়ে 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোত্তম', বৈপ্লবিক উপায়ে 'আইনানুসারে প্রতিষ্ঠিত' সরকারের উচ্ছেদ-সাধনের ষড়যন্ত্র, ট্রেন ও অন্যান্য ডাকাতি এবং নরহত্যার অপরাধে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিম্নোক্তরূপ শাস্তিবিধান করেন :—রামপ্রসাদ বিস্মিল—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড; ঠাকুর রোশন সিং—পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড ও প্রাণদণ্ড; বানোয়ারীলাল—প্রত্যেক ধারা অনুসারে পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড; গোবিন্দচরণ কর—দশ বৎসরের কারাদণ্ড; ভূপেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—প্রত্যেক ধারায় পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড; মুকুন্দলাল—দশ বৎসরের কারাদণ্ড; যোগেশ চট্টোপাধ্যায়—দশ বৎসরের কারাদণ্ড; মন্মথনাথ গুপ্ত—চৌদ্দ বৎসরের কারাদণ্ড; প্রেমকিষণ খান্না—পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; প্রণবেশ চট্টোপাধ্যায়—ঐ; রাজকুমার সিংহ—দশ বৎসরের কারাদণ্ড; রামদুলাল ত্রিবেদী—পাঁচ বৎসরের কারাদণ্ড; রামকিষণ ক্ষেত্রী—দশ বৎসরের কারাদণ্ড; শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ড; সুরেশ ভট্টাচার্য—সাত বৎসরের কারাদণ্ড; বিষ্ণুশরণ দুবলিস—ঐ। প্রমাণাভাবে হরগোবিন্দ ও শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাসকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং রাজসাক্ষী বানারসীলাল ও ইন্দুভূষণ মিত্র বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কারস্বরূপ মুক্তি লাভ করে।

রায় বাহির হইবার পর মামলার অপর দুই জন আসামী আসফাকুউল্লা খাঁ ও শচীন্দ্রনাথ বক্সী গ্রেপ্তার হন এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের বিচার হইয়া যায়।

বিচারে আসফাকুউল্লার ফাঁসী ও শচীন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

এই রায়ের বিরুদ্ধে ভূপেন সান্ন্যাল, শচীন সান্ন্যাল ও বানোয়ারীলাল ব্যতীত অপর সকলে অযোধ্যা চীফ কোর্টে আপীল করেন। এই আপীলের রায়ে রামপ্রসাদ, রাজেন লাহিড়ী, ঠাকুর রোশন সিং ও আসফাকুউল্লার ফাঁসীর হুকুম বহাল থাকে; যোগেশ চাটার্জি, গোবিন্দ কর ও মুকুন্দলালের দশ বৎসরের কারাদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়; সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুশরণের কারাদণ্ড সাত বৎসর হইতে বৃদ্ধি করিয়া দশ বৎসর করা হয় এবং রামনাথ পাণ্ডে ও প্রণবেশ চাটার্জির কারাদণ্ড কমাইয়া যথাক্রমে তিন ও চারি বৎসর করা হয়। যুক্তপ্রদেশ-সরকার ১৭ই সেপ্টেম্বর ফাঁসীর দিন ঘোষণা করে।

এই সময় ফাঁসীর আদেশ-প্রাপ্ত চারিজন বিপ্লবীর প্রাণরক্ষার জন্য সারা যুক্তপ্রদেশে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু হয়। নানাস্থানে সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া ফাঁসীর পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের দাবি তোলা হইতে থাকে। যুক্ত-প্রদেশের আইন-সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব তোলা হয়। ইহার ফলে ১২ই অক্টোবর পর্যন্ত ফাঁসীর দিন পিছাইয়া যায়। কিন্তু এই প্রস্তাবে আইন-সভার সকল বে-সরকারী সদস্যের সমর্থন সত্ত্বেও ফাঁসীর আদেশ বহাল থাকে। ইহার পর যুক্তপ্রদেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি মিলিতভাবে লাটসাহেবের নিকট ইঁহাদের প্রাণ ভিক্ষা করেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। অবশেষে ফাঁসীর আদেশ-প্রাপ্ত বিপ্লবীরা দেশবাসীর অনুরোধে এবং অর্থ-সাহায্যে ইংলণ্ডের প্রীভি-কাউন্সিলে আপীল করেন। কিন্তু সেখানেও ফাঁসীর আদেশ বহাল থাকে। ইহার পর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রমুখ কেন্দ্রীয় আইন সভার কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সদস্য ও দেশ-বরেণ্য নেতা বড়লাট সাহেবের নিকট এই চারিজন বিপ্লবীর প্রাণ ভিক্ষা করেন। কিন্তু উদ্ধত ইংরেজ-শাসকগণ সেই আবেদনেও কর্ণপাত করিল না। দেশবাসীর অনুরোধে বিপ্লবীরা শেষ চেষ্টা হিসাবে সম্রাটের নিকট প্রাণ ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু সেই আবেদনও অগ্রাহ্য হইল। শাসকগোষ্ঠীর এই চরম ঔদ্ধত্যের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য

ভারতের জনসাধারণ সেইদিন নূতন করিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিল। তাহাদের হৃদয়ে আত্মত্যাগী বীর বিপ্লবীদের আসন স্থায়ী হইয়া রহিল।

অবশেষে শেষ দিন ঘনাইয়া আসে। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর প্রাতঃকালে রামপ্রসাদ বিস্মিল শেষ বারের মত ভারতের স্বাধীনতা ও পূর্ণ মুক্তি কামনা করিয়া ফাঁসী-কাষ্ঠে আরোহণ করেন। ১৮ই ডিসেম্বর গোরক্ষপুর-জেলে রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আজন্ম-বিপ্লবী রামপ্রসাদ বিস্মিল দৃঢ়পদ-বিক্ষেপে ফাঁসীর মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন। জল্লাদ তাঁহার গলায় দড়ি পরাইয়া দিল। রামপ্রসাদ উপস্থিত সরকারী কর্মচারীদের উদ্দেশ করিয়া বলিলেন : "I wish the downfall of the British Empire." তারপর সব শেষ। ১৮ই ডিসেম্বর যখন গোরক্ষপুর-জেলে রামপ্রসাদ ধীর পদে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁহার অন্যতম সহকর্মী বীর বিপ্লবী ঠাকুর রোশনলাল একখানি গীতা হস্তে লইয়া অকম্পিত পদক্ষেপে এলাহাবাদ-জেলের ফাঁসী-মঞ্চে আরোহণ করেন। জল্লাদ যখন তাঁহার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরাইয়া দিতেছিল তখন এই রাজপুত বিপ্লবী বীরের বলিষ্ঠ কণ্ঠ হইতে গম্ভীর শব্দে ধ্বনিত হইল, "বন্দে মাতরম্"। পরদিন, ১৯শে ডিসেম্বর ভোর বেলা লক্ষ্ণৌ-জেলের ফাঁসী-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইলেন রামপ্রসাদ বিস্মিলের যোগ্য সহকারী আসফাকুউল্লা খাঁ। একখানা কোরাণ শরীফ তাঁহার কণ্ঠদেশে আবদ্ধ। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়াইয়া বিপ্লবী আসফাকুউল্লা উপস্থিত সরকারী কর্মচারীদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি ভারত স্বাধীন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আমার মৃত্যুতে সেই চেষ্টার অবসান হইবে না।" আসফাক্‌উল্লা হাসিতে হাসিতে জল্লাদের হস্তধৃত দড়ির ফাঁসীতে গলা গলাইয়া দিলেন।

এই বিপ্লবী বীরদের মৃত্যুর পর 'হিন্দুস্থান রিপাব্‌লিকান এসোসিয়েশন'-এর ভারতবর্ষকে ইংরেজ-শাসনের কবল হইতে মুক্ত করিয়া যুক্তরাষ্ট্রীয় রিপাব্‌লিক প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা কিছুমাত্র শিথিল হয় নাই, বরং পরবর্তী যুগে সেই প্রচেষ্টা আরও অগ্রসর হইয়া আর এক নূতন স্তরে প্রবেশ করে।

চতুর্থ খণ্ড

প্রথম অধ্যায়

১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের জাতীয় সংগ্রাম

নূতন গণ-জাগরণ

১৯২১ খৃস্টাব্দের জাতীয় সংগ্রাম প্রত্যাহারের পর একদিকে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে 'স্বরাজ'দল শাসন-সংস্কার ধ্বংসের উদ্দেশ্য লইয়া আইন-সভায় প্রবেশ করিলেও সেই উদ্দেশ্য ভুলিয়া গিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় শাসকদের সহিত সহযোগিতার পথ গ্রহণ করিতে থাকেন। অপর দিকে বিপ্লবীরা ফাঁসী, গুলি, দীপান্তর, দীর্ঘ কারাদণ্ড বরণ করিয়া অপূর্ব আত্মত্যাগের দ্বারা হতাশাচ্ছন্ন ভারতের বুকে আশার ক্ষীণ দীপ-শিখা জ্বালাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল। সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে তাহাদের সেই প্রচেষ্টা সাময়িকভাবে স্তব্ধ হইয়া পড়ে।

নূতন আইনের দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রাম দমন করিতে সক্ষম হওয়ায় বৃটিশ-শাসকদের ধৃষ্টতা সীমা ছাড়াইয়া যায়। ভারত-সচিব লর্ড বার্কেনহেড জাতীয় নেতাদের সহযোগিতার একটি শর্ত হিসাবে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে "ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অশরীরী আত্মা" নামে অভিহিত করিয়া ইহার মূলোচ্ছেদের জন্য জাতীয় নেতাদের সহযোগিতা দাবি করেন।(১) কিন্তু যে বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতের সমগ্র জাতীয় সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছে তাহাকে অস্বীকার করিবার শক্তি কাহারও নাই। স্বভাবতই গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ঘৃণাভরে ভারত-সচিবের সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু সহযোগিতার মনোভাবের ফলে 'স্বরাজ' দল দেশের জনগণের সমর্থন হারাইয়া ফেলে। ১৯২৬ খৃস্টাব্দে আইন-সভার নির্বাচনে কেবলমাত্র মাদ্রাজ ব্যতীত সর্বত্র তাহাদের পরাজয় ঘটে।

---

(১) R. P. Dutt: 'India To-day', P. 321.

সরকার এই সুযোগে এক নূতন আক্রমণ শুরু করে। ভারতের মূল অর্থনৈতিক শিল্পস্বার্থ বলি দিয়া জোর করিয়া চাপান বিভিন্ন চুক্তি ও আইনের দ্বারা বৃটিশের অর্থনৈতিক শোষণের নাগপাশে ভারতবর্ষকে আবদ্ধ করিবার ব্যবস্থাই সেই নূতন আক্রমণের রূপ। ভারতবর্ষ গত কয়েক বৎসরে যে সকল অর্থনৈতিক সুবিধা আদায় করিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা এবার এই নূতন আক্রমণে বিপন্ন হইয়া উঠে। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের 'কারেন্সি বিল', এক শিলিং ছয় পেন্স হিসাবে টাকার দর বাঁধিয়া দেওয়া এবং ভারতে বৃটিশ ইস্পাত-শিল্পকে অবাধ সুযোগ দিয়া ১৯২৭ খৃস্টাব্দের 'ইস্পাত-রক্ষা বিল'—এই গুলিই হইল সেই আক্রমণের অস্ত্র। ভবিষ্যৎ শাসন-সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে ১৯২৭ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষে যে 'সাইমন-কমিশন' প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয় কেবলমাত্র ইংরেজদের লইয়া সেই কমিশন গঠন করিয়া বৃটিশ-শাসকগণ "ভারতবাসীদের গণ্ডে চপেটাঘাত করে।" ভারতের মৌলিক অর্থনৈতিক স্বার্থ ও আত্মসম্মান বজায় রাখিবার জন্যই আবার জাতীয় সংগ্রাম অপরিহার্য হইয়া উঠে।

সাম্রাজ্যবাদী উৎপীড়ন ও জাতীয় অপমানের জ্বালা ভারতবাসীদের মধ্যে আবার সংগ্রামের চাঞ্চল্য জাগাইয়া তোলে। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের শেষ ভাগ হইতেই সারা ভারতবর্ষে আবার গণ-জাগরণ শুরু হইয়া যায় এবং সেই গণ-জাগরণই ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দে ভারতব্যাপী গণ-বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম হইতেই এই গণ-জাগরণের যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা হইতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, নূতন জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণ এবার আর সংগ্রামের মাঝপথে কোন প্রকার আপস-রফা, সংগ্রাম-প্রত্যাহার, নেতৃত্বের দোদুল্যমান চিত্ততায় বিভ্রান্ত হইবে না, তাহারা চূড়ান্ত সংগ্রামের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইতে থাকে। গান্ধীজীর পরিচালিত দুই বিরাট গণ-সংগ্রামই ভারতের সকল শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা, স্বাধীনতার আকাঙ্খা ও চূড়ান্ত সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প জাগাইয়া তোলে।

জনগণের এই নব জাগরণ কংগ্রেসের নেতৃত্বের বামপন্থী অংশ ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এক দুর্বার প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। ১৯২৭

খৃস্টাব্দের শেষ দিকে ভারতের উদীয়মান চরমপন্থী নেতা পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু দীর্ঘকাল য়ুরোপ ভ্রমণ করিয়া ভারতে ফিরিয়া আসেন। য়ুরোপ হইতে তিনি লইয়া আসেন সমাজবাদের নূতন আদর্শ। ভারতবর্ষে এই নূতন আদর্শ জনপ্রিয় করিয়া তোলা তাঁহার এই সময়ের অন্যতম প্রধান কাজ হইয়া দাঁড়ায়। ১৯২৭ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয় মাদ্রাজ শহরে। এই অধিবেশন বিশেষ করিয়া যুব-সমাজের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার অগ্রগতি সূচনা করে এবং বামপন্থী যুব-সমাজের উদীয়মান নেতা জহরলাল নেহেরু ও সুভাসচন্দ্র বসুর চেষ্টায় এই অধিবেশন হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতের জাতীয় সংগ্রামের লক্ষ্য বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত, অধিবেশনে 'সাইমন-কমিশন' বর্জন ও ভারতের ভবিষ্যৎ-গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সভ্যপদ গ্রহণ করে। প্রগতিশীল যুব-সমাজ ও বামপন্থী ভাবধারার প্রতিনিধি জহরলাল ও সুভাসচন্দ্র কংগ্রেসের দুইজন জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

কিন্তু বামপন্থী ভাবধারার এই জয় দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। মাদ্রাজ-কংগ্রেসে পুরাতন নেতৃবৃন্দের কেহ উপস্থিত না থাকায় বামপন্থী নেতৃবৃন্দ কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হন নাই। কিন্তু ১৯২৮ খৃস্টাব্দেই কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্ব সতর্ক হইয়া যায়। এই বৎসরের চাঞ্চল্যকর ঘটনাবলী ও গণ-জাগরণের নূতন চেহারা দেখিয়া তাঁহারা পূর্বের মত আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে 'সাইমন-কমিশন' বর্জন উপলক্ষে সারা ভারত অভূতপূর্ব গণ-জাগরণে কম্পিত হইয়া থাকে। কমিশনের সদস্যবৃন্দ কোন স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র জনসাধারণ বড় বড় সভা-শোভাযাত্রা ও ধর্মঘট করিয়া ইঁহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে, ছাত্র ও শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিয়া স্কুল-কলেজ ও কারখানা ছাড়িয়া চলিয়া আসে। এই বিরাট গণ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে নূতন প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘ' ও ছাত্র-সঙ্ঘ। শাসকগণ আতঙ্কিত হইয়া সর্বত্র বে-পরোয়াভাবে জনসাধারণের উপর গুলি

ও লাঠি চালায়, ক্রুদ্ধ জনসাধারণের সহিত সর্বত্র পুলিশের সংঘর্ষ চলিতে থাকে। পাঞ্জাবের এক জনসভায় সর্বজনমান্য নেতা লাজপত রায় পুলিশের লাঠির আঘাতে গুরুতররূপে আহত হন এবং সেই আঘাত হইতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। দেশের সর্বত্র জনসাধারণের এক নূতন সংগ্রামী চেহারা ফুটিয়া উঠে। এই সময়ে গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য এক সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে কংগ্রেসের পুরাতন নেতৃত্ব 'উদারপন্থী'দের সহিত হাত মিলাইয়া এক নূতন খসড়া-রিপোর্ট প্রস্তুত করেন। যে কমিটির উপর এই রিপোর্ট রচনার ভার দেওয়া হয় তার চেয়ারম্যান ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু। তাঁহারই নামানুসারে এই রিপোর্ট 'নেহেরু-রিপোর্ট' নামে খ্যাত। এই রিপোর্টে মাদ্রাজ-কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে "বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে দায়িত্বশীল সরকার" অর্থাৎ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব-শাসন দাবী করা হয়।

প্রথম হইতেই বোঝা গেল যে, এবারের গণ-জাগরণ ও গণ-সংগ্রাম হইবে পূর্বের দুইবারের গণ-জাগরণ ও গণ-সংগ্রাম হইতে বহুগুণ বেশী ব্যাপক ও শক্তিশালী। সকলেই উপলব্ধি করিলেন যে, গান্ধীজী ব্যতীত এই সংগ্রাম পরিচালনার শক্তি কাহারও নাই। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম নির্ভীক সেনাপতি চিত্তরঞ্জন দাস তখন আর বাঁচিয়া নাই। সুতরাং গান্ধীজী আবার সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ১৯২৪ খৃস্টাব্দে জেল হইতে মুক্তি পাইয়া তিনি এতদিন সবরমতী আশ্রমে তাঁহার গঠনমূলক কর্মপন্থা লইয়া ব্যস্ত ছিলেন। জাতীয় সংগ্রামের আহ্বানে তিনি তাঁহার "সূতাকাটা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, চিত্তশুদ্ধি ও শিক্ষা প্রচারের গঠনমূলক কর্মপন্থা" পরিত্যাগ করিয়া আবার সংগ্রামক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

১৯২৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন হয় কলিকাতা শহরে। অধিবেশনে বিপ্লবীদের উৎসাহে সুভাষচন্দ্র পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব তোলেন এবং সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন জহরলাল নেহেরু। কিন্তু গান্ধীজী প্রমুখ পুরাতন নেতৃত্বের তীব্র বিরোধিতায় অল্পসংখ্যক ভোটে এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। গান্ধীজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ তখনও এতদূর অগ্রসর হইতে

প্রস্তুত ছিলেন না। 'নেহেরু-রিপোর্ট' ও উহার মূল কথা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনই ছিল তাঁহাদের শেষ সীমা। তাই গান্ধীজী পূর্বেই মাদ্রাজ-কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবকে "হটকারিতা-প্রসূত ও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া গৃহীত" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। গান্ধীজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের বিশেষ চেষ্টায় 'নেহেরু-রিপোর্ট' ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাব অল্প-সংখ্যক ভোটাধিক্যে পাশ হইল। কিন্তু নেতারা জানিতেন যে, ভারতবর্ষের জনসাধারণ ঔপনিবেশিক শায়ত্ত-শাসনের দাবিতে সন্তুষ্ট নয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই তাহাদের একমাত্র দাবী। তাই প্রস্তাবে দেশবাসীকে আশ্বাস দিয়া বলা হইল যে, ইহা দ্বারা পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি নাকচ করা হইতেছে না, যদি শাসকগণ ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের দাবি স্বীকার না করে, তবে কংগ্রেস আবার অহিংস অসহযোগ-আন্দোলন শুরু করিবে, আর ট্যাক্স বন্ধ করিরাই সেই আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত, অর্থাৎ পূর্ণ একবৎসর কাল আন্দোলন স্থগিত রাখা হইল। কিন্তু তখন বাহিরে সর্বশ্রেণীর জন-সাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি লইয়া অবিলম্বে আপসহীন সংগ্রাম শুরু করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। "পূর্ণ স্বাধীনতা" ও "ভারতে স্বাধীন সমাজবাদী সাধারণ-তন্ত্র" প্রতিষ্ঠার দাবি লইয়া কংগ্রেস-অধিবেশনে ৫০ হাজার শ্রমিকের উপস্থিতি ও দুই ঘণ্টাকাল তাহাদের কংগ্রেস-মণ্ডপ অধিকার আসন্ন জাতীয় সংগ্রাম ও ভবিষ্যতের এক বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করিয়া আনে।

এক বৎসর সংগ্রাম স্থগিত রাখিবার ফলে শাসকগণ আক্রমণের এক বিরাট সুযোগ পাইয়া যায়। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসেই তাহারা গণশক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য আক্রমণ শুরু করে। ঐ মাসে ভারতের অন্যতম প্রধান সংগ্রাম-শক্তি শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গ্রেপ্তার হন। ইঁহাদের মধ্যে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির তিন জন সভ্যকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ইঁহাদের সকলকে লইয়া বিখ্যাত 'মীরাট ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয়। এই গ্রেপ্তারের ফলে আসন্ন জাতীয় গণ-সংগ্রামের পূর্বক্ষণে

সংগ্রামের অন্যতম প্রধান শক্তি শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব বিহীন হইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বড়লাট লর্ড আরুইন কমিউনিস্ট-দমনের অজুহাতে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতাবলে 'জন-নিরাপত্তা অর্ডিনান্স' নামক একটি বিশেষ আইন সৃষ্টি করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্বেই উহা চূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখেন।

এদিকে কংগ্রেসের চরমপত্রের শেষ সময় ঘনাইয়া আসে। কিন্তু এপর্যন্ত শাসকগণ নীরব থাকায় সকলে মনে করিল, সংগ্রাম অনিবার্য। তাই সংগ্রাম পরিচালনার জন্য গান্ধীজীকেই ১৯২৯ খৃস্টাব্দের কংগ্রেস-অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে মনোনীত করা হয়। কিন্তু গান্ধীজী বাহিরের জনসাধারণের সংগ্রামী মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই তাঁহার পরিবর্তে তরুণ নায়ক জহরলালের নাম সভাপতি-পদের জন্য প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবে জনসাধারণের উৎসাহ বাড়িয়া যায়।

ইতিমধ্যে, ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ১লা অক্টোবর বড়লাটের এক ঘোষণা বাহির হয়। অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন দেওয়া হইবে—ইহাই ছিল সেই ঘোষণার মূল কথা। এমন কি ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর মুখপত্র 'টাইম্‌স্' পত্রিকায় এই ঘোষণা ব্যাখ্যা করিয়া স্পষ্ট ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া হয় যে, এই ঘোষণায় "কোন প্রতিশ্রুতিও নাই, অথবা ইহা দ্বারা সরকারী নীতির কোন পরিবর্তনও বুঝাইতেছে না।"(১) কিন্তু তাহা সত্ত্বেও 'উদারপন্থী' ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ দিল্লী হইতে একটি ম্যানিফেস্টো বাহির করিয়া তাহাতে সানন্দে ঘোষণা করেন :

"এই (বড়লাটের) ঘোষণার অন্তর্নিহিত বিশ্বস্ততায় আমরা মুগ্ধ……আমরা এই আশা পোষণ করি যে, ভারতবর্ষের প্রয়োজনানুরূপ ঔপনিবেশিক শাসন-তন্ত্রের একটি খসড়া প্রণয়ন-কার্যে সম্রাটের সরকারের সহিত সহযোগিতা করিতে আমরা সক্ষম হইব।"(২)

(১) Quoted from 'India To-day' by R. P. Dutt, P. 336.

(২) B. P. Sitaramiya : 'History of Indian National Congress', P. 623.

এই ম্যানিফেস্টোতে যাঁহারা স্বাক্ষর করেন তাঁহাদের মধ্যে গান্ধীজী, এ্যানি বেশান্ত, মতিলাল নেহেরু, তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও জহরলাল নেহেরুর নাম উল্লেখযোগ্য। কিন্তু পরে জহরলাল তাঁহার এই স্বাক্ষরদানকে "ভুল ও বিপজ্জনক" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

একদিকে নেতৃবৃন্দ যখন বড়লাটের ভূয়া প্রতিশ্রুতিতে আত্মহারা হইয়া ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র প্রণয়ন-কার্যে শাসকদের সহিত সহযোগিতার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন, ঠিক তখনই অপর দিকে বিভিন্ন প্রদেশের বিপ্লবীরা প্রাণপণে শাসকগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করিতেছিল, অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিতেছিল। তখন পাঞ্জাবের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী ভগৎ সিং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্বাধীনতার বলিরূপে ফাঁসীর অপেক্ষায় রহিয়াছেন, তাঁহারই সহকর্মী যতীন দাস যেন নেতৃবৃন্দের আপসনীতির প্রতিবাদেই তাঁহার ঐতিহাসিক অনশনের দ্বারা কোটি কোটি ভারতবাসীকে সংগ্রামের নূতন মন্ত্রে দীক্ষা দিতেছিলেন। অগণিত জনসাধারণ পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার দৃঢ় সংকল্প লইয়া সংগ্রামের পথে নামিয়া পড়িতেছিল। তাহাদের সেই সংগ্রামের ধ্বনিতে নেতৃবৃন্দের সাময়িক দুর্বলতা দূর হইয়া গেল। ডিসেম্বর মাসে লাহোর-কংগ্রেসে সংগ্রামের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইল। এই অধিবেশনে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের সুপারিশসহ 'নেহেরু-রিপোর্ট' বাতিল বলিয়া এবং ইহার পরিবর্তে কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে পূর্ণ স্বাধীনতা ('পূর্ণ স্বরাজ') ঘোষণা করা হইল। "যখনই প্রয়োজন হইবে তখনই ট্যাক্স বন্ধের কর্মপন্থাসহ আইন অমান্যের আন্দোলন শুরু করিবার ক্ষমতা" নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির উপর অর্পিত হইল। "৩১শে জানুয়ারী মধ্য রাত্রে নূতন বৎসর আরম্ভের শুভ মুহূর্তে কংগ্রেস-সভাপতি (জহরলাল) ভারতের স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীন করিলেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতবর্ষে প্রথম স্বাধীনতা-দিবস পালন করা হয়, সর্বত্র বিপুল জনতা পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করিল। এই শপথ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতের জনগণ বজ্র-নিনাদে বিশ্বের নিকট ঘোষণা করিল, বৃটিশ শাসকদের নিকট 'বশ্যতা স্বীকার করা ভগবান ও মানুষের বিরুদ্ধে চরম

অপরাধ।' 'স্বরাজ'-এর মতই 'পূর্ণ স্বরাজ-এর অর্থ এবং গান্ধীজীর সংগ্রাম-কৌশল তখনও গভীর রহস্যে আবৃত হইয়া রহিল বটে, কিন্তু ভারতের জনগণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে সকল শক্তি লইয়া দণ্ডায়মান হইল। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদকে পরাভূত করিবার শক্তি তাহাদের না থাকিলেও তাহারা সর্বশক্তি লইয়া সেই চেষ্টা শুরু করিল। এবার জনগণের সংগ্রাম-শক্তি জাগিয়া উঠিল, সেই শক্তি সারা ভারতবর্ষে সংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়া দিল, দীর্ঘকালের জন্য এক বিরাট গণ-সংগ্রামের ঝড় উঠিল।"(৩)

১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দের গণ-সংগ্রাম

লাহোর-কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে আহ্বান করে। গান্ধীজী এই দেশব্যাপী সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু এই সংগ্রামে হিংসামূলক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইতে পারে—এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার মুষ্টিমেয় বিশ্বস্ত অনুচরদের মধ্যে সংগ্রাম সীমাবদ্ধ রাখিবার প্রয়াস পান। গান্ধীজী তাঁহার সবরমতী আশ্রমের লোকদের লইয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিবার পরিকল্পনা করেন। তিনি ভারতের সংগ্রামী শ্রমিকশ্রেণীকে আহ্বান করিলেন না, কৃষকদের আহ্বান করিলেন বটে, কিন্তু তাহাদের ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলনের সময় যাহাতে খাজনা বন্ধ করা না হয় তার জন্য বিশেষ নির্দেশ দেন।

গান্ধীজী তাঁহার আটাত্তর জন আশ্রমবাসী শিষ্য লইয়া সরকারের লবণ-আইন ভঙ্গের সিদ্ধান্ত করেন। সাগর-তীরে যাইয়া লবণ তৈরী করিবার উদ্দেশ্যে ৬ই এপ্রিল তাঁহার ঐতিহাসিক দণ্ডী-অভিযান শুরু হয়। সবরমতী হইতে দণ্ডী পদব্রজে তিন সপ্তাহের পথ। গান্ধীজী তাঁহার দীর্ঘ অভিযান শুরু করিবামাত্র সারা ভারতবর্ষ সংগ্রামের উত্তেজনায় অধীর হইয়া উঠে।

(৩) Hirendranath Mukherjee: 'India Struggles for Freedom', P. 142.

অভিযাত্রীদের প্রতি পদক্ষেপ ভারতের সমগ্র জনগণকে সংগ্রামের উন্মাদনায় অস্থির করিয়া তুলিতে থাকে।

ভারতের প্রত্যেকটি গণ-সংগ্রামের মতই এই সংগ্রামের পিছনেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কারণ ছিল। সেই সকল অর্থনৈতিক কারণই এই সংগ্রামকে পূর্বাপেক্ষা বহুগুণ ব্যাপক ও শক্তিশালী করিয়া তোলে। ১৯২৯-৩০ খৃস্টাব্দের বিশ্বজোড়া আর্থিক সংকটের ছায়া ভারতের আকাশও অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল, বিশ্বজোড়া শিল্প-সংকটের ফলে ভারতের কৃষিজাত দ্রব্যাদির দাম প্রায় অর্ধেক কমিয়া যায় এবং তাহার সহিত রৌপ্যের দাম কমিয়া যাইবার ফলে কৃষক সর্বস্ব হারাইয়া পথে বসে। ইহার উপর, সরকার কর্তৃক পূর্বে এক শিলিং ছয় পেন্স হারে টাকার বিনিময়-মূল্য বাঁধিয়া দিবার ফলে ভারতের জাতীয় ঋণ শতকরা এগার ভাগ বাড়িয়া যায়। এই আর্থিক সংকটে ভারতের প্রত্যেকটি শ্রেণী ভয়ংকর আর্থিক দুর্দশার কবলে পতিত হয়। ইহার ফলে এই সংগ্রাম আরও ব্যাপক ও দুর্বার হইয়া উঠে।

৯ই এপ্রিল গান্ধীজী তাঁহার অভিযানের মধ্যেই জনসাধারণের জন্য এক নূতন নির্দেশ ঘোষণা করেন। তিনি তাঁহার ঘোষণায় সরকারের লবণ-আইন অমান্য করিয়া প্রতি গ্রামে বেআইনিভাবে লবণ তৈরী, মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে পিকেটিং, বিদেশী বস্ত্র পোড়ানো, স্কুল-কলেজ বয়কট, সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা, অস্পৃশ্যতা পরিহার ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন করিবার নির্দেশ দেন। গান্ধীজীর পূর্ব-নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া সংগ্রাম উচ্চস্তরে আরোহণ করিল, গণ-সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিল। এই তরঙ্গ রোধ করিবার শক্তি কাহারও নাই।

সারা দেশে প্রত্যহ অসংখ্য সভা ও শোভাযাত্রা চলিতে থাকে। লক্ষ লক্ষ বালক, বৃদ্ধ, যুবক, এমন কি নারীরাও উন্মত্ত পুলিশের লাঠি ও গুলির সামনে নির্ভয়ে বুক পাতিয়া দেয়, পুলিশ শোভাযাত্রার পথরোধ করিবামাত্র শোভা-যাত্রীরা অহিংস প্রতিরোধের নীতি অনুসারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি সারা দিন পথের উপর বসিয়া থাকে। মেদিনীপুরের জনসাধারণের সংগ্রাম ভারতের

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচনা করে। কয়েক মাস যাবৎ মেদিনীপুরের জনসাধারণ বৃটিশ-শাসন অস্বীকার করিয়া চলিতে সক্ষম হয়। চট্টগ্রামের মৃত্যু-ভয়হীন বিপ্লবীরা শহরের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে এবং দুই দিন পর্যন্ত শহর অধিকার করিয়া রাখে।(১) পেশোয়ারে দশদিন পর্যন্ত বৃটিশ-শাসন অচল হইয়া থাকে। শোলাপুরের শ্রমিকগণ সাতদিনের জন্য শহরের মধ্যে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। দেশের বহু অঞ্চলে কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিশেষ করিয়া যুক্তপ্রদেশের কৃষক-বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে। এই সকল অঞ্চলে কৃষকের ট্যাক্স বন্ধের সংগ্রাম অবিলম্বে খাজনা বন্ধের সংগ্রামে পরিণত হয়। সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণের আঘাতে বৃটিশ-শাসনের মূল পর্যন্ত কাঁপিয়া উঠে।

এপ্রিল মাসের পেশোয়ারের ঘটনা সংগ্রামের মধ্যে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই মাসের প্রথম হইতেই সারা পেশোয়ারে বড় বড় সভা ও শোভাযাত্রা চলিতে থাকে। পুলিশ শত চেষ্টা করিয়াও সংগ্রাম দমন করিতে ব্যর্থ হয়। শাসকগণ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া স্থানীয় নেতাদের গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের সংবাদে সারা পেশোয়ারে আগুন জ্বলিয়া উঠে। ক্রুদ্ধ জনতার শোভাযাত্রা নেতাদের মুক্ত করিবার জন্য জেলের দিকে অগ্রসর হয়। শাসকগণ ভয় পাইয়া সৈন্যবাহিনী তলব করে। সৈন্যদের লইয়া কয়েকখানি সাজোয়া গাড়ী জনতার সম্মুখীন হইলে ক্রুদ্ধ জনতা একখানি সাজোয়াগাড়ী ঘিরিয়া ফেলে এবং সৈন্যদের নামাইয়া তাহা আগুন দিয়া ভস্মীভূত করে। অন্য গাড়ীগুলি ভয় পাইয়া পলায়ন করে। ইহার পর বহু সৈন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া জনতার উপর উন্মত্তের মত গুলি বর্ষণ করে এবং বহু লোক হতাহত হয়। ঠিক এই সময়ে দুই গাড়ী গারোয়ালী সৈন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাদের ইংরেজ-অধিনায়ক জনতার উপর গুলি বর্ষণের নির্দেশ দেয়। হাবিলদার ঠাকুর চন্দ্র সিংহের নেতৃত্বে গারোয়ালী সৈন্যেরা নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি করিতে অস্বীকার করে। এই ঘটনা ঘটে ২৫শে এপ্রিল। ইহার পর, ২৫শে এপ্রিল

(১) বিস্তারিত বিবরণ পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হইতে ৪ঠা মে পর্যন্ত জনসাধারণ সমগ্র পেশোয়ার দখল করিয়া রাখে। শাসকগণ জনসাধারণের হস্ত হইতে পেশোয়ার পুনর্দখল করিবার জন্য প্রকাণ্ড একটা ইংরেজ-বাহিনী ও কয়েক স্কোয়াড্রন সামরিক উড়োজাহাজ নিযুক্ত করে। উন্মত্ত ইংরেজ-সৈন্যগণ নির্বিচারে রাইফেল ও মেসিনগান হইতে গুলি এবং উড়োজাহাজ হইতে বোমা বর্ষণ করিয়া নিরস্ত্র জনতার হস্ত হইতে পেশোয়ার পুনর্দখল করে। বিদ্রোহী গারোয়ালী সৈন্যদের নেতা ঠাকুর চন্দ্র সিং ও অপর কয়েক-জনকে গ্রেপ্তার করিয়া সামরিক আদালতে বিচার করা হয়। বিচারে চন্দ্র সিংয়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ; একজনের পনের বৎসরের এবং অপর কয়েকজনের দশ হইতে তিন বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।(১)

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে সমান উদ্দাম গতিতে সংগ্রাম চলিতে থাকে। শাসকগোষ্ঠী অবশেষে এই সংগ্রাম-শক্তির মূলে আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে ৫ই মে গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করে। সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা ভারতবর্ষে সাধারণ ধর্মঘট ও হরতাল প্রতিপালিত হয়। বোম্বাই প্রদেশের অন্যতম শিল্প-কেন্দ্র শোলাপুরের ৫০ হাজার শ্রমিক গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে ক্রুদ্ধ হইয়া শহর দখল করিয়া নিজেদের সরকার গঠন করে এবং সাত দিন পর্যন্ত অপূর্ব শৃংখলার সহিত শহরের শাসন-কার্য পরিচালনা করে। ১২ই মে শাসকগণ এক বিরাট সৈন্যদল লইয়া শোলাপুর পুনরুদ্ধার করে এবং ঐ দিন হইতে সেখানে 'সামরিক আইন' ('মার্শাল ল') জারি করে। ইহার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত শহরের উপর সৈন্য ও পুলিশের অবাধ তাণ্ডবে বহু শ্রমিক নিহত ও আহত এবং শত শত শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়।

ইহার পর হইতে শাসকগণ আসল মূর্তিতে দেখা দেয় ; দেশের সর্বত্র গুলি-গোলা চলিতে থাকে। কয়েকটি শহরে 'মার্শাল ল' জারি হয়, যেখানে 'মার্শাল ল' জারি হইল না, সেখানে শুরু হয় 'অর্ডিনান্স'-শাসন। জুন মাসে কংগ্রেস ও উহার সকল সংগঠন বেআইনি ঘোষিত হয়। এমনকি সরকারী

(১) ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের মে মাসে 'peoples war' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত ঠাকুর চন্দ্র সিংহের লিখিত প্রবন্ধ হইতে তথ্য গৃহীত।

হিসাবেই সংগ্রাম শুরু হইবার এক বৎসরের মধ্যে ৬০ হাজার লোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। আর কংগ্রেসের হিসাবে "১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দে মাত্র দশ মাসের মধ্যেই ৯০ হাজার পুরুষ, নারী ও বালক বিভিন্ন সময়ের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।"(১) আইন-সভায় সরকারের মুখপাত্র স্বীকার করেন যে, কেবলমাত্র ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত সময়ে ২৯ বার জনতার উপর গুলি বর্ষণে ১০৬ জন নিহত ও ৪২০ জন সাংঘাতিকরূপে আহত হয়।

এইভাবে সরকারী দমননীতি ও গণ-সংগ্রাম সমান গতিতে চলিতে থাকে, গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড তুচ্ছ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়, ভারতের সকল জেল ও বন্দী-নিবাস পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কিন্তু আন্দোলন অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে। ইহার পর হইতে শাসকগণ গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডের পরিবর্তে কেবল গুলি বর্ষণ ও লাঠি চালনা দ্বারা জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার ব্যবস্থা অবলম্বন করে।

কিন্তু দমন ও নিষ্পেষণের সকল কৌশল ব্যবহার করা সত্ত্বেও এই বিরাট গণ-সংগ্রাম চূর্ণ করা সম্ভব হইল না! এদিকে শাসকগোষ্ঠীর উপর গণ-সংগ্রামের ফল ফলিতে শুরু করে। সারা দেশব্যাপী বিলাতী পণ্য বর্জনের ফলে বৃটিশ-ব্যবসায়ীদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চার হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র বোম্বাই শহরে বৃটিশ-ব্যবসায় লোপ পাইয়া যায়। বোম্বাইয়ের গণ-আন্দোলনের চেহারা দেখিয়া বৃটিশ-শাসকগোষ্ঠী আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। বিলাতের শাসকগোষ্ঠীর অন্যতম মুখপত্র 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় লিখিত হয়:

"বোম্বাই শহরে যদি সৈন্যবাহিনী ও সশস্ত্র পুলিশ বসান না হইত-তবে একদিনেই বোম্বাইয়ের সরকার নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত এবং কংগ্রেস সকলের সমর্থনে শাসন-ভার গ্রহণ করিত।"(২)

ভারতবর্ষে সকল বৃটিশ ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইতে দেখিয়া ভারত-

---

(১) B. Pattavi Sitaramiya : 'History of Indian National Congress', P. 876.

(২) Quoted from 'India To-day' by R. P. Dutt, P. 345.

বর্ষের ও ইংলণ্ডের বৃটিশ-ব্যবসায়ীগণ অবিলম্বে ভারতবাসীকে লইয়া কেন্দ্রে দায়িত্বশীল পার্লামেন্টারী সরকার গঠন করিয়া আপস করিবার জন্য চীৎকার তোলে।(১) ভারতে দুই উদারপন্থী "শান্তিদূত" স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও এম. আর. জয়াকর আপসের প্রস্তাব লইয়া যারবেদা-জেলে গান্ধীজীর সহিত আলোচনার জন্য ছুটাছুটি করিতে থাকেন। বড়লাটের প্রস্তাবানুসারে কংগ্রেস যাহাতে 'গোলটেবিল-বৈঠকে' যোগদান করে তাহার জন্য ইঁহারা গান্ধীজী, মতিলাল ও জহরলাল নেহেরুর সহিত আলোচনা করেন। কিন্তু গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের মধ্যভাগে কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই বিলাতে 'গোলটেবিল-বৈঠক' শুরু হয়। ২৬শে জানুয়ারী গান্ধীজী ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য নেতারা মুক্তি লাভ করেন। গান্ধীজী মুক্তিলাভ করিয়াই বড়লাট লর্ড আরুইন-এর সহিত আপসের আলোচনা শুরু করেন। ৪ঠা মার্চ 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয় এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দের ঐতিহাসিক জাতীয় সংগ্রাম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি'র বিভিন্ন শর্ত হইল :—ভারতের ভবিষ্যৎ-যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনার জন্য 'গোল টেবিল-বৈঠক'-এ কংগ্রেসের যোগদান, বিভিন্ন অর্ডিনান্স প্রত্যাহার, কেবলমাত্র অহিংস বন্দীদের মুক্তিদান এবং কেবলমাত্র সমুদ্র-উপকূলের কয়েকটি গ্রামে লবণ তৈরী করিবার অধিকার লাভ। লাহোর-কংগ্রেসে গৃহীত পূর্ণ স্বাধীনতার (পূর্ণ স্বরাজের) প্রস্তাব কেবল একটা 'কথার কথা'য় পর্যবসিত হইল। ১৯২২ খৃস্টাব্দের মত এবারেও ঠিক যে মুহূর্তে সংগ্রাম চরম পর্যায়ে আরোহণ করিতেছিল এবং গণ-সংগ্রামের আঘাতে বৃটিশ-শাসন পতনোন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল তখনই হঠাৎ রহস্যজনকভাবে সংগ্রাম বন্ধ করা হইল।

কিন্তু ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, "যে জাতীয় কংগ্রেসকে মাত্র কিছুদিন

(১) বোম্বাইয়ের ইংরেজ-ব্যবসায়ীদের মুখপত্র 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া', 'য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশন'-এর বোম্বাই-শাখা ও অন্যান্য য়ুরোপীয় সংগঠন এই দাবি তোলে।

পূর্বে বেআইনি ঘোষণা করিয়া ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল সেই জাতীয় কংগ্রেসের সহিত বৃটিশ-সরকার যে প্রকাশ্যে একটি চুক্তি করিতে বাধ্য হইল তাহা দ্বারা নিঃসন্দেহে জাতীয় আন্দোলনের বিরাট শক্তিই জাহির হইল। এই ঘটনা সর্বত্র আনন্দ ও জয়ের মনোভাব জাগাইয়া তুলিল……।"(১) কিন্তু রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন লোকের পক্ষে বুঝিতে কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না যে, ইহা জাতীয় সংগ্রামের চরম পরাজয় এবং এই বিরাট সংগ্রাম 'গোলটেবিল বৈঠক'-এর আলোচনার গোলকধাঁধার মধ্যে কোন রহস্যজনক কারণে আবদ্ধ করা হইয়াছে। ৫ই মার্চ গান্ধীজী 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' সমর্থন করিয়া এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন: "কংগ্রেস কখনই জয়লাভের চেষ্টা করে নাই।"(২) এই দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সংগ্রামের প্রধান পরিচালকের এই উক্তিতে জনসাধারণ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। মার্চ মাসে করাচী-কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি পণ্ডিত জহরলালকে চুক্তির প্রস্তাব উত্থাপন করিতে বলা হইলে তাঁহার ক্ষুব্ধ মনে প্রশ্ন জাগে—"এই জন্যই কি আমাদের দেশবাসী এক বৎসর ধরিয়া এত সাহস দেখাইয়াছে? আমাদের এত বীরত্বপূর্ণ উক্তি ও কার্যাবলী কি শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি লাভ করিল?" পণ্ডিত জহরলাল "জন-সমর্থনহীন" জানিয়াও কংগ্রেসের ঐক্য রক্ষার খাতিরে প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং আপসহীন সংগ্রামের একনিষ্ঠ পূজারী সুভাষচন্দ্র ইহার বিরোধিতায় কোন ফল হইবে না বুঝিয়া অধিবেশনে নীরব হইয়া থাকেন। প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হইল, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী জাতীয়তাবাদের সমাধি রচিত হইল। ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, করাচী-কংগ্রেসে যখন ভারতের বৃহত্তম জাতীয়-সংগ্রাম এই শোচনীয় পরিণতি লাভ করিতেছিল ঠিক তখনই ভারতের আপস-পলায়নহীন বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্মীরা ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য ইংরেজের ফাঁসী-কাষ্ঠে প্রাণ আহুতি দেন। ভগৎ সিং

(১) R. P. Dutt : 'India To-day', P. 348. (২) M. K. Gandhi : 'Speeches & Writings', P. 778.

এবং তাঁহার বৈপ্লবিক আদর্শ ও আত্মত্যাগ হতাশার অন্ধকারে পথহারা ভারতবাসীর অন্তরে ক্ষীণ দীপশিখার মত জ্বলিতে থাকে।

'গান্ধী-আরুইন চুক্তি'র শর্ত অনুসারে গান্ধীজী ইংলণ্ডে 'গোল টেবিল-বৈঠক'-এ যোগদান করেন। কিন্তু বৈঠকের আলোচনা সাম্প্রদায়িক সমস্যার চোরাবালিতে ডুবিয়া যায়। বৈঠকে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্র রচনা আর সম্ভব হইল না, ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গান্ধীজী রিক্ত হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি ফিরিবার পথে পোর্টসৈয়দ বন্দর হইতে তারযোগে ভারত-সচিবকে জানাইয়া দেন যে, তিনি তাঁহার সকল শক্তি দিয়া শান্তি রক্ষা করিবেন।

১৯৩২-৩৪ খৃস্টাব্দের সংগ্রাম

গান্ধীজী শান্তিরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইলেও শাসকগণ শান্তির জন্য মোটেই ব্যস্ত ছিল না। তাহারা 'গান্ধী-আরুইন-চুক্তি' ও 'গোল টেবিল-বৈঠক'-এর আড়ালে ভারতের সংগ্রাম-শক্তিকে নিঃশেষে চূর্ণ করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিল। গান্ধীজী 'গোল টেবিল-বৈঠক' হইতে ভারতে ফিরিবার পূর্বেই শাসকগণ তাহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়। দেশের জনসাধারণও বুঝিতে পারিতেছিল যে, কংগ্রেস-নেতৃত্ব না চাহিলেও সংগ্রাম অনিবার্য।

দেশের যুবশক্তি কখনই 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি' সমর্থন করে নাই, চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রদেশের ছাত্র-সংগঠনগুলি ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। সরকারী আক্রমণ শুরু হইবামাত্র তাহারা আবার সংগ্রাম শুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। গান্ধীজী ভারতে পদার্পণ করিবার পূর্বেই সরকারের আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেস-কমিটি ট্যাক্স বন্ধের আন্দোলন শুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। এই আন্দোলন অঙ্কুরে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে সরকার অবিলম্বে জহরলাল ও যুক্তপ্রদেশের অপর কয়েকজন প্রধান নেতাকে গ্রেপ্তার করে। 'লাল-কোর্তা'-আন্দোলন-এর দুর্গ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের বিখ্যাত নেতা খান আব্দুল গফুর খান (সীমান্ত-গান্ধী) ও তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খানসাহেব গ্রেপ্তার হন। যুক্তপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রধান দুর্গ বাংলাদেশে জরুরী 'অর্ডিনান্স'-এর রাজত্ব পূর্ণোদ্যমে শুরু হইয়া যায়।

গান্ধীজী ভারতে পদার্পণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল সংবাদ শুনিয়া বড়লাট লর্ড উইলিংডন-এর সহিত সাক্ষাতের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু শাসকগণ তখন আক্রমণের উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া এতই মত্ত যে বড়লাট সাক্ষাৎ না-মঞ্জুর করেন। গত ১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দের সংগ্রামে আক্রমণের উদ্যোগ ছিল কংগ্রেসের হাতে, আর এবার শাসকগণ সেই উদ্যোগ কাড়িয়া লইয়া কংগ্রেসকে উচিত শিক্ষা দিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাই তখন তাহাদের ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধীজী গ্রেপ্তার হইলেন। তাঁহার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের অন্য সকল নেতারাও কারাগারে আবদ্ধ হন। কংগ্রেস ও উহার সকল সংগঠন আবার বেআইনি ঘোষিত হইল এবং কংগ্রেস-তহবিল ও উহার সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। সারা দেশের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে জরুরী 'অর্ডিনান্স' জারি হইতে লাগিল।

জনসাধারণ এই আকস্মিক আক্রমণে প্রথমে বিভ্রান্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু এবারে তাহারা বিক্ষিপ্ত, সংগঠনহীন, নেতৃত্বহীন। তবু জনগণ মরিয়া হইয়া দেশব্যাপী প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালাইতে থাকে। ১৯৩২ খৃস্টাব্দের প্রথম চার মাসের মধ্যে ৮০ হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে কলিকাতায় গোপনে বেআইনি-ঘোষিত কংগ্রেসের এক অধিবেশন হয়। অধিবেশনের আলোচনায় দেখা যায় যে, ঐ সময়ে বন্দীর সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার ছাড়াইয়া গিয়াছে। অধিবেশন শেষ হইবার পূর্বেই পুলিশ আসিয়া অধিবেশন ভাঙ্গিয়া দেয় এবং উহার উদ্যোক্তাদের গ্রেপ্তার করে।

সারা দেশব্যাপী গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র চলিতে থাকে অমানুষিক উৎপীড়ন, নির্বিচারে গুলিচালনা, বিভিন্ন গ্রামের উপর সামগ্রিক জরিমানা,

পিটুনি ট্যাক্স আদায়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কৃষক ও অন্যান্য জনসাধারণের জমি-জমা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইতে থাকে। সারা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কত সাধারণ মানুষ বর্বর পুলিশের অমানুষিক উৎপীড়নে প্রাণ হারাইল, কত মানুষ চির জীবনের জন্য পঙ্গু হইয়া গেল, কত নারী সতীত্ব হারাইল, কত মানুষ যে জমি ও সকল সম্পত্তি হারাইল তাহার কোন হিসাব নাই। পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়া ভারত-সরকার সদম্ভে ঘোষণা করিল, মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যেই তাহারা ভারতের সংগ্রাম-শক্তি চূর্ণ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু দাম্ভিক শাসকগোষ্ঠীর আস্ফালন মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া ভারতের জনসাধারণ নেতৃত্ববিহীন হইয়াও দীর্ঘ দুই বৎসর পাঁচ মাস কাল অভূতপূর্ব বীরত্বের সহিত সংগ্রাম চালাইয়া যায়।

এই বিরাট গণ-সংগ্রাম সম্পূর্ণ নেতৃত্ববিহীন হইয়া আপন গতিতে চলিতে থাকে। এমনকি নেতৃবৃন্দও গ্রেপ্তারের পর যেন এই সংগ্রামশীল জনগণের কথা ভুলিয়া গেলেন। ১৯৩২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী জেলে বসিয়া "আমৃত্যু অনশন" শুরু করেন স্বাধীনতা বা সংগ্রামের কোন মূল দাবির জন্য নহে,—"হরিজন শ্রেণী"সমূহের পৃথক নির্বাচনের পরিকল্পনা নাকচ করিবার জন্য। তাঁহার অনশনের ফলে 'পুণা-চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত আসনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী আবার অনশন করেন। এবারের অনশনের কারণ হইল হরিজনদের স্বার্থ সম্পর্কে আরও সতর্কতা ও মনোযোগ অবলম্বনের এবং তাঁহার নিজের ও তাঁহার অনুগামীদের আত্মশুদ্ধির ব্যবস্থা করা। এই রহস্যময় ব্যক্তিটির প্রকৃত উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, এই অনশনের মধ্যেই ভারত-সরকার তাঁহাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেয়।

গান্ধীজীর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে গান্ধীজী বড়লাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন, কিন্তু বিজয়ী শাসক লর্ড উইলিংডন ঔদ্ধত্যের

সহিত তাঁহার প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেন। তাহা সত্ত্বেও কংগ্রেস-নেতৃত্ব জনগণের ব্যাপক আইন অমান্য আন্দোলনের অবসান ও উহার পরিবর্তে ব্যক্তিগত আইন অমান্যের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী কংগ্রেস-সভাপতির নির্দেশে কংগ্রেস ও উহার সকল সংগঠন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়। কংগ্রেস-নেতৃত্ব সম্ভবতঃ শাসকগণকে খুশি করিবার জন্যই কংগ্রেস-সংগঠন ভাঙ্গিয়া দিবার সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু শাসকগণ কংগ্রেসের এই সকল আত্ম-বিলোপকারী ব্যবস্থার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিল না, তাহারা তখন প্রাণপণে ব্যক্তিগত আইন অমান্যকারীদের দমন করিতে ব্যস্ত। গান্ধীজী স্বয়ং আবার আগস্ট মাসে গ্রেপ্তার হন এবং ঐ মাসের শেষ দিকেই আবার মুক্তিলাভ করেন। এই সকল ব্যাপারে দেশের অবস্থা ধোঁয়াচ্ছন্ন হইয়া উঠে। এই অবস্থার মধ্যেই এক রহস্যজনক কারণে গান্ধীজী কিছুদিনের জন্য রাজনীতি হইতে দূরে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়া হরিজন-অঞ্চল ভ্রমণে বাহির হন। অন্যদিকে নেতৃবিহীন হইয়াই সংগ্রাম চলিতে থাকে।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দের মে মাসে সরকারের অনুমতি লইয়া পাটনা শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে বিনা শর্তে সকল প্রকারের আন্দোলন প্রত্যাহার করা হয়। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-সংগ্রামের এই শোচনীয় পরিণতি আবার সারা দেশকে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে। দীর্ঘ পাঁচ বৎসরব্যাপী ভারতের রক্তস্নান, অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট, আত্মত্যাগ সবই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কংগ্রেস-নেতৃত্বের এক অংশ ডাঃ আনসারীর নেতৃত্বে একটা নূতন 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠন করিয়া কেন্দ্রীয় আইন-সভার নির্বাচনে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেন।

১৯৩৬ খৃস্টাব্দের জুন মাসে সাধারণভাবে কংগ্রেসের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হয়, কিন্তু ইহার কয়েকটি শাখা, বিভিন্ন যুবসঙ্ঘ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশের লালকোর্তাদলের উপর তখনও নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে। জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয় এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে দমননীতির এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই কোন অজ্ঞাত কারণে গান্ধীজী এক ঘোষণা দ্বারা কংগ্রেসের সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। ঘোষণায় বলা হয়, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অধিকাংশ কংগ্রেস-সভ্যের নিকট অহিংসা একটা "কর্ম-কৌশল মাত্র, মৌলিক আদর্শ" নহে—ইহাই তাঁহার কংগ্রেস-সভ্যপদ ত্যাগের কারণ। কিন্তু গান্ধীজী এইভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলিয়া গেলেও তিনিই কংগ্রেসের প্রকৃত চালক-শক্তি হইয়া থাকেন, কারণ এখন রাজনীতিক্ষেত্রে ও জনগণের মধ্যে তাঁহার আসন এতই সুপ্রতিষ্ঠিত যে তাঁহাকে বাদ দিয়া কোন জাতীয় আন্দোলন, কোন জাতীয় রাজনৈতিক প্রচেষ্টাই আর সম্ভব নহে। যাহা হউক, ১৯৩৯-৪০ খৃস্টাব্দের পূর্বে তিনি আর প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন নাই।

এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের বৃহত্তম গণ-সংগ্রাম ব্যর্থ হইলেও গান্ধীজীর নেতৃত্বে জনগণ এই সংগ্রামের মধ্য দিয়া যে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করে তাহার ফলেই জনগণের চেতনা উচ্চস্তরে আরোহণ করে এবং গণ-সংগ্রামের এক নূতন স্তরে আরোহণ করিবার পথ প্রস্তুত হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্গদেশে তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯২৮-১৯৩৪ খৃস্টাব্দ)

এযুগের বৈশিষ্ট্য

১৯২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গদেশে তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার যুগ। ১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে, অর্থাৎ দ্বিতীয় প্রচেষ্টার শেষ দিকে দমন-নীতির ফলে বিপ্লবীরা দলে দলে গ্রেপ্তার হইয়া কয়েক বৎসর জেলে আটক থাকিবার পরে ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মুক্তিলাভ করে এবং তাহার পর হইতে এই যুগ আরম্ভ হয়। একদিকে যেমন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন ১৯২০-২১ খৃস্টাব্দের দেশব্যাপী বিরাট গণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়া আসিয়া মৌলিক রূপান্তর লাভ করিয়াছিল, ঠিক তেমনই সেই জাতীয় আন্দোলনের আর একটি অংশ হিসাবে বৈপ্লবিক সংগ্রামও দুইবারের প্রচেষ্টার ফলে মধ্যশ্রেণীর ভিতর আরও বিস্তার লাভ করায় ইহার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য দেখা দেয়, এবং এমনকি আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী ও আদর্শের সংঘাতে সারা ভারতের বিপ্লবীদের চিন্তাধারা ও আদর্শের ক্ষেত্রে একটা মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। এযুগের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ :—

১। হতাশা ও আর্থিক সংকটের পরিণতি

এই যুগের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র পূর্বগত যুগগুলির ক্ষেত্র অপেক্ষা বহু গুণ বেশী বিস্তার লাভ করে। ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি : প্রথমতঃ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক গণ-চরিত্র গ্রহণ ও তাহার অনিবার্য ফলস্বরূপ ভারতের সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রাম-স্পৃহার স্ফূরণ, এবং জাতীয় সংগ্রামের নেতৃত্বের মধ্যে আপসপন্থী মনোভাবের প্রাধান্য; দ্বিতীয়তঃ, ১৯২৯-৩০ খৃস্টাব্দের বিশ্বব্যাপী

আর্থিক সংকট ও সেই আর্থিক সংকটের অনিবার্য আঘাতে ভারতের সকল শ্রেণীর আর্থিক জীবনে বিপর্যয়।

গান্ধীজীর উদ্ভাবিত ও তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত জাতীয় আন্দোলন দেশ-ব্যাপী জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার লাভ করিয়া সকল স্তরের জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রাম-স্পৃহা জাগাইয়া তুলিতে সক্ষম হয়, কিন্তু ১৯২১ খৃস্টাব্দের শেষদিকে সেই ব্যাপক জাতীয় গণ-সংগ্রাম চরম পর্যায়ে পৌঁছিবার মুহূর্তে আকস্মিকভাবে প্রত্যাহৃত হইবার ফলে জনসাধারণের মধ্যে, বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর যুবকগণ কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় আপসহীন বৈপ্লবিক সংগ্রামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।

১৯২৯ খৃস্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন হইতে যে ভয়ংকর আর্থিক সংকট শুরু হয় তাহা দ্রুত সারা দুনিয়াকে গ্রাস করিয়া ফেলে। বৃটেনের অর্থ-নীতির জোয়ালে আবদ্ধ ভারতবর্ষের আর্থিক জীবনেও বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা হু-হু করিয়া বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে চরম আর্থিক দুর্দশাগ্রস্ত মধ্যশ্রেণীর মধ্যে চরমপন্থী বৈপ্লবিক সংগ্রামের মনোভাব প্রবল আকারে দেখা দেয়। এই মনোভাবের দ্বারা পুষ্ট হইয়া বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র পূর্বাপেক্ষা বহু গুণ বেশী প্রসার লাভ করে। সরকারী রিপোর্টেও ইহা স্বীকার করিয়া বলা হইয়াছে :

"বৈপ্লবিক প্রচার ও ক্রিয়াকলাপ এই কয়েক বৎসরে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, বিপ্লবীরা একটা বৈপ্লবিক মনোভাব ব্যাপক আকারে সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং সেই মনোভাব শিক্ষিত ভদ্রলোক-সমাজের সকল স্তরে প্রবেশ করিয়াছে। মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকার-সমস্যা ইহার জন্য বহুলাংশে দায়ী। এই বেকার-সমস্যা বিপ্লবীদের প্রচারে বিশেষ সহায়ক হইয়াছে।"(১)

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Vol. II, Memorandum on Terrorism, P. 336.

২। সাংগঠনিক পরিবর্তন

সাধারণ জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রাম-স্পৃহার স্ফুরণের ফলে বৈপ্লবিক ভাবধারার প্রভাব বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়া স্কুল-কলেজের ছাত্রদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের দিকে আকর্ষণ করে। তাহার ফলে বৈপ্লবিক সমিতির সভ্য-সংখ্যা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে এই সকল গুণগত পরিবর্তনের ফলে বৈপ্লবিক সমিতির সাংগঠনিক পদ্ধতিতেও গুরুতর পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া উঠে। বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রথম যুগে সভ্যদের আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষাদানের ব্যবস্থাটি ছিল গুপ্ত-সমিতির সাংগঠনিক পদ্ধতির মূল ভিত্তিস্বরূপ। সেই যুগে বিশেষ করিয়া শক্তির দেবতা কালী দেবতার সম্মুখে পূজা-হোম প্রভৃতির পর তরবারি (কোন কোন ক্ষেত্রে মড়ার মাথার খুলিও) হস্তে লইয়া সভ্যদের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু এযুগের সংগঠন-পদ্ধতিতে এই সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা হয়। এযুগে সভ্যদের বৈপ্লবিক সাহিত্য পাঠ, সভ্যদের পরীক্ষা হিসাবে বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় দান, কিছু সময়ের জন্য নূতন সভ্যদের পরিচালকদের বিশেষ নজরে রাখা প্রভৃতি ঐ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্থান গ্রহণ করে।

প্রথম যুগে হিন্দুধর্মের শক্তি-সাধনার ভিত্তিতেই বৈপ্লবিক আদর্শ গড়িয়া উঠায় এবং তাহার ফলে বৈপ্লবিক আদর্শ ধর্মের সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ায় সভ্য-সংগ্রহ পদ্ধতির মধ্যেও ধর্মীয় অনুষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু এযুগে ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে উন্নত রাজনৈতিক চেতনা ও সংগ্রাম-স্পৃহা বিকাশ লাভ করায় এবং বিশেষ করিয়া বৈপ্লবিক ভাবধারা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করায় ঐ ভাবধারা ধর্মের স্তর অতিক্রম করিয়া ধর্মের প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছে। ইহা দ্বারা বৈপ্লবিক আদর্শ ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক ধাপ অগ্রগতির সূচনা হইয়াছে।

৩। বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারী

প্রথম যুগে বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারীর আবির্ভাব ঘটে নাই। কিন্তু এযুগে বহু নারী এই সংগ্রামে যোগদান করিয়া বহু ক্ষেত্রে অপূর্ব দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। বৈপ্লবিক সংগ্রামে নারীদের যোগদানের সাধারণ কারণ হইল প্রথমতঃ, ব্যাপক জাতীয় গণ-সংগ্রামের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নারীদের মধ্যেও জাতীয়তাবোধ ও সংগ্রাম-স্পৃহার সৃষ্টি; দ্বিতীয়তঃ, নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ও তাহার ফলস্বরূপ বহির্জগৎ ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। এই সকল কারণে একদিকে যেমন ১৯৩০-৩১ খৃস্টাব্দের অসহযোগ-আন্দোলনে নারীরা ক্রমশঃ বেশী সংখ্যায় যোগদান করে, তেমনি এই সময়ের বৈপ্লবিক সংগ্রামেও নারী-বিপ্লবীর সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। মেয়েরা বৈপ্লবিক সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করিয়া এবং নানাভাবে বিপ্লবীদের সাহায্য করিয়া এই সংগ্রামকে যে যথেষ্ট শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বাংলাদেশের বহু নারী নিজের এবং পরিবারবর্গের জীবন ও সাংসারিক শান্তি বিপন্ন করিয়াও বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়াছে, তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও বেআইনি সাহিত্য লুকাইয়া রাখিয়াছে এবং নিজের অঙ্গ হইতে অলংকার খুলিয়া বিপ্লবীদের হাতে তুলিয়া দিয়াছে। বাংলার নারীদের এই সাহায্যই অন্যতম কারণ যাহার জন্য এযুগের বৈপ্লবিক সংগ্রাম দুর্বার হইয়া উঠিয়াছিল এবং ইহা দমন করা শাসকদের পক্ষে বিশেষ কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। একথা স্বীকার করিয়া সরকারী রিপোর্টেও বলা হইয়াছে, "নারীরা যে ক্রমশঃ অধিক সংখ্যায় বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে যোগদান করিতেছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে এবং তাহাদের যোগদানের ফলে পুলিশের পক্ষে বিপ্লবীদের দমন করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।"(১)

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, p. 338

৪। সমাজবাদী ভাবধারা

এযুগে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে একটি নূতন আদর্শ ধীরে ধীরে প্রভাব-বিস্তার করিতে থাকে। ১৯১৭ খৃস্টাব্দের রুশ-বিপ্লব সারা দুনিয়ার চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে আলোড়ন পূর্বেই সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা এই সময় ভারতবর্ষেও দেখা দেয়। ১৯২৮ খৃস্টাব্দের পূর্বেই এদেশের শ্রমিক-আন্দোলন সেই আদর্শ অনুসারেই নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে এবং ইহার ফলে ইংরেজ-শাসকগণ ব্যাপকভাবে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করিয়া ও 'মীরাট ষড়যন্ত্র-মামলা'র আয়োজন করিয়া ভারতবর্ষ হইতে এই আদর্শের মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করে। এই সময়ে এই আদর্শের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাহক হইলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু। সমাজবাদী আদর্শ কেবল এদেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যেই নহে, পরন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ চিন্তা-নায়কদের একাংশের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। ১৯২৭ খৃস্টাব্দে পণ্ডিত মতিলাল ও জহরলালের মস্কো নগরীতে রুশ-বিপ্লবের বার্ষিক উৎসবে যোগদান মোটেই তাৎপর্যহীন নহে। পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুই জাতীয়-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথম ও একমাত্র ব্যক্তি যিনি ভারতের যুব-সমাজের মধ্যে সমাজবাদী আদর্শ প্রচার করেন। তিনিই প্রথম ১৯২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে নিখিল-বঙ্গ ছাত্র-সম্মেলনের সভাপতির ভাষণে ছাত্র-সম্প্রদায়ের সম্মুখে সমাজবাদ ও আন্তর্জাতিকতার আদর্শ তুলিয়া ধরেন। তারপর ১৯২৮ খৃস্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেস-অধিবেশনের সময় হাওড়া জিলা কংগ্রেসকর্মী-সম্মেলনে ও নিখিলবঙ্গ যুব-সম্মেলনে তিনি যে ভাষণ দেন তাহাতেও এই আদর্শের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়।

এইভাবে সমাজবাদের উন্নততর বৈপ্লবিক আদর্শ ভারতের বিপ্লবীদের চিন্তা-ধারার মধ্যেও ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। এযুগের বিপ্লবীরা কর্মপন্থা হিসাবে প্রধানতঃ সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করিলেও তখন হইতে তাহারা এই নূতন আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে এই আদর্শের প্রভাব আরও স্পষ্ট হইয়া উঠে এবং তাহারই পরিণতিস্বরূপ

'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সঙ্ঘ' পরে 'হিন্দুস্থান সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী বাহিনী' (Hindusthan Socialist Republican Army) নাম গ্রহণ করে। ১৯২৮—৩৪ খৃস্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসানের পর বাংলা ও ভারতের অন্যান্য স্থানের বিপ্লবীদের আদর্শ ও কর্মপন্থার ক্ষেত্রে যে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় সমাজবাদী আদর্শের অনিবার্য প্রভাবই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ।

৫। 'রিভোল্ট' বা 'এড্‌ভান্স' দল

'রিভোল্ট' বা 'এড্‌ভান্স' দলের সৃষ্টি ১৯২৮-৩৪ খৃস্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই নূতন দলকে ভিত্তি করিয়াই এযুগের বিপ্লব-প্রচেষ্টা পরিচালিত হয়। ১৯২৩-২৫ খৃস্টাব্দের ব্যর্থ বিপ্লব-প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা হইতেই এই নূতন দলের সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়, আর তাহা আরম্ভ হয় জেলখানার মধ্যে বসিয়া।

১৯২৪-২৫ খৃস্টাব্দে সরকারী অর্ডিনান্সের বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া বাংলা দেশের বিপ্লবীরা দলে দলে গ্রেপ্তার ও কারাগারে আবদ্ধ হয়। কারাগারে আবদ্ধ হইবার পর বিপ্লবীদের মধ্যে এক ব্যাপক ও গভীর আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার বিষয় হইল—(১) ১৯২৩-২৫ খৃস্টাব্দের ও তাহার পূর্বের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিভিন্ন ত্রুটি সংশোধনের উপায় নির্ণয়; (২) পরবর্তী বিপ্লব-প্রচেষ্টার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা।

এই উভয় বিষয়েই বিপ্লবীদের মধ্যে গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। একপক্ষে গেলেন বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির প্রধান নেতারা, আর বিভিন্ন সমিতির তরুণ বা অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী নেতারা হইলেন অপর পক্ষ। প্রবীন নেতাদের মতে, বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ হইল উপযুক্ত আয়োজনের অভাব। তাঁহারা বলিলেন, উপযুক্ত আয়োজনের অভাবেই বিপ্লব-প্রচেষ্টা বার বার ব্যর্থ হইতেছে, সুতরাং মুক্তির পরে পুনরায় অবিলম্বে বিপ্লব-প্রচেষ্টা আরম্ভ না করিয়া প্রথমে আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে হইবে এবং যতদিন সেই আয়োজন সম্পূর্ণ না হয় ততদিন ধৈর্য ধরিয়া অপেক্ষা করিতে হইবে। তরুণ বা অপেক্ষাকৃত কম

বয়সী নেতারা এই মতের ঘোরতর বিরোধী। তাঁহাদের মতে, বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ আয়োজনের অভাব নহে, বিভিন্ন বৈপ্লবিক সমিতির মধ্যে সহযোগিতার অভাব ও উহাদের আভ্যন্তরিক কলহই ব্যর্থতার মূল ও প্রধান কারণ। তাঁহারা বলিলেন, বিভিন্ন বিপ্লবীদলকে, অন্ততপক্ষে বাংলাদেশের প্রধান দুইটি দলকে—অনুশীলন ও যুগান্তর সমিতিকে—অবিলম্বে কাজের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে, কেবলমাত্র গুপ্তহত্যা দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টির বদলে ব্যাপক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনার ভিত্তিতে বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতার ব্যবস্থা করিতে হইবে, এবং মুক্তির পর অবিলম্বে কাজ শুরু করিতে হইবে। বিভিন্ন দলের মধ্যে ঐক্য ও সহযোগিতার প্রশ্নেও গুরুতর মতভেদ দেখা দেয়। প্রবীন বিপ্লবীরা নিজ নিজ দলের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখিবার বিশেষ পক্ষপাতী, আর তরুণ নেতারা দেশের স্বাধীনতার জন্য আশু বিপ্লবের স্বার্থে দলীয় স্বতন্ত্রতা বিসর্জন দিতে কুন্ঠিত নহেন। জেলখানায় থাকিতেই উভয় পক্ষের এই মতভেদ তীব্র হইয়া উঠে। বাহিরে আসিবার পর এই মতভেদ আরও প্রবল হইয়া উঠে, প্রবীন নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের মতে অটল হইয়া থাকেন এবং ইঁহাদের বিরুদ্ধে তরুণ নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা ক্রমশঃ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। এই অবস্থা কিছুদিন চলিবার পর এই দুই পক্ষের মধ্যে আপস অসম্ভব বুঝিয়া সকল দলের তরুণ কর্মীরা অবশেষে নিজ নিজ মূল দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বাহির হয় এবং সকলে সম্মিলিত হইয়া দাঁড়ায়। তরুণ কর্মীরা নিজ নিজ মূল দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সম্মিলিত হয় বলিয়া এই সম্মিলিত দলকে 'রিভোল্ট-গ্রুপ' বা 'বিদ্রোহী দল' নামে অভিহিত করা হইত। পরে ইহাদের বলা হইত 'এড্ভান্স' বা 'অগ্রদূত' দল'।(১) এই 'রিভোল্ট-গ্রুপ' বা সম্মিলিত দলের মধ্যে থাকে অনুশীলন পার্টি ও যুগান্তর সংযুক্তদলের কর্মিগণ। 'যুগান্তর সংযুক্তদল' বলিতে বুঝাইত মূল যুগান্তর সমিতির সহিত সংযুক্ত ময়মনসিংহ, বরিশাল, মাদারীপুর, হুগলী ও চট্টগ্রামের যুগান্তর শাখা-পার্টিগুলিকে। ১৯২৮-৩৪ খৃস্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রধানতঃ ইহাদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়।

(১) সতীশচন্দ্র পাকড়াশী: 'অগ্নিদিনের কথা', পৃঃ ১৩৮।

নূতন বৈপ্লবিক সংগঠন

১৯২৮ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে বিপ্লবী রাজবন্দীরা মুক্তি পাইয়া দলে দলে কারাগার হইতে বাহির হয়। তাহারা বাহিরে আসিয়া দেখিল, জনসাধারণের হতাশা কাটিয়া যাইতেছে, সারা দেশের আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া আর একটা বিরাট সংগ্রামের ঝড় উঠিতেছে। ১৯২৩-২৫ খৃস্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলেও দেশের মানুষ কারামুক্ত বিপ্লবীদের বিজয়ীর সম্মান, শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাইল, তাহারা এই আপস-পলায়নহীন মুক্তি-সংগ্রামের বীর যোদ্ধাদের অন্তর দিয়া বরণ করিল।

এই সময়ে বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে নবজাগরণের যে জোয়ার আসে এবং তাহাদের নিকট হইতে কারামুক্ত বিপ্লবীরা যে অভূতপূর্ব অভিনন্দন লাভ করে তাহার একটি চমৎকার বর্ণনা দিয়া 'রিভোল্ট' বা 'এড্‌ভান্স' দলের অন্যতম প্রধান নায়ক সতীশচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয় তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন :—

"বিপ্লবী নেতারা জেল থেকে ফিরে এসে বাংলার সর্বত্র এমন অভিনন্দন পাচ্ছেন যা তাঁরা পূর্বে কোনদিন পাননি ; সভা-সম্মেলনে তাঁদেরই সংবর্ধনা, পতাকা-উত্তোলন, উদ্বোধন ও সভাপতিত্ব করার সম্মান পাচ্ছেন তাঁরাই। বাংলার ছাত্র ও যুবকদের মন আকৃষ্ট ক'রে ফেলেছে সদ্যমুক্ত বিপ্লবী কর্মীরা—যাঁদের সাথীরা গুলিতে-ফাঁসীতে প্রাণ দিয়েছে, এতদিন কারা-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। কংগ্রেস-নেতাদের চেয়েও তাঁদের সম্মান ও শ্রদ্ধা বেশী।

"চারিদিকে জনসাধারণের মধ্যে নব জাগরণের সাড়া—রাজনৈতিক চেতনা বেশ উদ্বুদ্ধ ; সংগ্রামাত্মক নীতি ও কর্মপদ্ধতিতে দেশের জনসাধারণকে সুসংগঠিত করে নেওয়ার এই তো প্রকৃষ্ট সময়, আর বিপ্লবী সংগঠনগুলিই এ দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত।"

জেল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসিবার পর বিপ্লবীদের প্রাথমিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে পাকড়াশী মহাশয় বলেন :

এই সময় 'ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘ'(১) প্রতিষ্ঠিত হয়। "এর কিছুদিন পরে সকল দলের (সকল বিপ্লবীদলের) লোক নিয়েই 'ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘ'-এর শাখা হিসাবে 'ঢাকা জিলা স্বাধীনতা-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'রিভোল্ট' বা 'এডভান্স' দলের অন্যতম প্রধান নায়ক নিরঞ্জন সেনকে সম্পাদক ক'রে বরিশালেও সঙ্ঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে অন্য কয়েকটি জিলাতেও এই সঙ্ঘের শাখা (প্রধানতঃ তরুণ বিপ্লবীদের উদ্যোগে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তখন বিপ্লবী দলগুলির ঐক্য ইহার বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা-কংগ্রেসে বিপ্লবীরা অংশ গ্রহণ করেন। বিপ্লবী নেতা ও কর্মীরা দু' হাজার যুবককে মিলিটারী পোষাকে সজ্জিত ক'রে মিলিটারী কায়দায় ট্রেনিং দিয়ে কংগ্রেসের কার্য পরিচালনের ব্যবস্থা করেন। বিপ্লবী দলের নেতা ও কর্মীরা এই 'জাতীয় বাহিনী' পরিচালনের ভার নেন। সুভাষচন্দ্র ছিলেন ইহার সর্বাধিনায়ক (G.O.C.)।"

এদিকে বিপ্লবী দলগুলির মধ্যে পুরাতন নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তরুণদলের মতভেদ বাড়িয়াই চলে। প্রবীণেরা পূর্ণ আয়োজন না করিয়া বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুরু করিতে নারাজ। অন্যদিকে, তরুণদলের অন্যতম প্রধান নায়ক পাকড়াশী মহাশয় বলেন :

"ঢাকার যুবকগণ নেতৃত্বের পুরানো ধারায় আর বিশ্বাসী নয়, তারা চায় নূতন কাজের নির্দেশ। ভিতরে ভিতরে পার্টি-নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ জমে উঠছে।...বরিশালেও ঐ একই কথা, নিরঞ্জন সেন (বরিশালের তরুণদলের নায়ক) এই খবর আনলো। প্রভাত চক্রবর্তী (ত্রিপুরা জিলার তরুণ দলের

(১) প্রথমে কারামুক্ত বিপ্লবীদের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি লইয়া 'বঙ্গীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর বাংলা দেশের কানাইলাল গাঙ্গুলী ও ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সাহায্যে স্বরাজের দাবি লইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু 'ভারত-স্বাধীনতা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর বিপ্লবীদের সাহায্যে সুভাষচন্দ্র একটি পাল্টা 'ভারত স্বাধীনতা-সঙ্ঘ' স্থাপন করেন। এখানে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত স্বাধীনতা-সঙ্ঘের' কথাই বলা হইতেছে।

(যুক) কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থানের পার্টি-সভ্যদের সংগ্রামাত্মক কাজের কথা
নায়।"

এবার বিভিন্ন সমিতির তরুণদল নিজ নিজ সমিতির পুরাতন নেতৃত্বের
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা শুরু করে।

"ঢাকা, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও অন্যান্য জিলার অনুশীলন পার্টির কতিপয়
বক মিলে কলিকাতা-কংগ্রেসের সময় পার্ক সার্কাসে একটি গোপন বৈঠকে
আলোচনা করে।...কাজ চাই, কাজ চাই—কাজ। কাজ মানে সশস্ত্র
প্রতিরোধ।...লাহোর থেকে ভগৎ সিং প্রভৃতি কয়েকজন 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট
রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এর ('হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন' পরে
এই নাম গ্রহণ করে) বিপ্লবী কর্মী কংগ্রেসে এসে দক্ষিণ-কলিকাতার যতীন দাসের
(ইনি পূর্ব হইতেই 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের সভ্য ছিলেন) সঙ্গে
একযোগে কাজ করা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব
একত্রে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করলে একটা নূতন অবস্থার
সৃষ্টি হবে—এই ছিল পাঞ্জাবী বিপ্লবীদের বক্তব্য। লাহোরের এ্যাসিস্ট্যান্ট
পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাণ্ডার্সকে হত্যা ক'রে তারা কাজ আরম্ভ করে দিয়েছে।
পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের বিপ্লবীরা বাংলার অন্য নেতাদের সঙ্গে আলোচনা
নিরর্থক বুঝে আমাদের সঙ্গেই কাজ করা সম্বন্ধে কথাবার্তা বলেন। পরে
যতীন দাস নূতন ধরণের বোমা তৈরী শিক্ষার জন্য এলাহাবাদ ও লাহোরে
যান।"

"কলিকাতা-কংগ্রেসের সময় বরিশালের নিরঞ্জন সেন, দক্ষিণ-কলিকাতার
যতীন দাস ও বিনয় রায়, ঢাকার সতীন্দ্র রায়, ব্রজেন দাস ও অপর
কয়েকজন বিপ্লবী কর্মীর সহিত আলোচনা দ্বারা একসঙ্গে কাজ করবার জন্য
এবং তাহা অবিলম্বে শুরু করবার জন্য উন্মুক্ত হয়েছিলেন। নূতন কার্যভার
গ্রহণের জন্য তাঁরা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেন।"(১)

(১) উপরোক্ত উদ্ধৃতিসমূহ সতীশচন্দ্র পাকড়াশী-রচিত 'অগ্নিদিনের কথা' নামক পুস্তকের
১৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।

বিপ্লবীদের চেষ্টাতেই সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস-অধিবেশনে স্বাধীনতার দাবি তোলেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব পাশ হইল না, পাশ হইল স্বায়ত্ব-শাসনের প্রস্তাব। কংগ্রেসের এই অধিবেশনের সময় হইতেই বিপ্লবী সমিতিগুলির পুরাতন নেতৃত্বের সহিত তরুণদলের বিরোধ বৃদ্ধি পাইয়া চরম আকার ধারণ করে। অবিলম্বে কাজ শুরু করাই এখন বিরোধের প্রধান কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু বিরোধ যতই তীব্র হইয়া উঠিতে থাকে ততই বিভিন্ন সমিতির তরুণ কর্মীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়া চলে।

"প্রথমে দলের ভিতরে প্রবীন আর নবীনে বিরোধ-বিতর্ক, মন কষাকষি চলে। পরে ক্রমশঃ বিভিন্ন দলের নবীন কর্মীরা পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পড়ে। তারা কিছু করবার জন্য নিজ নিজ দলের বা দল-নেতৃত্বের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হ'তে প্রস্তুত হয়। যুগান্তরের বরিশাল-শাখা ও চট্টগ্রাম-দল, অনুশীলনের ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, দক্ষিণ-কলিকাতা ও বহরমপুরের প্রধান অংশ অবিলম্বে সংগ্রাম আরম্ভ করার জন্য আগুয়ান হয়। ঢাকার 'বেঙ্গল ভলাণ্টিয়ার' (বি. ভি.) দলও এই সম্মিলিত সংগ্রামোন্মুখ দলে যোগদান করে। সকল দলের যুবকদের মধ্যেই চাঞ্চল্য দেখা দেয়।"(১)

এইভাবে বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির তরুণদল নিজ নিজ সমিতির প্রবীণ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সকলে অনতিবিলম্বে বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা শুরু করিবার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয় এবং এইভাবে একটি নূতন দল গড়িয়া উঠে। এই দলই প্রথমে 'রিভোল্ট-গ্রুপ' বা 'বিদ্রোহী দল' এবং পরে 'এড্ভান্স গ্রুপ' বা 'অগ্রগামী দল' নামে অভিহিত হয়। ঢাকার সতীশ পাকড়াশী; চট্টগ্রামের সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী; কলিকাতার যতীন দাস, বিনয় রায়, বরিশালের নিরঞ্জন সেন; ত্রিপুরার প্রভাত চক্রবর্তী প্রভৃতি এই নূতন দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

(১) সতীশ পাকড়াশী: 'অগ্নিদিনের কথা', পৃঃ ১৫৩।

'রিভোল্ট গ্রুপের'

সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

নূতন বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া উঠিল, এবার কর্মপন্থা স্থির করিবার পালা। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে রংপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনের অধিবেশনে নূতন বিপ্লবীদলের নেতারাও সমবেত হন। রংপুরে বসিয়াই অম্বিকা চক্রবর্তী, সতীশ পাকড়াশী, যতীন দাস, বিনয় রায় ও নিরঞ্জন সেন একত্রে কর্মপন্থা লইয়া আলোচনা করেন। তখন তরুণদল নূতন কল্পনায় বিভোর, তাঁহারা যে কর্মপন্থা লইয়া আলোচনা করেন তাহা গুপ্তহত্যা বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের কর্মপন্থা নহে। কারণ তাঁহারা জানিতেন যে, কেবলমাত্র গুপ্ত-হত্যা বা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। তাঁহাদের আলোচ্য কর্মপন্থা হইল দেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন। সতীশ পাকড়াশীর কথায়,—"আমরা এবার ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের পথ ছেড়ে ছোট ছোট বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম করে বিপ্লবী কর্মধারার উচ্চতর পন্থা প্রতিষ্ঠা করব। একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে শত্রুর ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে রক্তগঙ্গা বইয়ে দেব।...তারফলে নিষ্ক্রিয়তার স্থানে শুদ্ধ-সক্রিয় এক জাতীয় আন্দোলন দাঁড়িয়ে যাবে"(১),—ইহাই হইল এই বিপ্লবী দলের কর্মপন্থার মূল কথা।

রংপুরের আলোচনা-বৈঠকেই এই কর্মপন্থা গৃহীত হয় এবং উক্ত কর্মপন্থা অনুসারে পরিকল্পনাও মোটামুটিভাবে স্থির করা হয়। এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিয়া সতীশ পাকড়াশী মহাশয় বলেন :

"তিন জিলায় (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালে) অস্ত্রাগার আক্রমণ, ঢাকা ও কলিকাতার ছোট ছোট ঘাঁটি আক্রমণ, একই দিনে একই সময়ে সশস্ত্র অভ্যুত্থান—শুধু এই পরিকল্পনা নিয়ে আরম্ভ, তারপর অবস্থানুযায়ী আরও

(১) সতীশ পাকড়াশী : 'অগ্নিদিনের কথা', পৃঃ ১৫৩।

কতকগুলি ব্যবস্থা করার কথা হয়। পরবর্তী চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ঐ প্ল্যানেরই একটি অংশ।"(১)

এই নূতন দলের সৃষ্টি ও নূতন পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারী বিবরণে বলা হয়:

"প্রকৃতপক্ষে ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের অবস্থা হইল এই যে, দুইটি প্রধান দলের—অনুশীলন ও যুগান্তরের—প্রধান নেতারা একত্রে মিলিয়া একটা সাধারণ অভ্যুত্থানের দুঃসাহসী পরিকল্পনা লইয়া অগ্রসর হন।…১৯২৮ ও ১৯২৯ খৃস্টাব্দের কংগ্রেস-অধিবেশন সমগ্র ভারতের বিপ্লবীদের মিলনের সুযোগ আনিয়া দেয়। ইহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, সেই সভায় একটা সাধারণ অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা চলে এবং উহাকে একটা নির্দিষ্ট রূপ দেওয়া হয়। কিন্তু প্রবীণ নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, এখন পর্যন্ত যথেষ্ট অস্ত্র ও লোকবল সংগৃহীত হয় নাই, সুতরাং তাঁহারা আরও অপেক্ষা করিবার পক্ষপাতী। 'গরম' নেতাদের দ্বারা পরিচালিত একটা বিরাট সংখ্যক তরুণদল এই মতের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া অবিলম্বে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়।"(২)

এই পরিকল্পনা অনুসারে নেতাদের এক এক জনের উপর এক একটি কাজের ভার দেওয়া হয়। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পক্ষে বিশেষ জরুরী হইল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করা। এই কাজের ভার পড়ে যতীন দাসের উপর। ইহা ব্যতীত উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষার ভারও ছিল তাঁহার উপর। এই ভার লইয়া যতীন দাস উত্তর-ভারতে চলিয়া যান এবং ১৯২৯ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি ভগৎ সিং প্রভৃতির সহিত 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে গ্রেপ্তার হন। নভেম্বর মাসে চট্টগ্রামের সূর্য সেন ও গণেশ ঘোষ, বরিশালের নিরঞ্জন সেন এবং ঢাকার সতীশ পাকড়াশী একত্রে অভ্যুত্থান সম্পর্কে শেষ আলোচনার জন্য কলিকাতায় মিলিত হন। তাঁহারা অস্ত্রের অভাব

(১) সতীশ পাকড়াশী: 'অগ্নিদিনের কথা', পৃঃ ১৫৩।

(২) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, Vol. II, Memorandum on Terrorism, P. 329.

ঘটাইবার জন্য প্রথমেই তিনটি জিলার (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের) তিনটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উপর জোর দেন এবং সেই অনুসারে ব্যবস্থা করিতে থাকেন। নভেম্বর মাসেই এই অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত জানাইয়া একটি লাল ইস্তাহার বাহির করিয়া বাংলাদেশের যুবকদের আসন্ন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে আহ্বান করা হয়।(১)

মেছুয়াবাজার-ষড়যন্ত্র

একদিকে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা অনুসারে কলিকাতা শহরে এবং বিভিন্ন জিলায় আয়োজন চলিতে থাকে, অপর দিকে লাল ইস্তাহার প্রকাশিত হইবার পর কলিকাতা ও বাংলাদেশের পুলিশ আবার সক্রিয় হইয়া উঠে। আসন্ন অভ্যুত্থানের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য তাহারা পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু করে। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর শেষ রাত্রে পুলিশ কলিকাতার মেছুয়া-বাজারের একটি বাড়ী ঘেরাও করে। সেখানে কাগজ-পত্র, বহু ঠিকানা, লাল ইস্তাহার ও বোমা তৈরীর 'ফরমুলা'সহ সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন ও রমেন বিশ্বাস গ্রেপ্তার হন। ভোর বেলায় পুলিশ যখন খানাতল্লাসীতে ব্যস্ত তখন পূর্বের কথা মত বোমা ও রিভলভার লইয়া এক যুবক সেই বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া মালপত্রসহ গ্রেপ্তার হয়। পর পর আরও কয়েকটি বাড়ী হইতে বোমা তৈরীর সাজ-সরঞ্জামসহ আরও কয়েকজন যুবক গ্রেপ্তার হয়। খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার কেবল কলিকাতাতেই সীমাবদ্ধ রহিল না, বিভিন্ন জিলায় খানাতল্লাসী ও গ্রেপ্তার চলিতে থাকে। বিভিন্ন জিলায় মোট ৩২ জন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয়। কিছুদিন পরে ইহাদের লইয়া 'মেছুয়াবাজার বোমার মামলা' শুরু হয়। এই মামলায় সতীশ পাকড়াশী ও নিরঞ্জন সেনের প্রত্যেকের সাত বৎসর করিয়া এবং অপর কয়েকজনের পাঁচ বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হয়।

---

(১) 'রিভোল্ট' দলের অভ্যুদয় ও প্রবীন নেতৃত্বের সহিত নবীন বিপ্লবীদের বিরোধ সম্পর্কে প্রবীন নেতৃত্বের পক্ষ হইতে লিখিত কোন পুস্তক বা নির্ভরযোগ্য তথ্য না থাকায় অনন্যোপায় হইয়া এক পক্ষীয় বক্তব্য উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম। —গ্রন্থকার

এই গ্রেপ্তারের সংবাদে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে। শীঘ্র আয়োজন শেষ করিবার জন্য তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল একই পরিকল্পনার অপর অংশ 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' 'অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পর সারা বাংলাদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রামের যে ঝড় উঠে তাহাতে বাংলার শাসকদের হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এই সংগ্রামে চট্টগ্রামের যুগান্তর-শাখা, ঢাকার 'শ্রীসংঘ' ও 'বি. ভি.' বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। এই সংগ্রাম চলে ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, তারপর ইহা সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

চট্টগ্রামের সশস্ত্র স্বাধীনতা-সংগ্রাম

বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের নায়ক সূর্য সেনের বাড়ী ছিল চট্টগ্রাম জিলার নোয়াপাড়া গ্রামে। ১৯১৬ খৃস্টাব্দে তিনি বহরমপুর-কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষা দেন। বহরমপুর-কলেজে পড়িবার সময়েই উক্ত কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁহাকে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। ১৯১৮ খৃস্টাব্দে সূর্য সেন চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া একটি নূতন বিপ্লবী দল গঠন করেন। এই দলটি যুগান্তর সমিতির সহিত যুক্ত থাকিয়া স্বাধীন ভাবে কাজ করিতে থাকে। ১৯২১ খৃস্টাব্দে অসহযোগ-আন্দোলন শুরু হইলে সূর্য সেন তাঁহার সহকর্মীদের সহিত একত্রে সেই আন্দোলনে যোগদান করেন। সেই সময় স্থানীয় কর্মীদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। সূর্য সেন এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক হন। সেই সময় হইতেই তিনি হইলেন চট্টগ্রামের "মাস্টার দা"। কংগ্রেসের অসহযোগ-আন্দোলন শেষ হইবার পর সহকর্মীদের সহিত তিনি আবার পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করেন। এই সময়, অর্থাৎ

১৯২৩ খৃস্টাব্দে এই বিপ্লবীদলের দ্বারা আসাম-বেঙ্গল রেল-কোম্পানির টাকা লুণ্ঠিত হইবার পর সূর্য সেন ও তাঁহার কয়েক জন সহকর্মী আত্ম-গোপন করেন, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহারা উক্ত ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া মামলার বিচারে প্রমাণাভাবে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির পর তিনি আবার আত্ম-গোপন করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। কলিকাতায় বাস করিবার সময় পুলিশ একদিন তাঁহার গোপন আশ্রয়স্থলে হানা দেয়। শোনা যায়, তিনি নাকি চাকরের বেশ ধরিয়া পুলিশের বেড়াজাল হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই আবার গ্রেপ্তার হইয়া তিনি দুই বৎসর কাল আটক থাকেন। ইহার পর মুক্তিলাভ করিয়া তিনি আবার আত্মগোপন করেন।

১৯২৮ খৃস্টাব্দে বিপ্লবীদের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা অপসারিত হইলে সূর্য সেন আবার প্রকাশ্যভাবে কংগ্রেসের কাজ করিতে থাকেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গোপনে বিপ্লবের আয়োজন শুরু করেন। এই সময় প্রবীন ও নবীন দলের মতভেদ প্রবল আকার ধারণ করিলে তিনি নবীন দলের (রিভোল্ট-গ্রুপের) অন্যতম নায়ক হিসাবে বাংলাদেশব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের আয়োজন করিতে থাকেন। নবীন দলের নেতৃবৃন্দ একই সময়ে তিনটি জিলায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা করেন চট্টগ্রাম জিলা তাহার মধ্যে একটি। সূর্য সেন ও তাঁহার সহকর্মীরা তাঁহাদের নিজ জিলা চট্টগ্রামে অভ্যুত্থানের ভার গ্রহণ করেন।

অভ্যুত্থানের আয়োজন

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, 'রিভোল্ট গ্রুপ'-এর নেতারা ১৯২৯ খৃস্টাব্দে রংপুর ও কলিকাতায় বসিয়া সশস্ত্র অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিনটি জিলার (চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের) তিনটি অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। তারপর তিন জিলার বিপ্লবীরা নিজ নিজ জিলায় গিয়া কাজ শুরু করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে

যাঁহারা কলিকাতায় বসিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাঁহারা অল্প দিনের মধ্যেই মেছুয়াবাজার ও অন্যান্য স্থান হইতে গ্রেপ্তার হন।

এই গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইবামাত্র চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা বিশেষ শঙ্কিত হইয়া উঠেন। তাঁহাদের ভয় হয় পাছে পুলিশ মেছুয়াবাজারের ঘটনার সহিত চট্টগ্রামের সম্পর্ক জানিয়া ফেলে। ইহার পর তাঁহারা আরও সতর্কতার সহিত দ্রুত আয়োজন করিতে থাকেন।

সূর্য সেন ও তাঁহার সহকর্মীদের উদ্যোগে একদিকে যেমন চট্টগ্রামের কংগ্রেসের কাজ নূতন করিয়া শুরু হয়, তেমনি অপর দিকে কংগ্রেসের কাজের মধ্য দিয়া বহু যুবককে বিপ্লবী দলের সভ্য করা হয়। চট্টগ্রামের সর্বত্র যুব-সমিতি ও শরীর-চর্চার আখড়া স্থাপিত হয় এবং এই সকল প্রতিষ্ঠানের মারফত একটি সুশৃঙ্খল বিপ্লবী যুবকদল গড়িয়া উঠে। দলের পরিচালকদের চেষ্টায় এই যুবকদল বন্দুক-রিভলভার ছোঁড়া, মোটর চালনা প্রভৃতি শিক্ষা করে। ইহাদের একটি সৈন্যবাহিনীরূপে গড়িয়া তোলা হয়। গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ এই বাহিনীর পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন।

অবশেষে তাঁহাদের আয়োজন শেষ হইলে কাজ শুরু করিবার দিন স্থির হয় ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল। ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে ১৮ই এপ্রিল তারিখটি চিরদিন লাল অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কারণ, ভরেতের বিপ্লবীরা এ পর্যন্ত বহু বৃহৎ পরিকল্পনা করিয়াছেন, এমন কি চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরিকল্পনা অপেক্ষাও অনেক বড় পরিকল্পনা হইয়াছে কিন্তু তাহার একটিও কার্যকরী করা সম্ভব হয় নাই। চট্টগ্রামের এই পরিকল্পনাটি ব্যতীত অন্য সকল পরিকল্পনাই অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন ও তাঁহার সহকারী অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতির নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা কাজ শুরু করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা

বাংলাদেশের নবীন দলের প্রদেশব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনা অনুসারে সূর্য সেন ও তাঁহার সহকর্মীরা একটি স্থানীয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। পরিকল্পনা ছিল এইরূপ :—(১) সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর ঘাঁটি ও ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র দখল করা; (২) চট্টগ্রামে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীর ঘাঁটি বিধ্বস্ত করা এবং ঘাঁটির অস্ত্রশস্ত্র দখল করিয়া পুলিশ-ঘাঁটিতে লইয়া আসা; (৩) চট্টগ্রামের সহিত ঢাকার ও কলিকাতার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য শহরের টেলিফোন-এক্‌চেঞ্জ ধ্বংস করা; (৪) চট্টগ্রামের সহিত বাহিরের রেল ও টেলিফোন-সংযোগ নষ্ট করা; (৫) পাহাড়তলী য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করিয়া ইংরেজদের বন্দী করা।

এই কাজগুলি সুসম্পন্ন করিবার জন্য প্রধান পরিচালকদের নেতৃত্বে কয়েকটি দল গঠন করিয়া এক এক দলের উপর এক একটি কাজের ভার দেওয়া হয়। প্রথম দলের ভার গ্রহণ করেন অনন্ত সিং ও গণেশ ঘোষ, দ্বিতীয় দলের ভার গ্রহণ করেন লোকনাথ বল ও নির্মল সেন, তৃতীয় দলের ভার পড়ে অম্বিকা চক্রবর্তীর উপর, চতুর্থ দলটিকে রেলপথ ধ্বংসের ভার দিয়া উপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম হইতে চল্লিশ মাইল দূরে ধূম নামক স্থানে প্রেরণ করা হয়। ইহা ব্যতীত ২০ জনের একটি দলকে রিজার্ভ হিসাবে রাখা হয়।

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

১৮ই এপ্রিল সন্ধ্যাকালে 'ভারতের রিপাব্‌লিকান আর্মি' এই নামে এক-খানি ঘোষণা-পত্র চট্টগ্রাম শহরে বিলি করিয়া বিপ্লবীরা ইংরেজ-শাসকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম ঘোষণা করে। এই ঘোষণা-পত্রে ভারতের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করিবার কথা ঘোষণা করা হয়।*

---

* ঘোষণা-পত্রখানি এই গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য।

১৮ই এপ্রিল, রাত্রি দশ ঘটিকা। চট্টগ্রামের কংগ্রেস-অফিস (১) ও গণেশ ঘোষের দোকান হইতে বিপ্লবীরা চারিটি দলে ভাগ হইয়া নিজ নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হয়।

যে দলটির উপর য়ুরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করিয়া সাহেবদের বন্দী করিবার ভার ছিল তাহারা ক্লাবে গিয়া দেখিতে পায় যে ক্লাব প্রায় শূন্য, ঐ রাত্রে সাহেবেরা অন্য কোথাও গিয়াছিল। কাজেই এই দলটি দুই ভাগে ভাগ হইয়া একটি ভাগ পুলিশ-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভারপ্রাপ্ত দলটির সহিত এবং অপর ভাগ সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত দলের সহিত যোগদান করে।

পুলিশ-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ভারপ্রাপ্ত দলের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন। সকলেরই খাকির সামরিক পোষাক, আর কম্যাণ্ডারের পোষাক একজন সামরিক অফিসারের অনুরূপ—সব মিলাইয়া যেন একটি নিয়মিত সৈন্যদল যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে মার্চ করিয়া চলিয়াছে। দলটি পুলিশ-অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী হইবামাত্র দলের কম্যাণ্ডার ও আর কয়েকজন বিপ্লবী অস্ত্রাগার-রক্ষী সান্ত্রীর নিকট দৌড়াইয়া গিয়া তাহাকে গুলি করে। রক্ষীটি ধরাশায়ী হইবামাত্র বিপ্লবীরা দরজা ভাঙ্গিয়া অস্ত্রাগারের মধ্যে প্রবেশ করে। তাহারা অস্ত্রাগার হইতে রিভলভার ও মাস্কেট-বন্দুক এবং বহু গুলি সংগ্রহ করে এবং পুলিশ-লাইনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র পুলিশদের লাইন হইতে বিতাড়িত করে।

সামরিক অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত দলটি অস্ত্রাগারের নিকটবর্তী হইবামাত্র দলের কম্যাণ্ডার অস্ত্রাগার-রক্ষী সান্ত্রীর নিকট গিয়া দাঁড়ান এবং তাহার চ্যালেঞ্জের জবাব দিবার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্রীটিকে গুলি করেন। সান্ত্রীটি ধরাশায়ী হয়। গুলির শব্দ শুনিয়া আর একজন সান্ত্রী দৌড়াইয়া আসিবামাত্র সেও বিপ্লবীদের গুলিতে আহত হয়। এই সময় সার্জেণ্ট-মেজর ফ্যারেল সাহেব গুলির শব্দ শুনিয়া তাহার কোয়ার্টার হইতে দৌড়াইয়া আসিবামাত্র সেও বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারের ফটক ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ

(১) এই সময়ে বিপ্লবীরাই চট্টগ্রামের কংগ্রেস পরিচালনা করিতেন এবং কংগ্রেস-অফিস তাহাদেরই দখলে ছিল।

এবং বহু রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল ও একটি লুইস্ গান (এক রকমের মেসিন গান) কুড়াইয়া লয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া বিপ্লবীরা একটি মারাত্মক ভুল করে। এই সকল অস্ত্রের গোলাগুলি ছিল গুলি-বারুদের ঘরে (ম্যাগাজিন) আবদ্ধ। এই ঘরের কথা বিপ্লবীরা সম্পূর্ণ ভুলিয়া যায়।* এই ভুলের ফলে বিপ্লবীদের হস্তগত অস্ত্রশস্ত্রগুলি, বিশেষ করিয়া রাইফেলগুলি ও মেসিনগানটি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য হইয়া থাকে।

অস্ত্রাগার অধিকার করিয়া থাকাকালে ঐ পথ দিয়া সরকারী কর্মচারীদের যে গাড়ী গিয়াছে তাহার উপরেই বিপ্লবীরা বেপরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করে। ইহার ফলে একজন রেলের গার্ড, দুইজন ট্যাক্সি-ড্রাইভার ও ম্যাজিস্ট্রেটের গাড়ীর একজন কনেস্টবল নিহত হয়। ইহার পর বিপ্লবীরা অস্ত্রাগারটিতে পেট্রল দিয়া আগুন ধরাইয়া দেয় এবং লুণ্ঠিত অস্ত্রশস্ত্র গাড়ীতে বোঝাই করিয়া অন্য দলগুলির সহিত মিলিত হইবার জন্য পুলিশ-লাইনের দিকে চলিয়া যায়। ইতিমধ্যে ব্যারাক হইতে বার বার বিপ্লবীদের আক্রমণ করা হয়। কিন্তু সকল আক্রমণ প্রতিহত করিয়া তাহারা সরিয়া যাইতে সক্ষম হয়।

টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ-অফিসের ভারপ্রাপ্ত দল (সংখ্যায় ৬ জন) আফিসের মধ্যে প্রবেশ করে এবং টেলিফোন-অপারেটরকে ক্লোরোফর্ম প্রয়োগে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। তারপর বিপ্লবীরা টেলিফোন-বোর্ডটিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দেয়। টেলিগ্রাফ-মাস্টার দৌড়িয়া আসিবামাত্র বিপ্লবীরা তাহাকে গুলি করে। আহত হইয়াও সে ফিরিয়া গিয়া একটি বন্দুক লইয়া আসে এবং প্রাণপণে গুলি ছুঁড়িতে থাকে। বিপ্লবীদের অস্ত্র কেবল রিভলভার, দূরপাল্লার বন্দুকের সহিত কেবলমাত্র রিভলভার দ্বারা লড়াই করা সম্ভব নয় বুঝিয়া তাহারা সরিয়া পড়ে। ইহরে ফলে টেলিগ্রাম-অফিস ধ্বংস করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। তারপর বিপ্লবীদের এই দলটি পুলিশ-লাইনের দিকে গিয়া প্রধান দলের সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে প্রধান

* 'India in 1930' (Govt. Publication).

দলের সংখ্যা বাড়িয়া হয় যাট। পুলিশ-লাইনে থাকিয়া নেতারা সকল বিপ্লবীকে পুলিশ-অস্ত্রাগার হইতে সংগৃহীত মাস্কেট-বন্দুক চালনা শিক্ষা দেন।

"অস্থায়ী স্বাধীন সরকার"

বিপ্লবীদের বিভিন্ন দল পুলিশ-লাইনে আসিয়া জড় হইবার পর সকলে সামরিক কায়দায় সারিবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে এই অভ্যুত্থানের প্রধান নায়ক সূর্য সেনকে প্রেসিডেণ্ট করিয়া 'ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার' ঘোষণা করা হয়। সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান বিপ্লবীরা অস্থায়ী স্বাধীন সরকারের প্রেসিডেণ্টকে সামরিক কায়দায় অভিবাদন করে।

পশ্চাৎ অপসরণ

টেলিগ্রাফ-অফিসের ব্যর্থতার পর বিপ্লবীরা রাইফেল প্রভৃতি বড় অস্ত্রের অভাব বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে। সামরিক অস্ত্রাগার হইতে যথেষ্ট রাইফেল লইয়া আসিলেও গুলির অভাবে সেগুলি প্রায় অব্যবহার্য হইয়া আছে, গুলির অভাবে মেসিনগানটিও ব্যবহার করিবার উপায় নাই। বিপ্লবীরা সামরিক অস্ত্রাগার হইতে রাইফেল ও মেসিনগানের গুলি আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, এবার সেই ভুলের ফল ফলিতে শুরু করে।

রাত্রি প্রায় ১২টার সময় বাংলাদেশের পুলিশের ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল ফারমার সাহেব, চট্টগ্রামের পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট জন্‌সন্ সাহেব ও এ্যাসিট্যাণ্ট পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এবং বারাক্লাফ্ নামে সৈন্যবাহিনীর একজন অফিসার—এই চারিজন একত্র হইয়া চট্টগ্রাম-বন্দরের জেটির অস্ত্রাগার হইতে একটি মেসিনগান যোগাড় করেন এবং একটি উচ্চ জলের ট্যাঙ্কের উপর উঠিয়া বিপ্লবীদের উপর মেসিনগান হইতে গুলি বর্ষণ করিতে শুরু করেন। বিপ্লবীরা মাস্কেট-বন্দুক হইতে পাণ্টা গুলিবর্ষণ করিয়া জবাব দেয় এবং উহাদের দিকে একটি বোমা ছুঁড়িয়া মারে। কিন্তু বোমাটি ফাটে নাই।

তাহা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা প্রাণপণে গুলি বর্ষণ করিয়া দুইবার শত্রুপক্ষকে নিস্তব্ধ করিয়া দেয়।

বিপ্লবীরা পুলিশ-অফিসারদের মেসিনগানের গুলিবর্ষণের মধ্যে দাঁড়াইতে না পারিয়া ক্রমশঃ শহরের উত্তর দিকস্থ পাহাড়ের দিকে হটিয়া গিয়া পাহাড়ের মধ্যে আশ্রয় লয়। হটিয়া যাইবার সময় তাহারা পুলিশ-ব্যারাকে আগুন ধরাইয়া দিয়া যায়। হিমাংশু সেন নামে একজন বিপ্লবী পুলিশ-ব্যারাকে আগুন ধরাইবার সময় সাংঘাতিকরূপে অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিল। দুইজন প্রধান নেতা, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ আহত হিমাংশুকে মোটরে করিয়া লইয়া যান। কিন্তু সময়মত ফিরিতে না পারায় তাঁহারা প্রধান দলের সহিত মিলিত হইতে পারেন নাই। পরে হিমাংশুর মৃত্যু হয়।

বিপ্লবীরা পাহাড়ের মধ্যে থাকিয়া পুলিশ ও সৈন্যদের সহিত যুদ্ধ চালাইবে—ইহাই ছিল তাহাদেব উদ্দেশ্য। তাহারা যখন পাহাড়ের দিকে হটিয়া যায় তখন তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ছিল একটি করিয়া মাস্কেট-বন্দুক, একটি রিভলভার বা পিস্তল এবং ঝুলি-বোঝাই গুলি। ইহা সম্বল করিয়াই বিপ্লবীরা ইংরেজ-রাজের সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী ও পুলিশের উন্নত রাইফেল ও মেসিন-গানের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হয়।

এদিকে ১৮ই এপ্রিল রাত্রেই বিপ্লবীদের আর একটি দল চট্টগ্রাম শহর হইতে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী ধুম নামক স্থানে রেল-লাইন তুলিয়া ও টেলিগ্রাফ-লাইন কাটিয়া চট্টগ্রাম শহরকে বহির্জগত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছিল। অন্য একটি দল সত্তর মাইল দূরবর্তী লাকসাম-জংসনের নিকট টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলে এবং একটি মালগাড়ী লাইন-চ্যুত করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু মালগাড়ী লাইন-চ্যুত করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধ

ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম-পোতাশ্রয়ের একটি জাহাজের বেতার মারফত এই এই অভ্যুত্থানের সংবাদ কলিকাতায় ও অন্যান্য স্থানে প্রেরিত হয়। এই ভয়ংকর

সংবাদে বাংলাদেশের শাসকগণ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া "চট্টগ্রামের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে" দলে দলে সৈন্য পাঠাইতে থাকে।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে মোট ৫৭ জন বিপ্লবী পাহাড়ে আরোহণ করিয়াছিল। তাহারা ১৮ই এপ্রিল শেষ রাত্রে ও পরের দিন এক পাহাড় হইতে অপর পাহাড়ে ঘুরিয়া অবশেষে জালালাবাদ পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। পাহাড়টি উঁচু ও খাড়া, শত্রু-বাহিনীকে বাধা দিবার পক্ষে সুবিধাজনক স্থান। বিপ্লবীরা এই পাহাড়ে থাকিয়া শত্রুর আক্রমণের অপেক্ষা করিতে থাকে। এদিকে বিপ্লবীরা পাহাড়ে আরোহণ করিবার পর পশ্চাৎ ধাবনকারী পুলিশদল তাহাদের সূত্র হারাইয়া ফেলে। ২০শে এপ্রিল সকাল বেলা লেফ্‌টানাণ্ট স্মিথ-এর নেতৃত্বে 'ঈস্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেল-বাহিনী'র একদল সৈন্য চট্টগ্রামে উপস্থিত হয় এবং আশেপাশের পাহাড়ে বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে থাকে। এই অনুসন্ধানের ফলে সৈন্যদল ২২শে এপ্রিল দ্বিপ্রহরের সময় জালালাবাদ পাহাড়ে বিপ্লবীদের সন্ধান পায় এবং বিকাল ৫টার সময় পাহাড়ের নীচ হইতে আক্রমণ আরম্ভ করে। বিপ্লবীরাও পাল্টা-আক্রমণ করিয়া জবাব দেয়। বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে ইংরেজদলের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। তাহারা বাধ্য হইয়া পিছনে হটিয়া যায়। এই যুদ্ধে বিপ্লবীদের দুইজন গুরুতররূপে আহত হয়। সন্ধ্যার অন্ধকারে ইংরেজপক্ষ আবার আক্রমণ শুরু করে। এবার তাহারা এক সঙ্গে নীচের ও পার্শ্ববর্তী পাহাড় হইতে মেসিনগান প্রভৃতি লইয়া আক্রমণ চালায়। বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণে এই আক্রমণও ব্যর্থ হয়। ইরেজপক্ষ রাত্রি ৮টার সময় আবার হটিয়া যায়। জালালাবাদ পাহাড়ের যুদ্ধে বিপ্লবীদের ১০ জন নিহত ও কয়েকজন আহত হয় এবং ইংরেজপক্ষের ৭৪ জন নিহত ও প্রায় দেড় শত জন আহত হয়। ২৩শে এপ্রিল শত্রুপক্ষ উড়োজাহাজ হইতে বিপ্লবীদের উপর বোমা ও মেসিনগানের গুলিবর্ষণ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

গেরিলা-যুদ্ধের সিদ্ধান্ত

জালালাবাদের যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও বিপ্লবীরা বুঝিল যে, এই অল্প সংখ্যক লোক লইয়া বিরাট ইংরেজ-বাহিনীর সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। নেতারা পরামর্শ করিয়া স্থির করেন, এইবার গ্রামাঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িয়া গুপ্ত ভাবে হঠাৎ-আক্রমণে শত্রু-সৈন্যদের বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে বেশীর ভাগ লোককে শহরে পাঠাইয়া দিয়া অল্প কয়েকজন সহকর্মীর সহিত সূর্য সেন পাহাড় হইতে নামিয়া গ্রামাঞ্চলে আত্মগোপন করেন।

২৩শে এপ্রিল চারিজন বিপ্লবী (অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ এবং আরও দুইজন) বাহিরে পলায়নের উদ্দেশ্যে নোয়াখালি জিলার ফেণী রেল-স্টেশনে উপস্থিত হইলে স্টেশনের পুলিশ তাঁহাদের অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাঁহাদের দেহ খানাতল্লাস করিবার জন্য অগ্রসর হইবামাত্র বিপ্লবীরা পুলিশের দিকে গুলি বর্ষণ করিয়া পলায়ন করেন। এই গুলিবর্ষণে একজন দারোগা ও দুইজন কনস্টেবল আহত হয়।

এই সময় বিপ্লবীরা বিশেষ অর্থাভাবে পড়িলে কেহ কেহ ডাকাতি দ্বারা অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দেয়। কিন্তু প্রধান নায়ক সূর্য সেন ডাকাতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁহারা দলের সভ্য ও দরদীদের সাহায্যের উপরেই নির্ভর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় বিপ্লবী নেতারা দিনের বেলায় লুকাইয়া থাকিয়া রাত্রিকালে বাহির হইয়া দলের পুনর্গঠন করিতে থাকেন। কয়েক দিন পর দলের সভ্য ফকির সেন গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের নিকট সকল সংবাদ ফাঁস করিয়া দেয়।

কালারপোলের যুদ্ধ

গেরিলা-যুদ্ধের সিদ্ধান্ত অনুসারে ৬ই মে তারিখে বিপ্লবীদের একটি দল কর্ণফুলী নদীর তীরে ইংরেজ-কর্মচারীদের বাসভবনগুলি আক্রমণের উদ্দেশ্য লইয়া চট্টগ্রাম শহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাত্রিকালে তাহারা নদীর

তীরে পৌঁছিবামাত্র কয়েকজন স্থানীয় গুণ্ডা তাহাদের চিনিয়া ফেলে এবং পুলিশে সংবাদ দেয়। ইহার পর গুণ্ডা ও সশস্ত্র পুলিশ বিপ্লবীদের আক্রমণ করে। বিপ্লবীদের অস্ত্র কেবল রিভলভার, তাহারা পুলিসের রাইফেলের মুখে দাঁড়াইতে না পারিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। তাহাদের ছয় জন একখানা নৌকায় আরোহণ করিয়া নদীর অপর তীরে যাত্রা করে। ইতিমধ্যে চট্টগ্রামের পোর্ট-পুলিশের একটি বড় দল স্টিমলঞ্চে করিয়া বিপ্লবীদের পশ্চাৎধাবন করে। মাঝ-নদীতে পুলিশের লঞ্চখানি বিপ্লবীদের নৌকার নিকটবর্তী হইবামাত্র বিপ্লবীরা গুলি বর্ষণ শুরু করে। পুলিশদলও রাইফেল হইতে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। এইভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে বিপ্লবীরা নদীতীরে পৌঁছিয়া একটি কাঠের গাঁদা ও একটি মাটির ঢিপির আড়ালে থাকিয়া বহুক্ষণ যুদ্ধ করে। ইতি-মধ্যে পুলিশের গুলিতে বিপ্লবীদের চারিজন—স্বদেশ রায়, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন ও দেবপ্রসাদ গুপ্ত—নিহত হইয়াছেন। তখন বাকী দুইজন, সুবোধ চৌধুরী ও ফণী নন্দী আর যুদ্ধ করা বৃথা মনে করিয়া যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হন।

চন্দননগরের সংঘর্ষ

২৮শে জুন অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন এবং স্বেচ্ছায় পুলিশের নিকট ধরা দেন। তাঁহাকে একখানি স্পেশাল ট্রেনে করিয়া চট্টগ্রাম লইয়া আসা হয়। পরে তাঁহার ও অন্যান্য ধৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রাগার-লুণ্ঠন ও 'সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ'-এর অভিযোগে মামলা শুরু হয়।

এদিকে কলিকাতার গোয়েন্দা-বিভাগ সংবাদ পায় যে, অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের কয়েক জন পলাতক বিপ্লবী চন্দননগরের এক বাড়ীতে লুকাইয়া আছেন। এই সংবাদ পাইয়া ৩১শে আগস্ট পুলিশ-কমিশনার টেগার্ট সাহেব একদল সশস্ত্র পুলিশ লইয়া চন্দননগরের এই বাড়ী ঘেরাও করে। এখানে পুলিশের সহিত বিপ্লবীদের এক খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং ইহাতে জীবন ঘোষাল নামে চট্টগ্রামের এক

বিপ্লবী নিহত হন। অন্য দুইজন বিপ্লবী সঙ্গীসহ চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নায়ক গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল গ্রেপ্তার হন। ইহাদেরও চট্টগ্রামে লইয়া আসা হয়।

এদিকে যখন এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল তখন অন্য দিকে বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন অবশিষ্ট বিপ্লবীদের লইয়া নূতন নূতন পরিকল্পনা করিয়া চট্টগ্রামের ইংরেজ-সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছিলেন। আর ইংরেজ-সরকার এই বিপ্লবীদের ভয়ে দিশাহারা হইয়া চারিদিক হইতে চট্টগ্রামে বহু সৈন্য জড় করে। তাহারা সূর্য সেন ও তাঁহার সহকর্মীদের খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সমগ্র চট্টগ্রাম তোলপাড় করিতে থাকে এবং জনসাধারণ বিপ্লবীদের সাহায্য করিতেছে মনে করিয়া সারা চট্টগ্রাম জিলার উপর দিয়া অত্যাচারের বন্যা বহাইতে থাকে।(১)

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের পরবর্তী ক্রিয়াকলাপ পরে যথা সময়ে বিবৃত হইবে।

বৈপ্লবিক আলোড়ন

"এই অভ্যুত্থান (চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন) বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদের ইতিহাসে অতুলনীয়। ইহার সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সারা বাংলা দেশে বৈপ্লবিক উল্লাসের জোয়ার বহিতে থাকে। এই সংবাদ তড়িৎশক্তির মত কাজ করে এবং সেই মুহূর্ত হইতে বাংলাদেশের সন্ত্রাসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটে। সকল গুপ্ত সমিতির তরুণ সভ্যদের মনে অস্ত্রশক্তি দ্বারা এ দেশ হইতে বৃটিশকে বিতাড়িত করিবার ধারণা পূর্বেই বদ্ধমূল হইয়াছিল, কিন্তু এত দিন তাহাদের প্রধান নেতারা তাহাদের ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন।

(১) চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের উপরোক্ত তথ্যসমূহ 'India in 1930' নামক সরকারী রিপোর্ট; 'Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34'. Vol II. Appendix A এবং একটি অপ্রকাশিত 'Notes on Chittagong Armoury Raid' ও 'Chittagong Armoury Raid' by Ganesh Ghose (Published in Independence Number, Amrita Bazar Patrika) হইতে সংগৃহীত।

এবার তাহারা চট্টগ্রামের সন্ত্রাসবাদীদের পন্থা অবলম্বনের জন্য চীৎকার শুরু করে। বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির নূতন সভ্য-সংখ্যা অব্যাহত গতিতে বাড়িয়া চলে। এই জোয়ারে বাধা দিবার শক্তি প্রবীন নেতাদের ছিল না, সে চেষ্টাও তাঁহারা করিলেন না। চট্টগ্রামের ঘটনার পর তাঁহাদের অতিসাবধানী নীতি চালাইয়া যাইবার আর কোন কারণ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না।" (১)

এবার সারা বাংলার উপর দিয়া বৈপ্লবিক সংগ্রামের ঝড় বহিতে লাগিল।

যুগান্তর সমিতির পরিকল্পনা

মে মাসে কলিকাতার মূল যুগান্তর সমিতির নেতারা একত্রিত হইয়া একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন এবং পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে বোমা তৈরীর ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের পরিকল্পনাটি ছিল নিম্নরূপ :—

(১) কলিকাতায় ও বিভিন্ন জিলায় একই সময়ে হোটেল, ক্লাব, সিনেমা প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের বোমা দ্বারা হত্যা করা।

(২) দমদমের বিমান-ঘাঁটি পেট্রোল দিয়া ভস্মীভূত করা।

(৩) কলিকাতার গ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন-কেন্দ্রগুলি ধ্বংস করিয়া নগরীর গ্যাস ও বিদ্যুৎ-সরবরাহ বন্ধ করা।

(৪) বজবজের পেট্রোল-ডিপো বোমা দ্বারা ধ্বংস করিয়া কলিকাতার পেট্রোল-সরবরাহ বন্ধ করা।

(৫) ট্রামের তার কাটিয়া কলিকাতার ট্রাম-চলাচল বন্ধ করা।

(৬) কলিকাতার সহিত মফঃস্বল জিলাগুলির টেলিগ্রাফ-যোগাযোগ বানচাল করা।

(৭) কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিভিন্ন পুল ও রেল-লাইন ডিনামাইট ও হাতবোমা দ্বারা ধ্বংস করা।(২)

(১) Joint Committee Report, P. 331.

(২) Do Do, P. 331.

টেগার্ট হত্যার চেষ্টা

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হইল। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট টেগার্ট-হত্যার যে চেষ্টা হয় তাহা উক্ত পরিকল্পনারই প্রথম অংশ। স্থির হইয়াছিল, কুখ্যাত পুলিশ-কমিশনার টেগার্টকে হত্যা করিয়া সারা বাংলা-দেশের যুগান্তর সমিতির সভ্যদের বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু করিবার ইঙ্গিত জানানো হইবে।

বিপ্লবীরা টেগার্ট সাহেবের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। তাহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, টেগার্ট সাহেব প্রত্যহ একটা নির্দিষ্ট সময়ে কলিকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে মোটরে করিয়া আসে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২৫শে আগস্ট যুগান্তর সমিতির বিশিষ্ট সভ্য অনুজাচরণ সেন ও দীনেশচন্দ্র মজুমদার বোমা ও রিভলভার লইয়া টেগার্টের গন্তব্য পথের উপর অপেক্ষা করিতে থাকেন। নির্দিষ্ট সময়ে টেগার্টের গাড়ী ডালহৌসি স্কোয়ারে প্রবেশ করিবা-মাত্র বিপ্লবীরা গাড়ী লক্ষ্য করিয়া বোমা ছুঁড়িলেন। বোমাটি টেগার্টের গাড়ীর পিছনে ভীষণ শব্দে ফাটিয়া যায়। কিন্তু গাড়ীখানির কোনই ক্ষতি হয় নাই, উহা দ্রুত অদৃশ্য হইয়া যায়। এদিকে অনুজাচরণের নিজের নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে তাঁহার দেহ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হয়। অনুজাচরণের সঙ্গী দীনেশ মজুমদারও ঐ বোমার আঘাতে ভীষণ আহত হইয়াছিলেন। তিনি আহত দেহেই পলায়নের চেষ্টা করেন এবং কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হন। নিহত অনুজাচরণের দেহ তল্লাস করিয়া আরও দুইটি বোমা ও একটি গুলি-ভর্তি রিভলভার এবং দীনেশ মজুমদারের নিকট হইতেও একটি বোমা ও একটি রিভলভার পাওয়া যায়।

ডালহৌসি স্কোয়ার ষড়যন্ত্র-মামলা

২৫শে আগস্ট ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টের হত্যার চেষ্টার সময় ঘটনাস্থলে অনুজাচরণ নিহত ও দীনেশ মজুমদার আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হইবার পর ঐদিনই ডাঃ নারায়ণ রায় গ্রেপ্তার হন। সরকারী মতে ডাঃ নারায়ণ রায় ছিলেন যুগান্তর

সমিতির বোমার কারখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মী। তাঁহার গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ উক্ত কারখানাটিও আবিষ্কার করে। ইহার পর হইতে এই সম্পর্কে চারিদিকে গ্রেপ্তার শুরু হইয়া যায়। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত গ্রেপ্তার চলিতে থাকে এবং যুগান্তর সমিতির বহু কর্মী ধরা পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসে ইহাদের লইয়া 'ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয়। মামলার শুনানির সময় ডাঃ নারায়ণ রায় তাঁহার সহকর্মীদের বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে এই ষড়যন্ত্রের সকল দায়িত্ব নিজের ও তাঁহার পলাতক ভ্রাতা গোবিন্দ রায়ের উপর লইয়া আদালতে এক বিবৃতি দেন। এই বিবৃতিতে তিনি কখন কিভাবে বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন, কখন বিপ্লবীদলে যোগদান করেন, কি ভাবে বোমা তৈরী শুরু করেন এবং কি ভাবে বোমার মাল-মসলা সংগ্রহ করেন তাহা ব্যাখ্যা করেন। মামলার বিচারে বিপ্লবীদের ২০ বৎসরের দ্বীপান্তর হইতে শুরু করিয়া ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হয়। এই মামলার অপর আসামী গোবিন্দ রায় তখন পর্যন্ত পলাইয়া থাকিতে সক্ষম হন।

লোম্যান হত্যা

এদিকে ঢাকার 'রিভোল্ট' দলের বিপ্লবীরাও তাহাদের নিজ পরিকল্পনা লইয়া কাজ শুরু করিয়াছিল। আগস্ট মাসের শেষদিকে বাংলাদেশের পুলিশের ইনস্‌-পেকটর-জেনারেল লোম্যান সাহেব ঢাকা জিলার পুলিশের কাজকর্ম পরিদর্শন করিবার উদ্দেশ্যে ঢাকা শহরে উপস্থিত হন। ২৯শে আগস্ট লোম্যান সাহেব ঢাকা জিলার পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হড্‌সন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতাল পরিদর্শন করিতে আসেন। বিপ্লবীরা পূর্বেই পুলিশের বড়কর্তার এই হাসপাতাল পরিদর্শনের সংবাদ পাইয়াছিল এবং পূর্ব হইতেই এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। ইনসপেকটর-জেনারেল লোম্যান ও পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হড্‌সন যখন হাসপাতালের এক রোগীর সহিত কথা বলিতে ব্যস্ত, তখন উক্ত মিটফোর্ড কলেজের একজন ছাত্র তাহাদের গুলি করিয়া পলায়ন করিতে সক্ষম হন। গুলির আঘাতে লোম্যান ও

হড্‌সন উভয়েই গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন পর লোম্যান সাহেবের মৃত্যু হয়, কিন্তু হড্‌সন সাহেব বাঁচিয়া উঠেন। পুলিশ হত্যাকারীকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিলেও তাঁহাকে চিনিতে পারে। ঢাকার মিটফোর্ড কলেজের ছাত্র ও 'বি. ভি.' দলের সভ্য বিনয়কৃষ্ণ বসুই হইলেন এই বিপ্লবী হত্যাকারী। কিন্তু সারা বাংলাদেশব্যাপী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও পুলিশ বিনয় কৃষ্ণের সন্ধান পাইল না।

রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ

কর্ণেল সিমসন হত্যা

সারা বাংলার পুলিশ যখন লোম্যানের হত্যাকারী বিনয়কৃষ্ণ বসুকে খুঁজিতে ব্যস্ত, তখন বিনয় অপর দুইজন বিপ্লবী-সহকর্মীর সহিত কলিকাতায় বসিয়া বাংলা-সরকারের প্রধান দপ্তর রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ করিয়া ইংরেজ শাসন-কর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা করিতেছিলেন।

১৯৩০ খৃস্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর। বেলা ১১টায় রাইটার্স বিল্ডিংস-এর দৈনন্দিন কাজকর্ম শুরু হইবার পর তিনজন বিপ্লবী—বিনয়কৃষ্ণ বসু, দীনেশ গুপ্ত ও সুধীরকৃষ্ণ (বাদল) বসু—য়ুরোপীয় বেশ-ভূষায় সজ্জিত ও সশস্ত্র হইয়া রাইটার্স বিল্ডিংস-এ প্রবেশ করিলেন। বিপ্লবীদের বেশ-ভূষা ও কথাবার্তা শুনিয়া কাহারও সন্দেহ হইল না। বিপ্লবীরা সরাসরি বিভিন্ন বিভাগের বড়কর্তাদের অফিসের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা প্রথমেই কারা-বিভাগের ইনস্‌পেকটর-জেনারেল কর্ণেল সিম্পসন-এর ঘর দেখিতে পাইলেন এবং ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সিম্পসনের উপর গুলি করিলেন। গুলি সিম্পসনের বক্ষ ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। গুলির শব্দ পাইয়া সিম্পসনের পাশের কামরা হইতে বিচার-বিভাগের সেক্রেটারী নেলসন সাহেব বাহির হইবামাত্র বিপ্লবীরা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন, নেলসন সাহেব উরুতে গুলি বিদ্ধ হইয়া ধরাশায়ী হন। ইহার পর বিপ্লবীরা বারান্দা দিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে সাহেবদের কামরার মধ্যে গুলি বর্ষণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের

একটি গুলি বাংলা-সরকারের প্রধান সেক্রেটারী টাউনেণ্ড সাহেবকে গুরুতররূপে আহত করে।

ইতিমধ্যে বিপ্লবীদের গুলি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিলে তাঁহারা আত্মহত্যা করিয়া গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য একটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দেন। বিপ্লবীরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, রাইটার্স বিল্ডিংস-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিরাপদে বাহির হইয়া আসা সম্ভব হইবে না। এইজন্য তাঁহারা আত্মহত্যার আয়োজন করিয়াই আসিয়াছিলেন। তাঁহারা ঘরে প্রবেশ করিবার পর সুধীর 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' নামক তীব্র বিষের গুড়া গিলিয়া ফেলেন এবং বিনয় ও দীনেশ তাঁহাদের মস্তকে নিজেদের রিভলভার হইতে গুলি করেন। সুধীরের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়, কিন্তু গুরুতররূপে আহত হইয়াও বিনয় ও দীনেশ তৎক্ষণাৎ মরিতে পারিলেন না। কয়েকদিন পর হাসপাতালে বিনয়ের মৃত্যু হয়, কিন্তু সরকারী ডাক্তারদের প্রাণপণ চেষ্টায় দীনেশ বাঁচিয়া উঠেন। পরে বিচারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ৭ই জুলাই দীনেশ গুপ্ত ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেন।

ব্যর্থ ষড়যন্ত্র

উপরোক্ত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ব্যতীত এই সময়ে আরও বহু বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের আয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু উহার প্রায় সবগুলিই পুলিশের তৎপরতার ফলে ব্যর্থ হয়। সরকারী মতে, "পুলিশ আরও কয়েকটি অস্ত্রাগার ও সরকারী ধনাগার লুণ্ঠন এবং সরকারী কর্মচারীদের হত্যার পরিকল্পনা জানিয়া ফেলে। পুলিশের চেষ্টায় বহু ষড়যন্ত্রকারী গ্রেপ্তার হয় এবং তাহার ফলে বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ায় বহু ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। এইভাবে আরও বড় এবং আরও চাঞ্চল্যকর কয়েকটি পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই পুলিশ তাহা ব্যর্থ করিয়া দিতে সক্ষম হয়।"(১)

(১) Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Vot II. p. 333.

বিপ্লবের প্রয়োজনে অর্থ-সংগ্রহের জন্য বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক ডাকাতি ও অর্থ লুণ্ঠন শুরু করে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল পাঁচ-ছয় জন যুবক একত্রে কলিকাতার টালা-অঞ্চলের কালীকুমার ব্যানার্জি লেনের হরিশ্চন্দ্র সেন ও রামকানাই ভূইঞার গদিতে হানা দিয়া ১৫ হাজার টাকার নোট লইয়া উধাও হয়। ২রা জুন ঢাকার মূলচর থানার কিছু দূরে বিপ্লবীরা একজন ওভারসিয়ারের নিকট হইতে এক হাজার টাকা কাড়িয়া লয়। ২৫শে আগস্ট তিন জন যুবক সৈদপুর সাহাতলী রেল-স্টেশনের মধ্যে ডাক লুট করিয়া এক হাজার টাকা লইয়া যায়। ৩রা সেপ্টেম্বর রাজশাহী রেল-স্টেশনের নিকট একটি ডাক লুট করিয়া বিপ্লবীরা ৩৬৫০৲ টাকা হস্তগত করে। ৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকা জিলার সিরাজদিঘা থানার ইছাপুর পোস্ট অফিস ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা নগদ ও অলংকারে মোট ১৩৪৭৲ টাকা লাভ করে। ২৪শে সেপ্টেম্বর ফরিদপুরের গোপালপুর নামক স্থানের এক বাড়ী ডাকাতিতে ৫৫১৲ টাকা লুণ্ঠিত ১৭ই অক্টোবর কলিকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রীটের মানিকচাঁদ গোপালচাঁদের গদি বিপ্লবীদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। এখানে বিপ্লবীদের গুলিতে একব্যক্তি নিহত এবং ২৩৪৬৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৩০শে অক্টোবর বিপ্লবীরা বাখরগঞ্জ জিলার মাধবপাশা গ্রামের এক বাড়ীতে ডাকাতি করিয়া ৩৭৫১৲ টাকা লাভ করে। ১৪ই নভেম্বর ময়মনসিংহের যশোদল নামক স্থানের এক বাড়ী ডাকাতিতে নগদ ও অলংকারে বহু অর্থ লুণ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত এই বৎসরে আরও বহু রাজনৈতিক ডাকাতি হয়। উহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইল ময়মনসিংহ জিলার 'আর· সিম কোম্পানি'র ১৫ হাজার টাকা লুণ্ঠন। ১২ই নভেম্বর কোম্পানির একজন জমাদার ও দুই জন দারোয়ান ১৫ হাজার টাকা লইয়া টাঙ্গাইল হইতে পদব্রজে যাত্রা করে। বিপ্লবীরা পূর্বেই এই সংবাদ পাইয়াছিল। তাহারা উহাদের অপেক্ষায় পথের মধ্যে একস্থানে লুকাইয়া থাকে। জমাদার ও দারোয়ানগণ ঐ স্থানে পৌঁছিবামাত্র বিপ্লবীরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া

টাকার থলিয়াগুলি লইয়া উধাও হয়। ইহা ব্যতীত ২৬শে নভেম্বর বাখরগঞ্জ জিলার রঘুনাথপুরের এক বাড়ী ডাকাতিতে ৯৩১৲ টাকা, ৮ই ডিসেম্বর ঢাকার 'ইণ্টারমিডিয়েট' কলেজের এক বেয়ারার নিকট হইতে ২০৯৩৲ টাকা, এবং ১৮ই ডিসেম্বর ঢাকা জিলার টঙ্গিবাড়ী মহকুমার পয়সাগাঁও নামক গ্রামের এক ডাকাতিতে নগদে ও অলংকারে ২১৪৫৲ টাকা লুষ্ঠিত হয়।

গুপ্তহত্যা ও হত্যার চেষ্টা

১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জিলার 'রামানন্দ য়ুনিয়ন হাইস্কুল'-এর একজন শিক্ষক পুলিশের গুপ্তচর সন্দেহে কিশোরগঞ্জের বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হয়। ১৬ই মে হাওড়া জিলার শিবপুর থানার বড় দারোগার গৃহে বোমা পড়ে। ১৯শে জুলাই রংপুর জিলার গাইবান্ধা শহরের রাস্তা দিয়া যখন কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী যাইতেছিল তখন তাহাদের উপর বোমা পড়ে। বোমাটি বিস্ফোরিত হইলেও কেহ হতাহত হয় নাই। ২রা আগস্ট ময়মনসিংহ শহরে একজন কনেস্টবল আসামী গ্রেপ্তার করিতে গেলে বিপ্লবীরা তাহাকে গুলি করিয়া পলায়ন করে। কনেস্টবলটি গুরুতররূপে আহত হয়। ২৫শে আগস্ট কলিকাতার পুলিশ-কমিশনার চার্লস টেগার্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে ডালহৌসি-স্কোয়ারে তাহার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। টেগার্ট অক্ষত অবস্থায় পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। ২৬শে আগস্ট কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে কলিকাতার জোড়াবাগান থানার মধ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে কয়েকজন পথচারী আহত হয়। ২৭শে আগস্ট হত্যার উদ্দেশ্যে কলিকাতার ইডেন গার্ডেন পুলিশ-ফাঁড়ীতে বোমা পড়ে; ইহার ফলে একজন কনেস্টবলসহ তিনজন লোক আহত হয়। ২৯শে আগস্ট রতনভূষণ হাজরা নামক এক গুপ্তচর জনৈক বিপ্লবীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিবার সময় কলিকাতার দেশবন্ধু পার্কের মধ্যে উক্ত বিপ্লবীর গুলিতে নিহত হয়। ঐ দিনই ঢাকা শহরের মিট্‌ফোর্ড হাসপাতালে বাংলাদেশের পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর-জেনারেল লোম্যান সাহেব ও ঢাকার পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্টর হড্‌সন সাহেবের উপর বিপ্লবীরা গুলি করে। পরে লোম্যান সাহেবের মৃত্যু হয়, কিন্তু হড্‌সন সাহেব গুরুতর-

রূপে জখম হইয়াও বাঁচিয়া উঠেন। ৩০শে আগস্ট ময়মনসিংহ শহরে উক্ত জিলার গোয়েন্দা-পুলিশের ইনস্‌পেক্টর পবিত্র বসুর বাড়ীতে বোমা পড়ে। ইহার ফলে তাহার দুই ভাই আহত হয়। ২৩শে সেপ্টেম্বর খুলনা শহরের থানার মধ্যে উপবিষ্ট খুলনা জিলার গোয়েন্দা-পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টরকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ১৩ই অক্টোবর ময়মনসিংহ জিলার গোয়েন্দা-বিভাগের সাব্-ইন্‌স্‌পেক্টর ও তাহার দেহরক্ষী যখন ময়মনসিংহের আবগারী গুদাম লুণ্ঠনের দুইজন পলাতক আসামীকে গ্রেপ্তার করিতে যায় তখন তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। ফলে দেহরক্ষী নিহত হয়। ১লা ডিসেম্বর ত্রিপুরা জিলার চাঁদপুর রেলওয়ে-ষ্টশনে দুইজন বাঙ্গালী যুবক চার্লস টেগার্টকে ভুল করিয়া রেল-পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর তারিণীচরন মুখার্জির উপর গুলি করে। তারিণী মুখার্জি গুরুতররূপে আহত হয় এবং এই সম্পর্কে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস নামক এক যুবক গ্রেপ্তার হয়। পরে এই যুবকের ফাঁসী হয়। ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার বঙ্গীয় সরকারের প্রধান দপ্তর 'রাইটার্স বিল্ডিংস্'-এ তিনজন বিপ্লবী কারা-বিভাগের ইনস্‌পেক্টর-জেনারেল সিম্‌সন্ সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং বাংলা-সরকারের বিচার-বিভাগের সেক্রেটারী নেল্‌সন্ সাহেবকে আহত করে।

কলিকাতাসহ সারা বাংলাদেশে (১৯৩০ খৃস্টাব্দে) ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি যে সকল সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় তাহার সংখ্যা মোট ছত্রিশটি। পুলিশের সহিত সংঘর্ষে মোট ১৭ জন সন্ত্রাসবাদী নিহত হয়, ইহা ব্যতীত দুইজন (রাইটার্স বিল্ডিংস-এ) আত্মহত্যা করে। সন্ত্রাসবাদীদের দ্বারা নিহত সরকারী কর্মচারীদের সংখ্যা উনিশ। এই বৎসরে বিপ্লবীরা ডাকাতি, লুণ্ঠন প্রভৃতি দ্বারা মোট ৫১ হাজার ১ শত ৭৯ টাকা হস্তগত করে। বৎসরের শেষ-দিকে (বেঙ্গল-অর্ডিনান্স অনুসারে) মোট ৪০১ জন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীকে আটক করা হয় এবং মোট ৪১ জন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী বিভিন্ন অপরাধে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।"(১)

(১) Govt. Publication—'India in 1930', P. 540.

দমননীতি

একদিকে যেমন পূর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হয়, তেমনি শাসকগণও তাহা দমননীতির দ্বারা কঠোরভাবে পিষিয়া মারিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে যে 'বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল এ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট' (বেঙ্গল-অর্ডিনান্স) পাশ হইয়াছিল ১৯৩০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসেই তাহার মেয়াদ শেষ হইবার কথা ছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই, বাংলা-সরকার ১৯২৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে উহার মেয়াদ বাড়াইয়া আইন পাশ করে। এই আইন অনুসারে উহার মেয়াদ আরও পাঁচ বৎসর বাড়িয়া যায়। কিছুদিন পরেই উক্ত অ্যাক্টের ধারা কঠোরতর করিয়া তোলা হয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের পর বড়লাট বঙ্গীয় সরকারকে আরও ব্যাপক ক্ষমতা দিয়া এক অর্ডিনান্স জারি করেন। এই অর্ডিনান্স অনুসারে বিনা বিচারে আটক, বিনা পরোয়ানায় গ্রেপ্তার ও খানাতল্লাসী করিবার ব্যাপক অধিকার পুলিশকে দেওয়া হয়। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর এই অর্ডিনান্সও আইনসভায় পাশ হইয়া স্থায়ী আইনে পরিণত হয়। ১৯৩০ খৃস্টাব্দ শেষ হইবার পূর্বেই ৪০১জনকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। ইহাদের মধ্যে গুপ্ত সমিতিগুলির কয়েকজন প্রধান নেতাও আটক হন, "কিন্তু তাহাতে বৈপ্লবিক সংগঠনগুলির শক্তি কোন ক্রমেই ক্ষুন্ন হয় নাই।…ভয়ংকর বিদ্রোহাত্মক সাহিত্য পুস্তক ও পুস্তিকার আকারে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হইতে থাকে।"(১)

* * * *

১৯৩১ খৃষ্টাব্দ

ডাকাতি ও লুণ্ঠন

এই বৎসর বিপ্লবীদের দ্বারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ৪৮টি ডাকাতি ও বিপুল পরিমাণ সরকারী অর্থ লুণ্ঠিত হয় এবং ইহা দ্বারা বিপ্লবীরা মোট ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫ শত ৩০৲ টাকা সংগ্রহ করে। এই সকল রাজনৈতিক ডাকাতি ও লুণ্ঠনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নীচে দেওয়া হইল :—

(১) Joint Committee Report, 1933-34, Vot. II. P. 333-34.

২০শে জানুয়ারী বাগেরহাট ডাক লুণ্ঠন করিয়া বিপ্লবীরা ৮৩৪৲ টাকা পায়। ২৬শে জানুয়ারী ঢাকা শহরে একটি ডাক-পিওনের নিকট হইতে ১৫০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী ময়মনসিংহ জিলার জামালপুর শহরে রেলি ব্রাদার্স-এর কুঠিতে ডাকাতি দ্বারা ৭৯১৯৲ টাকা ও ২১ ফেব্রুয়ারী ঢাকার শুয়াপাড়ার এক বাড়ীতে ডাকাতি দ্বারা ২০২২৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ৪ই মার্চ ত্রিপুরা জিলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পোস্টঅফিস লুণ্ঠিত হয়। এখানে বিপ্লবীরা ১০৯১২৲ টাকা পায়। ১০ই মার্চ ফরিদপুর জিলার পালং থানার এক বাড়ীর ডাকাতিতে ২৭৮৩ টাকা, ২৭শে মার্চ ময়মনসিংহ জিলার খামারগাঁও নামক স্থানের ডাকাতিতে ২২৪৯ টাকা এবং ৭ই এপ্রিল ফরিদপুর জিলার পালং স্টিমার-স্টেশনের ডাকাতিতে ১৫৪০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১১ই এপ্রিল ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাড়ী-স্টেশনের নিকটে একটি ট্রেন-ডাকাতিতে ৯১৬০৲ টাকা এবং ২০শে এপ্রিল কলিকাতার শিয়ালদহ রেল-স্টেশনের ডাকাতিতে ৪৯৩৮৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৭ই জুলাই ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জের নিতাইগঞ্জ নামক স্থানের ডাকাতিতে ৮৩৭৯৲ টাকা এবং ১লা আগস্ট কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল অফিসের দরজায় কলিকাতা-কর্পোরেশনের ৬২০২৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১১ই সেপ্টেম্বর খুলনা জিলার রঘুনাথপুরের ডাকাতিতে ২০০০৲ টাকা, ১৩ই সেপ্টেম্বর ময়মনসিংহের নিয়ামৎপুরের ডাকাতিতে ২৩৩৩৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়। ১৩ই অক্টোবর ঢাকা শহরের ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে এক দুঃসাহসিক ডাকাতি দ্বারা বিপ্লবীরা নগদ ২৮ হাজার টাকা লুট করে। ইহাই এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ডাকাতি। ইহা ব্যতীত ১৬ই নভেম্বর ফরিদপুরের কানাইকাঠি নামক স্থানের ডাকাতিতে ২৫০০৲ টাকা, ৪ঠা ডিসেম্বর ময়মনসিংহ জিলার শেওড়াকাণ্ড গ্রামের ডাকাতিতে ২৬০৮৲ টাকা, ১৫ই ডিসেম্বর ফরিদপুর জিলার নড়িয়া স্টিমার-স্টেশনে ডাক লুণ্ঠনে ১৯০০৲ টাকা বিপ্লবীদের হস্তগত হয়।

পেডি হত্যা

৭ই মার্চ সন্ধ্যা প্রায় ৭ ঘটিকার সময় মেদিনীপুর জিলার ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেব মেদিনীপুর শহরের কারিগরী বিদ্যালয়ে প্রদর্শনী দেখিতে যান।

জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত থাকিবার সংবাদ বিপ্লবীরা পূর্বেই জানিতে পারিয়াছিল এবং এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিবার জন্য তাহারা পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। যথা সময়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিদ্যালয়-প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ছাত্রদের তৈরী দ্রব্যাদি দেখিবার সময়ে দুইজন যুবক পিছন হইতে তাহাকে গুলি করে। সঙ্গে সঙ্গেই ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেবের মৃত্যু হয়। হত্যাকারী যুবকেরা পলায়ন করিতে সক্ষম হয়।

গার্লিক হত্যা

রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ ও কারা-বিভাগের ইনসপেকটর-জেনারেল সিম্পসন সাহেবের তিনজন হত্যাকারীর অন্যতম দীনেশ গুপ্তের আত্মহত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসীর আদেশ হয়। আলিপুরের সেসন-জজ গার্লিক সাহেবই ছিলেন দীনেশ গুপ্তের বিচারক। বিপ্লবীরা দীনেশের "হত্যাকারী" বিচারক গার্লিক সাহেবকে হত্যা করিয়া দীনেশের ফাঁসীর প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। ২৭শে জুলাই সেসন-জজ গার্লিক সাহেব যখন আলিপুর-কোর্টের মধ্যে বিচারকার্যে ব্যস্ত ছিলেন এমন সময় এক যুবক কোর্টের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সরাসরি গার্লিক সাহেবের মস্তক লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। গুলি গার্লিকের মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হয়। গার্লিক সাহেবের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। যুবকটি গার্লিক সাহেবকে পড়িয়া যাইতে দেখিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া পলাইবার চেষ্টা করে। একজন পুলিশ-সার্জেন্ট যুবকের পশ্চাৎধাবণ করিয়া তাহাকে গুলি করে। যুবকটি গুরুতররূপে আহত হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে 'পটাশিয়াম সায়নাইড' নামক বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করে। তাহার দেহ তল্লাসী করিয়া এক টুকরা কাগজ পাওয়া যায়। তাহাতে লিখিত ছিল:

"যে আদালতের অন্যায় বিচারে দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হইয়াছে সেই আদালত নিপাত যাউক।"

গার্লিকের হত্যাকারীর নাম কানাই ভট্টাচার্য্য। প্রথমে এই নামটি অজ্ঞাত থাকে, পরে উহা প্রকাশ পায়। কানাই ২৪ পরগণা জিলার লোক।

ডিনামাইট-ষড়যন্ত্র

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর কয়েক মাসের মধ্যেই চারিদিক হইতে বহু যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রাম-জেলে আটক করা হয়। অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ প্রভৃতি নেতাদেরও গ্রেপ্তার করিয়া চট্টগ্রাম-জেলে লইয়া আসা হয়। এই বন্দী বিপ্লবীরা প্রথম হইতেই জেলখানা হইতে বাহিরের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে এবং ডিনামাইট প্রভৃতির সাহায্যে জেলখানা উড়াইয়া দিয়া পলায়নের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনা অনুসারে চট্টগ্রাম শহরের প্রধান সরকারী অফিস, জেলখানা, বিচারালয় প্রভৃতি স্থান উড়াইয়া দিবার জন্য ডিনামাইট তৈরীর ব্যবস্থা হয়। বন্দীদের পলায়ন ও চট্টগ্রামের গোটা শাসন-যন্ত্রটাকে বিকল করিয়া দেওয়াই ছিল এই ডিনামাইট-ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পরিকল্পনা অনুসারে সকল আয়োজন সম্পূর্ণ করিবার পূর্বেই দলের কোন সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতায় এই ষড়যন্ত্রের সকল সংবাদ পুলিশ জানিয়া ফেলে এবং ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। শোনা যায়, এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হইবার পর সরকার নাকি এত ভয় পাইয়াছিল যে, তাহারা বন্দী বিপ্লবীদের সহিত একটা আপস করে। এই আপস অনুসারে স্থির হয় যে, বন্দীরা সকল অপরাধ স্বীকার করিবে, আর সরকার-পক্ষ তাহাদের সামান্য শাস্তি দিয়া নিষ্কৃতি দিবে। এই ষড়যন্ত্রের অভিযোগে কাহাকেও তিন বৎসরের বেশী শাস্তি দেওয়া হয় নাই।

ক্যাসেল হত্যার চেষ্টা

ঢাকা-বিভাগের কমিশনার ক্যাসেল সাহেব বিভিন্ন জিলা ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইল মহকুমায় আসিয়া উপস্থিত হন। ময়মনসিংহের বিপ্লবীরাও কমিশনার সাহেবের আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। কমিশনার ক্যাসেল টাঙ্গাইল শহরে আসিয়া ২১শে আগস্ট তারিখে মোটরে আরোহণ করিয়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক পরিদর্শন করিতে যান। এক যুবক ব্যাঙ্কের পথে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়ে, কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। যুবকটি নিরাপদে পলায়ন করিতে

সক্ষম হয়। পুলিশ এক যুবককে অপরাধী সন্দেহে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু যুবকটি প্রমাণ অভাবে মুক্তি পায়।

আশানুল্লা হত্যা

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর হইতে পুলিশের উৎপীড়নে চট্টগ্রামের সাধারণ লোকের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠে। সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার প্রভৃতি বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া পুলিশ ধরিয়া লয় যে, সাধারণ লোক পলাতক বিপ্লবীদের সাহায্য করে বলিয়াই তাঁহাদের গ্রেপ্তার করা যাইতেছে না। এই ধারণা লইয়া চট্টগ্রামের জনসাধারণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পুলিশ তাহাদের উপর ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করে। পুলিশ-কর্মচারীদের মধ্যে ইনস্‌পেক্টর খানবাহাদুর আশানুল্লার অত্যাচারে বহু লোক গৃহহীন-সম্পত্তিহীন হইয়া পথের ভিখারী হয়, বহু লোক রুজি-রোজগার হারায়, তাহার অত্যাচার জনসাধারণের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে। বিপ্লবীরা আশানুল্লার অত্যাচার হইতে জনসাধারণকে রক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত করে। ৩০শে আগস্ট এক বিপ্লবী যুবকের গুলিতে আশানুল্লা নিহত হয়। পুলিশ সন্দেহবশে হরিপদ ভট্টাচার্য নামক এক অল্পবয়স্ক যুবককে গ্রেপ্তার করে। এই হত্যার পর চট্টগ্রামের জনসাধারণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ও তাহাদের নৈতিক বল চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে জিলার শাসকগণ এক ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইয়া দেয়। নিহত খানবাহাদুর আশানুল্লা ছিল মুসলমান আর হত্যাকারী বলিয়া কথিত যুবকটি ছিল হিন্দু। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানদেরও হত্যা করিতেছে—পুলিশের এই দুষ্ট প্রচারের পর মুসলমান গুণ্ডারা পুলিশের সাহায্যে হিন্দুদের উপর আক্রমণ শুরু করে। ইহার কয়েকদিন পরেই পুলিশ-ইনস্‌পেকটর খানবাহাদুর আশানুল্লার হত্যার অভিযোগে হরিপদের বিচার হয় এবং বিচারে হরিপদ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণো হত্যার চেষ্টা

২৮শে অকটোবর ঢাকা শহরের একটি প্রধান রাস্তার উপর একটি দোকানের সম্মুখে ঢাকা জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্ণো সাহেব তাহার মোটর গাড়ীতে বসিয়া-

ছিলেন। পূর্ব হইতেই ঢাকার বিপ্লবীরা এই অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিবার জন্য ইহার গতিবিধির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিল। ২৮শে অকটোবর ডুর্ণো সাহেবকে ঐ স্থানে গাড়ীর মধ্যে দেখিয়া তাঁহার পশ্চাৎ-অনুসরণকারী এক যুবক তাহাকে গুলি করিয়া পলায়ন করে। ডুর্ণো সাহেব গুরুতররূপে জখম হইয়াও প্রাণে বাঁচিয়া যান। এই সম্পর্কে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয় নাই।

ভিলিয়ার্স হত্যার চেষ্টা

ক্রমাগত ইংরেজ-হত্যা ও হত্যার চেষ্টায় কলিকাতার ইংরেজ-সাহেবগণ একদিকে যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠে, তেমনি অপরদিকে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে শুরু করে। কলিকাতার 'য়ুরোপীয়ান এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি ভিলিয়ার্স ইহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিপ্লবীদের আরও কঠোর হস্তে দমন করিবার জন্য সরকারকে উসকানি দিতে থাকেন। বিপ্লবীরা ভিলিয়ার্সকে হত্যা করিয়া ইংরেজদের মুখ বন্ধ করিবার সিদ্ধান্ত নেয়। ২৯শে অকটোবর ভিলিয়ার্স সাহেব তাঁহার ক্লাইভ স্ট্রীটের অফিসে যখন কাজে ব্যস্ত ছিলেন, তখন এক যুবক তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে গুলি করে। ভিলিয়ার্স সাহেব গুরুতররূপে আহত হইয়াও বাঁচিয়া যান। যুবকটি পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। পুলিশ এই যুবককে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট পেডি সাহেবের হত্যাকারী বলিয়া কথিত বিমল গুপ্ত বলিয়া সন্দেহ করে।

ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস্ হত্যা

১৪ই অকটোবর ত্রিপুরা জিলার ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস্ সাহেব যখন তাঁহার বাংলোতে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন দুইটি বালিকা একখানি আবেদন-পত্র লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। স্টিভেনস্ সাহেব যখন তাহাদের আবেদন-পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন, তখন বালিকাদের মধ্যে একজন

ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেনস্‌কে গুলি করে এবং স্টিভেনস্‌ সাহেবের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। বালিকা দুইটি ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয়। পরে ট্রাইবুনালের বিচারে তাহারা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই বালিকা দুইটির একজন সুনীতি চৌধুরী, অপর জন শান্তি ঘোষ।

অন্যান্য হত্যা ও হত্যার চেষ্টা

২৩শে ফেব্রুয়ারী বাখরগঞ্জ জিলার গোয়েন্দা-বিভাগের এক দারোগার বরিশাল শহরস্থ গৃহে তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে বোমা নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ১৬ই মার্চ চট্টগ্রামের বরামা নামক স্থানে চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পলাতক নেতা তারকেশ্বর দস্তিদার গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য চট্টগ্রাম জিলার গোয়েন্দা-বিভাগের একজন দারোগাকে গুলি করিয়া তাহাকে গুরুতররূপে জখম করিয়া পলাইতে সক্ষম হন। ১৭ই মার্চ নদীয়া জিলার গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্‌পেকটরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। ঐ দিনই নদীয়া জিলার সদর থানার মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে কয়েকজন কনেস্টবল আহত হয়। ঐদিন নদীয়া জিলার পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার গৃহে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ২৪শে এপ্রিল উক্ত জিলায় কয়েকজন সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি বোমা ফেলা হয়। ইহাতে দুইজন সাহেব সামান্য আঘাত পায়। ১০ই সেপ্টেম্বর বর্ধমানের মেমারি থানায় একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ইহাতে তিনজন লোক আহত হয়। ১১ই নভেম্বর ময়মনসিংহ জিলার রাজবল্লভপুরে পুলিশ-ইনস্‌পেকটর মনোরঞ্জন চৌধুরীকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহাকে গুলি করা হয়। কিন্তু ইনস্‌পেকটর চৌধুরী আহত হইয়াও বাঁচিয়া যায়। ৩০শে ডিসেম্বর মানিকতলা ডাকাতি-মামলার প্রধান সাক্ষীকে কলিকাতার গৌরীবাড়ী লেনে গুলি করিয়া হত্যা করা হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

রাজনৈতিক ডাকাতি ও লুণ্ঠন

১৯৩২ খৃস্টাব্দে মোট ৬৮টি রাজনৈতিক ডাকাতি ও ডাক-লুট হয় এবং ইহাতে দুই লক্ষাধিক টাকা লুণ্ঠিত হয়। ইহার মধ্যে ট্রেণ-ডাকাতি হয় তিনটি এবং ডাক লুট হয় ১১টি। পাঁচটি ডাকাতিতে বিপ্লবীদের মোট দ্বারা পাঁচজন লোক নিহত হয়।

গুপ্তহত্যা

১৯৩২ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে সারা বাংলাদেশে গুজব রটিয়া যায় যে, প্রত্যেক শহরের ক্লাব ও সিনেমায় ইংরেজদের পাইকারী হারে হত্যা করা হইবে। এই গুজব রটিবার পর এদেশের ইংরেজ-সাহেবগণ আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে। তাহারা ভীষণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া বিশেষ সতর্কতার সহিত বাস করিতে থাকে। ইহার পর হইতে তাহারা, বিশেষ করিয়া ইংরেজ-শাসকগণ আর বিশেষ প্রয়োজন না হইলে ঘর হইতে বাহির হইত না এবং যখন বাহির হইত তখন বহু প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত হইয়া থাকিত। কিন্তু তাহা সত্বেও এদেশের বহু উচ্চ-পদস্থ ইংরেজ-শাসক বিপ্লবীদের ক্রোধের আগুন হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই।

চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার বিচার

ইতিমধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সম্পর্কে ধৃত বিপ্লবীদের বিচার শুরু হইয়াছিল। এই মামলা সারা ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩২ খৃস্টাব্দের ১লা মার্চ মামলার রায় বাহির হয়। বিচারে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল, লালমোহন সেন, সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, আনন্দ গুপ্ত, ফকির সেন, সহায়রাম দাস, রণধীর দাশগুপ্ত, সুবোধ রায় ও সুখেন্দু দস্তিদারের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। পৃথক বিচারে অম্বিকা চক্রবর্তী এবং সরোজ গুহও যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন।

ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস হত্যা

৩০শে এপ্রিল মেদিনীপুরের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ডগলাস সাহেব মেদিনীপুর শহরের 'ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড'-এর অফিসে বোর্ডের এক সভায় সভাপতিত্ব করিতে উপস্থিত হন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যথারীতি রক্ষীবেষ্টিত হইয়াই সভায় উপস্থিত হন। কিন্তু বিপ্লবীরাও পূর্বেই তাঁহার আগমনের সংবাদ পাইয়া উপযুক্ত আয়োজন করিয়া রাখে। সভার কাজ যথারীতি আরম্ভ হইবার পর এক যুবক সম্মুখ হইতে ডগলাস সাহেবকে গুলি করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডগলাসের প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। ডগলাস-হত্যার অভিযোগে প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়।

ধলঘাটের যুদ্ধ

বঙ্গীয় সরকার বিপ্লবীদের দমনের জন্য ১৯৩১ খৃস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর '১১নং বেঙ্গল ইমারজেন্সি পাওয়ার্স অর্ডিনান্স' নামক যে বিশেষ আইন চালু করে তাহা অবিলম্বে চট্টগ্রাম জিলায় প্রয়োগ করা হইয়াছিল। এই বিশেষ আইন অনুসারে সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ একত্রিত হইয়া চট্টগ্রাম জিলার সর্বত্র পলাতক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য হানা দিতে থাকে। এই বিশেষ আইন অনুসারে জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে যে-কোন লোকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, যে-কোন রাস্তার যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, যে-কোন গ্রামের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য, যে-কোন লোকের গৃহে প্রবেশ এবং যে-কোন লোককে যে-কোন সময় গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ১৩ই জুন চট্টগ্রাম জিলার ধলঘাট-থানার পটিয়া নামক গ্রামে বিপ্লবীরা আত্মগোপন করিয়া আছে এই সংবাদ পাইয়া সামরিক অফিসার ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ-এর অধীনে একদল সৈন্য ও পুলিশ পটিয়া গ্রামে হানা দেয়। সৈন্য ও পুলিশের দল সারা গ্রামটি ঘিরিয়া ফেলে এবং কয়েকজন গোয়েন্দা-অফিসারের সহিত ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া পলাতক বিপ্লবীদের অনুসন্ধান করিতে থাকে।

সূর্য সেন তাঁহার সহকর্মী নির্মল সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত ও অপূর্ব সেনের সহিত ঐ গ্রামের সাবিত্রী দেবী নাম্নী এক বিধবা মহিলার বাড়ীতে গোপনে বাস করিতেছিলেন। ১৩ই জুন রাত্রি প্রায় ১০ ঘটিকার সময় ক্যাপ্টেন ক্যামেরণের নেতৃত্বে একদল সৈন্য আসিয়া সেই বাড়ী ঘেরাও করে। বিপ্লবীরা তখন ঐ বাড়ীর নীচের তলায় বসিয়া আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। সৈন্যদল বাড়ী ঘেরাও করিবার সংবাদ পাইবামাত্র সকলে উপর তলায় উঠিয়া যান। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণ সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছিলেন, এমন সময় বিপ্লবীদের গুলির আঘাতে তিনি নিহত হন। ইহার পর বহুক্ষণ ধরিয়া দুইপক্ষে গুলি বর্ষণ চলে এবং সূর্য সেনের দুইজন বিশিষ্ট সহকর্মী নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। এই দুই বিপ্লবীর আত্মদানের ফলে অন্য তিনজনের পলায়নের পথ সুগম হয়। বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলি বর্ষণে হতভম্ব ও ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের অলক্ষ্যে সূর্য সেন, প্রীতি ও কল্পনা পলায়ন করিতে সক্ষম হন। এই যুদ্ধে গৃহকর্ত্রী বুড়ী মা যে সাহস ও বুদ্ধির পরিচয় দেন তাহা স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে চিরদিন অম্লান থাকিবে।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা

২৭শে জুন ঢাকার সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কামাক্ষ্যা সেন ঢাকা শহরে তাঁহার নিজ গৃহে এক সাক্ষাৎপ্রার্থী যুবকের সহিত সাক্ষাতের জন্য বাহির হন। তখন উক্ত যুবক অকস্মাৎ রিভলভার বাহির করিয়া তাঁহাকে গুলি করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কামাক্ষ্যা সেনের মৃত্যু হয়। এই হত্যা সম্পর্কে কালিপদ ভট্টাচার্য নামক এক যুবক গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারে তাহার ফাঁসীর আদেশ হয়।

পুলিশ-সুপারিণটেণ্ডেণ্ট হত্যা

২৯শে জুলাই ত্রিপুরা জিলার পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট এলিসন সাহেব কুমিল্লা শহরে এক যুবকের রিভলভারের গুলিতে নিহত হন।

য়ুরোপীয়ান ইনষ্টিটিউট আক্রমণ

২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রিকালে চট্টগ্রাম শহরের 'পাহাড়তলী রেলওয়ে ইনস্টিটিউট'-এ যখন বহু ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব একত্রিত হইয়া নাচ-গান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে মগ্ন ছিল, তখন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার নামক একজন নারী-বিপ্লবীর নেতৃত্বে একদল বিপ্লবী বোমা ও রিভলভার লইয়া এই ইনস্টিউটের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে। ইনস্টিটিউটের হলঘরের মধ্যে একই সঙ্গে বোমা ও রিভলভারের গুলি বর্ষিত হয়। এই আক্রমণে একজন ইংরেজ-মহিলা নিহত এবং বহু ইংরেজ ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সাহেব গুরুতররূপে আহত হয়। সাহেবরাও রিভলভার ও চায়ের কাপের দ্বারা পাল্টা আক্রমণ করে। বিপ্লবীদের নায়িকা প্রীতিলতা রিভলভারের গুলিতে আহত হন। নিকটে অবস্থিত সৈন্যদল ছুটিয়া আসিবার পূর্বেই বিপ্লবীরা আক্রমণ শেষ করিয়া উধাও হইয়া যায়। আক্রমণকারীদের পরিচালিকা নারী-বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য ইনস্টিটিউটের বাহিরেই বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

গভর্ণর হত্যার চেষ্টা

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসাবে বাংলাদেশের গভর্ণর স্যার জন এ্যণ্ডারসন সাহেব বাৎসরিক সমাবর্তন-উৎসবে পৌরাহিত্য করিবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট হাউস'-এ উপস্থিত হন। পূর্ব হইতেই বিপ্লবীরা এই সমাবর্তন-উৎসবে বাংলাদেশের ইংরেজ-শাসকদের প্রধান ব্যক্তি গভর্ণর এ্যণ্ডারসনকে বধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

এই এ্যণ্ডারসন বাংলাদেশে আসিবার পূর্বে আয়ার্লণ্ড-এ বিপ্লবীদের দমন করিয়া কুখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রবর্তিত 'ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান' নীতির ফলে আয়ার্লণ্ডের উপর দিয়া অত্যাচারের ঝড় বহিয়াছিল। বাংলার বিপ্লবীদের দমনের জন্য ইংরেজ-শাসকগণ এই "অভিজ্ঞ" ও কুখ্যাত ব্যক্তিটিকে গভর্ণর করিয়া বাংলায় প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইতিমধ্যে গভর্ণর এ্যণ্ডারসন

বিপ্লব-দমনের নামে আয়ার্লণ্ড-এর মতই বাংলাদেশে অত্যাচারের তাণ্ডব শুরু করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের বিপ্লবীরা এই কুখ্যাত গভর্ণরকে হত্যা করিয়া ইংরেজ-শাসকদের ধৃষ্টতার জবাব দিবার জন্য প্রস্তুত হয়।

৬ই ফেব্রুয়ারী 'সিনেট-হাউস'-এ যথারীতি সমাবর্তন-উৎসব শুরু হইলে গভর্ণর এ্যণ্ডারসন বক্তৃতা আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতার সময় সভার মধ্য হইতে বীণা দাস নাম্নী এক নারী-বিপ্লবী গভর্ণরের দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহার বক্ষদেশ লক্ষ্য করিয়া গুলি করেন। কিন্তু এ্যণ্ডারসনের সৌভাগ্যক্রমে গুলিটি তাঁহার বুক-পকেটস্থ নোট বইতে লাগিয়া প্রতিহত হয় এবং এ্যণ্ডারসন বাঁচিয়া যান। বীনা দাস ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হন। বিচারে তাঁহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়

অন্যান্য হত্যার চেষ্টা

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী বোর্ণ নামে একজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্ট ঢাকা শহরে কর্তব্যরত অবস্থায় পায়চারি করিতেছিল। তখন দুইজন বিপ্লবী তাহার মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়া আঘাত করে। সার্জেণ্ট গুরুতর-রূপে আহত হইয়া চেতনা হারাইয়া ফেলে। এই অবসরে বিপ্লবীরা তাহার কোমর হইতে রিভলভারটি খুলিয়া লইয়া পলায়ন করে।

২২শে জানুয়ারী হাওড়া জিলার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাওড়া-আমতা রেল-লাইনের উপর অবস্থিত পাতিহাল রেল-স্টেশন সংলগ্ন ম্যাজিস্ট্রেটের বাংলোর মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহাতে তিনজন কনেস্টবল আহত হয়। ১১ই মার্চ মুর্শিদাবাদ জিলার কান্দি মহকুমার সাব-ডিভিসনাল অফিসারকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে একটি বোমা পড়ে। ইহাতে কেহ হতাহত হয় নাই। ১৮ই মে চট্টগ্রাম শহরের একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-অফিসারের নামে প্রেরিত একটি পার্সেল চট্টগ্রাম পোস্ট-অফিসের মধ্যেই ফাটিয়া যায়। ইহার ফলে একজন কুলি আহত হয়। জনৈক পুলিশ-অফিসারকে হত্যার উদ্দেশ্যে পার্সেলের মধ্যে একটি বোমা প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু

পার্সেলটি যথাস্থানে পৌছিবার পূর্বে নাড়াচাড়ার ফলে পোস্ট-অফিসের মধ্যেই উহা বিস্ফোরিত হয়। ২৬শে মে ঢাকা সরকারী দপ্তরের (কালেকটারীর) সামনে সুলেমান খাঁ নামে সরকারী দপ্তরের একজন রক্ষীকে মারাত্মক আঘাত করিয়া বিপ্লবীরা তাহার রিভলভার লইয়া পলায়ন করে। ১২ই জুন ফরিদপুর জিলার ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিবার সময় রেল-গাড়ীখানি যখন উক্ত জিলার রাজবাড়ী-স্টেশনে আসিয়া দাঁড়ায় তখন তাঁহাদের হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের কামরার মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি বিস্ফোরিত হইলেও কেহ হতাহত হয় নাই। ৫ই আগস্ট কলিকাতার চৌরঙ্গি রোডের উপর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এ্যালফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করিবার প্রথম চেষ্টা হয়। ওয়াটসন সাহেব যখন চৌরঙ্গি রোড দিয়া মোটরে যাইতেছিলেন তখন এক যুবক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গাড়ীর মধ্যে গুলি ছোঁড়ে। গুলিটি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু কার্যসিদ্ধি হইয়াছে মনে করিয়া যুবকটি গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য 'পটাসিয়াম সায়ানাইড' নামক বিষপানে আত্ম-হত্যা করে। ২২শে আগস্ট ঢাকা জিলার এ্যাডিসনাল পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট গ্র্যাসবি সাহেব যখন মোটরগাড়ীতে ঢাকা শহরের নবাবপুর রেল-ক্রসিং পার হইতেছিলেন, তখন এক যুবক তাহাকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করে। গ্র্যাসবি সাহেব গুরুতররূপে আহত হইয়াও শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া উঠেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সম্পাদক এ্যালফ্রেড ওয়াটসনকে হত্যা করিবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এবারও ওয়াটসন সাহেব বাঁচিয়া যান। ঐ তারিখে ওয়াটসন সাহেব যখন স্ট্র্যাণ্ড রোড দিয়া মোটরে যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে গুলি করা হয়। ১৮ই নভেম্বর রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের অত্যাচারী সুপারিনটেণ্ডেণ্ট লিউক সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়। কিন্তু গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। ১৯শে ত্রিপুরা জিলার কালিকচ্ছ গ্রামে 'মালিয়া' নামক এক পুলিশের-গুপ্তচরকে হত্যার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইহা ব্যতীত ১৯৩২ খৃস্টাব্দের ১১ই জানুয়ারী ফরিদপুর জিলার একজন সার্কেল-অফিসার যখন নৌকাযোগে যাইতেছিলেন, তখন উক্ত জিলার গোহালা নামক

স্থানে তাঁহার নৌকার মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ২রা এপ্রিল নদীয়া জিলার পলাশীপাড়া গ্রামে পুলিশের গুপ্তচর ফটিক সিংহকে হত্যা করিবার জন্ম তাহার গৃহে একটি বোমা নিক্ষেপ করা হয়। কেহ হতাহত হয় নাই। ১১ই এপ্রিল হাওড়া জিলার আমতা থানার বড় দারোগার বাসায় একটি বোমা পড়ে। ইহার ফলে একজন কনেস্টবল আহত হয়।

* * *

১৯৩৩ খৃস্টাব্দ
রাজনৈতিক ডাকাতি ও লুণ্ঠন

১৯৩৩ খৃস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী হাওড়া জিলার বড়ময়রা নামক স্থানে একটি ডাক লুট হয়। ৪ঠা জানুয়ারী ত্রিপুরা জিলার নালুয়া গ্রামে একটি ডাকাতি, ২২শে মে খুলনা জিলার ফকিরহাটে ডাক লুটের চেষ্টা, ২৪শে মে বাঁকুড়া শহরে ডাক লুট, ১৩ই জুন ঢাকার ফলসাতিয়া গ্রামে একটি ডাক লুট, ১৬ই জুন রাজসাহী জিলার রাণীবাজারে এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে এক হাজার টাকা লুট এবং ২৮শে জুন বাঁকুড়া জিলার দেরুয়াবাড়ী নামক স্থানে একটি সশস্ত্র ডাক লুট হয়। ইহা ব্যতীত, ৯ই জানুয়ারী ঢাকা শহরে ফ্র্যাভেল নামক একজন সৈন্যকে একটি লোহার ডাণ্ডা দ্বারা আঘাত করিয়া তাহার রিভলভার ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা হয়।

গৈরালার যুদ্ধ
সূর্যসেনের গ্রেপ্তার

১৯৩৩ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশ আবার চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার-লুণ্ঠনের প্রধান নায়ক সূর্য সেনের সন্ধান পায়। এই সময় তিনি চট্টগ্রাম শহরের নিকটস্থ গৈরালা গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সহিত কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও মণি দত্ত নামক আরও তিনজন বিপ্লবী বাস করিতেছিলেন। জনৈক বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসীর নিকট হইতে

এই সংবাদ পাইয়া একটি প্রকাণ্ড গুর্খা-সৈন্যদল তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিতে আসে। ঐ দিন রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টার সময় বাড়ীর চারিদিকে গুর্খা-সৈন্যের বেষ্টনী দেখিয়া সূর্য সেন সঙ্গীদের গুলি চালাইবার নির্দেশ দেন। বহুক্ষণ দুই পক্ষের গুলি বর্ষণ চলে। এই গুলি বর্ষণে বাড়ীর মালিক পূর্ণ তালুকদার ও তাঁহার ছোট ভাই নিহত হন। গুলি বর্ষণের আড়ালে সকলের অলক্ষ্যে সূর্য সেন ও তাঁহার সঙ্গীরা পলাইবার জন্য বাহির হন। সঙ্গীরা নিরাপদে সরিয়া পড়েন, কিন্তু সূর্য সেন যখন একটি পুকুরের জলে নামিয়া আত্মগোপন করিতেছিলেন, তখন একটি গুর্খা-সৈন্য তাঁহাকে ঝাপটাইয়া ধরে। এইভাবে সূর্য সেন অবশেষে বন্দী হন।

যে বিশ্বাসঘাতক গ্রামবাসী পুলিশকে সূর্য সেনের সংবাদ দিয়াছিল, সে কয়েকদিন পরেই প্রকাশ্য দিবালোকে বিপ্লবীদের দ্বারা নিহত হয়। গ্রামবাসীরা হত্যাকারীদের নাম জানিয়াও পুলিশকে বলিয়া দেয় নাই।

চন্দননগরে সশস্ত্র সংঘর্ষ

বাংলাদেশের বহু বিপ্লবী পুলিশের তৎপরতায় অস্থির হইয়া ফরাসী চন্দন-নগরে গিয়া আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু চন্দননগরের ফরাসী সরকার ভারতের ইংরেজ-শাসকদের সহিত হাত মিলাইয়া এই বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। কলিকাতার পুলিশের পক্ষে চন্দননগরে গিয়া চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করা চন্দননগরের ফরাসী সরকারের সাহায্য ও সহযোগিতার ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। চন্দননগরের ফরাসী শাসনকর্তা মসিয়েঁ কুই বৃটিশ-সরকারের নির্দেশে চন্দননগরে আশ্রয়প্রাপ্ত বিপ্লবীদের অতিষ্ঠ করিয়া তোলেন। বাংলার বিপ্লবীরা মসিয়েঁ কুইকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইবার জন্য সচেষ্ট হয়। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের ১০ই মার্চ মসিয়েঁ কুই স্বয়ং একদল পুলিশসহ একজন পলাতক বিপ্লবীকে তাঁহার গোপন আশ্রয়স্থলে গ্রেপ্তার করিতে যান। কুইর পুলিশদল আশ্রয়-স্থলটি ঘিরিয়া ফেলে এবং তিনি স্বয়ং খানা-তল্লাস করিবার জন্য উক্ত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন। এমন সময়

পলাতক বিপ্লবীটি গুলি ছুঁড়িতে ছুঁড়িতে ঘর হইতে বাহির হন এবং পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করিয়া পলায়ন করেন। বিপ্লবীর গুলিতে মসিয়েঁ কুই ভীষণ আহত হইয়াও প্রাণে বাঁচিয়া যান।

গহিরার সংঘর্ষ

১৯৩৩ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম-অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কয়েকজন নেতা ঐ জিলার মধ্যেই পলাতক থাকিয়া আবার চট্টগ্রামের যুবকদের সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী শত চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। এই বৎসরের ১৮ই মে পুলিশ সংবাদ পায় যে, চট্টগ্রামের গহিরা নামক স্থানে কয়েকজন বিপ্লবী আত্মগোপন করিয়া আছে। এই সংবাদ পাইবামাত্র সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যদের একটা বড় দল ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া গোটা অঞ্চল ঘিরিয়া ফেলে। ইহার পর পুলিশ ও সৈন্যদের অফিসারগণ প্রত্যেক বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া খানাতল্লাস করিতে থাকে। এই-ভাবে এক বাড়ীতে প্রবেশ করিবামাত্র দুই জন পলাতক বিপ্লবী এক ঘরের মধ্য হইতে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ শুরু করেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত উভয়পক্ষে গুলি বিনিময় হইবার পর বিপ্লবীদের গুলি ফুরাইয়া যায়। ইহার পর বিপ্লবীরা পলায়নের কোন উপায় নাই দেখিয়া আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই দুই জন বিপ্লবীর একজন অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম প্রধান নায়ক তারকেশ্বর দস্তিদার ও অপরজন কল্পনা দত্ত। বিচারে তারকেশ্বরের প্রাণদণ্ড ও কল্পনা দত্তের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়।

কলিকাতায় সশস্ত্র সংঘর্ষ

২২শে মে উত্তর-কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক বাড়া হইতে বহুক্ষণ-ব্যাপী সশস্ত্র সংঘর্ষের পর দুই জন নেতৃস্থানীয় পলাতক বিপ্লবী ও অপর এক যুবক পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হন। এই তিনজন বিপ্লবা হইলেন নলিনী দাস, দীনেশ মজুমদার ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়। নলিনী দাস কিছুদিন পূর্বে হিজলী-

বন্দীশালা হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। দীনেশ মজুমদার ১৯৩০ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসে ডালহৌসি স্কোয়ার বোমার মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে আবদ্ধ থাকাকালে সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন। ইহার পর এই দুইজন পলাতক বিপ্লবী নেতা অপর কয়েকজন বিপ্লবীর সহযোগিতায় বিভিন্ন জিলার ছত্রভঙ্গ বিপ্লবীদের সংগঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা উত্তর-কলিকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের এক বাড়ীতে কেন্দ্র করিয়া কাজ চালাইতেছিলেন। ২২শে মে গোয়ন্দা-পুলিশ তাঁহাদের গোপন-আশ্রয়ের সন্ধান পায়। ঐ দিন রাত্রিকালে একদল সশস্ত্র পুলিশসহ গোয়েন্দা-বিভাগের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ঐ বাড়ীতে হানা দেয়। গোয়েন্দা-কর্মচারীরা বিপ্লবীদের গৃহের নিকবর্তী হইবামাত্র বিপ্লবীদের সহিত পুলিশের রীতিমত যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে গুলি নিঃশেষ হইলে বিপ্লবীরা উপর হইতে পাইপ বাহিয়া নীচে নামিয়া পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহারা নীচে নামিবামাত্র পুলিশ তাঁহাদের গ্রেপ্তার করে। এই সংঘর্ষে গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্‌পেক্টর এম. ভট্টাচার্য গুরুতররূপে আহত হয়। ইহার পর বিচারে দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী, নলিনী দাসের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ হত্যা

২রা সেপ্টেম্বর মেদিনীপুর শহরের ফুটবল-খেলার মাঠে এব ফুটবল-খেলার আয়োজন হয়। এই খেলায় মেদিনীপুর জিলার ম্যাজিস্ট্রেট বার্জ সাহেবেরও খেলিবার কথা ছিল। খেলা শুরু হইবার ঠিক পূর্বক্ষণে বার্জ সাহেব খেলার মাঠে উপস্থিত হইয়া মাঠে নামিবেন এমন সময় দুইজন যুবক তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার হইতে গুলি করে। কয়েকটি গুলি বার্জ সাহেবের বক্ষ ও মস্তক ভেদ করিয়া বাহির হয় এবং তাঁহার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। ইতিমধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের দেহরক্ষীরা ঐ দুই যুবককে গুলি করে।

যুবকদ্বয় আহত অবস্থায় ধরা পড়ে এবং পরে মারা যায়। ইহাদের একজন অনাথ পাঞ্জা ও অপর জন মৃগেন দত্ত। ঘটনাস্থলে আরও কয়েকজন যুবক ধরা পড়ে। ধৃত যুবকদের দুই দফায় বিচার হয়। বিচারে ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, রামকৃষ্ণ রায় ও নির্মল ঘোষ—এই তিনজনের ফাঁসী হয়। ইহা ব্যতীত এই সম্পর্কে ধৃত নবজীবন নামে একটি কিশোর পুলিশের প্রহারের ফলে জেলে মারা যায়। ইহারা সকলেই ছিল 'বি. ভি.' দলের সভ্য।

অস্ত্রাগার আবিষ্কার

অকটোবর মাসের গোড়ার দিকে উত্তর-কলিকাতার এক বাড়ী হইতে অনেকগুলি রিভলভার, পিস্তল, কয়েকটি বন্দুক, বহু গুলি, বোমা ও বোমার খোল এবং বহু ডিনামাইট স্টিক আবিষ্কৃত হয়। পুলিশ এই সম্পর্কে কয়েক জন লোককে গ্রেপ্তার করে।

দেওভোগের সংঘর্ষ

১৯৩৩ খৃস্টাব্দের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল ঢাকার দেওভোগ নামক গ্রামে 'ভিলেজ গার্ড'দের সহিত বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংঘর্ষ।

গভর্ণর জন এ্যাণ্ডারসন বিপ্লবীদের দমনের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে 'ভিলেজ গার্ড' তৈরী করেন। একদিন ঢাকা জিলার নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ গ্রামে 'ভিলেজ গার্ড'দের সহিত সশস্ত্র বিপ্লবীদের এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে বিপ্লবীদের রিভলভারের গুলিতে একজন 'গার্ড' নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। বিপ্লবীদের একজন ঘটনাস্থলে ধরা পড়ে এবং অপর সকলে পলায়ন করে। বিচারে ধৃত বিপ্লবী মতি মল্লিকের প্রাণদণ্ড হয়। এই ঘটনাটিও 'বি. ভি.' দলের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

সশস্ত্র স্টেশন-ডাকাতি

২৮শে অকটোবর পনের জন যুবক রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া দিনাজপুর জিলার হিলি রেল-স্টেশন আক্রমণ করে। স্টেশনের লোকজন

তাহাদের বাধা দিবার চেষ্টা করিলে যুবকেরা গুলিবর্ষণ করিয়া তাহাদের বিতাড়িত করে। তারপর তাহারা স্টেশনের অফিস-ঘরে প্রবেশ করে এবং সিন্দুক ভাঙ্গিয়া বিপুল পরিমাণ অর্থ ও ডাকের থলিয়াগুলি লইয়া সরিয়া পড়ে। বিপ্লবীদের গুলিবর্ষণে একজন ডাক-পিওন, একজন রেলওয়ে-কারিগর এবং চারিজন কুলি আহত হয়। ডাক-পিওনটি পরে মারা যায়। ঐদিনই পুলিশ সাত জন যুবককে এই ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাহাদের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়।

দমননীতি ও বৈপ্লবিক সংগ্রাম

১৯৩১ খৃস্টাব্দ হইতে যে প্রচণ্ড দমননীতি শুরু হয়। তাহার ফলে ক্রমশঃ বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রবল জোয়ার ধীরে ধীরে কমিয়া আসিতে থাকে এবং ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের সংখ্যা বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। সরকার প্রথম হইতেই বিপ্লবীদের দমনের জন্য কতকগুলি আইন পাশ করিয়া সেই সকল আইনের বলে দলে দলে বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার, আটক ও কারাদণ্ড দিতে থাকে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের অকটোবর মাসে '১১ নং বঙ্গীয় বিশেষ ক্ষমতা অডিনান্স' পাশ হয়। ইহার পর '১৯৩২ খৃস্টাব্দের বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী দমন আইন' ও '১৯৩২ খৃস্টাব্দের বঙ্গীয় ফৌজদারী আইন' (অস্ত্র ও বিস্ফোরক সম্পর্কে) পাশ করিয়া সরকার উহাদের দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রাম দমনের প্রয়াস পায়।

এই সকল আইনের বেড়াজালে পড়িয়া শত শত যুবক-যুবতী গ্রেপ্তার হইতে থাকে। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ বিপ্লবীদের উপর অমানুষিক শারীরিক উৎপীড়ন করিত। এই ধরণের উৎপীড়নে মেদিনীপুরের নবজীবন নামে এক কিশোর ও ঢাকার অনিল দাসের মৃত্যু ঘটে। অনিল দাস ছিলেন ঢাকার 'শ্রীসংঘ' দলের একজন প্রধান নেতা। অনিল দাস একটি ট্রেণ-ডাকাতি সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া পুলিশের প্রহারের ফলে ঢাকা জেলে মারা যান। ১৯৩২ খৃস্টাব্দের শেষভাগ হইতেই বাংলাদেশ-জোড়া বৈপ্লবিক সংগ্রামের বেগ মন্দীভূত হইতে শুরু

করে। ১৯৩২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এই বেগ বিশেষ ভাবে হ্রাস পায়। এই সময়ে পুলিশের বিশেষ তৎপরতায় বিপ্লবীদের বহু পরিকল্পনা কার্যকরী হইবার পূর্বেই ব্যর্থ হইয়া যায় এবং একে একে নেতৃবৃন্দ ও দলে দলে বিপ্লবী কর্মীরা গ্রেপ্তার হইতে থাকে। ইহার ফলে কোন বড় রকমের ষড়যন্ত্র সফল করিয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে বড় বড় বৈপ্লবিক সমিতিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায় এবং অবশিষ্ট বিপ্লবী কর্মীরা দলহারা ও সংগঠন-হারা হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ইহার পর যে সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় তাহা এই সকল ছত্রভঙ্গ বিপ্লবীদের ব্যক্তিগত চেষ্টার ফল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ইহার দ্বারা বাংলাদেশের তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসানের সূচনা হয় এবং পুলিশের অব্যাহত তৎপরতার ফলে সেই অবসান আসন্ন হইয়া উঠে। তাহা সত্ত্বেও ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কতিপয় বিপ্লবীর ব্যক্তিগত চেষ্টায় কয়েকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ

১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্যেই সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সমিতিগুলির সংগঠন ছিন্নভিন্ন এবং সহস্র সহস্র বিপ্লবী কর্মী গ্রেপ্তার, আটক ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। তাহার অনিবার্য পরিণতি হিসাবে বাংলাদেশের বৈপ্লবিক সংগ্রাম স্তিমিত হইয়া আসিলেও যে সকল বিপ্লবী তখনও আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহারা তাহাদের ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা বৈপ্লবিক সংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়া রাখিবার প্রয়াস পায়। তাহার ফলেই এই বৎসরেও কয়েকটি বৈপ্লবিক কর্ম অনুষ্ঠিত হয়।

ইংরেজ-সাহেবদের উপর আক্রমণ

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম শহরের ইংরেজ-সাহেবগণ একটি ক্রিকেট-খেলার আয়োজন করে। চট্টগ্রাম শহরের সকল ইংরেজ-সাহেব খেলা

দেখিবার জন্য মাঠে সমবেত হয়। চট্টগ্রামের অবশিষ্ট বিপ্লবীরা এই সুযোগের জন্য পূর্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল। খেলা আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পরেই কয়েকজন যুবক বোমা ও রিভলভার লইয়া সাহেবদের উপর আক্রমণ করে। তাহাদের আকস্মিক আক্রমণে কয়েকজন সাহেব আহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে থাকে। খেলার মাঠে পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্টও উপস্থিত ছিলেন এবং বিপ্লবীদের আক্রমণের আশঙ্কা করিয়া কয়েকজন সশস্ত্র পুলিশ লইয়া আসিয়াছিলেন। আক্রমণ শুরু হইবার পর পুলিশ-সুপারিন-টেণ্ডেণ্ট ও সশস্ত্র পুলিশদল বিপ্লবীদের উপর রাইফেল হইতে গুলি বর্ষণ শুরু করে। পুলিশের গুলিতে নৃত্যগোপাল ও হিমাংশু নামক দুইজন যুবক নিহত হয় এবং বাকী সকলে আহত হইয়া গ্রেপ্তার হয়। সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্বয়ং একজন যুবককে গ্রেপ্তার করিতে গেলে তিনি উক্ত যুবকের গুলিতে আহত হন, কিন্তু উক্ত যুবকও গ্রেপ্তার হয়। পরে ধৃত যুবকদের লইয়া এক মামলা হয় এবং মামলার বিচারে কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন চক্রবর্তী নামে দুইজন যুবক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

সূর্যসেন ও তারকেশ্বরের ফাঁসী

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সমগ্র চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের উপর শোকের ছায়া ঘনাইয়া আসে। ঐ দিন ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়কদের অন্যতম সূর্য সেন ও তাঁহার প্রধান সহকর্মীদের অন্যতম তারকেশ্বর দস্তিদার ইংরেজ-রাজের ফাঁসীকাষ্ঠে জীবন আহুতি দেন। সমগ্র ভারতবাসীর প্রতিবাদ ও আবেদন সত্ত্বেও ইংরেজ-সরকার সূর্য সেনের ফাঁসীর আদেশ বহাল রাখে। ফাঁসীর সময় ধার্য হইয়াছিল ১৩ই জানুয়ারী ভোর ৫টা। ১২ই তারিখে বিকাল ৫টা হইতেই চট্টগ্রামের বিক্ষুব্ধ জনসাধারণের ভয়ে একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী শহরের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে এবং বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ রাস্তায় টহল দিতে থাকে। সন্ধ্যা ৬টায় জেল-গেটের প্রহরী-সংখ্যা অনেক গুণ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। সন্ধ্যার পর হইতেই শহরের

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে জনসাধারণ নানাবিধ বৈপ্লবিক ধ্বনি দিয়া তাহাদের প্রিয় নেতা 'মাস্টার দা' ও তারকেশ্বরকে বিদায়-অভিনন্দন জানাইতে থাকে। এদিকে জেলের মধ্যে সূর্য সেন ও তারকেশ্বর রাত্রি ১২টা পর্যন্ত জেলের অন্যান্য বন্দীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর তারকেশ্বর একটি বৈপ্লবিক সঙ্গীত গাহিয়া জেলের বন্দীদের এবং চট্টগ্রাম তথা সমগ্র দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে শেষবারের মত বিদায় গ্রহণ করেন। ভোর পাঁচটার সময় চিরস্মরণীয় বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেন ও তাঁহার যোগ্য সহকর্মী তারকেশ্বর দস্তিদার চট্টগ্রাম জেলের ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করেন। ১৬ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম ও বাংলার জনসাধারণ উপবাসী থাকিয়া এই দুই বিপ্লবী বীরের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে।

থানা আক্রমণ

৬ই মার্চ হাওড়ার কয়েকজন বিপ্লবী যুবক সশস্ত্র হইয়া একটি থানা আক্রমণ করে। যুবকেরা প্রথমে থানার মধ্যে কয়েকটি বোমা নিক্ষেপ করে এবং বোমার আঘাতে কয়েকজন কনেস্টবল ও একজন দারোগা আহত হয়। তারপর বিপ্লবীরা থানার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে দুইজন কনেস্টবল থানার অফিস হইতে বন্দুক লইয়া আক্রমণকারীদের উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে। আক্রমণকারীরা অবশেষে পলাইয়া যায়। তাহাদের দুইজন ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হয় এবং আরও কয়েকজন পরে ধরা পড়ে।

গভর্ণর এ্যাণ্ডারসন হত্যার চেষ্টা

৮ই মার্চ দার্জিলিং শহরে লেবং-এর ঘোড়দৌড়ের মাঠে বাংলার গভর্ণর স্যার জন এ্যাণ্ডারসন সদলবলে ঘোড়দৌড় দেখিতে আসেন। ঘোড়দৌড়ের পর লাটসাহের বিজয়ীকে একটি কাপ পুরস্কার দিবেন, এমন সময় একজন যুবক আগাইয়া আসিয়া লাট সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার হইতে গুলি করে। প্রথম গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইলে যুবক দ্বিতীয় বার গুলি করে, কিন্তু দ্বিতীয় গুলিটি বাহির হইল না। ইতিমধ্যে দার্জিলিং-এর পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ও লাট

সাহেবের দেহরক্ষীর রিভলভারের গুলিতে যুবকটি আহত হইয়া পড়িয়া যায়। ইহার পর সকলে মিলিয়া যুবকটিকে ঝাপটাইয়া ধরিয়া তাহার হাত হইতে রিভলভার কাড়িয়া লয় এবং তাহাকে বাঁধিয়া ফেলে। ইতিমধ্যে এক যুবতী দৌড়াইয়া লাট সাহেবের নিকটবর্তী হয় এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। কিন্তু তাহারও প্রথম গুলিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় এবং দ্বিতীয় বার গুলি করিবার পূর্বেই লাট সাহেবের দেহরক্ষীরা তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার হাত হইতে পিস্তল কাড়িয়া লয় ও তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই সম্পর্কে যাহারা গ্রেপ্তার হয় তাহাদের নাম হইল ভবানী ভট্টাচার্য, উজ্জলা মজুমদার, সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জি ও মনোরঞ্জন ব্যানার্জি। ইহারা সকলেই 'বি. ভি.' দলের সভ্য। ইহাদের লইয়া পরে এক মামলা শুরু হয় এবং মামলার বিচারে ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসী, উজ্জলা মজুমদারের ১৪ বৎসরের দ্বীপান্তর এবং সুকুমার, মধু ও মনোরঞ্জনের ১০ বৎসর করিয়া দ্বীপান্তর-দণ্ড হয়। ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারী ভবানী ভট্টাচার্যের ফাঁসী হয়।

* * * * *

বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান

১৯৩৪ খৃস্টাব্দে উপরোক্ত ঘটনাবলী ব্যতীত কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতি ও ডাকলুট অনুষ্ঠিত হয়। এই বৎসর আরও একটি নূতন আইন পাশ করিয়া পুলিশ ও শাসকদের হস্তে ব্যাপক ক্ষমতা তুলিয়া দেওয়া হয়। সেই আইনের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া বাংলাদেশের অবশিষ্ট বিপ্লবীরাও কারারুদ্ধ হয়। এই ভাবে বাংলাদেশের তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান ঘটে। বাংলাদেশের সাময়িক গভর্ণর স্যার জন উডহেড সদম্ভে পূর্বাপেক্ষা অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘোষণা করিয়া বলেন:

"সন্ত্রাসবাদীরা তাহাদের প্রচেষ্টায় ক্রমাগতভাবে অকৃতকার্য হইয়াছে, আর পুলিশ সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্র একটার পর একটা ব্যর্থ করিতে এবং তাহাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে কৃতকার্য হইয়াছে; প্রত্যেকটি জিলা হইতে ভুরি ভুরি সংবাদ আসিতেছে,...বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ ধরা

পড়িয়াছে। এসবের ফল কি হইতে পারে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। অব্যাহত ও ধারাবাহিক দমননীতি সফল হইয়াছে।”(১)

শাসকগণ ইহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে না পারিয়া ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের পূর্বের ‘বেঙ্গল অর্ডিনান্স’ সংশোধিত আকারে আইন-সভায় পাশ করিয়া আইনে পরিণত করে। এই আইনে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন সমিতি ও ক্লাবগুলিকে বেআইনী ঘোষণা এবং অন্যান্য উপায়ে বৈপ্লবিক সংগঠনের সভ্য সংগ্রহ বন্ধ করিবার ক্ষমতা জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের হস্তে অর্পণ করা হয়। ইহা ব্যতীত, এই আইনের দ্বারা দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র সমূহ দমন এবং যে-কোন ব্যক্তির নিকট রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র পাওয়া যাইবে তাহাকেই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা হয়।

এই ভাবে ১৯৩০ খৃস্টাব্দে বৈপ্লবিক সংগ্রাম শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন আইন ও ‘অর্ডিনান্স’-এর নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া বাংলাদেশের শত শত যুবক বাংলাদেশ ও আন্দামান দ্বীপের জেলখানা ও বন্দী-নিবাস ভরিয়া ফেলে। প্রতি বৎসর শত শত বিপ্লবী কর্মী গ্রেপ্তার হইবার ফলে বৈপ্লবিক সংগ্রামের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। ১৯৩০ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসরের গ্রেপ্তারের একটি মোটামুটী হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

	সংশোধিত ফৌজদারী আইনে	১৮১৮ খৃস্টাব্দের ৩নং আইনে
বৎসর	গ্রেপ্তার ও আটক	গ্রেপ্তার ও আটক
১৯৩০	৪৫৪	×
১৯৩১	৪৫২	১৮
১৯৩২	৯২৭	৩
১৯৩৩	৩৩৩	×
১৯৩৪ (২)	১৬৭	×
মোট	২৩৩৪	২১

(১) “India in 1933-34.”

(২) ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত হিসাব ‘Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, 1933-34, Vol. II’ হইতে এবং ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের হিসাব সরকারী রিপোর্ট “India in 1933-34” হইতে গৃহীত।

এই ভাবে শাসকদের দমননীতির প্রচণ্ড আঘাতে দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের বৈপ্লবিক সংগ্রাম—বাংলাদেশের তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা—অবশেষে একদিন স্তব্ধ হইয়া আসে। বিদেশী শাসনের কবল হইতে দেশ-মাতৃকার পূর্ণ মুক্তির জন্য বাংলার বিপ্লবীরা দলে দলে ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেয়, অসহ্য কারা-যন্ত্রণা হাসিমুখে বরণ করে, কিন্তু তাহারা বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সহিত আপস বা রক্তাক্ত সংগ্রামের ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবার কথা চিন্তাও করিতে পারে নাই। অবশেষে বাংলাদেশের তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান হয় বটে, কিন্তু বিপ্লবীদের মৃত্যুঞ্জয়ী আত্মত্যাগের আদর্শ ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি অপরাজেয় হইয়া থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়

উত্তর-ভারতে তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯২৮-৩৪ খৃস্টাব্দ)

'হিন্দুস্থান সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী সংঘ'

কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলার পর

১৯২৩ খৃস্টাব্দে যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ বকসী, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিস্মিল, শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল প্রভৃতি বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের চেষ্টায় যুক্তপ্রদেশে 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সংঘ' নামক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান গঠিত হইবার পর উহার শাখা-প্রশাখা সারা উত্তর-ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছিল। ১৯২৫ খৃস্টাব্দেই যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন শহরে এবং যুক্তপ্রদেশের বাহিরে পাঞ্জাবে, বিহারে, মাদ্রাজে ও মধ্য প্রদেশে এই সংগঠনের শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তারপর ১৯২৫ খৃস্টাব্দের বিখ্যাত 'কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা'র সময় এই সংগঠনের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় কর্মী গ্রেপ্তার হইবার ফলে এই বিরাট সংগঠনের মূলকেন্দ্র স্বরূপ যুক্তপ্রদেশের সংগঠন এবং অন্যান্য প্রদেশের সংগঠনও ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়। ব্যাপক গ্রেপ্তার, খানাতল্লাস,

উৎপীড়ন প্রভৃতির ফলে সংঘের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে চরম হতাশ দেখা দেয় এবং উহা সারা যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়ে। 'কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা'র পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করিয়া 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সংঘ'-এর অন্যতম কর্মী অজয়কুমার ঘোষ বলেন:

"আমাদের নেতারা কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বন্দী হ'লেন। ধর-পাকড়, খানাতল্লাস, গ্রেপ্তার, সন্দেহভাজনদের নিগ্রহ, এই সব শাসনের নমুনা হ'য়ে দাঁড়াল। এই ধর-পাকড়ের ফলে আমার স্বপ্ন চুরমার হ'য়ে গেল। যাঁরা একদিন আমাদের মতবাদের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল, তাঁরা এবার আমাদের এড়িয়ে চলতে শুরু ক'রলেন। কানপুরে আমাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যায়ামাগার ছেড়ে ছেলেরা একে একে চ'লে গেল। কারণ, আমাদের বিপ্লবীদলের কর্মী-সংগ্রহের কেন্দ্র হিসাবে ব্যায়ামাগারের উপর পুলিশের দৃষ্টি পড়েছিল। গোটা প্রদেশটাই আশঙ্কায়, ভয়ে তখন অভিভূত হয়ে পড়েছে।" (১)

সারা যুক্তপ্রদেশব্যাপী গ্রেপ্তার এড়াইয়া সংঘের দুই-এক জন নেতৃস্থানীয় কর্মী আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চন্দ্রশেখর আজাদ ছিলেন তাঁহাদের একজন। পুলিশ 'কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে চন্দ্রশেখরকে সারা যুক্তপ্রদেশে প্রাণপণে খুঁজিয়াও তাঁহার কোন সন্ধান পাইল না। চন্দ্রশেখর জানিতেন যে, গ্রেপ্তার হইলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড অনিবার্য। তিনি ইহাও জানিতেন যে, তাঁহার গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে সংঘ ও উত্তর-ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ অন্ততঃ দীর্ঘ কালের জন্য অন্ধকারে ডুবিয়া যাইবে। তাই সংঘ ও বিপ্লবের ভবিষ্যৎকে বাঁচাইবার জন্যই চন্দ্রশেখর অতি সতর্কতার সহিত গ্রেপ্তার এড়াইয়া চলেন।

কিন্তু তিনি গ্রেপ্তার এড়াইবার জন্য নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন না, 'কাকোরী ষড়যন্ত্র-মামলা' শেষ হইবার পূর্বেই আবার সংঘের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। তিনি তাঁহার সহকর্মীরূপে যাঁহাদের পাইলেন তাঁহারা কেহই পুরাতন বা অভিজ্ঞ লোক নহেন, তাঁহারা সকলেই বয়সে নবীন এবং

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎসিং ও তাঁর সহকর্মীরা', পৃঃ ৫।

সকলেই কলেজের ছাত্র। চন্দ্রশেখর এই নবীন কর্মীদের লইয়া ১৯২৬ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকেই সংঘের পুনর্গঠনের কাজ শুরু করেন। চন্দ্রশেখরের এই নূতন সহকর্মীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইলেন ভগৎ সিং, মহাবীর সিং, কিশোরীলাল, জয়গোপাল, শিববর্মা, হংসরাজ বোরা, রাজগুরু, শুকদেব, বিজয় সিং, জয়দেব কাপুর, ডাঃ গয়াপ্রসাদ ও বটুকেশ্বর দত্ত। পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের এই তরুণ বিপ্লবীরা অভিজ্ঞ বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদের যোগ্য নেতৃত্বে সারা উত্তর-ভারতব্যাপী এক বিপ্লবের আয়োজনে আত্মনিয়োগ করেন।

এই সকল কর্মীদের লইয়া 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সংঘ'-এর একটি কেন্দ্রীয় কমিটি এবং কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে প্রত্যেক প্রদেশে একটি করিয়া প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়। তারপর প্রাদেশিক কমিটির অধীনে প্রত্যেক জিলায় একটি করিয়া জিলা-কমিটিও গঠিত হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হইলেন ভগৎ সিং, আর যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদক হন শিব বর্মা। ইহারা কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যরূপে কেন্দ্রীয় কমিটির কাজ এবং নিজ নিজ প্রদেশের প্রাদেশিক কমিটির সম্পাদকের কাজ একই সঙ্গে চালাইতে থাকেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদকরূপে সংঘের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন চন্দ্রশেখর আজাদ।

কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রাদেশিক কমিটিগুলির চেষ্টায় বিভিন্ন প্রদেশের জিলায় জিলায় সংঘের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। সংঘের সভ্যগণ স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সংঘের দিকে আকর্ষণ করিয়া বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার জন্য বিভিন্ন স্থানে বহু প্রকাশ্য সমিতি স্থাপন করে। ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্মীরা একত্রে মিলিয়া পাঞ্জাবে এই ধরনের একটি সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতিটি 'নওজোয়ান ভারত সভা' নামে সারা পাঞ্জাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। "সোসালিস্ট মতবাদ এবং বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী প্রচারের জন্যই তরুণদের নিয়ে এই সমিতির সৃষ্টি হয়েছিল। সন্ত্রাসবাদী দলের কর্মী সংগ্রহের কেন্দ্রও ছিল এটি। এই সমিতি কয়েক বছরে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং পাঞ্জাবী তরুণদের বিপ্লবী দীক্ষাও এই সমিতি থেকেই দেওয়া হ'ত।" (১)

---

(১) অজয়কুমার ঘোষ : 'ভগৎসিং ও তাঁর সহকর্মীরা' (অনুবাদ), পৃঃ ৬।

১৯২৮ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা-কংগ্রেসের সময় সংঘের তরফ হইতে ভগৎ সিং কলিকাতায় আসিয়া বাংলাদেশের নবীন বিপ্লবীদের '(রিভোল্ট গ্রুপ'-এর) সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁহারা সকলে মিলিয়া ভারতব্যাপী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন।

এই সময় 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সংঘের' পুরাতন সভ্য যতীন্দ্রনাথ দাস সংঘের যোগাযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দক্ষিণ-কলিকাতায় থাকিয়া বাংলা-দেশের 'রিভোল্ট গ্রুপ'-এর সহিত মিলিতভাবে বিপ্লব-প্রচেষ্টা শুরু করিয়াছিলেন। ভগৎ সিং যতীন দাসকে উত্তর-ভারতে গিয়া সংঘের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদান করিতে আহ্বান করেন। যতীন্দ্রনাথ এই আহ্বানে সাড়া দেন। তিনি বাংলার বিপ্লবীদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং তাহাদের ও উত্তর-ভারতের বিপ্লবী-দের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ভার লইয়া যুক্তপ্রদেশে চলিয়া যান এবং উত্তর-ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদান করেন।

১৯০৪ খৃস্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ দাসের জন্ম হয়। পাঠ্য অবস্থাতেই ১৯২০ খৃস্টাব্দে তিনি গান্ধীজীর অসহযোগ-আন্দোলনে যোগদান করিয়া দুইবার অল্প মেয়াদের কারাদণ্ড ভোগ করেন। এই সময়েই তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯২৩ খৃস্টাব্দে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া তিনি তরুণ বিপ্লবী বিনয় রায় প্রভৃতির সহিত একযোগে দক্ষিণ-কলিকাতার বিখ্যাত তরুণ সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে তিনি দক্ষিণ-কলিকাতা কংগ্রেস-কমিটির সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৫ খৃস্টাব্দে পুনরায় বৈপ্লবিক সংগ্রাম সুরু হইলে যতীন্দ্রনাথ বিশেষ আইনে গ্রেপ্তার হন। তাঁহাকে বহু দিন পাঞ্জাবের মিনওয়ালী জেলে আটক রাখা হয়। এই জেলে আটক থাকা কালেই তিনি উত্তর-ভারতের, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের ভগৎ সিং প্রভৃতি বিপ্লবীদের সহিত পরিচিত হন এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহার বৈপ্লবিক যোগাযোগ গড়িয়া উঠে। ১৯২৮ খৃস্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি আবার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন।

আদর্শের সংঘাত

সংঘের পুনর্গঠনের কাজ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এক নূতন আদর্শ সংঘের সভ্যদের চিন্তাধারা প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিতে থাকে। ইতিপূর্বেই সমাজবাদী ভাবধারা ভারতবর্ষের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে শুরু করিয়াছিল। সংঘের সভ্যদের মধ্যেও সমাজবাদী ভাবধারা প্রভাব বিস্তার করে এবং তাহা লইয়া সভ্যদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও পড়াশুনা চলিতে থাকে। কিন্তু সংঘের সভ্যদের মধ্যে এই নূতন আদর্শ লইয়া আলাপ-আলোচনা চলিলেও সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থায় তাহাদের বিশ্বাস কিছুমাত্র শিথিল হইল না। তবে কর্মপন্থা যাহাই হউক না কেন, বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদের পর ভারতবর্ষে সমাজবাদী আদর্শে রাষ্ট্র গঠন সম্পর্কে তাহাদের মধ্যে কোন দ্বিমত ছিল না।

সংঘের মধ্যে কিভাবে নূতন সমাজবাদী আদর্শ প্রভাব বিস্তার করে এবং কিভাবে পুরাতন সন্ত্রাসবাদী আদর্শের সহিত নূতন সমাজবাদী আদর্শের সংমিশ্রণ ঘটে সেই সম্পর্কে সংঘের অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য এবং ভগৎসিং, চন্দ্রশেখর আজাদ প্রভৃতির সহকর্মী অজয়কুমার ঘোষ বলেন :—

"......সোসালিস্ট প্রচার-সাহিত্য তখন এদেশে আসতে শুরু করেছে। নভেম্বর-বিপ্লবের সফলতা, রুশিয়ায় সোসালিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, তুরস্ক এবং চীনে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েটের সাহায্য প্রদান—এই নতুন সোসালিস্ট স্টেট আর তার মতবাদের প্রতি প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ল।

"ইতিমধ্যে আর একটা ঘটনা ঘটল, আর সেটি ঘটল আমাদের দেশেই। তখন তার তাৎপর্য আমরা ঠিক বুঝ্‌তে পারিনি, অস্পষ্ট অনুমান করেছিলাম মাত্র। দেশ তখন শান্ত, অবসাদে ডুবে গেছে, ঠিক এই সময়ে বোম্বাইতে 'গিরনী কামগর য়ুনিয়ন'-এর পরিচালনায় এক বিরাট ধর্মঘট শুরু হ'ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে কলিকাতা ও কানপুরেও ধর্মঘট-সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল। দেশ সজাগ হয়ে উঠ্‌ল।

"আমাদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, জাতিকে জাগিয়ে তুলতে হ'লে জনগণের শত্রুর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ—সশস্ত্র বিদ্রোহ—একান্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু একথাও মনে হ'ত, সন্ত্রাসবাদ আমাদের স্বাধীনতার পথে নিয়ে যেতে পারবে না। তাই আমাদের মধ্যে মাঝে মাঝে প্রশ্ন উঠ্‌ত, সন্ত্রাসবাদ-অনুপ্রাণিত এই আন্দোলনকে কোন্ পথে চালিত ক'রে এই সুষ্ঠু শাসন-পদ্ধতিতে গিয়ে উত্তীর্ণ হব। বৃটিশ-শাসন বাতিল ক'রে সেখানে আমরা কোন পদ্ধতিকে স্থান দেব? আমাদের সে প্রশ্ন যদিও তখন ছিল অস্পষ্ট, কিন্তু দলের ভিতর তখন তা' সকলের মুখেই শোনা যেত।" ( )

'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'

সংঘের মধ্যে এই আদর্শের সংঘাত ক্রমশঃ প্রবল আকারে দেখা দেয় এবং সংঘের সভ্যদের মধ্যে সমাজবাদী আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু সংঘের সভ্যগণ তখনও সন্ত্রাসবাদের প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। তাই তাহারা সমাজবাদের সহিত সন্ত্রাসবাদের সমন্বয় সাধন করে। তাহারা সমাজবাদ গ্রহণ করে আদর্শ হিসাবে, আর সন্ত্রাসবাদ হইল তাহাদের কর্মপন্থা। তাহারা এইভাবে দুই পরস্পর-বিরোধী আদর্শ ও কর্মপন্থার সমন্বয় সাধন করিয়া তাহাই অনুসরণ করিতে থাকে।

"আমাদের সর্বপ্রথম প্রশ্ন, স্বাধীনতা আর সোসালিজ্‌ম্-এর জন্য কি উপায়ে আমরা যুদ্ধ করবো......? আমাদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত সশস্ত্র বিদ্রোহ হচ্ছে এখন একমাত্র উপায়। এ ছাড়া আর কোন উপায়েই নিয়মতন্ত্রের মোহ ভাঙবে না, দেশও ভীতি থেকে মুক্তি পাবে না। সরকারী উপরওয়ালাদের উপর আমাদের এই সুনিয়ন্ত্রিত আক্রমণে যখন দেশের বদ্ধজলায় আলোড়ন শুরু হবে, যখন জনগণের ভীতি দূর হবে, তখনই শুরু হবে আন্দোলন। সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে, তার সশস্ত্র সেনাবাহিনীরূপে আমরা তাকে

(১) অজয়কুমার ঘোষ: "ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা", পৃঃ ৫-৬।

সোসালিজ্‌ম্‌-এর যুদ্ধে রূপান্তরিত করব। জন-আন্দোলনের সহায়তা করে আমরা সফল হব। আমাদের সফলতা গড়ে তুল্‌বে স্বাধীন ভারত, সমাজবাদী ভারত।" (১)

সুতরাং সংঘের সভ্যগণ স্থির করিলেন, সন্ত্রাসবাদী পন্থায় সশস্ত্র বিদ্রোহের দ্বারা বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া ভারতবর্ষে সমাজবাদী আদর্শে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে। এই সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সংঘের পুরাতন নামের পরিবর্তন করা হইল। এত দিন সংঘের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে সাধারণ-তন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাই হইল এবার সংঘের উদ্দেশ্য। তাই এই উদ্দেশ্যের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সংঘের নূতন নাম হইল 'হিন্দুস্থান সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী সংঘ' (Hindusthan Socialist Republican Association).

কর্মপন্থা সম্পর্কে 'হিন্দুস্থান সাধারণতন্ত্রী সংঘ' ও কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য থাকিলেও এই দুই দলের আদর্শের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল বলিয়া কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি সংঘের সভ্যদের গভীর সহানুভূতি ছিল। এই আদর্শের মিল সম্পর্কে সংঘের বিশিষ্ট সভ্য অজয়কুমার ঘোষ বলেন :

"তাদের (কমিউনিস্টদের) মতই আমরা সাম্রাজ্যবাদকে ঘৃণা করতাম, নিয়মতন্ত্রের মোহ আমাদের ছিল না, তাদেরই মত সোজাসুজি স্বাধীনতা আদায় করার পক্ষপাতী ছিলাম আমরা। সোসালিজ্‌ম্‌-এর প্রচেষ্টাতেও আমরা ছিলাম একমত।"

স্যাণ্ডার্স হত্যা

১৯২৮ খৃস্টাব্দে দেশব্যাপী জাতীয় আন্দোলনের ঝড় উঠিতে থাকে। ঐ বৎসর 'সাইমন কমিশন' বর্জন উপলক্ষে দেশের সর্বত্র এক বিরাট আন্দোলন শুরু হয়। পাঞ্জাবে লালা লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে এই আন্দোলন প্রবল আকার

(১) অজয়কুমার ঘোষ: "ভগবৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা", পৃঃ ৮।

ধারণ করে। এক সভায় বক্তৃতা দিবার সময় পুলিশ ভারতের এই সর্বজনমান্য নেতা লালাজীকে লাঠিদ্বারা অমানুষিকভাবে প্রহার করে সেই প্রহারের ফলেই এই বৃদ্ধ জন-নেতার মৃত্যু হয়। লালাজীর মৃত্যু সারা ভারতের, বিশেষ করিয়া পাঞ্জাবের যুবশক্তিকে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য পাগল করিয়া তোলে। লালা লাজপৎ রায় ও সভাস্থ জনসাধারণের উপর যে পুলিশদল লাঠি চালনা করে সেই পুলিশদলের পরিচালক ছিল লাহোরের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পুলিশ-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডার্স সাহেব। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা স্যাণ্ডার্স সাহেবকে হত্যা করিয়া এই বর্বরসুলভ লাঠি-চালনার প্রতিশোধ গ্রহণের সিদ্ধান্ত করে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯২৮ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভগৎ সিংহের গুলিতে স্যাণ্ডার্স নিহত হয়। স্যাণ্ডার্স-হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ ও দিল্লীর সংঘের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ পূর্ণোদ্যমে শুরু হইয়া যায়।

কেন্দ্রীয় পরিষদে বোমা

১৯২৮ খৃস্টাব্দে সারা ভারতবর্ষে শ্রমিক-ধর্মঘটের জোয়ার বহিতে থাকে। বোম্বাইয়ের 'গিরনী কামগর য়ুনিয়ন'-এর নেতৃত্বে দেড় লক্ষ শ্রমিক দীর্ঘ ছয় মাস পর্যন্ত ধর্মঘট চালাইয়া শ্রমিক-সংগ্রামের এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের চটকল-শ্রমিক ও কানপুরের সূতাকল-শ্রমিকদের অভূতপূর্ব ধর্মঘট-সংগ্রাম শাসকদের শঙ্কিত করিয়া তোলে। ভারত-সরকার এই ঐতিহাসিক শ্রমিক-সংগ্রামের পরিচালক কমিউনিস্টদের 'পেজাণ্ট এণ্ড ওয়ার্কার্স পার্টি'কে দমনের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে সারা ভারতবর্ষে কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার শুরু হয়। কমিউনিস্টদের প্রতি সহানুভূতিশীল 'হিন্দুস্থান সমাজবাদী সাধারণতন্ত্রী সংঘ'-এর কর্মীরা কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারকে নিজেদের উপর আক্রমণ বলিয়া ধরিয়া লয়।

"......দেশময় কমিউনিস্ট-কর্মীদের গ্রেপ্তার বিপ্লবী আন্দোলনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি বলেই আমাদের কাছে মনে হ'লো। এ যে ক্রমে আমাদের মতবাদের উপরেই সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ শুরু হ'লো! এমন এক আন্দোলনের

উপর তারা আঘাত করেছে যার প্রতি আমাদের আছে সহানুভূতি, যার সঙ্গে আমাদের আছে প্রাণের যোগ।" (১)

ভগৎ সিং প্রভৃতি সংঘের নেতৃবৃন্দ স্থির করিলেন, সাম্রাজ্যবাদের এই আক্রমণের প্রতিবাদ করিতে হইবে, সেই প্রতিবাদ হইবে এমন প্রতিবাদ যাহা সমগ্র দেশকে জাগাইয়া তুলিবে; সেই প্রতিবাদ সারা দেশের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশময় প্রতিবাদের ঝড় তুলিবে। কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরেই ভারতের ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-আন্দোলন দমন করিবার উদ্দেশ্যে ভারত-সরকার কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদে কুখ্যাত 'ট্রেড ডিসপিউট বিল' পাশ করিয়া লয়। ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্মীরা অবিলম্বে তাঁহাদের ঐতিহাসিক প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সিদ্ধান্ত করেন। 'ট্রেড ডিসপিউট বিল' পাশ হইবার কয়েক দিন পরেই এক-দিন ভগৎ সিং ও তাঁহার অন্যতম সহকর্মী বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদের অধিবেশনকালে পরিষদ-গৃহে একটি বোমা নিক্ষেপ করেন। বোমাটি সশব্দে ফাটিয়া গিয়া পরিষদ-গৃহে ভীষণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার হন। কয়েকদিন পরেই তাঁহারা উভয়ে একত্রে একটি লিখিত বিবৃতি দিয়া তাঁহাদের বোমা-নিক্ষেপের কারণ দেশ-বাসীদের জানাইয়া দেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাহাদের লইয়া 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয় এবং বিচারে তাঁহারা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত হন।

লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা

পরিষদে বোমা-বিস্ফোরণের কয়েকদিন পরেই পুলিশ লাহোরে একটি বিরাট বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এই কারখানাটিতে নাকি প্রায় সাত হাজার বোমার খোল ও সম পরিমাণ মাল-মসলা পাওয়া যায়। এই সম্পর্কে সুখদেও, কিশোরীলাল প্রভৃতি সংঘের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মী গ্রেপ্তার হন। ইহাদের

---

(১) অজয়কুমার ঘোষ : 'ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা' (অনুবাদ), পৃঃ ৯।

মধ্যে সংঘের নেতৃস্থানীয় কর্মী জয়গোপাল ও হংসরাজ ভোরা গ্রেপ্তার হইবামাত্র পুলিশের নিকট সংঘের সকল তথ্য, সকল বিশিষ্ট কর্মীদের নাম ও ঠিকানা ফাঁস করিয়া দেয়। এবার সারা উত্তর-ভারত জুড়িয়া পূর্ণোদ্যমে গ্রেপ্তার শুরু হয়। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের মে মাসে পুলিশ যুক্তপ্রদেশের সাহারানপুরে একটি বিরাট বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এই কারখানায় সংঘের প্রধান নায়কদের তিনজন—শিব বর্মা, ডাঃ গয়াপ্রসাদ ও জয়দেব কাপুর—গ্রেপ্তার হন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও দিল্লীর প্রায় অধিকাংশ নেতা ও কর্মী গ্রেপ্তার হন, যাঁরা বাকী রহিলেন তাঁহারা বৈপ্লবিক আন্দোলন চালাইবার জন্য আত্মগোপন করিলেন। যাঁহারা গ্রেপ্তার হইলেন তাঁহাদের মধ্যে সাতজন রাজসাক্ষী হন। এই সাতজনের মধ্যে দুইজন ছিলেন সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য।

পরিষদে বোমা নিক্ষেপের অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তকেও 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে বিচারের জন্য লাহোরে লইয়া আসা হয়। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'র প্রথম শুনানি আরম্ভ হয়। তখন মামলার আসামী ছিলেন তেরজন। বিচার শুরু হইবার পর আরও অনেকে গ্রেপ্তার হন। বিজয় সিং ও রাজগুরুকে পরে ভিসাভাই নামক স্থানে গ্রেপ্তার করা হয়। যাঁহাদের লইয়া বিখ্যাত 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয় তাঁহাদের মধ্যে ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত, শিব বর্মা, যতীন্দ্রনাথ দাস, রাজগুরু, বিজয় সিং, শুখদেব, ডাঃ গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর, কিশোরীলাল, অজয় ঘোষ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুলিশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চন্দ্রশেখর আজাদ তখনও আত্মগোপন করিয়া বাহিরের বিপ্লব-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

ঐতিহাসিক প্রায়োপবেশন

'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হইবার পূর্বেই পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি সুব্যবহারের দাবি লইয়া ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর

দত্ত জেলের মধ্যে অনশন শুরু করেন। মামলা শুরু হইবার পর অন্যান্য বন্দীরাও রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ শ্রেণী-ভাগ, ভাল খাদ্য, সংবাদপত্র-সরবরাহ, বই ও লেখাপড়ার ব্যবস্থার দাবি লইয়া ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্তের সহিত প্রয়োপবেশনে যোগ দেন। পুলিশ ও জেল-কর্তৃপক্ষের অত্যাচার-অবিচার প্রতিকারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা লইয়া বন্দীরা অনশন-ধর্মঘট চালাইতে থাকেন। জেল-কর্তৃপক্ষ চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে বন্দীদের বল প্রয়োগ করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করে। তাহার ফলে যতীন দাসের অবস্থা খারাপ হইয়া পড়ে। কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি অজ্ঞান হইয়া থাকেন। জ্ঞান হইবার পর দেখা গেল, তিনি নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। কিন্তু সেই অবস্থাতেও যতীন্দ্রনাথ অনশন-ধর্মঘট ভঙ্গ করিতে, এমন কি ঔষধ-পথ্য গ্রহণ করিতেও রাজী হইলেন না। তিনি কেবল একটা কথা বলিলেন—I shall stick to the last (আমি শেষ পর্যন্ত অনশন-ধর্মঘট চালাইব)। যতীন্দ্রনাথের পর শিব বর্মার অবস্থা খারাপ হইয়া পড়িল, তারপর আরও অনেকেরই জীবন-সংশয় হইয়া উঠিল। মামলা মুলতুবী রহিল।

এদিকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনশন-ধর্মঘট চলিলেও নিষ্ঠুর সরকার বন্দীদের দাবি মানিয়া লইল না। অন্যদিকে বিপ্লবী বন্দীদের জীবন-রক্ষার জন্য বাহিরে গণ-আন্দোলনের ঝড় উঠিল, সরকারের অনমনীয় মনোভাবের বিরুদ্ধে ভারত-ব্যাপী জনগণের ক্রোধ ফাটিয়া পড়িতে লাগিল, সভা-শোভাযাত্রায় ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়া উঠিল। ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতের বিভিন্ন জেলের রাজনৈতিক বন্দীরাও লাহোরের অনশনকারী বন্দীদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া অনশন-ধর্মঘট শুরু করে। মীরাট ষড়যন্ত্র-মামলার বন্দীরাও এই ধর্মঘটে যোগদান করেন। দেখিতে না দেখিতে সারা পৃথিবীতে এই অনশনের সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল, ভারতের বীর বিপ্লবী যোদ্ধাদের এই ঐতিহাসিক সংগ্রামের প্রতি সারা দুনিয়ার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল।

বন্দীদের অনশন-ধর্মঘট দীর্ঘ দুইমাস অতিক্রম করিল, অনশনকারীদের অবস্থা প্রতিদিন খারাপ হইতে লাগিল। তখন তাহাদের মধ্যে মৃত্যু-

প্রতিযোগিতা শুরু হইয়া গিয়াছে—কে কাহার আগে মরিবে। বন্দীদের অনমনীয় দৃঢ়তা ও বাহিরের গণ-আন্দোলনের চাপে সরকার অবশেষে নতি স্বীকার করে। জেলের নিয়ম-কানুন বদলাইবার জন্য বেসরকারী লোক লইয়া একটি তদন্ত-কমিটি গঠিত হয়। বন্দীদের অধিকাংশ দাবিই মানিয়া লওয়া হইবে—এই আশ্বাসে বন্দীরা অবশেষে অনশন-ধর্মঘট ভঙ্গ করেন।

যতীন দাসের মৃত্যু

যতীন দাস তখন মৃত্যু-শয্যায়। বিপ্লবী বন্দীদের ঐতিহাসিক অনশন-সংগ্রাম অবশেষে জয়লাভ করিল। এই জয়ের জন্য যিনি সর্বাধিক ত্যাগ স্বীকার করিলেন তিনি তাহার ফল ভোগ করিতে পারিলেন না। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সময়ে যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন অজয়কুমার ঘোষ তাহাদের অন্যতম। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু সম্পর্কে তিনি তাঁহার পুস্তিকায় বলেন:

"যতীন দাসের তখন আর বাঁচবার আশা নেই। সে কথা বল্‌তে পারে না, কানেও শুন্‌তে পায় না—এমনি তাঁর অবস্থা। তখন বার বার মনে হ'ত, হায়, জয়লাভ আমরা করেছি, কিন্তু এই জয়লাভের জন্য যে সব চাইতে বেশী ত্যাগ স্বীকার করল, সে তো তার ভাগ পাবে না!

"শেষ দিনের কথা মনে পড়ে, মৃত্যু-শয্যায় সে শুয়ে আছে। তাঁকে ঘিরে বসে আছি আমরা। গলায় কি যেন একটা ঠেলে উঠ্‌ছিল, অব্যক্ত এক কান্না যেন গুমরে মরছিল। সে চলে গেল, মুখ তুলে তাকালাম। জেলের নির্দয় কর্তৃপক্ষের চোখ দিয়েও জল ঝরছিল। তাঁর মৃতদেহ জেলের ফটকের বাইরে নিয়ে গেল, সেখানে জমে উঠ্‌ছিল বিরাট জনতা। লাহোরের পুলিশ স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট হ্যামিল্‌টন হার্ডি সেই জনতার সুমুখে টুপি খুলে ভক্তিভরে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন তাঁকে—যাঁর কাছে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সমস্ত শক্তি পরাজয় স্বীকার করেছে।" (১)

---

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা' (অনুবাদ), পৃঃ ২১।

বৃটিশ-শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে ৬৩ দিন অনশনে থাকিয়া বীর বিপ্লবী যতীন দাস মৃত্যু বরণ করিলেন। মৃত্যু তাঁহাকে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিল। বিপ্লবীরা বৃটিশের কারাগারকেও সংগ্রামের ক্ষেত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেশের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের চেতনা জাগাইয়া তোলাই ছিল সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্য। যতীন্দ্রনাথ আত্মোৎসর্গ করিয়া সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিয়া গেলেন। তাঁহার মৃত্যু দেশের মর্মমূলে এক নূতন চেতনা জাগাইয়া সারা দেশকে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিল।

লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলার বিচার

রাজনৈতিক বন্দীরা যে প্রতিশ্রুতিতে অনশন ভঙ্গ করিয়াছিলেন সরকার তাহা পালন করিল না। সুতরাং দাবি আদায় করিবার জন্য তাঁহাদের আরও দুইবার অনশন করিতে হয়।

এদিকে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নয় মাস ধরিয়া বিচার চলিবার পর হঠাৎ একদিন বিচারের পালা শেষ হইয়া গেল। এই মামলা লইয়া সরকার তখন ভীষণ বিপদে পড়িয়াছিল, কারণ উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে মামলাটি তখন ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। লাহোরের সহকারী পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ফার্ণ সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলেও তিনি স্যাণ্ডার্স সাহেবের হত্যাকারী ভগৎ সিংকে সনাক্ত করিতে পারেন নাই। বন্দীদের বীরত্বপূর্ণ অনশন-সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়া কয়েকজন প্রধান সাক্ষী বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করে এবং রাজসাক্ষীদের মধ্যে দুইজন তাহাদের স্বীকারোক্তি প্রত্যাহার করে।

এইভাবে যখন মামলাটি ফাঁসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন সরকার "জরুরী প্রয়োজনে" এবং "শান্তি ও নিরাপত্তা"র অজুহাতে '১৯৩০ খৃস্টাব্দের লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা অর্ডিনান্স' নামে এক উদ্ভট আইন প্রয়োগ করে। ইহার ধারাগুলি এতই অদ্ভুত যে, কোন সভ্য সরকারের পক্ষে ইহা চিন্তা করাও অসম্ভব। এই

[অর্ড]িনান্স অনুসারে এই মামলার বিচারের ভার এক স্পেশাল ট্রাইবুনালের [উ]পর দেওয়া হয়। ট্রাইবুনালের বিচারের সময় আসামীদের উপস্থিত না থাকিলেও চলিবে, আসামী-পক্ষের সাক্ষী ও উকিলেরও দরকার হইবে না। এই ট্রাইবুনালের হস্তে যে-কোন দণ্ড, এমন কি প্রাণদণ্ডের ক্ষমতাও ন্যস্ত হয়। এই আইনে ট্রাইবুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আসামীদের আপীল করিবার অধিকারও হরণ করা হয়। ইহা ব্যতীত বন্দীদের উপর নির্মম অত্যাচার শুরু হয়। একদিন আদালতের মধ্যেই পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালায়। এই অন্যায়ের প্রতিবাদে ট্রাইবুনালের একমাত্র ভারতীয় সদস্য আগা হায়দর সাহেব এক বিবৃতি দিলে তাঁহাকে টাইবুনাল হইতে বহিষ্কৃত করা হয়।

এইভাবে চারি মাস ধরিয়া ট্রাইবুনালের বিচারের প্রহসন চলিবার পর ১৯৩০ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসের গোড়ার দিকে মামলার রায় বাহির হয়। রায়ে ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেবের প্রাণদণ্ড; শিব বর্মা, ডাঃ গয়াপ্রসাদ, জয়দেব কাপুর, কিশোরীলাল প্রভৃতি সাত জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও অন্যান্যদের দীর্ঘ কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কয়েকজন প্রমানাভাবে মুক্তি লাভ করেন, অজয় ঘোষ তাঁহাদের মধ্যে একজন।

ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের ফাঁসী

বৃটিশ-শাসকগণ প্রতিহিংসার বশে উন্মত্ত হইয়া একটা বিচারের অভিনয় করিয়া ভগৎ সিং ও তাঁহার দুইজন সহকর্মীকে ফাঁসী দিয়া হত্যা করিবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু এতদিনে ভগৎ সিংকে সমগ্র দেশের জনসাধারণ তাহাদের আদর্শ বীর সন্তান বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে, মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়স্ক এই বিপ্লবী যুবকের বীর মূর্তি সারা দেশের যুবকদের হৃদয়ের মনি কোঠায় চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। ভগৎ সিং-এর সহকর্মী অজয় ঘোষ মুক্তিলাভ করিয়া বাহিরে আসিবামাত্র তাহা প্রত্যক্ষ করেন। তিনি বলেন :—

"বাইরে এসে সেদিন বুঝতে পারলাম, ভগৎ সিংয়ের মূল্য আমাদের দেশের কাছে কতখানি। তখনকার দিনে যত সভা হ'ত সেখানে আকাশ-বাতাস

কাঁপিয়ে শ্লোগান উঠত "ভগৎ সিং জিন্দাবাদ"। ভগৎসিংই প্রথম "ইনক্লাব জিন্দাবাদ" শ্লোগানের প্রবর্তন করেন। তখন থেকে আমাদের জাতীয় আন্দোলনে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনির পরিবর্তে এই শ্লোগানেরই প্রচলন শুরু হয়। ভগৎ সিংয়ের নাম তখন লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে শোনা যেত, প্রতি যুবকের বুকে আঁকা ছিল তাঁহারই মূর্ত্তি। আমার বুক আনন্দে ও গর্বে ভরে যেত যখন ভাবতাম, এমন একজন লোকের সহকর্মী ছিলাম আমি, যাঁকে আমি চিনতাম।" (১)

ট্রাইবুনালের বিচারে ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীদের ফাঁসীর আদেশ হইলেও এই আদেশের বিরুদ্ধে সারা দেশব্যাপী যে আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহার ফলে সকলেই মনে করিয়াছিল যে, সরকার কিছুতেই তাঁহাদের ফাঁসী দিতে সাহস করিবে না, এবং কংগ্রেস-নেতারাই তাঁহাদের প্রাণ বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিবেন। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধী ও বড়লাট লর্ড আরুইন-এর মধ্যে এক চুক্তির শর্ত লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। সেই সকল শর্তের মধ্যে একটি বিষয় ছিল দেশের রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান। সকলেই আশা করিয়াছিল যে, ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা মুক্তি না পাইলেও তাঁহাদের প্রাণদণ্ড মকুব হইবেই। কিন্তু গান্ধীজী ও অন্যান্য জাতীয় নেতারা চাহিলেও বড়লাট তাঁহাদের মুক্তি দিতে রাজি হইলেন না। ইহা ব্যতীত বিপ্লবীরা হিংসায় বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া গান্ধীজীও তাঁহাদের মুক্তি বা প্রাণদণ্ড মকুবের জন্য বেশী কিছু করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের বিষয়টি বাদ দিয়াই 'গান্ধী-আরুইন চুক্তি' স্বাক্ষরিত হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই বীর বিপ্লবীদের প্রাণ রক্ষার সকল আশা ফুরাইল।

"১৯৩১ সাল, এপ্রিল মাস, কংগ্রেসের করাচী-অধিবেশনের ঠিক পূর্বে একদিন তাঁদের ফাঁসী হ'য়ে গেল। ভগৎ সিংয়ের বয়স তখন চব্বিশও পূর্ণ হয়নি।

"আমি করাচীর পথে এ সংবাদ পেলাম, যারাই শুনলো, শিশুর মতই কেঁদে উঠল। আমি তো বিমূঢ় হয়ে গেলাম।"

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্মীরা', পৃঃ ২২।

"একটা ধূমকেতুর মত ভগৎ সিং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আকাশে ক্ষণিকের জন্য উদয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁর এই ক্ষণিক উদয় ব্যর্থ হয় নি। কোটি কোটি লোকের দৃষ্টি ছিল তাঁর উপর নিবদ্ধ। তারা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল নূতন ভারতের আত্মার প্রতীক। মরণে নির্ভীক, সাম্রাজ্যবাদী শাসনের উচ্ছেদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল সে। সে চেয়েছিল আমাদের এই দেশে সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে তুল্‌তে এক স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রাকার।" (১)

চন্দ্রশেখর আজাদ

ব্যবস্থা-পরিষদে বোমা-বিস্ফোরণ ও লাহোরে বোমার কারখানা আবিষ্কারের পর যখন চারিদিকে গ্রেপ্তার শুরু হয়, তখন চন্দ্রশেখর পূর্বের বহু বারের মতই এবারেও পুলিশের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া গ্রেপ্তার এড়াইতে সক্ষম হন। লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা সম্পর্কে প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় কর্মী গ্রেপ্তার হইবার ফলে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন' ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছিল। পুরাতন কর্মীদের মধ্যে কেবল বিশ্বম্ভর-দয়াল, কৈলাসপতি, কান্সীরাম, লেখরাম, বিদ্যাভূষণ ও ধন্বন্তরী কোন প্রকারে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে সক্ষম হন। চন্দ্রশেখর এই সকল পুরাতন কর্মীদের সাহায্যে আবার পাঞ্জাব, দিল্লী, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারের ভাঙ্গা দল পুনর্গঠিত করিয়া তুলিলেন।

চন্দ্রশেখর তাঁহার সহকর্মীদের সহিত একত্রে বড়লাটের স্পেশাল ট্রেন ভুঁই-বোমা (মাইন) দিয়া উড়াইয়া দিবার এক পরিকল্পনা করেন। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়লাট সাহেব স্পেশাল ট্রেনে করিয়া ভ্রমণে বাহির হন। বিপ্লবীরা লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলার প্রতিশোধ হিসাবে স্পেশাল ট্রেনখানি উড়াইয়া দিয়া বড়লাটকে হত্যা করিবার আয়োজন করেন। স্পেশাল ট্রেন দিল্লী অতিক্রম করিবার পূর্বেই বড়লাটের গাড়ীর নীচে কয়েকটি ভুঁই-বোমা বিস্ফোরিত হয়। ইহার ফলে ট্রেনখানি [illegible] ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎ সিং ও তাঁর [illegible]

কিন্তু বড়লাট মরিতে মরিতে বাঁচিয়া যান। পুলিশ বুঝিল, চন্দ্রশেখর আজাদ বাঁচিয়া থাকিতে তাহাদের শান্তি নাই। আজদকে ধরিবার জন্য পুলিশ এবার ব্যাপক আয়োজন করে, সারা দিল্লী শহর ঘিরিয়া এক বিরাট জাল ফেলা হয়। কিন্তু এবারেও সুচতুর চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করা পুলিশের পক্ষে সম্ভব হইল না। চন্দ্রশেখর পুলিশের বেড়াজালের ফাঁক দিয়া পলাইয়া লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হন।

চন্দ্রশেখর লাহোরে বসিয়া এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করেন। তখন লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলার বন্দীদের প্রত্যহ জেল হইতে গাড়ীতে করিয়া আদালতে লইয়া আসা হইত। চন্দ্রশেখর পরিকল্পনা করিলেন, আদালতে যাইবার পথে বন্দীদের গাড়ীর উপর বোমা মারিয়া বন্দীদের মুক্ত করিবেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিনি স্বয়ং কয়েকজন সহকর্মীর সহিত একত্রে কয়েকটি বোমা লইয়া বন্দীদের যাতায়াত-পথের উপর অপেক্ষা করিতে থাকেন। যথাসময়ে বন্দীদের গাড়ী আসিল। চন্দ্রশেখর স্বয়ং একটি বোমা নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইবামাত্র তাঁহার হস্তস্থিত বোমাটি ফাটিয়া যায়। চন্দ্রশেখর কোন প্রকারে প্রাণে বাঁচিয়া যান, কিন্তু বন্দীদের উদ্ধার করিবার আয়োজন পণ্ড হয়। চন্দ্রশেখর ও তাঁহার সহকর্মীরা পুলিশের হস্তে ধরা পড়িতে পড়িতে কোন প্রকারে পলাইতে সক্ষম হন এবং পুলিশের চক্ষে ধূলা দিয়া আবার দিল্লীতে আসেন।

দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া এবার চন্দ্রশেখর তাঁহার সহকর্মীদের সহিত একত্রে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয় এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য তাঁহারা দিল্লীর এক ধনী ব্যবসায়ীর অফিসে ডাকাতি করিবার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ৬ই জুলাই চন্দ্রশেখর ও তাঁহার তিনজন সহকর্মী প্রত্যেকে একটি করিয়া পিস্তল লইয়া দিল্লীর চাঁদনী চকের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শেঠ লছমী নারায়ণের গদিতে রাত্রি দশ ঘটিকার সময় হানা দেন। বিপ্লবীরা গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া লোহার সিন্দুকের চাবি আদায় করেন এবং সিন্দুকে রক্ষিত ১৪২০০৲ টাকার নোট লইয়া মোটরযোগে পলায়ন করেন।

এই ডাকাতির সূত্র ধরিয়া দিল্লীর গোয়েন্দা-পুলিশ জানিতে পারে যে, চন্দ্রশেখর তখন দিল্লীতে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করিতেছেন। চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ এক বিরাট আয়োজন করে। পুলিশের উৎপাতে অভ্যুত্থানের আয়োজনে বিলম্ব ঘটিতে থাকিলেও তিনি কাজ চালাইতে থাকেন। কিন্তু আগস্ট মাসের শেষ দিকে তাঁহার পক্ষে দিল্লীতে পলাইয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠায় অগত্যা তিনি দিল্লীর গোয়েন্দা-পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া আবার লাহোরে উপস্থিত হন। ইহার কয়েক দিন পরেই সংঘের দিল্লীর প্রাদেশিক শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মী কৈলাসপতি বহু অস্ত্রশস্ত্রসহ গ্রেপ্তার হন এবং পুলিশ ছয় হাজার বোমার খোল ও প্রচুর মাল-মসলাসহ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে।

চন্দ্রশেখর লাহোরে পৌঁছিয়া দিল্লীর মতই পাঞ্জাবেও একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন। এই আয়োজন তাঁহার আগমনের পূর্ব হইতেই শুরু হইয়াছিল এবং কথা ছিল যে, দিল্লী ও পাঞ্জাবে একই সময়ে অভ্যুত্থান শুরু হইবে। এখন দিল্লীর আয়োজন পণ্ড হওয়ায় চন্দ্রশেখর পাঞ্জাবের প্রচেষ্টা সফল করিয়া তুলিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন।

ইহার পর পাঞ্জাবের জিলায় জিলায় পর পর বোমা ফাটিতে থাকে। বোমার আঘাতে কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী ও ইংরেজ-সাহেব নিহত ও আহত হয়। পুলিশের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে ইহাও চন্দ্রশেখরেরই কাজ। সারা উত্তর-ভারতের পুলিশ চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা শুরু করে। ইহার ফলে চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব না হইলেও পাঞ্জাব ও দিল্লীর বহু বিপ্লবী ধরা পড়ে এবং বহু অস্ত্রশস্ত্র ও কয়েকটি ছোট বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়।

এই গ্রেপ্তারের পর লাহোর ও দিল্লীতে দুইটি নূতন ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হয়। এই মামলা দুইটির একটি 'দ্বিতীয় লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' ও অপরটি 'নূতন দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত। এই সকল মামলাতেও চন্দ্রশেখরকে প্রধান আসামী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা তখনও

সম্ভব হইল না, পুলিশের চক্ষে ধূলি দিয়া তিনি আবার লাহোর হইতে পলায়ন করেন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া তাঁহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরিয়া দিতে পারিলে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হইবে বলিয়া ঘোষণা করে। একদিকে পুলিশ চন্দ্রশেখরকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য ছুটাছুটি করিয়া হয়রান হইতে থাকে, অপর দিকে এই অনমনীয় ও অদ্ভুতকর্মা বিপ্লবী ফাঁসীর দড়ি ও দশ হাজার টাকার পুরস্কার তাচ্ছিল্য-ভরে উপেক্ষা করিয়া সারা উত্তর-ভারত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার ছত্রভঙ্গ দল পুনর্গঠিত করিতে থাকেন।

অজয়কুমার ঘোষ লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা হইতে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসিবার পর চন্দ্রশেখরের সহিত তাঁহার গোপনে সাক্ষাৎ হয়। এই সাক্ষাতের বিবরণ হইতে চন্দ্রশেখরের মনোভাব ও আদর্শগত পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাই এই বিবরণটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"১৯৩০ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে জেল থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর (চন্দ্রশেখরের) সঙ্গে দেখা। তখনও তিনি তেমনি নির্ভীক, তেমনি অনমনীয়। এই অশ্রান্ত বিপ্লব-প্রচেষ্টার ভিতরেও তিনি সময় করে বহু বই পড়ে ফেলেছেন। তাঁর ভাবধারা তখন আর কাঁচা নেই। নিজে তিনি ভালো করে ইংরেজি জান্‌তেন না বলেই অন্য কেহ তাঁকে পড়ে বুঝিয়ে দিত। সোভিয়েৎ য়ুনিয়নকে তখন তিনি গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, সহকর্মীদের সেখানে তিনি শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাবেন।

"কংগ্রেস আর সরকারের মধ্যে সাময়িক শান্তি স্থাপনের গুজব তখন চারিদিকে শোনা যাচ্ছিল। যদিও বিফলতা তাঁকে দমিয়ে দিতে পারে নি, তবু তিনি দলের আর সকলের মতই বুঝ্‌তে পারছিলেন যে, আমরা যা চেয়েছিলাম তা হয় নি, হবে না। তিনি এবং তাঁর সহকর্মীরা আত্মোৎসর্গ ক'রে যে চেষ্টা করেছিলেন, যে আঘাত তাঁরা হেনেছিলেন, তা নিষ্ফল হয়েছে। জাতীয় আন্দোলন বিপ্লবের খাতে প্রবাহিত হয় নি। পেশোয়ার, শোলাপুর আর চট্টগ্রামের ঘটনায় যে আশা আমাদের মনে জেগেছিল, সে আশা অপূর্ণ রয়ে গেল।

"আজাদ তখন এই সব নিয়েই গভীরভাবে ভাবতেন। সন্ত্রাসবাদের প্রতি আস্থা যে তিনি একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলেন তা নয়। কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, কোথায় যেন গোল বেঁধেছে। আত্মোৎসর্গকারী একদল বীর যুবক জাতীয় আন্দোলনকে বিপ্লবের খাতে বইয়ে দিতে পারবে—এই ধারণার কোথায় যেন ভুল থেকে গেছে। তিনি আমার কাছে জান্‌তে চাইলেন, ভগৎ সিং-এর এ সম্বন্ধে মত কি। জেলে আলোচনার ফলে আমরা কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা আবিষ্কার করতে পেরেছি কিনা—তাও তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"তাঁর নিজের মত হ'লো এই : সংখ্যায় যত বেশী সম্ভব কমরেডদের এখন চাষী আর মজুরদের ভিতর গিয়ে তাদের সচেতন ক'রে সোসালিস্ট আন্দোলন গড়ে তুল্‌তে হবে। তিনি এবং অবশিষ্ট কর্মীরা থাক্‌বেন সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত। তাঁরা শিক্ষানবিশদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে আন্দোলনের প্রয়োজন অনুসারে ভবিষ্যতের বিপ্লবের জন্য তৈরী করে রাখ্‌বেন।" (১)

চন্দ্রশেখর এই ভাবেই আবার দল গঠন করিতে শুরু করেন। কিন্তু এবার তিনি বেশীদূর অগ্রসর হইবার সুযোগ পাইলেন না। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে চন্দ্রশেখর লাহোর হইতে পলাইয়া আসিয়া এলাহাবাদে উপস্থিত হন। তখন যুক্তপ্রদেশের দল অন্যান্য প্রদেশের মতই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে, বহু কর্মী গ্রেপ্তার হইয়া কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছে। চন্দ্রশেখর ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশিষ্ট কর্মীদের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেছিলেন। বার বার ব্যর্থতার ফলে যে সকল কর্মী হতাশ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের তিনি বুঝাইয়া আবার সক্রিয় করিয়া তুলিতেছিলেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে এলাহাবাদের এ্যালফ্রেড পার্কে একজন পুরাতন কর্মীর সহিত চন্দ্রশেখরের গোপনে সাক্ষাৎ করিবার কথা ছিল। এই সাক্ষাতের কথা যাহারা পূর্বে জানিত তাহাদের মধ্যে কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া এই সম্পর্কে পুলিশকে সংবাদ দেয়। পুলিশ এই সংবাদ পাইয়া পূর্ব হইতেই ছদ্মবেশে পার্কটিকে

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা' (অনুবাদ), পৃঃ ২৫–২৬।

ঘিরিয়া রাখে। চন্দ্রশেখর নির্দিষ্ট সময়ে পার্কে প্রবেশ করিবামাত্র সশস্ত্র পুলিশ-দল তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে। চন্দ্রশেখরও সশস্ত্র হইয়াই আসিয়াছিলেন। কিন্তু একদিকে চন্দ্রশেখর একাকী আর অন্যদিকে প্রায় এক ডজন সশস্ত্র পুলিশ, তাহা সত্ত্বেও উভয় পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া গুলিবর্ষণ চলে। পুলিশের দুইজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী চন্দ্রশেখরের গুলিতে গুরুতররূপে আহত হইয়া ধরাশায়ী হয়। এই অসমান যুদ্ধে চন্দ্রশেখরের দেহ পুলিশের গুলিতে ক্ষত-বিক্ষত হয়। অবশেষে একটি গুলি চন্দ্রশেখরের মস্তকে লাগে এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে।

এইভাবে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী নায়কদের অন্যতম চন্দ্রশেখর আজাদের কর্মময় জীবনের অবসান হইল। কিন্তু তাঁর দুর্দমনীয় সাহস, তাঁর অনমনীয় ইচ্ছাশক্তি, অদ্ভুত কর্মক্ষমতা সারা উত্তর-ভারতের—সারা ভারতবর্ষের—বিপ্লবী যুবশক্তির প্রতীক হইয়া রহিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের মধ্যে চন্দ্রশেখর চিরস্থায়ী আসন লাভ করিলেন।

উত্তর-ভারতে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ

যুক্তপ্রদেশ

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

১৯৩০ খৃস্টাব্দে চন্দ্রশেখর আজাদ যুক্তপ্রদেশের ঝাঁসী ও কানপুরে কেন্দ্র স্থাপন করিয়া 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর কার্য পরিচালনা করেন। বেনারস শহরও ছিল তাঁহার অপর কর্মকেন্দ্র।

১৯৩০ খৃস্টাব্দের গোড়ার দিকে চন্দ্রশেখরের একজন সহকর্মী বিদ্যাভূষণ দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা সম্পর্কে বেনারসে গ্রেপ্তার হন। বিদ্যাভূষণ ১৯২৯ খৃস্টাব্দের জুন মাস হইতে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে বেনারসের বিভিন্ন অঞ্চলে 'বোমার দার্শনিক তত্ত্ব' নামক একটি ইস্তাহার ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। যুক্তপ্রদেশের অন্যান্য শহরেও

ইস্তাহারটি বিলি করা হইয়াছিল। এই ইস্তাহারে বোমা তৈরীর সহজ প্রণালী ও বোমার ধ্বংসকারী ক্ষমতা ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। মে মাস হইতে জুলাই মাস পর্যন্ত সময়ে যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে এগারটি বোমা ফাটে। ইহার ফলে কয়েক ব্যক্তি হতাহত হয়। ৮ই আগস্ট ঝাঁসীতে বিভাগীয় কমিশনারকে হত্যা করিতে গিয়া লক্ষ্মীকান্ত পাণ্ডে নামক এক যুবক একটি পিস্তল ও একটি বোমাসহ গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ৮ই সেপ্টেম্বর একজন গুপ্তচরকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় একজন স্ত্রীলোক নিহত হয়। ২৮শে সেপ্টেম্বর বালিয়া জিলার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ১৬ই নভেম্বর কানপুর শহরের থানার মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু উহা ফাটে নাই। ১লা অক্টোবর বেনারসের জনৈক দারোগার গৃহের দরজায় একটি বোমা ঝুলাইয়া রাখা হয়। দরজা খুলিবামাত্র বোমাটি ফাটিয়া যায়, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই।

এই বৎসর যুক্তপ্রদেশের বহুস্থানে বিপ্লবীরা পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয় এবং গ্রেপ্তারের সময় তাহাদের সহিত পুলিশের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সশস্ত্র সংঘর্ষ ঘটে। এই সম্পর্কে কানপুরের ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১লা ডিসেম্বর একদল পুলিশ সদাশিব পোদ্দার নামক একজন পলাতক বিপ্লবীকে 'নূতন দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে গ্রেপ্তার করিতে যায়। পথে এক যুবককে দেখিতে পাইয়া গোয়েন্দারা তাহাকে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর বিশিষ্ট কর্মী সালিগরাম শুক্ল বলিয়া চিনিতে পারে। পুলিশ তাঁহাকে পলাইতে দেখিয়া গুলিবর্ষণ শুরু করে। সালিগরামও তাঁহার পিস্তল দিয়া পাল্টা গুলি বর্ষণ করেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ গুলি বর্ষণের পর কানপুরের সহকারী পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট হার্ট সাহেব ও একজন কনেস্টবল গুরুতররূপে আহত ও একজন কনেস্টবল নিহত হয়। সালিগরামও বহু গুলির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে ঘটনাস্থলে প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর

পর তাঁহার দেহ তল্লাসী করিয়া দুইটি রিভলভার ও তিনশত গুলি পাওয়া যায়। ৪ঠা তারিখে গোয়েন্দা-পুলিশ কানপুরের একটি পুস্তকালয় হইতে নন্দকিশোর নিগম নামক এক বিপ্লবীকে একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার করে। ইনি 'দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা'র একজন পলাতক আসামী ছিলেন। পুলিশ ডিসেম্বর মাসে আরও সাত জন পলাতক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়।

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

১৯৩১ খৃস্টাব্দে সারা যুক্তপ্রদেশে বহু বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন স্থানে বহু বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। এই সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিম্নে বর্ণিত হইল :—

১লা হইতে ১৩ই জানুয়ারী পর্যন্ত বেনারস শহরে পর পর বহু বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং ইহার ফলে বহু লোক হতাহত হয়। ২রা জানুয়ারী কানপুরে অশোককুমার বসু নামক এক বিপ্লবী যুবক গোয়েন্দা-বিভাগের ইনস্পেকটর টিকারাম ও অপর একজন দারোগাকে রিভলভার দ্বারা হত্যার চেষ্টা করে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয় ও যুবকটি পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়। ১১ই জানুয়ারী কানপুরের ডেপুটি কালেকটরকে হত্যার উদ্দেশ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি ফাটে নাই বা কেহ গ্রেপ্তারও হয় নাই। ২৭শে ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে এলাহাবাদের আলফ্রেড পার্কে পুলিশের সহিত খণ্ডযুদ্ধে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশনের' প্রধান নায়ক চন্দ্রশেখর আজাদ নিহত হন। ৬ই জুন কানপুরে দুইজন কনেস্টবল একজন পলাতক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিলে তাহারা উভয়েই উক্ত বিপ্লবীর গুলিতে গুরুতররূপে আহত হয় এবং বিপ্লবীটি পলায়ন করে।

চন্দ্রশেখর আজাদের মৃত্যুর পর দলের মধ্যে গভীর হতাশার সৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে বহু বিপ্লবী দল ছাড়িয়া দেয়, অনেকে পলাতক বিপ্লবীদের ধরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে পুলিশের সহিত সহযোগিতা শুরু করে। ১৮ জুলাই পুলিশের সহিত সহযোগিতাকারী সন্দেহে বীরভদ্র তেওয়ারী নামক একজন কর্মীকে

[..]া করিবার চেষ্টা চলে, কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২১ জুলাই রাজারাম [..]াম নামক এক বিপ্লবী যুবক পুলিশের সহিত সহযোগিতাকারী সন্দেহে [র]মেশ মেটা নামক দলের একজন সভ্যের প্রাণনাশের চেষ্টা করে। এই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। ১১ই আগস্ট রাজারাম জলিমকেই উক্ত কারণে হত্যা করা হয়। ২৪শে নভেম্বর বীরভদ্র তেওয়ারীকে পুনরায় হত্যা করিবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

এই বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এই :—

২৩শে জানুয়ারী এলাহাবাদে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর "প্রধান সেনাপতি" যশপাল পুলিশের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষের পর দুইটি রিভলভার ও বহু গুলিসহ আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। ১লা ফেব্রুয়ারী লক্ষ্ণৌ শহরে একটি বোমা বিস্ফোরণে চারিজন দারোগা, দুইজন হেড কনেস্টবল ও দুইজন পথিক গুরুতররূপে আহত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ও ৮ই এপ্রিলের মধ্যে এলাহাবাদ শহরে পর পর কয়েকটি বোমা বিস্ফোরিত হয় এবং ইহার ফলে কয়েকজন পুলিশ-কর্মচারী আহত হয়। ১লা এপ্রিল বেনারসের গঙ্গার উপরিস্থিত ডাফরিন ব্রিজ ধ্বংস করিবার সময় পাঁচজন বিপ্লবী পুলিশের হস্তে ধরা পড়ে। ১০ই মে সীতাবপুরে পুলিশ-সুপারকে হত্যার জন্য একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি ফাটিলেও কেহ হতাহত হয় নাই। ২২শে নভেম্বর দুইজন বিপ্লবী যুবক ডাকাতির উদ্দেশ্যে চেন টানিয়া একটি ট্রেন থামায়। কিন্তু ট্রেনের গার্ডের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষের পর গার্ডকে আহত করিয়া যুবকদ্বয় পলায়ন করে। পরে তাহারা উভয়েই পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দ

৪ঠা জানুয়ারী আগ্রা শহরে তিনজন বিপ্লবী যুবক একটি ডাক লুট করিয়া ৪৪৭৫৲ টাকা হস্তগত করে। ৫ই জানুয়ারী কানপুর শহরে এক পলাতক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় উক্ত বিপ্লবীর সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয়।

বিপ্লবী যুবকটি আহত অবস্থায় গ্রেপ্তার হয়। ২রা ফেব্রুয়ারী দুইজন বিপ্লবী যুবক রিভলভার লইয়া একটি ডাক লুট করে। ১৫ মার্চ বেনারস শহরে একজন পলাতক বিপ্লবী একটি রিভলভার ও ৫৯টি গুলিসহ গ্রেপ্তার হয়। ২১শে মে লক্ষ্ণৌ শহরে একটি থানার সম্মুখে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কেহ হতাহত হয় নাই। ইহা ব্যতীত এই বৎসর আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ

১৯৩৪ খৃস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশে কয়েকটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। (১) ১২ই জুন কানপুরের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার বাসস্থানে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। উহার দুইদিন পরে রাত্রিকালে যখন কানপুরের ব্রিস্টল হোটেলে সাহেবদের আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল, তখন বিপ্লবীরা এই হোটেলটির মধ্যে দুইটি বোমা ছুঁড়িয়া মারে। এই বোমা দুইটির একটিও ফাটে নাই। জুলাই মাসে কয়েকজন বিপ্লবী বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য লক্ষ্ণৌ শহরের এক ব্যবসায়ীর গদিতে এক ডাকাতি করিয়া কয়েক হাজার টাকা লইয়া যায়। ইহার পর যুক্তপ্রদেশে আর কোন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নাই।

*

বিহার প্রদেশ

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

২৯শে মে ঝাঁঝড়া নামক স্থানে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হয়। ৩০শে মে 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর বিহার প্রাদেশিক শাখার সভ্যগণ ধেলুযাহা নামক স্থানে আর একটি সশস্ত্র ডাকাতি করিয়া বহু অর্থ হস্তগত করে। ১৩ই অকটোবর জামালপুর শহরে পাঁচজন বিপ্লবী যুবক একজন সশস্ত্র দারোগা ও একজন কনেস্টবলের উপর পাঁচটি গুলি নিক্ষেপ করে। দারোগা এবং কনেস্টবলটিও গুলি বর্ষণ করিয়া তাহার জবাব দেয়। বিপ্লবীরা পলায়ন করে।

(১) Govt. Publication—'India in 1933-34'.

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

১৩ই এপ্রিল পাটনা শহরে একটি স্কুল-গৃহে বিপ্লবীরা যখন বোমা তৈরী করিতেছিল, তখন দুইটি বোমা ফাটিয়া যায়। পুলিশ পরে স্কুল-গৃহ খানাতল্লাস করিয়া একটি বোমা উদ্ধার করে। ১৫ই জুন হাজিপুর রেল-স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার তাহার সহকারীর সহিত যখন একটি টাকার থলিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন বিপ্লবীরা তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া টাকার থলিটি ছিনাইয়া লয়। স্টেশন-মাস্টার ও তাহার সহকারী গুরুতররূপে আহত হয়। স্টেশন-মাস্টার পরে মারা যায়। ২৮শে জুন পাটনা শহরে বিপ্লবীরা বোমা দ্বারা একজন দারোগাকে হত্যা করে এবং একজন কনেস্টবলকে আহত করে। দুইজন বিপ্লবী আহত হইয়াও পলায়ন করিতে সক্ষম হয়। পুলিশ পরে কয়েকটি স্থান খানাতল্লাস করিয়া তিনটি বোমা, একটি রিভলভার, ৭১টি গুলি ও একটি অটোম্যাটিক পিস্তল উদ্ধার করে। ৩১শে জুলাই দুইজন বিপ্লবী একত্রে বোমা তৈরী করিবার সময় একটি বোমা ফাটিয়া যায়। তাহার ফলে একজন বিপ্লবী নিহত হয়। ১২ই আগস্ট একটি রিভলভার, একটি পিস্তল, কিছু পরিমাণ গান পাউডার ও ক্লোরোফর্মসহ দুইজন যুবক পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

৯ই নভেম্বর বেতিয়া নামক স্থানে ১৯৩০ খৃস্টাব্দের 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'র একজন রাজসাক্ষী দুইজন যুবকের দ্বারা ছুরিকাহত হয়। ইহার পর বিহারে আর কোন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নাই।

পাঞ্জাব প্রদেশ

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

২২শে ফেব্রুয়ারী অমৃতসরে খালসা কলেজের প্রিন্সিপাল যখন ছাত্রদের এক সভায় বক্তৃতা করিতেছিলেন, তখন এই সভায় একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। পুলিশের সহিত সহযোগিতা করিবার অপরাধে প্রিন্সিপালকে হত্যা করিবার

জন্যই বোমাটি নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বোমার আঘাতে একজন ছাত্র নিহত ও এগারজন ছাত্র আহত হয়। ৯ই মার্চ অমৃতসরের শহর-কোতোয়ালীর সামনে তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। কেহ হতাহত হয় নাই। ৯ই মে মুলতান শহরে একদল পুলিশসহ একজন ম্যাজিস্ট্রেট এক ব্যক্তির গৃহে জলকরের দায়ে মাল ক্রোক করিতে যান। ঐ সময় ডেপুটি কমিশনার এবং পুলিশ-সুপরিণ্টেডেণ্টও পলাতক বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য ঐ স্থানে উপস্থিত হন। এই সময় অফিসারসহ এই গোটা পুলিশদলকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্তী বাড়ীর ছাদ হইতে একটি সাংঘাতিক ধরনের বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমার আঘাতে পুলিশ-সুপারিণ্টেডেণ্ট, দুইজন নিম্নপদস্থ অফিসার ও চারিজন কনেস্টবল গুরুতররূপে আহত হয়। পরে এই সম্পর্কে তিনজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হইয়া দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। ২৬শে মে সিয়ালকোটে এক বিপ্লবী যুবক বোমা তৈরী করিবার সময় একটি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় যুবকটি নিহত হয়। ২৮শে মে কয়েকজন বিপ্লবী লাহোরের এক বাড়ীতে যখন একটি বোমা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল, তখন বোমাটি হঠাৎ ফাটিয়া যায়। ইহার ফলে কেহ হতাহত হয় নাই। ২৭ ও ২৮শে মে লুধিয়ানা শহরে বিপ্লবীরা ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বোমা তৈরী করিয়া উহার দুইটি রেল-লাইনের উপর ফাটাইয়া পরীক্ষা করে। ইহার ফলে রেল-লাইন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ৬ই জুন লায়ালপুর শহরের য়ুরোপীয়ান ক্লাবে বোমা পড়ে, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। ১৬ই জুন ঝঙ্গ শহরে একটি থানার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমার আঘাতে দুইজন পুলিশ-কর্মচারী আহত হয়। ১৯শে জুন রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর, অমৃতসর, লায়ালপুর, গুজরানওয়ালা ও শেখপুর শহরে একই সময়ে বোমা বিস্ফোরিত হয়। ইহার ফলে দুইজন পুলিশ-কর্মচারী নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ২৮শে জুলাই অমৃতসরে দুইটি রিভলভার ও বহু সংখ্যক গুলিসহ দুইজন বিপ্লবী যুবক গ্রেপ্তার হয়। ২৯শে আগস্ট অমৃতসরে পুলিশ-ব্যারাকের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে দুইজন পুলিশ-কর্মচারী আহত হয়।

৪ঠা অক্টোবর গোয়েন্দা-বিভাগের স্পেশাল অফিসার খানবাহাদুর আব্দুল আজিজ যখন লাহোরের ক্যানাল ব্রিজের পাশ দিয়া গাড়ীতে যাইতেছিলেন, তখন পার্শ্ববর্তী একটি ঝোপের মধ্য হইতে তাঁহার গাড়ী লক্ষ্য করিয়া গুলি বর্ষণ করা হয়। ইহার ফলে তাঁহার আর্দালি গুরুতররূপে আহত হয়। আজিজ সাহেব পলায়ন করিতে সক্ষম হন। ৭ই নভেম্বর লাহোরের এক বাড়ীতে একটি ছোট বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ১৫ই নভেম্বর লাহোরের একটি বাড়ীতে খানাতল্লাসীর ফলে ছয়টি রিভলভার ও বহু গুলি পুলিশের হস্তগত হয়।

গভর্ণর হত্যার চেষ্টা

১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাবের গভর্ণর সাহেব লাহোর-বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন-উৎসবে যোগদান করেন। উৎসব শেষ হইলে তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘর হইতে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতেছিলেন, তখন হরিকিষণ নামক এক বিপ্লবী যুবক গভর্ণর সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। বাহু ও কোমরে গুলি লাগিয়া গভর্ণর সাহেব ধরাশায়ী হন। এই গুলি-বর্ষণের ফলে একজন পুলিশ-ইন্‌স্‌পেক্‌টর, একজন দারোগা ও দুইজন ইংরেজ-মহিলা গুরুতররূপে আহত হয়, কিন্তু গভর্ণর ও অন্যান্য সকলে বাঁচিয়া যান। হরিকিষণকে ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং বিচারে তাহার প্রাণদণ্ড হয়।

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

এই বৎসর পাঞ্জাবে কয়েকটিমাত্র ঘটনা ঘটে। ৩১শে জানুয়ারী লাহোরে একটি ছোট বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ১৪ই এপ্রিল আম্বালা শহরে একটি অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম ধরা পড়ে। ৭ই মে পুলিশ যখন শক্তিগড় হইতে দুইজন পলাতক বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিতেছিল, তখন দুইজন বিপ্লবী রিভলভার লইয়া পুলিশদলের উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে একজন কনেস্টবল নিহত এবং একজন হেড কনেস্টবল ও দারোগা আহত হয়। ২১শে মে সাহাদারা নামক স্থানে পুলিশ দুইজন পলাতক বিপ্লবীকে

গ্রেপ্তার করে। তাহাদের জিনিসপত্র খানাতল্লাস করিয়া দুইটি রিভলভার একটি পিস্তল ও পাঁচটি ডিনামাইট-স্টিক পাওয়া যায়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

১২ই মার্চ লাহোরে চারিজন বিপ্লবী যুবক রিভলভার ও পিস্তল লইয়া একটি গহনার দোকানে প্রবেশ করে এবং বহু গহনা ও টাকা লইয়া সরিয়া পড়ে। ১১ই মে রাত্রিকালে লুধিয়ানা শহরের নিকটে লুধীয়ানা-ফিরোজপুর লাইনের টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলা হয়। ১১ই মে রাত্রিকালে তিনটি স্থানে টেলিগ্রাফ-লাইন ছিন্ন করা হয়।

১৯৩৩ ও ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে পাঞ্জাবে কোন উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নাই।

* * * * *

দিল্লী প্রদেশ

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

৬ই জুলাই দিল্লী নগরীর চাঁদনীচকের বিখ্যাত গাড়োরিয়া স্টোরে চন্দ্রশেখর আজাদের নেতৃত্বে এক সশস্ত্র ডাকাতিতে ১৪ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। ২৮শে অক্টোবর 'প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা'র অন্যতম প্রধান আসামী, 'হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর কেন্দ্রীয় সমিতির সভ্য ও সংঘের দিল্লী শাখার সম্পাদক কৈলাসপতি পলাতক অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। পুলিশ তাঁহার গোপন আড্ডারও সন্ধান পায় এবং সেই স্থান খানাতল্লাসী করিয়া চারিটি সাংঘাতিক ধরনের বোমা, একটি মশার পিস্তল, বহু গুলি, বোমা তৈরীর মসলা ও বহু বৈপ্লবিক ইস্তাহার হস্তগত করে। এই গ্রেপ্তারের সূত্র ধরিয়া পুলিশ দিল্লী শহরের এক বাড়ীতে একটি বিরাট বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। এই কারখানায় ছয় হাজার বোমা তৈরীর উপযুক্ত বোমার খোল ও মাল-মসলা পাওয়া যায়। এসোসিয়েশন-এর সভ্যদের ধারণা, কৈলাসপতি বিশ্বাসঘাতকতা

করিয়া এই সকল অস্ত্রশস্ত্র ও বোমার কারখানাটি ধরাইয়া দেন। এমন কি অনেকে মনে করেন যে, কৈলাসপতি কয়েকজন নেতৃস্থানীয় পলাতক বিপ্লবীর সন্ধানও পুলিশকে জানাইয়া দেন এবং ইহার ফলেই তাঁহারা গ্রেপ্তার হন।(১)
১লা নভেম্বর রাত্রিকালে গোয়েন্দা-বিভাগের দুইজন কর্মচারী 'হিন্দুস্থান সোসা-লিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্য ধন্বন্তরী ও শুকদেবকে দিল্লী শহরের এক অঞ্চলে দেখিতে পায়। পুলিশ ধন্বন্তরী ও শুকদেবকে 'দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা' ও 'প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা' সম্পর্কে খুঁজিতেছিল। তাঁহারা এতদিন আত্মগোপন করিয়াছিলেন। গোয়েন্দা-কর্মচারীদ্বয় তাঁহাদের দেখিবা-মাত্র চিনিতে পারে এবং তাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য অগ্রসর হয়। ধন্বন্তরী ও শুকদেব প্রথমে পলায়নের চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সময় কয়েকজন কনেস্টবল আসিয়া গোয়েন্দাদের সহিত মিলিত হয়। তখন পলায়ন অসম্ভব বুঝিয়া ধন্বন্তরী তাঁহার পশ্চাৎ-অনুসরণকারী পুলিশদের একজনকে গুলি করেন। পুলিশ কনেস্টবলটি আহত হইয়াও অন্যান্যের সহিত তাঁহার অনুসরণ করে এবং বেটন দিয়া ধন্বন্তরীর মস্তকে আঘাত করে। এই আঘাতের ফলে ধন্বন্তরী চেতনা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন। পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ-দল যখন ধন্বন্তরীকে গ্রেপ্তার করিতে ব্যস্ত ছিল, তখন সুযোগ পাইয়া শুকদেব সকলের অলক্ষ্যে পলায়ন করেন। ইহার কয়েকদিন পরেই শুকদেবও লাহোরে গ্রেপ্তার হন। এই ঘটনার কয়েকদিনের মধ্যেই চন্দ্রশেখর আজাদের সহকর্মী বিশ্বম্ভর দয়াল ও বিদ্যাভূষণ দিল্লীতে গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তারের কয়েকদিন পরেই জেলের মধ্যে আপেণ্ডিসাইটিস রোগে বিশ্বম্ভরদয়ালের মৃত্যু হয়। ইহার পর কৈলাসপতি, ধন্বন্তরী, শুকদেব, হাজারিলাল পাণ্ডে (২) ও বিদ্যাভূষণ এবং আরও কয়েকজনকে লইয়া 'নূতন (দ্বিতীয়) দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলা' শুরু হয় এবং এই বিপ্লবীদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়।

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা' (অনুবাদ), পৃঃ ৪৪। (২) হাজারিলাল ৩১শে অক্টোবর দিল্লীর কুইন্স গার্ডেনস্-এ ইনস্পেকটর সর্দার সাহেব করম সিংকে হত্যার চেষ্টা করিতে গিয়া গ্রেপ্তার হন।

১৯৩১ ও '৩২ খৃস্টাব্দ

১৯৩১ খৃস্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল জনৈক পুলিশ-অফিসারকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর মেইন স্টেশনে একখানি ট্রেনের একটি কামরার উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার ফলে চারিজন কুলি গুরুতররূপে আহত ও কামরাটি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু পুলিশ-কর্মচারীটি রক্ষা পায়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রিকালে 'লোথিয়ান-কমিটি'র ইংরেজ-সভ্যগণ একখানি স্পেশাল ট্রেনে যাইতেছিলেন। এই স্পেশাল ট্রেনখানিকে উড়াইয়া দিবার জন্য বিপ্লবীরা হার্ডিংস্ ব্রিজের নিকটে রেললাইনের উপর একটি বোমা পাতিয়া রাখে। ট্রেনখানি লাইনের উপর দিয়া অতিক্রম করিবার সময় বোমাটি ফাটিয়া যায়, কিন্তু ট্রেন বা লাইনের কোন ক্ষতি হয় নাই। এই বৎসরের ২০শে জুলাই দুইজন যুবক একটি কনেস্টবলের রিভলভার কাড়িয়া লইবার

উদ্দেশ্যে একটি লোহার ডাণ্ডা দিয়া তাহার মাথায় আঘাত করে। কিন্তু অন্য কয়েকজন পুলিশ আসিয়া পড়ায় যুবকেরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

ইহার পর দিল্লীতে আর কোন উল্লেখযোগ্য বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নাই।

বোম্বাই ও সিন্ধুপ্রদেশ

'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর সভ্যগণ প্রথম হইতেই বোম্বাই এবং সিন্ধু প্রদেশেও শাখা বিস্তার করে। এই সকল শাখার সভ্যগণ প্রথম হইতেই উত্তর-ভারতের অন্যান্য স্থানের মত বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করিয়া দেয়।

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

২১শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই প্রদেশের জলগাঁও নামক স্থানের জেলখানায় বসিয়া ভগবান দাস নামক 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এর একজন সভ্য প্রথম লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলার রাজসাক্ষী জয়গোপালকে গুলি করিয়া হত্যার চেষ্টা করে। ভগবান দাস জলগাঁও-জেলে বিচারাধীন আসামীরূপে আবদ্ধ ছিলেন। জয়গোপালকেও তখন ঐ জেলে আটক রাখা হইয়াছিল। ভগবান দাস বাহিরের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন, এবং জয়-গোপালকে হত্যা করিয়া বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাহির হইতে একটি রিভলভার লইয়া আসেন। ২১শে ফেব্রুয়ারী জয়গোপাল যখন একজন দারোগার সহিত কথা বলিতেছিল, তখন ভগবান দাস দূর হইতে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটি গুলি ছোঁড়েন। গুলি লাগিয়া জয়গোপাল গুরুতররূপে আহত হয় এবং দারোগাটির গায়েও গুলি লাগে। কিন্তু জয়-গোপালের আঘাত গুরুতর হইলেও শেষ পর্যন্ত সে বাঁচিয়া যায়। বিচারে ভগবান দাসের ফাঁসি হয়।

এপ্রিল মাসে জি-আই-পি রেলপথের কয়েকটি স্টেশন, ব্রীজ ও রেললাইন ধ্বংসের চেষ্টা হয়। এই সময়ে জি-আই-পি রেলপথের শ্রমিকদের ধর্মঘট

চলিতেছিল। বিপ্লবীরা কয়েকজন ধর্মঘটী শ্রমিকের সহযোগিতায় এই ধ্বংস-কার্যের পরিকল্পনা করে। ১০ই ও ১১ই এপ্রিল প্যারেল ও দাদারের মধ্যবর্তী মসজিদ স্টেশনের নিকটে রেলপথ ধ্বংসের জন্য কয়েকটি বোমা পাতা হয়। বোমাগুলি বিস্ফোরিত হইবার ফলে রেললাইন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সম্পর্কে কয়েকজন বিপ্লবী গ্রেপ্তার হয় এবং তাহাদের গোপনকেন্দ্র খানাতল্লাস করিবার সময় কতকগুলি বোমা ধরা পড়ে।

১৫ই সেপ্টেম্বর সিন্ধুদেশের করাচী শহরের প্রধান পুলিশকেন্দ্রের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। ২৯শে সেপ্টেম্বর করাচীর রেওয়াচাঁদ নামক এক ব্যক্তির গৃহে বোমা পড়ে। ইহার ফলে কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। ২৯শে অক্টোবর টেলর নামক একজন সার্জেণ্টের উপর গুলি চলে। টেলর গুরুতররূপে আহত হইয়াও বাঁচিয়া যায়। ২৫শে নভেম্বর করাচী শহরে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। ২৮শে নভেম্বর সিন্ধুদেশের হায়দরাবাদ শহরের ডেপুটি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার বাংলোর উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

১৩ই জানুয়ারী বোম্বাই প্রদেশের আহম্মদনগরের সাবজেলের মধ্যে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু ইহার ফলে কেহ হতাহত হয় নাই। মে ও জুন মাসে বোম্বাই প্রদেশের পুনা শহরে একটি সরকারী অস্ত্রাগার হইতে দুইটি রাইফেল ও একটি বন্দুক অপহৃত হয়। সরকারের ধারণা, ইংরেজ-কর্মচারীদের হত্যার উদ্দেশ্যেই এই অস্ত্রগুলি অপহৃত হইয়াছিল। এই সম্পর্কে কয়েকজন যুবক গ্রেপ্তার হয়।

গভর্ণর হত্যার চেষ্টা

২২শে জুলাই পুনা শহরে বোম্বাই প্রদেশের অস্থায়ী গভর্ণর স্যার আর্নেস্ট হটসনকে হত্যার চেষ্টা হয়। ঐ দিন গভর্ণর সাহেব পুনার ফার্গুসন

কলেজ পরিদর্শন করিতে আসেন। কলেজ পরিদর্শনের পর তিনি যখন কলেজের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া কথা বলিতে ছিলেন, তখন ঐ কলেজেরই একজন ছাত্র গভর্ণরকে লক্ষ্য করিয়া রিভলভার হইতে গুলি ছোঁড়ে। একটি গুলি গভর্ণরের বুকপকেটস্থিত নোট বইয়ের লোহার বোতামে লাগিয়া প্রতিহত এবং অন্যান্য গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এইভাবে গভর্ণর সাহেব প্রাণে বাঁচিয়া যান। ঘটনাস্থলেই ছাত্রটিকে গ্রেপ্তার করা হয়। খানাতল্লাসীর ফলে তাহার নিকট হইতে দুইটি রিভলভার ও একটি ছোরা পাওয়া যায়। ছাত্রটি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

২৩শে জুলাই সিন্ধুদেশের একটি গ্রামে ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ৪৬১৭৲ টাকা সংগ্রহ করে। পুলিশের ধারণা, ভগৎসিংয়ের গ্রেপ্তার ও প্রাণদণ্ডের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এই অর্থ লুণ্ঠিত হইয়াছিল।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

৩রা জুন সিন্ধুদেশের হায়দরাবাদ শহরে 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিকান এসোসিয়েশন'-এর কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সভ্য হংসরাজ ওরফে "বেতার" পলাতক অবস্থায় গ্রেপ্তার হন। গ্রেপ্তার-কালে খানাতল্লাস করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তিনটি পিস্তল ও বহু কার্তুজ এবং দুইটি বোমার খোল পাওয়া যায়।

১৯শে অক্টোবর বোম্বাই প্রদেশের শ্যানভেল নামক শহরে কোলাবা মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার চেষ্টা চলে। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট আহত হইয়াও প্রাণে বাঁচিয়া যান। ৩০শে অক্টোবর 'এস এস হিরাবতী' জাহাজযোগে পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া হইতে আনায়ন করিবার সময় চারিটি রিভলভার ও বহু কার্তুজ একজন যাত্রীর নিকট হইতে ধরা পড়ে।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দ

'আনন্দ মণ্ডল'

৭ই এপ্রিল বোম্বাই শহরে একদল যুবক একটি রাস্তার উপর একব্যক্তির নিকট হইতে কিছু অর্থ কাড়িয়া লয়। এই ঘটনার সূত্র হইতে পুলিশ অনুসন্ধান

করিয়া 'আনন্দ মণ্ডল' নামক একটি নূতন বিপ্লবীদলের সন্ধান পায়। উক্ত যুবকগণ এই নূতন বিপ্লবীদলের সভ্য।

'আনন্দ মণ্ডল'-এর সভ্যগণ একটি ক্ষুদ্র বোমার কারখানা স্থাপন করিয়া তাহাতে কয়েকটি বোমা তৈরী করে। এই কারখানায় তৈরীকরা দুইটি বোমা ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে বোম্বাই শহরের এম্পায়ার থিয়েটার-এ নিক্ষিপ্ত হয় এবং দুইবারেই থিয়েটারের কয়েকজন লোক আহত হয়। পরে 'আনন্দ মণ্ডলের' সভ্যগণ প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হয়।

২১শে এপ্রিল বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ শহরে একটি বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হয়। এই কারখানাটি খানাতল্লাস করিয়া পুলিশ একটি রিভলভার, বহু পরিমাণ বোমার মাল-মসলা ও একটি ইস্তাহারের বহু কপি হস্তগত করে। এই ইস্তাহারে বিলাতী বস্ত্র-ব্যবসায়ীদিগকে হত্যার ভয় দেখান হয়। এই সম্পর্কে কয়েকজন যুবক গ্রেপ্তার হয়। ১৬ই জুন সিন্ধুদেশের হায়দরাবাদ শহরে দুইজন বৃটিশ-সৈন্যের উপর একট বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। সৈন্য দুইটির একজন আহত হয়।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ

১৯৩৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে বোম্বাই প্রদেশের শোলাপুর শহরে পর পর কতকগুলি বোমা বিস্ফোরিত হয়। এই সময় শোলাপুরের সুতাকল শ্রমিক-দের ধর্মঘট চলিতেছিল। সরকারী মতে, বিপ্লবীরা ধর্মঘটী শ্রমিকদের পক্ষ লইয়াই এই সকল বোমা নিক্ষেপ করে। (১) ২০শে এপ্রিল পুনা শহরের একগৃহে একটি বোমা ফাটিয়া যায়। পুলিশ এই গৃহ খানাতল্লাস করিয়া একটি ছোট বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। জুন মাসে শোলাপুরে একজন ইংরেজ-সাহেবের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

* * * * *

---

(১) Govt. of India publication—'India in 1933-34', P. 48.

মধ্যপ্রদেশ

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

৭ই এপ্রিল নরসিংহপুর জিলার কাউরিয়া গ্রামে এক স্বর্ণকারের গৃহে একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমার আঘাতে স্বর্ণকার নিহত হয়। পরে পুলিশ এক গৃহ খানাতল্লাস করিয়া বোমা তৈরীর বহু মাল-মসলা ও বৈপ্লবিক ইস্তাহারের বহু কপি হস্তগত করে।

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

২১শে আগস্ট বিভাগীয় কমিশনার বুরহানপুরের মারাঠী স্কুলে বয়েজ স্কাউটদের সমাবেশ পরিদর্শন-কালে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি না ফাটিবার ফলে বিপ্লবীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। ২৪শে সেপ্টেম্বর দুইজন উচ্চপদস্থ ইংরেজ সামরিক অফিসার যখন 'পাঞ্জাব মেল' ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছিল, তখন ডোঙ্গরগাঁও স্টেশনের নিকট তাহারা উভয়েই ছুরিকাহত হয়। তাহাদের একজন, লেফ্‌টানণ্ট হেক্‌স্ট, এই ছুরিকাঘাতের ফলে পরে মারা যায়। এই সম্পর্কে দুইজন বিপ্লবী যুবককে গ্রেপ্তার করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর-দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

নূতন বিপ্লবী দল

৩রা এপ্রিল বেতুল নামক স্থানে একজন দারোগার গৃহ হইতে একটি রিভলভার চুরি হয়। ৯ই জুন ওয়ার্ধা জিলার হিঙ্গনঘাট রেল-স্টেশনের লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ১৪০৩৲ টাকা লুণ্ঠন করা হয়। ২রা জুলাই নাগপুর শহরের পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলো হইতে একটি রিভলভার চুরি হয়। সরকারী মতে, এই বৎসরের এই তিনটি ঘটনার সহিত 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্‌লিকান এসোসিয়েশন'-এর কোন সম্পর্ক নাই। একটি নূতন বিপ্লবীদলের

দ্বারাই এই তিনটি ঘটনা অনুষ্ঠিত হয়; এই দলের মোট দশজন সভ্য গ্রেপ্তার হইয়া বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। (১)

মাদ্রাজ প্রদেশ

১৯৩৩ খৃস্টাব্দ

সরকারী বিবরণে দেখা যায় যে, 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন' মাদ্রাজেও উহার একটি শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে এই শাখা-সমিতির সভ্যগণের দ্বারা কয়েকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। (২)

মাদ্রাজ সিটি ষড়যন্ত্র-মামলা

১৬ই মার্চ মাদ্রাজের আইন-সভার হলঘরে গভর্ণরের আসনের উপর একটি রিভলভার পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের ইংরেজ-শাসকদের পরিণাম স্মরণ করাইয়া দেওয়াই ছিল এই অভিনব পন্থার উদ্দেশ্য, ১৫ই এপ্রিল কোকনদ শহরে একটি নৌকার মধ্যে এক যুবক দুইটি বোমাসহ ধরা পড়ে। ২৬শে এপ্রিল উতাকামণ্ড শহরে চারিজন বিপ্লবী সামরিক পোষাকে সজ্জিত হইয়া এবং প্রত্যেকে একটি করিয়া রিভলভার লইয়া শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত 'ত্রিবাঙ্কুর ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে'-এ হানা দেয়। বিপ্লবীরা ব্যাঙ্কের কোষাগারে রক্ষিত সকল অর্থ লুণ্ঠন করিয়া সরিয়া পড়ে। পরে চারিজন যুবকই গ্রেপ্তার ও দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি সম্পর্কে পুলিশ মোট বাইশজনকে গ্রেপ্তার করে। পরে এই বাইশজনকে লইয়া একটি ষড়যন্ত্র-মামলা শুরু হয়। এই মামলাটিই

(১) 'Report on the Indian Constitutional Reform, 1933-44', Memorandum on Terrorism, P. 361.

(২) Same, P. 320.

'মাদ্রাজ সিটি ষড়যন্ত্র-মামলা' নামে খ্যাত। মামলার বিচারে প্রায় সকলেই বিভিন্ন কারাদণ্ড লাভ করে।

ইহার পর মাদ্রাজে আর কোন বৈপ্লবিক ঘটনা ঘটে নাই।

রাজপুতানা

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ

১৯৩৪ খৃস্টাব্দে রাজপুতানার আজমীরে কয়েকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয় এবং তখনই রাজপুতানার বিপ্লবীদলের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। সরকারী মতে, 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এর কোন পলাতক নেতা রাজপুতানায় আসিয়া এখানেও এসোসিয়েশনের একটি শাখা-সমিতি স্থাপন করেন। এই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন প্রথম দিল্লী ষড়যন্ত্র-মামলার একজন পলাতক আসামী। নভেম্বর মাসের শেষ দিকে আজমীর রেল স্টেশনে একজন যুবক একটি রিভলভারসহ গ্রেপ্তার হয়। তাহার গ্রেপ্তারের সূত্র ধরিয়া পুলিশ এই স্থানের গুপ্ত সমিতির সন্ধান পায় এবং সমিতির প্রায় সকল সভ্যকে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। পরে সভ্যদের প্রায় সকলেই বিভিন্ন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। (১)

(১) Govt. Publication—'India in 1933-34', P. 49.

'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এ ভাঙ্গন

১৯২৩ খৃস্টাব্দে যুক্তপ্রদেশকে কেন্দ্র করিয়া যে 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা ১৯২৩ খৃস্টাব্দ হইতে ১৯৩৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ বারো বৎসরকাল বহু ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া, রাজেন লাহিড়ী, রাম-প্রসাদ বিস্মিল, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, শিব বর্মা, রাজগুরু, শুকদেব প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিপ্লবীদের অক্লান্ত চেষ্টায় সারা উত্তর-ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন

স্থানে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া একটা বিরাট আন্তঃপ্রাদেশিক বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়িয়া উঠে। দীর্ঘ বারো বৎসরকাল ধরিয়া এই বৈপ্লবিক প্রতিষ্ঠান ভারতের নয়টি প্রদেশের শত-সহস্র যুবককে পূর্ণ স্বাধীনতা ও বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এবং দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত করে। তারপর জনগণের ঘনিষ্ঠ সংযোগ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার ফলেই এই বিরাট প্রতিষ্ঠান রাজেন লাহিড়ী, রামপ্রসাদ বিস্মিল, চন্দ্রশেখর আজাদ, ভগৎ সিং, যতীন্দ্রনাথ দাসের মত দেশ-বরেণ্য আদর্শ বিপ্লবী নায়ক সৃষ্টি করিয়াও ইতিহাসের অমোঘ নিয়মেই একদিন ইহা অন্তঃসার শূন্য হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়! এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত যে শোচনীয় অবস্থায় পতিত হয় এবং যেভাবে ইহা ভাঙ্গিয়া যায় তাহা বর্ণনা প্রসঙ্গে ইহার নেতৃস্থানীয় সভ্যদের অন্যতম অজয় কুমার ঘোষ বলেন:—

"১৯৩০ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আজাদের মৃত্যু হলো। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এর উপর যে আঘাত পড়লো, সে-আঘাত থেকে প্রতিষ্ঠানটির বেঁচে ওঠ্‌বার আর সম্ভাবনা রইলো না। সরকারের নির্যাতন-নিপীড়নই শুধু যে দল ভেঙ্গে দিল তা নয়, দলের মধ্যে মূলগত দুর্বলতাই দেখা দিল। আজাদের ব্যক্তিত্ব, তাঁর অনুপ্রেরণা ও দলের ভিতরে তাঁর সম্মান উপর্যুপরি অকৃতকার্যতা এবং মত-বিরোধের মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দলের নীতিবোধ ম্রীয়মান হয়ে এল। ইতিমধ্যে কৈলাশপাটের (কৈলাশপতির) মত বিপ্লবী নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতা দলের ভিতরে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। এবার সবাই জানতে পারলো, আজাদের মৃত্যুর কারণও তাঁদেরই দলের একজন বিখ্যাত নেতা।

"দল তখন ভাঙ্গনের মুখে। কেউ জানে না, পরবর্তী বিশ্বাসঘাতক কে, পুলিশের গোয়েন্দা হিসাবে কার স্বরূপ ধরা পড়বে? পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নেই, সবাই সবাইকে সন্দেহের চোখে দেখে—এই তখন অবস্থা। তাছাড়া ব্যক্তিগত বিবাদ, অভিযোগ ও প্রতিবাদে গোটা পরিবেশটাই তখন বিষিয়ে

উঠেছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে পুলিশের গোয়েন্দা এবং অন্যান্য বাজে লোক এসে দলে ভিড় করতে লাগল। দলের তহবিল তছরূপ, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ডাকাতি, নৈতিক অধঃপতন—এই সব লক্ষণ ক্রমশই বেড়ে যেতে লাগল।

"এই সব ব্যপার দেখে অধিকাংশ কর্মীই বীতশ্রদ্ধ হয়ে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলো। তারা সন্ত্রাসবাদ আর তাদের সহর্মীদের প্রতি বিশ্বাস হারালো। এমন কি, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রতিও আর আস্থা রইলো না তাদের। এদেশে কিছুই হবে না, আমরা ভীরু আর বিশ্বাস-ঘাতকের জাত—এই হ'লো তাদের ধুয়ো। যারা এতদিন পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে পালিয়ে ছিল, তারা একে একে ধরা পড়তে লাগলো। দীর্ঘ দিনের শাস্তি হ'লো তাদের। অবশিষ্টদের মধ্যে দেখা দিল নৈরাশ্য।

"দলের ভিতরটা তখন মরচে ধরে গেছে। আজাদ আর ভগৎ সিং তাঁদের বুকের রক্তে, তাঁদের আত্মত্যাগে যে দল একদিন গড়ে তুলেছিলেন, বাইরের আঘাত সে আর সইতে পারলো না, ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেল।" (১)

(১) অজয়কুমার ঘোষ: 'ভগৎ সিং ও তাঁর সহকর্মীরা' (অনুবাদ), পৃঃ ৪৪-৪৫।

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, আসাম ও ব্রহ্মদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টা

(১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দ)

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৩০ খৃস্টাব্দের ২রা জুলাই পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্টে কলিকাতাগামী একখানা ট্রেনের ইঞ্জিনের নীচে লাইনের উপর একটি বোমা পাতিয়া রাখা হয়। গাড়ী ছাড়িবামাত্র বোমাটি ফাটিলেও ইঞ্জিনের কোন ক্ষতি হয় নাই। ৮ই জুলাই পেশোয়ারে জনৈক অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার গৃহের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটী ফাটিলেও কেহ হতাহত হয় নাই। ১৫ই জুলাই ম্যাকেসন গার্ডেনস্-এ স্থাপিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক স্বরূপ দুইটি পুরাতন কামানের একটিকে উড়াইয়া দিবার জন্য উহার মুখের মধ্যে একটি বোমা ফাটান হয়। ইহার ফলে উক্ত কামানটির বিশেষ ক্ষতি হয়। ১লা সেপ্টেম্বর পেশোয়ারে জনৈক পুলিশ-ইনস্পেক্টরকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাহার গৃহের সম্মুখে একটি বোমা পাতিয়া রাখা হয়। বোমাটি ফাটিলেও কেহ হতাহত হয় নাই। ১লা সেপ্টেম্বর তারিখেই বান্নু শহরের পুলিশ-ইনস্পেক্টরের গৃহে একটি বোমা ফাটে, কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই।

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

১৪ই জানুয়ারী মর্দান জিলার কুদি কেল্লা নামক স্থানে এক হিন্দু যুবকের গৃহ হইতে দুইটি হাতবোমা আবিষ্কৃত হয়। ২১শে জানুয়ারী পেশোয়ারে একটি রেল-ইঞ্জিনের উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমাটি ফাটিলেও

ইঞ্জিনের কোন ক্ষতি হয় নাই। ১৪ই মার্চ পেশোয়ারে কিশাখান নামক স্থানের থানার উপর একটি বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু বোমাটি ফাটে নাই। ১৫ই আগস্ট কোট নাজিবুল্লা নামক স্থানের এক গৃহে বসিয়া বোমা তৈরী করিবার সময় একটি বোমা ফাটিয়া গেলে এক যুবক আহত হয়।

ইহা ব্যতীত উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আর কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপের উল্লেখ দেখা যায় না।

আসাম

১৯৩১ খৃস্টাব্দ

১৬ই জানুয়ারী হরষপুর ও গোবিন্দপুরের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ডাকাতি করিয়া বিপ্লবীরা ৩৪২০৲ টাকা লইয়া যায়। ৩১শে জানুয়ারী কামালগঞ্জ নামক স্থানে একটি ডাক লুণ্ঠিত হয়। ২রা জুলাই গৌরীপুর জংসনের নিকট এক বাড়ীতে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হয়। এই ডাকাতিতে ২৭৯৭৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

১৯৩২ খৃস্টাব্দ

২৭শে ফেব্রুয়ারী সায়েস্তাগঞ্জ ও হবিগঞ্জের মধ্যবর্তী কোনস্থানে চারিজন মুখোসধারী যুবক রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া একটি ট্রেনের ডাক-গাড়ীতে প্রবেশ করে এবং ডাকের সকল ব্যাগ লইয়া উধাও হয়। ২৭শে সেপ্টেম্বর দুঘার নামক স্থানে একটি ডাকাতিতে নগদ ও অলংকারে ১৫৪০০৲ টাকা লুণ্ঠিত হয়।

১৯৩৩ খৃস্টাব্দ

১২ই জানুয়ারী শ্রীহট্টের নিকট চারিজন যুবক দুইজন ডাকবাহীকে শ্রীহট্ট হইতে সুনামগঞ্জ যাইবার পথে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে ডাকের থলিয়াগুলি কাড়িয়া লয় এবং থলিয়ার মধ্য হইতে ইনসিওর-খামে ভরা প্রায় হাজার টাকা ও উহা ব্যতীত নগদ ৪ শত টাকা লইয়া উধাও হয়।

ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রীহট্ট জিলায় এক ডাকাতিতে প্রায় তিন হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই ডাকাতির সময় একটি বালক দুর্ভাগ্যক্রমে বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত

হয়। ১৩ই মার্চ শ্রীহট্ট জিলার ইটাখোলা নামক স্থানে ছয় জন যুবক রিভলভার প্রভৃতি অস্ত্র লইয়া একজন ডাক-হরকরাকে আক্রমণ করিয়া তাহার নিকট হইতে ডাকের থলিয়াটি কাড়িয়া লয়। এই সময় কতিপয় ব্যক্তি যুবকদের ঘিরিয়া ফেলিলে একজন যুবক রিভলভার হইতে গুলি বর্ষণ করে। ইহার ফলে এক ব্যক্তি নিহত ও কয়েক ব্যক্তি আহত হয়। যুবকটি ঘটনাস্থলে ধরা পড়ে। ইতিমধ্যে অন্যান্য যুবকগণ ডাকের থলিয়া হইতে চৌদ্দশত টাকা লইয়া পলায়ন করে। পরে আরও চারিজন যুবক এই সম্পর্কে গ্রেপ্তার হয়।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ

মার্চ মাসে শ্রীহট্ট জিলায় একটি ডাক লুটে প্রায় দশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। এই সময় বিপ্লবীদের দমনের উদ্দেশ্যে আসামের আইন-সভায় একটি দমনমূলক আইন পাশ হয়। কিন্তু এই আইন পাশ হইবার পরেও বহু ডাকাতি এবং ডাক ও ট্রেন লুট হয়। ইহাদের মধ্যে দুইটি ট্রেন-ডাকাতি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। একটি ট্রেন-ডাকাতি হয় ১৯৩২ খৃস্টাব্দের জুন মাসে এবং অপরটি হয় ঐ বৎসরের নভেম্বর মাসে। এই দুইটি ডাকাতিতে প্রায় বিশ হাজার টাকা লুণ্ঠিত হয়। (১)

* * * * *

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশে এই সময়ের বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ কেবল মাত্র ব্রহ্মদেশের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী মতে, এই সকল বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপে কোন ব্রহ্মদেশীয় লোক অংশ গ্রহণ করে নাই। (২)

১৯৩০ খৃস্টাব্দ

২রা জুলাই ইন্‌সিন শহরের নিকটে দুইজন উচ্চপদস্থ পুলিশ-কর্ম্মচারীকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে রিভলভার হইতে গুলি ছোঁড়া হয়। ঐ কর্মচারীরা আহত হইয়াও প্রাণে বাঁচিয়া যায়। ১লা সেপ্টেম্বর প্রকাশ্য দিবালোকে

(১) Govt. of India publication—'India in 1933-34', P. 48.
(২) same, P. 48- (৩) same, P. 48.

রেঙ্গুনের রাস্তায় একটি ডাক লুট হয়। ২৮শে অক্টোবর মুভিন্তা ও নাউন্দ-চিডাউক স্টেশনের মধ্যবর্তী স্থানে রেঙ্গুন মেল-ট্রেনখানিকে লাইনচ্যুত করা হয়।

১৯৩৪ খৃস্টাব্দ

এই বৎসর আকিয়াবের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে বৈপ্লবিক প্রভাব বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই স্থানের বাঙ্গালীদের মধ্যে কয়েকজন যুবক একত্রিত হইয়া একটি বিপ্লবীদল গড়িয়া তোলে এবং ইহাদের দ্বারা কয়েকটি বৈপ্লবিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় রেঙ্গুন শহরেও বাঙ্গালীরা একটি বিপ্লবীদল গড়িয়া তোলে। নিম্নোক্ত বিষয়গুলি রেঙ্গুনের এই বিপ্লবীদলের কর্মপন্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল: সশস্ত্র ও অন্যান্য ডাকাতি, ব্যাঙ্ক-লুট, উচ্চপদস্থ পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের হত্যা। রেঙ্গুনের একটি বাঙ্গালী ছাত্রকে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার নিকট হইতে পুলিশ এই সকল তথ্য জানিতে পারে।

* * * * *

বিপ্লব-প্রচেষ্টার অবসান

১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ও উত্তর-ভারতের মোট তিন সহস্রাধিক বিপ্লবী বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও বিনা বিচারে আটক হন। কেবল মাত্র বাংলা দেশেই ২১৭৭ জনকে বিনা বিচারে আটক রাখা হয়। ইহাদের বহরমপুর, বক্সা, হিজলী ও দেউলী বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ রাখা হয় এবং দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবীদের প্রায় সকলকেই প্রেরণ করা হয় সুদূর আন্দামান দ্বীপে।

বিনা বিচারে আটক বন্দীদের প্রায় সকলেই ১৯৩০-৩৪ হইতে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ থাকেন। কিন্তু বন্দীরা জেলখানায় আবদ্ধ হইয়াও তাঁহাদের সংগ্রাম ভুলিয়া যান নাই। ১৯৩২ খৃস্টাব্দে কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় হিজলী বন্দী-শিবিরে দুইজন রাজবন্দী, সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন, বন্দী-শিবিরের শান্ত্রীদের গুলিতে নিহত এবং

আরও বহু রাজবন্দী আহত হন। পরে আহত রাজবন্দীদের কয়েকজনকে বন্দী-শিবির হইতে খড়্গপুর হাসপাতালে পুলিশ-পাহারায় স্থানান্তরিত করিবার সময় দুইজন নেতৃস্থানীয় রাজবন্দী পলায়ন করেন। ইহা ব্যতীত এই সময়ের মধ্যে আরও কয়েকজন রাজবন্দী বাহিরের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদান করিবার জন্য বিভিন্ন বন্দী-শিবির ও জেলখানা হইতে পলায়ন করেন। বিভিন্ন বন্দী-শিবির ও জেলখানার নানাবিধ রক্ষা-ব্যবস্থা ও অসংখ্য সিপাহী-শান্ত্রীর সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া ঐ রাজবন্দীরা যেভাবে পলায়ন করেন তাহাতে এমন কি শাসকগোষ্ঠীও বিস্ময়ে অভিভূত হয়। এই সময়ের মধ্যে বক্সা বন্দী-শিবির হইতে দুইজন, বহরমপুর বন্দী-শিবির হইতে দুইজন এবং সর্বাপেক্ষা সুরক্ষিত মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে দুইজন বন্দী পলায়ন করেন। পরে তাঁহাদের সকলেই পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া বিভিন্ন ষড়যন্ত্র মামলা ও বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপের অভিযোগে দীর্ঘ কারাদণ্ড লাভ করেন। মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেল হইতে যে দুইজন বন্দী পলায়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে 'ডালহৌসি-স্কোয়ার বোমার মামলা'য় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত দীনেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন অন্যতম। তিনি ১৯৩৩ খৃস্টাব্দে পুনরায় গ্রেপ্তার হইয়া এক বিশেষ আদালতের বিচারের রায় অনুসারে ফাঁসি-কাষ্ঠে প্রাণ দেন। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দে আন্দামান-জেলে আবদ্ধ দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরা তাঁহাদের ভারতবর্ষে ফিরাইয়া আনিবার দাবি লইয়া অনশন-ধর্মঘট শুরু করেন। এই ঐতিহাসিক সংগ্রামে 'লাহোর ষড়যন্ত্র-মামলা'র মহাবীর সিং প্রাণ বিসর্জন দেন। এই বিখ্যাত অনশন-ধর্মঘটের সংবাদ ভারতবর্ষে পৌঁছিবামাত্র সারা ভারতের ছাত্র-যুবসমাজ এক বিরাট সংগ্রাম' আরম্ভ করে এবং ভারতের বিভিন্ন বন্দীশালায় আবদ্ধ বিপ্লবী রাজবন্দীরাও আন্দামানের বন্দীদের দাবি সমর্থন করিয়া অনশন-ধর্মঘট শুরু করেন। এই দেশব্যাপী সংগ্রামের ফলে শাসকগণ অবশেষে আন্দামান হইতে বন্দীদের ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হয়।

এদিকে বিভিন্ন জেল ও বন্দীশালায় আবদ্ধ রাজবন্দী ও কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের চিন্তাধারায় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে। এবার দীর্ঘকাল জেলখানায় আবদ্ধ

থাকিবার ফলে বিপ্লবীরা তাঁহাদের বিপ্লব-প্রচেষ্টা, বৈপ্লবিক ক্রিয়াকলাপ ও সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আদর্শ সম্বন্ধে চিন্তা ও পর্যালোচনা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পান। বারবার বিপ্লব-প্রচেষ্টার ব্যর্থতার ফলে এবার বিশেষ করিয়া সংখ্যাধিক তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আদর্শ সম্বন্ধে সমালোচনার মনোভাব জাগিয়া উঠে। তরুণ বিপ্লবীদের মধ্যে এই সমালোচনা ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং সেই সমালোচনা হইতে একটা রূঢ় সত্য ক্রমশঃ তরুণ বিপ্লবীদের মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে। এই সত্যটি কেবল বাংলাদেশের বিপ্লবীদের মনেই দেখা দেয় নাই, তাহা বাংলা ও উত্তর-ভারতের সকল তরুণ বিপ্লবীদের কাছে সমান ভাবেই ধরা পড়িয়াছিল। ভগৎ সিং ও চন্দ্রশেখর আজাদের সহকর্মী অজয় ঘোষের ভাষায় তাহা হইল এই :—

"যে সত্য এতদিন চাপা ছিল, সে দিন তা বেরিয়ে পড়ল। সেই সত্য এই যে, কেবলমাত্র মধ্যশ্রেণী নিয়ে গড়া বিপ্লবীদল ব্যক্তিগত বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে সবচেয়ে বড় সংগ্রাম বলে মনে করে বলেই জনগণ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে দেশকে তারা জাগাতে তো পারেই না, বরং দলগত একতা ও নীতি-বোধের জন্য নেতাদের ব্যক্তিত্বের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়। এমনি করেই জীবন সেদিন আমাদের সব মোহ ভেঙ্গে দিল। সন্ত্রাসবাদের প্রতি যেটুকু বিশ্বাস ছিল তাও হারিয়ে ফেললাম। পুরানো যা ছিল তা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু কোন পথ এবার গ্রহণ করবো, কোন পথ?" (১)

বিপ্লবীরা এই পথের সন্ধান পূর্ব হইতেই পাইয়াছিলেন, এবার তাঁহারা সেই পথকেই একমাত্র পথ বলিয়া গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন। সেই পথ হইল গণ-সংগ্রামের পথ। এই সময় গণ-সংগ্রামের পথ বিপ্লবীদের নিকট এক অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াই ধরা দেয়। আর সেই পথ ভারতের ব্যাপকতম জাতীয় সংগ্রামের মধ্য হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে। বিপ্লবীরা দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল ধরিয়া যে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য লইয়া সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে, অবশেষে সেই পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্য সমগ্র ভারতের জনসাধারণের লক্ষ্যে পরিণত হইয়াছে। এই

(১) অজয়কুমার ঘোষ : "ভগৎ সিং ও তাহার সহকর্মীরা" (অনুবাদ), পৃঃ ৪৫।

দীর্ঘকালের বৈপ্লবিক সংগ্রামের শিক্ষায় ও অনিবার্য প্রভাবে ১৯১৯ খৃস্টাব্দে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতাই ভারতের জাতীয় সংগ্রামের চরম লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। দীর্ঘ ৩৮ বৎসর ব্যাপী আপস-পলায়নহীন বৈপ্লবিক সংগ্রামে বিপ্লবীদের এত আত্মত্যাগ, এত লাঞ্ছনা, এত দুঃখ বরণ এইভাবে সার্থক হইয়া উঠিয়াছে। বৈপ্লবিক সংগ্রামের দ্বারা ভারতের বৈদেশিক শাসনের উচ্ছেদ ও স্বাধীনতা লাভ সম্ভব না হইলেও সকল শ্রেণীর জনসাধারণকে পূর্ণ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম উহার ঐতিহাসিক কর্তব্য সম্পাদনে অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছে। সুতরাং বিপ্লবীরা উপলব্ধি করিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের আর কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, এখন পূর্ণ স্বাধীনতা জাতীয় সংগ্রামের চরম লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হওয়ায় এবং সেই চরম লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে জনসাধারণের আবির্ভাবের ফলে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম এখন জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সহিত সামঞ্জস্যহীন ও অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে, সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম এখন উহার ঐতিহাসিক তাৎপর্য হারাইয়া ফেলিয়াছে। সুতরাং এইভাবে রাজনৈতিক ভিত্তি হারাইবার ফলে স্বভাবতই এবার সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রামের অবসান অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে।

এদিকে দেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও গুরুতর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এতদিন ইংরেজ-শাসকগণ সামনে থাকিয়া সাক্ষাৎভাবে শাসন-কার্য পরিচালনা করিয়া আসিয়াছে। এবার ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের নূতন শাসনতন্ত্র চালু হওয়ায় কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ দেশের শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করেন। দেশীয় মন্ত্রীদের কার্যে বৃটিশ-সরকার অনাবশ্যক ভাবে হস্তক্ষেপ করিবে না—এই আশ্বাসে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতের নয়টি প্রদেশে কংগ্রেস একক মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং বাকী দুইটি প্রদেশে, অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশেও দেশীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইহার ফলে রাজনৈতিক অবস্থা এবং জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রেও মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয়। এতদিন যাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার

ছিলেন, যাঁহাদের নেতৃত্বে এতদিন দেশের কোটি কোটি মানুষ স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, এবার তাঁহাদেরই দেশের শাসন-কার্যের পরিচালকরূপে দেখিয়া জনসাধারণের মধ্যে নূতন আশা-ভরসা জাগিয়া উঠে। দেশীয় মন্ত্রি-সভা, বিশেষ করিয়া নয়টি প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা এতদিনের প্রচলিত বহু অত্যাচার-উৎপীড়ন মূলক আইন-কানুন রদ করিয়া উহাদের পরিবর্তে আংশিক ব্যক্তি-স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের রাজনৈতিক অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন দেখা দেয় এবং প্রত্যেকটি শ্রেণীর নিজস্ব দাবি ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এক উচ্চতর পর্যায়ে আরোহণ করে। এই পরিবর্তনের ফলে দেশব্যাপী যে নূতন ও ব্যাপক গণ-সংগ্রাম গড়িয়া উঠিতে থাকে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগ্রাম সেই গণসংগ্রামের দিক হইতেও সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যহীন ও অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং বিপ্লবীরা এবার বাহিরে আসিয়া সেই নূতন গণ-সংগ্রামের সহিত নিজেদের মিলিত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

যে সকল প্রদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভা গঠিত হয় সেই সকল প্রদেশে পূর্বে রাজ-নৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বাংলাদেশে ফজলুলহকের মন্ত্রি-সভা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান না করায় অবশেষে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে গান্ধীজী স্বয়ং বন্দী-মুক্তি সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করেন। তাঁহার হস্তক্ষেপের ফলে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের শেষভাগে ও ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের প্রথমভাগে বাংলাদেশের বিনা-বিচারে আটক রাজবন্দীরাও মুক্তিলাভ করেন। কিন্তু আন্দামান-ফেরৎ কারাদণ্ডিত বন্দীরা তখনও মুক্তি পাইলেন না। আরও কিছু দিন পর একটি অনশন-ধর্মঘটের দ্বারা তাঁহারা তাঁহাদের মুক্তি আদায় করিতে সক্ষম হন।

বিপ্লবীরা এইভাবে মুক্তি পাইয়া বাহিরে আসেন। কিন্তু এবার তাঁহারা কোন পথ, কোন আদর্শ গ্রহণ করিবেন? পথের সন্ধান, দীর্ঘকালের বিপ্লব-প্রচেষ্টার পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন জেল ও বন্দীশালায় বসিয়া রাজনৈতিক আলোচনা ও পুস্তক পাঠের মধ্য দিয়া বিপ্লবীরা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন যে, "মুষ্টিমেয় যুবক মিলে বিপ্লব করতে পারে না, দেশকেও জাগাতে পারে না। বিপ্লব দ্বারা বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করতে হ'লে চাই সহিষ্ণুতার সঙ্গে জনগণের

মধ্যে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনা। তাদের নিজেদের দাবির ভিত্তির উপর তাদের সংগঠিত ক'রে ছোট ছোট সংঘাতের মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে ক্ষমতা অধিকার করবার জন্য সর্বশেষ সংগ্রামের পথে চালিত করতে হবে। সেই খানেই বিপ্লবের সার্থকতা।" (১)

সমাজবাদের আদর্শ তরুণ ও চিন্তাশীল বিপ্লবীদের এই উপলব্ধি দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত করে। সমাজবাদের আদর্শ বহু পূর্ব হইতেই তরুণ বিপ্লবীদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছিল। বিভিন্ন জেল ও বন্দীশালায় বসিয়া বিপ্লবীরা এই আদর্শ বুঝিবার জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া আলোচনা ও সমাজবাদের গ্রন্থ পাঠ করেন। ইহার ফলে বিপ্লবীদের একটা বিরাট অংশ জেলে বসিয়াই সমাজবাদের আদর্শ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়া মুক্তির পর কমিউনিস্ট ও সোসালিস্ট পার্টিতে যোগদানের জন্য প্রস্তুত হন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা নিজেদের কমিউনিস্ট বলিয়া মনে করিতেন তাঁহারা জেল ও বন্দীশালায় থাকিতেই নিজেদের উপযুক্ত কমিউনিস্টরূপে গড়িয়া তুলিবার জন্য একত্রিত হইয়া 'কনিউসিস্ট কনসোলিডেসন' (কমিউনিস্ট-সংহতি) নামে সংগঠন স্থাপন করেন। মুক্তি লাভের পর ইঁহারা প্রায় সকলেই কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ইহা ব্যতীত অনুশীলন পার্টির প্রায় সকল সভ্য নিজেদের সমাজবাদী বলিয়া ঘোষণা করিয়া 'রেভলিউশনারী সোসালিস্ট পার্টি' (আর-এস-পি) গঠন করেন। কিন্তু প্রবীন বিপ্লবী নেতাদের কেহই কমিউনিস্ট পার্টি অথবা সোসালিস্ট পার্টিতে যোগদেন করিলেন না। বহু পূর্ব হইতেই তাঁহাদের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ গড়িয়া উঠিয়াছিল। এবার তাঁহারা বাহিরে আসিয়া কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থা মানিয়া লইয়া কংগ্রেসের কার্যেই সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করেন। এইভাবে ভারতের সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামের অবসান ঘটে।

(১) অজয়কুমার ঘোষ : ভগৎ সিং ও তাঁহার সহকর্মীরা (অনুবাদ), পৃঃ ৪৭।

পঞ্চম অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলনে বৈপ্লবিক সংগ্রামের স্থান

রাজনৈতিক ও সামাজিক মূল্য

বিচার

ভারতবর্ষে বিপ্লববাদের অভ্যুদয় কতকগুলি বিশেষ সামাজিক-রাজনৈতিক কারণের অবশ্যম্ভাবী ফল। শোষণ-উৎপীড়ন মূলক বৈদেশিক শাসন, উন্নত ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর চরম অর্থনৈতিক দুর্দশা, তাহাদের মধ্যে জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ, গোড়ার দিকের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বের আপসপন্থী মনোভাব—এইগুলি সেই সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল কারণই জাতীয় আন্দোলনের আপসপন্থী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে আপসবিরোধী চরমপন্থী ভাবধারার সৃষ্টি করে। জাতীয় আন্দোলনের আপস-বিরোধী চরমপন্থী ভাবধারা হইতেই ভারতের বিপ্লববাদের সৃষ্টি। তাই জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী ভাবধারার মতই ভারতের বিপ্লববাদও সামাজিক-রাজনৈতিক কারণ সমূহের অনিবার্য ফল। এই জন্যই ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে পরস্পর বিরোধী কারণ সমূহের যে দ্বন্দ্ব প্রথম হইতেই দেখা দেয়, সেই দ্বন্দ্ব চরমপন্থী রাজনৈতিক ভাবধারা এবং বিপ্লববাদের মধ্যেও প্রথম হইতেই প্রতিফলিত হইয়াছিল।

গোড়ার দিকের জাতীয় আন্দোলনের আপসপন্থী পুরাতন নেতৃত্ব কোন সময়েই শোষণ ও উৎপীড়ন মূলক বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা চিন্তাও করিতে পারেন নাই। অথচ তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের প্রধান শক্তি শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী চরম আর্থিক দুর্দশার চাপে পরাধীনতার জ্বালায় অস্থির হইয়া আপস-বিরোধী প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য হয়। এই দ্বন্দ্বই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরম পন্থার সৃষ্টি করে। এই আপসহীন চরমপন্থী সংগ্রামের মনোভাব জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতির

সূচনা করে। কিন্তু অনিবার্য সামাজিক-অর্থনৈতিক কারণেই এই অগ্রগতির মূলে কয়েকটি বিরাট দুর্বলতা থাকিয়া যায় এবং সেই দুর্বলতা লইয়াই ইহা বাড়িয়া উঠে। এই চরমপন্থী সংগ্রামের মনোভাব তখন পর্যন্ত কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তখন পর্যন্ত জনসাধারণের অপর কোন অংশই মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের কল্পিত এই চূড়ান্ত সংগ্রামে যোগদান করিতে এবং ইহাকে কার্যকরী ও সফল করিয়া তুলিতে প্রস্তুত ছিল না। যে উন্নত জাতীয় চেতনা থাকিলে তাহা সম্ভব হইতে পারে তাহা তখনও জনসাধারণের মধ্যে দেখা দেয় নাই। তখনকার সামাজিক-রাজনৈতিক অবস্থায় জনগণের মধ্যে চেতনার উন্মেষের কোন সম্ভাবনাও ছিল না। কাজেই জনগণের মধ্যে সেই চেতনা না থাকাতে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দও জনগণের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে এবং তাহাদের জাতীয় সংগ্রামের প্রধান শক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাই তাঁহাদের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করিয়া গণ-সংগ্রাম গড়িয়া তুলিবার কথা কল্পনা করাও সম্ভব হয় নাই। এই জন্যই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত চরমপন্থী বা নরমপন্থী কোন নেতৃত্বই বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণকে জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে টানিয়া আনিবার কথা ভাবিতে পারেন নাই। সুতরাং চরমপন্থীরা তাঁহাদের আপস-বিরোধী সংগ্রামের মনোভাবের দ্বারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরাট অগ্রগতির সূচনা করিলেও গণ-দৃষ্টিভঙ্গি ও গণ-সংযোগহীন হইবার ফলে সেই অগ্রগতিকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে ব্যর্থ হন। গণ-সংগ্রামের পথ তখনও স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই বলিয়াই বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের অবরুদ্ধ ক্রোধ ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদের রূপে ফাটিয়া পড়ে। দেশব্যাপী সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের দূর পরিকল্পনা সত্ত্বেও ভারতের বিপ্লববাদ মূলতঃ এই সন্ত্রাসবাদকে ভিত্তি করিয়াই গড়িয়া উঠিতে থাকে।

ভারতের বিপ্লববাদ গণ-সংগ্রামের সহিত সংযুক্ত না হইবার ফলে উহা গোড়ার দিকে আর একটি দুর্বলতা আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠে। শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী যখন বহু ব্যয়সাধ্য ও কষ্টার্জিত ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক দুর্দশার

কবল হইতে মুক্তি পাইল না, তখন তাহাদের মধ্যে দেখা দিল দারুণ হতাশা। এই হতাশা ও মরিয়া মনোভাব তাহাদের আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিরূপ করিয়া তোলে। অন্য দিকে তখন বিদেশী শাসকদের সর্বগ্রাসী ধনিক সভ্যতার কবল হইতে ভারতের প্রাচীন সভ্যতাকে বাঁচাইবার জন্য জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত মধ্য-শ্রেণী মরিয়া হইয়া উঠে। এই দুইটি কারণে শিক্ষিত সম্প্রদায় একদিকে য়ুরোপীয় সভ্যতার ঘোরতর বিরোধী হইয়া উঠে, য়ুরোপীয় সভ্যতার গ্রহণযোগ্য প্রগতিশীল বিষয়গুলিও 'শাসকদের সভ্যতা' বলিয়া ঘৃণাভরে বর্জন করে, আর অপর দিকে তাহারা মরিয়া হইয়া সনাতন হিন্দুধর্মের ভালমন্দ সব কিছু "একমাত্র খাঁটি ও পবিত্র" বলিয়া বরণ করে। তাহারা এইভাবে আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পরিবর্তে সমাজ-প্রগতির আধুনিক স্তরের সহিত সামঞ্জস্যহীন প্রাচীন হিন্দুধর্মের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে এবং প্রাচীন হিন্দুধর্মের উপরই তাহারা তাহাদের চরমপন্থী রাজনীতির বনিয়াদ গড়িয়া তোলে। এইভাবে চরমপন্থীরা তাহাদের আধুনিক ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবধারার সহিত প্রগতি-বিরোধী প্রাচীন হিন্দুধর্মের সংযোগ সাধন করিয়া জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। চরমপন্থীদের সৃষ্ট এই পরস্পর-বিরোধী আদর্শের সংমিশ্রণ সেই সময় হইতেই বরাবর ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে নানা ভাবে ও নানারূপে প্রভাবান্বিত করিতে থাকে।

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে পরস্পর-বিরোধী চরমপন্থা ও প্রাচীন হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণের প্রথম পথ-প্রদর্শক হইলেন তৎকালীন চরমপন্থী জাতীয়তা-বাদের শ্রেষ্ঠ নায়ক বালগঙ্গাধর তিলক। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের এই শ্রেষ্ঠ নায়ক তাঁহার এই পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের ফলে ১৮৯০ খৃস্টাব্দে তৎকালীন সামাজিক অবস্থায় প্রগতিশীল 'এজ অফ কন্‌সেণ্ট বিল' নামক একটি আইনের খসড়ার তীব্র বিরোধিতা করেন। এই আইনে হিন্দু বালিকাদের বিবাহের বয়স দশ হইতে বাড়াইয়া বারো করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছিল। রাণাডে প্রভৃতি তখনকার সকল প্রবীন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই সমাজ-সংস্কার মূলক আইনের স্বপক্ষে দাঁড়াইয়া প্রগতিশীলতার পরিচয় দিলেন, কিন্তু সর্বাপেক্ষা

প্রগতিশীল রাজনৈতিক ভাবধারার স্রষ্টা হইয়াও বালগঙ্গাধর তিলক তাঁহার বিপুল প্রভাব লইয়া ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং এই ভাবে সনাতন হিন্দুধর্ম রক্ষার অজুহাতে বাল্য বিবাহের সমর্থন করিয়া প্রগতি-বিরোধীদের শক্তিশালী করিয়া তোলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি 'গো-রক্ষা সমিতি' স্থাপন করিয়া হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে "গো-মাতা"কে রক্ষা করিবার জন্য গো-মাংস-ভোজীদের বিরুদ্ধে এক প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক যুক্তিতর্কের কথা বাদ দিলেও প্রধানতঃ ভারতের মুসলমানদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হওয়ায় ইহা জাতীয় আন্দোলনের ঐক্য ও অগ্রগতি ব্যাহত করিবার পক্ষে সহায়ক হয়। কারণ, এই আন্দোলন জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের পরিবর্তে এই দুই সম্প্রদায়ের বিরোধের একটি কারণ হইয়া থাকে।

জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনীতি-ক্ষেত্রে যে মতই পোষণ করুন না কেন, তাঁহারা ধর্মের প্রশ্নটিকে রাজনীতি হইতে দূরেই রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তিলক ও অন্যান্য চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ রাজনীতিকে ধর্মের পোষাকে আবৃত করিয়া এবং তাহার সাহায্যে হিন্দু মধ্যশ্রেণীর সহজাত ধর্ম-সংস্কারে আঘাত দিয়া তাহাদের মধ্যে ইংরেজ-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা জাগাইবার চেষ্টা করেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাষ্ট্রে তিলক গণপতি দেবতাকে, আর বাংলা দেশের চরমপন্থী নেতারা শক্তির দেবতা কালীকে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রেরণা দাতারূপে আমদানি করেন। বাংলা দেশের চরমপন্থী ভাবধারা ও বৈপ্লবিক আদর্শের অন্যতম পথ প্রদর্শক অরবিন্দ ঘোষ ঈশ্বর ও জাতীয়তাবাদকে এক ও অভিন্ন বলিয়া ঘোষণা করেন।

ভারতের মুসলমানগণ যে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় যোগদান করে নাই, রাজনীতির সহিত হিন্দুধর্মের সংমিশ্রনই তাহার অন্যতম প্রধান কারণ। তাহার ফলে ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টা প্রথম হইতেই কেবল মাত্র হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে এবং এইভাবে প্রগতিশীল চরমপন্থী জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে ভারতের সমগ্র জনগণের ঐক্যের বদলে বিভেদের ভিত্তি রচিত হয়।

সামাজিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় যে, গোড়ার দিকের জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনৈতিক দিক হইতে কোন প্রগতিশীলতার পরিচয় দিতে না পারিলেও তাঁহারা সামাজিক দিক হইতে বিভিন্ন বিষয়ে প্রগতি-শীল ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন, আর অন্য দিকে (চরমপন্থী নেতৃত্ব রাজনৈতিক ভাবধারার দিক হইতে বিশেষ প্রগতিশীল ভূমিকা গ্রহণ করিলেও তাঁহারা বিভিন্ন সামাজিক কুসংস্কার সমর্থন করিয়া তখনকার অবস্থায় সামাজিক অগ্রগতি যতটুকু সম্ভব ছিল তাহাও ব্যাহত হইতে সাহায্য করিয়াছেন। এই ভাবে জাতীয় আন্দোলনের চরমপন্থী নেতৃত্ব "রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রগতি বিরোধী" বলিয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে চিহ্নিত হইয়া রহিয়াছেন।)

(চরমপন্থীদের এই ধর্মীয় ও সমাজ-প্রগতি বিরোধী ভাবধারা কেবল নীতির দিক হইতেই নহে, কৌশলের দিক হইতেও জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে ক্ষতিকর হইয়া উঠে। ইহার ফলে উক্ত ভাবধারা জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজ-নৈতিক চেতনার বিকাশে বাধা হইয়া দাঁড়ায়,) এমন কি ইহার ফলে তাঁহারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হন। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, চরমপন্থী নেতৃত্বের অনেকেই শেষ পর্যন্ত বিপ্লব-প্রচেষ্টা, এমন কি রাজনীতির সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া ধর্মসাধনা বা আপসমূলক রাজনীতির পথ গ্রহণ করেন।

(চরমপন্থীদের সমাজ-প্রগতিবিরোধী আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের ফলে জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের একটি অংশ চরমপন্থী রাজনীতির প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি হারাইয়া ফেলেন এবং উহার প্রতি বিরূপ হইয়া এমনকি শেষপর্যন্ত চরমপন্থীদের বিরুদ্ধেও আন্দোলন শুরু করেন। এইভাবে জাতীয় আন্দোলনের প্রগতিশীল অংশের মধ্যেও বিভেদ দেখা দেয়। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁহার 'আত্মজীবনী'তে তাঁহার পিতা ও তৎকালীন জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রগতিশীল নায়ক পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর রাজনৈতিক মনোভাব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই বিভেদের কথা ও তৎকালীন চরম-পন্থীদের সমাজ-প্রগতিবিরোধী ভাবধারার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন:)

"এই দৃঢ়চেতা, গভীর ভাব-প্রবণ, তেজোদৃপ্ত ও প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষটি (পণ্ডিত মতিলাল) ছিলেন নরমপন্থীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। কিন্তু তথাপি ১৯০৭ ও ১৯০৯ খৃস্টাব্দ এবং তাহার পরের কয়েক বৎসর পর্যন্ত নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন নরমপন্থীদের চেয়েও নরমপন্থী, আর চরমপন্থীদের উপর খড়্গহস্ত। তবে আমার মনে হয়, তিনি তিলককে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

"ইহার কারণ কি ?.........তিনি তাঁহার স্পষ্ট চিন্তাধারার মারফত উপলব্ধি করেন যে, বড় বড় ও চরমপন্থী বুলি যদি অনুরূপ কাজের দ্বারা সমর্থিত না হয় তবে সেই সকল বুলি অর্থহীন হইয়া পড়ে। তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি মেলিয়া কোন কার্যকরী কর্মপন্থা দেখিতে পান নাই।......আর তখনকার চরমপন্থী আন্দোলনের ভিত্তি ছিল একটা ধর্মমূলক জাতীয়তাবাদ। সেই ধর্মমূলক জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার স্বভাবের সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। তিনি কখনই প্রাচীন ভারতের পুনরভ্যুদয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন নাই। প্রাচীন ভারতের ভাবধারার প্রতি তাঁহার কোন সহানুভূতি ছিল না, অথবা সেইগুলি সম্বন্ধে তাঁহার কোন ধারণাও ছিলনা। তিনি প্রাচীনকালের সমাজ-প্রথা, জাতি-বিভাগ বা ঐ ধরনের বিষয়গুলিকে ঘৃণাই করিতেন। কারণ ঐগুলিকে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল পশ্চিমের দিকে, পশ্চিমী প্রগতির প্রতি তিনি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, ইংলণ্ডের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মারফতেই এই প্রগতি (ভারতবর্ষেও) আসিতে পারে।

"সামাজিক দিক্ হইতে বিচার করিলে, ১৯০৭ খৃস্টাব্দে যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় হয় তাহা ছিল নিশ্চিত রূপে প্রতিক্রিয়াশীল।" (১)

কিন্তু একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, চরমপন্থীরা গভীর দেশভক্তি ও দ্রুত স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়াই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে ধর্মের আমদানি করিয়াছিলেন এবং বৈদেশিক শাসকদের প্রতি তীব্র ঘৃণাই তাঁহাদের

(১) Jawhar Lall Neheru : "Auto-biography", P. 23-24.

প্রাচীন হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয়ের প্রয়াসী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা ধর্মানুষ্ঠান ও বাৎসরিক ধর্মোৎসব উপলক্ষে যে সকল বড় সভা-সমিতি ও গণ-সমাবেশ করিতেন তাহাতে ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক প্রচার ও বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভই সৃষ্টি করা হইত। তাঁহারা এই সকল উৎসব সামনে রাখিয়া ব্যাপক ভাবে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়িয়া তুলিতেন এবং ধর্মের আবরণে বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য লইয়া ব্যায়ামের আখড়া ও যুবসমিতি প্রতিষ্ঠা করিতেন। তখনকার দিনে সরকারী দমননীতির প্রচণ্ড প্রকোপে প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তোলা ও রাজনৈতিক প্রচার-কার্য চালানো সম্ভব ছিল না। সেই সময়ে শাসকগোষ্ঠী এমন কি সাধারণ শরীর-চর্চার আখড়াগুলিকেও ভয়ের চোখে দেখিত। সুতরাং সামাজিক দিক হইতে প্রতিক্রিয়াশীল হইলেও বৈপ্লবিক সংগঠন ও প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মের ব্যবহার তখন অপরিহার্য ও যুক্তিসম্মতই হইয়াছিল।

পরবর্তীকালের বিপ্লবীরা গোড়ার দিকের এই সকল দুর্বলতা বহুলাংশে কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার সময়, বৈপ্লবিক সংগ্রামের ক্ষেত্র আরও বিস্তৃত হইবার ফলে এবং বিপ্লববাদ মধ্যশ্রেণীর মধ্যে আরও ছড়াইয়া পড়ায় এই সংগ্রামের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহার ফলে এই দুই যুগের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী বিপ্লবীদের মধ্য হইতে ধর্মের প্রভাব যথেষ্ট হ্রাস পায়। গোড়ার দিকে দীক্ষার সময়ে যে সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা হইত তাহা এই দুই যুগে তুলিয়া দেওয়া হয়, এমনকি আনুষ্ঠানিক দীক্ষা-ব্যবস্থাও পরে লোপ পায়। ইহা নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক ভাবধারার একধাপ অগ্রগতি সূচনা করে।

বিপ্লববাদের অবদান

(১)

জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিপ্লবীদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান হইল পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি। বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের মারফত পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য লইয়াই ভারতের বিপ্লববাদের জন্ম। যখন জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব সামান্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের বেশী কিছু ভাবিতে পারিতেন না, এমন কি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনও ছিল তাঁহাদের কল্পনার বাহিরে, তখনই বিপ্লবীরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের দৃঢ় সংকল্প লইয়া ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়। তখন হইতে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দলে দলে ফাঁসী, গুলি, যাবজ্জীবন ও দীর্ঘ কারাদণ্ড বরণ করিয়া নিজেদের বিশেষ উপায়ে দীর্ঘ ৩৮ বৎসর কাল (১৮৯৭-১৯৩৪) মৃত্যুপণ সংগ্রাম চালাইয়াছেন।

দেশের জনসাধারণের জাতীয় চেতনার বিকাশ সাধনে বিপ্লবীদের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ও মৃত্যুপণ সংগ্রাম বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ১৯০৫ খৃস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষে সারা বাংলা ও ভারতবর্ষে জাতীয় জাগরণের যে প্রথম সাড়া জাগিয়া উঠে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল বিপ্লবীদের এই সংগ্রাম। বৈপ্লবিক প্রচার ও বিপ্লব-প্রচেষ্টা দেশের জনসাধারণের সামনে বিদেশী শাসনের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। সেই সময়ে বিপ্লবীদের প্রচার ও বিপ্লব-প্রচেষ্টা এবং বিপ্লবীদের সক্রিয় সমর্থনে বিদেশী বর্জন আন্দোলনই ১৯০৫-০৭ খৃস্টাব্দের প্রথম জাতীয় জাগরণ ও জাতীয় সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করিয়াছিল।

এই যুগের বিপ্লব-প্রচেষ্টা ও বিদেশী-বর্জন আন্দোলন একত্রে মিলিয়া দেশের মধ্যে যে নূতন জাতীয় চেতনার সৃষ্টি করে তাহার অনিবার্য প্রভাবেই জাতীয় আন্দোলনের নরমপন্থী নেতৃত্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবি গ্রহণ করিতে

বাধ্য হয়। তখনকার রাজনৈতিক অবস্থায় এই দাবি জাতীয় আন্দোলনের একধাপ অগ্রগতি সূচনা করিয়াছিল।

ইহার পর হইতে ১৯২৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান দাবি হইয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পরে কংগ্রেসের প্রধান দাবি হইল 'স্বরাজ'। কিন্তু 'স্বরাজ' শব্দের প্রকৃত অর্থ কোন দিন স্পষ্ট ভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নাই। কোন অজ্ঞাত কারণে এমন কি গান্ধীজী নিজেও কোন দিন ইহার ব্যাখ্যা দেন নাই। (১) কিন্তু কেহ এই 'স্বারাজ' শব্দটির কোন ব্যাখ্যা না করিলেও "ইহা খুবই স্পষ্ট ছিল যে, আমাদের নেতাদের প্রায় সকলেই 'স্বরাজ' শব্দের দ্বারা স্বাধীনতা অপেক্ষা যথেষ্ট কম কিছুই বুঝিতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এই সম্পর্কে গান্ধীজী কোনদিনই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেন নাই, আর এই সম্পর্কে কেহ স্পষ্ঠ ভাবে চিন্তা করুক তাহাও তিনি চাহিতেন না।" (২)

জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য সম্পর্কে বিপ্লবীদের মনে কোন অস্পষ্টতা ছিলনা। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি লইয়াই ভারতের বিপ্লববাদের জন্ম এবং পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের জন্যই বিপ্লবীরা শেষ পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়াছে। বিপ্লবীদের সেই সংগ্রামের ফলেই পূর্ণ স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত ভারতের জনসাধারণের দাবি হইয়া উঠিয়াছে।

১৯২৯ খৃস্টাব্দে লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি গৃহীত হয়। ইহার পূর্বে বিপ্লবীদের চেষ্টায় ও সমর্থনে সুভাষচন্দ্র এই দাবি তুলিয়াছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের বিরাট প্রভাবে তখন এই প্রস্তাব পরাজিত হয়। এই অধিবেশনের এক বৎসরের মধ্যে দেশের ভিতর একটা বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। সারা দেশব্যাপী একটা বিরাট সংগ্রামের ঢেউ উঠিতে শুরু করে, বাংলাদেশ ও গোটা উত্তর-ভারত ব্যাপীয়া বিপ্লবীরা চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়। সেই

(১) Subhas Chandra Basu. 'The Indian Struggle', 1920-34, p. 68, and Jawahar Lall Neheru : 'Auto-biography', p. 76.

(২) Jawaharlall Neheru : 'Auto-biography' p. 76.

সংগ্রামে সারা ভারতে যে বিরাট আলোড়ন শুরু হয় তাহা হইতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উঠিয়া ভারতের আকাশ-বাতাস কাঁপাইয়া তোলে। তখন আর কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষে এই দাবি অগ্রাহ্য করা সম্ভব হইল না। ১৯২৯ খৃস্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে ভারতের বিপ্লবীদের ও সমগ্র জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিধ্বনিত করিয়া লাহোর-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক এই দাবি গৃহীত হওয়ায় ইহার জন্য বিপ্লবীদের এতদিনের আত্ম-বিসর্জন, ত্যাগ ও দুঃখবরণ আংশিকভাবে সার্থক হইয়া উঠে, তাহাদের দাবি ভারতের সমগ্র জনসাধারণের সংগ্রামের ধ্বনিতে পরিণত হয়।

ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টার সকল ত্রুটি ও দুর্বলতা সত্ত্বেও বিপ্লবীরা এই ভাবে একটা বিরাট ও স্থায়ী সফলতা লাভ করিতে সক্ষম হন : প্রথমতঃ তাঁহাদের সংগ্রামের ফলেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ভারতের জনসাধারণ ও জাতীয় কংগ্রেসের দাবিতে পরিণত হয়; দ্বিতীয়তঃ এই দাবি সমগ্র জনসাধারণের সামনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

(২)

গোড়ার দিকে স্বাধীন ভারতের শাসনতান্ত্রিক রূপ সম্পর্কে বিপ্লবীদের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মহারাষ্ট্রের বিপ্লবীরা তাহাদের জাতীয় বীর শিবাজীর আদর্শে মহারাষ্ট্রে ও ভারতবর্ষে "ধর্মরাজ্য" স্থাপনের আদর্শ গ্রহণ করেন। ঐ সময় বাংলাদেশের বিপ্লবীদের মধ্যেও বহু প্রকারের মত দেখা দেয়—কেহ বলিতেন রাজতন্ত্র, কেহ বলিতেন মহারাষ্ট্রের মত "ধর্মরাজ্য", কেহ বা অস্পষ্ট ধারণা লইয়া "রামরাজ্য"-এর কথা বলিতেন। কিন্তু পরবর্তী যুগে, অর্থাৎ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার সময়, বিপ্লবীদের ধারণা আরও স্পষ্টতা লাভ করে। এই দিক হইতে বাংলা দেশের বিপ্লবীদের অপেক্ষাও উত্তর-ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যে উন্নত চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে নূতন বৈপ্লবিক সংগঠন শুরু করিবার সময় বিপ্লবীরা তাঁহাদের লক্ষ্য হিসাবে 'সাধারণতন্ত্র' (রিপাব্লিক) প্রতিষ্ঠার আদর্শ গ্রহণ করেন। স্বাধীন ভারতে গণভোটে, অর্থাৎ জাতি-ধর্ম ও স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথাই তাঁহারা চিন্তা করিয়াছিলেন। স্বাধীন ভারতে রিপাব্লিক বা সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ অনুসারেই উত্তর-ভারতের বিপ্লবীরা তাহাদের বৈপ্লবিক দলের নাম দেন 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'। বিপ্লবীদের এই আদর্শ ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের এক বিরাট অগ্রগতি সূচনা করে।

পরবর্তী যুগে উত্তর-ভারতের বিপ্লবীরা স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আরও স্পষ্ট, আরও উন্নত ধারণার পরিচয় দিতে সক্ষম হন। তখন সমাজবাদী আদর্শ সবেমাত্র এদেশে প্রচারিত হইতে শুরু করিয়াছে। সেই প্রথম অবস্থাতেই এই উন্নত আদর্শ বিপ্লবীদের আকৃষ্ট করে। বাংলাদেশের বিপ্লবীরাও তখন এই আদর্শ লইয়া আলোচনা শুরু করিয়াছেন। কিন্তু উত্তর-ভারতের 'হিন্দুস্থান রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন'-এর ভগৎ সিং, শিববর্মা, অজয় ঘোষ প্রভৃতি বিপ্লবী নায়কগণ কেবল এই আদর্শ লইয়া আলোচনার মধ্যেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। তাঁহারা তাঁহাদের কর্মপন্থার পরিবর্তন না করিলেও স্বাধীন ভারতের লক্ষ্য হিসাবে এই নূতন ও উন্নত আদর্শটিকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্য অনুসারেই তাঁহারা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদের দলের নাম পরিবর্তন করিয়া 'হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাব্লিকান এসোসিয়েশন' নাম দেন। এই নাম ভবিষ্যৎ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিকরূপ সম্পর্কে বিপ্লবীদের চিন্তাধারার আরও এক বিরাট অগ্রগতি সূচনা করে।

(৩)

ভারতের বিপ্লবীরা উপরোক্ত দুইটি আদর্শ ব্যতীত আরও যে সকল আদর্শ জনসাধারণকে শিক্ষা দেন তাহার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল আত্মত্যাগ, নীরব কর্ম-সাধনা, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, আদর্শ সিদ্ধির সংগ্রামে হাসিমুখে সকল

দুঃখ-যন্ত্রণা বরণ, সাহস ও বীরত্ব। দীর্ঘকালের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মারফত বিপ্লবীরা এই সকল আদর্শ জনসাধারণকে শিখাইতে সক্ষম হইয়াছেন এবং জন-সাধারণ তাঁহাদের এই সকল আদর্শ অন্তরের সহিত বরণ করিয়া বিপ্লবীদের "জাতীয় বীর" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল আদর্শের জন্যই জনসাধারণের নিকট হইতে বিপ্লবীরা যে শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়াছেন তাহা জাতীয় আন্দোলনের বহু শ্রেষ্ঠ নেতার ভাগ্যেও মেলে নাই। এই সকল আদর্শের জন্যই বৈপ্লবিক সংগ্রাম ভারতের জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এক স্থায়ী ও উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে এবং ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামকে গৌরব মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছে।

পঞ্চম খণ্ড

স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়

১৯৩৫-'৪৭ খৃস্টাব্দ

মহাসংগ্রামের শিক্ষা

কংগ্রেসের পরিচালনায় ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের ভারতব্যাপী গণ-সংগ্রাম এবং বাংলাদেশ ও উত্তর-ভারত ব্যাপী ১৯২৯-৩৪ খৃস্টাব্দের বৈপ্লবিক সংগ্রাম একত্রে মিলিয়া যে মহাসংগ্রামের সৃষ্টি করিয়াছিল সেই মহাসংগ্রামের ব্যর্থতার ফলে সারা দেশ গভীর হতাশায় ডুবিয়া যায়, সারা দেশে রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। তখন পণ্ডিত জহরলাল প্রভৃতি প্রধান নেতৃবৃন্দ কারাগারে আবদ্ধ, কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা বহুগুণ কমিয়া গিয়া মাত্র সাড়ে চার লক্ষে পরিণত হয়। ঠিক এই অবস্থায় ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। ১৯৩১ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে করাচী শহরে কংগ্রেসের যে বিশেষ অধিবেশন হয় তাহার পর বোম্বাই-অধিবেশনই কংগ্রেসের প্রথম পূর্ণ অধিবেশন।

বোম্বাই-অধিবেশনে গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে সুতাকাটা, খদ্দর পরিধান করা প্রভৃতি শর্ত দ্বারা কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা সীমাবদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং গান্ধীজী স্বয়ং কংগ্রেসের সভ্যপদ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসের সহিত সকল প্রকাশ্য সম্পর্ক ছেদ করেন। বোম্বাই-অধিবেশনে এই সকল সিদ্ধান্ত ও কেবল মাত্র আইন-সভা সম্পর্কিত কর্মপন্থা গ্রহণের ফলে জনসাধারণের হতাশা গভীরতর হইয়া উঠে। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে আইন-সভার নির্বাচনে কংগ্রেসের যোগদানের ফলেও জনসাধারণের হতাশা কাটে নাই বা পূর্বের রাজনৈতিক উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়া উঠে নাই।

কিন্তু এই হতাশাজনক অবস্থা ও জাতীয় সংগ্রামের দুর্দিন সত্ত্বেও কংগ্রেসের মধ্যে একটা নূতন ভাবধারা, একটা নূতন শক্তি ধীরে ধীরে দেখা দিতে থাকে। কংগ্রেসের তরুণ নেতা ও সভ্যগণ এই শক্তিকে স্বাগত জানাইলেন, আর প্রবীন

নেতৃত্ব ইহার প্রতি প্রথম হইতেই বিরূপ হইয়া উঠেন। সমাজবাদ হইল সেই নূতন ভাবধারা আর সমাজবাদীরা হইলেন সেই নূতন শক্তি। ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে গান্ধীজী কংগ্রেস ত্যাগ করিবার সময় যে বিবৃতি দেন তাহাতে তিনি এই ভাবধারা ও শক্তিকে উদ্দেশ করিয়া বলেন: "আমার ও বহু কংগ্রেস-কর্মীর মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে।" ইহা খুবই স্পষ্ট যে, "বেশীর ভাগ কংগ্রেসকর্মীদের" নিকট অহিংসা "একটা মৌলিক আদর্শ" নহে, কেবল একটা "কর্ম-কৌশল" মাত্র। কংগ্রেসের মধ্যে সমাজবাদীদের সংখ্যা ও প্রভাব যে ভাবে দ্রুত বাড়িয়া যাইতেছিল তাহা উল্লেখ করিয়া গান্ধীজী বলেন: "যদি তাহারা কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাবশালী হইয়া উঠে, আর তা সম্ভবও বটে, তাহা হইলে আর আমার পক্ষে কংগ্রেসে থাকা সম্ভব নয়।" ইহা ব্যতীত, সাধারণ ভাবে বিপুল সংখ্যক কর্মীদের মধ্যে প্রবীন নেতৃত্বের আপস-পন্থার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের মনোভাব ক্রমশঃ জাগিয়া উঠিতে থাকে। ইহার ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের সূচনা হয়। এই নূতন ভাবধারা ও নূতন শক্তির আবির্ভাব কেবল ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের একটানা গণ-সংগ্রাম ও বৈপ্লবিক সংগ্রামের ফলেই সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে যে বিরাট অগ্রগতি সম্ভব হইয়াছিল তাহা এই মিলিত মহাসংগ্রামেরই অনিবার্য পরিণতি। ইহা ব্যতীত, ভারতের জনসাধারণ ঐ মহাসংগ্রামের মধ্য দিয়া যে বিপুল রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও চেতনা লাভ করে তাহার ফলেই সমগ্র জাতীয় আন্দোলন ভবিষ্যৎ সফলতার দিকে কয়েক ধাপ অগ্রসর হইতে সক্ষম হয়। এই মহাসংগ্রামের মধ্যে কংগ্রেস যে বিপুল গণ সমর্থন লাভ করিয়াছিল; জনগণের অফুরন্ত সংগ্রাম-শক্তির যে বিপুল উৎস বাধামুক্ত হইয়া গিয়াছিল; জনগণের যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা, স্বাধীনতা-স্পৃহা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগ প্রত্যক্ষ করা গিয়াছিল তাহা হইতে ইহাই চূড়ান্তরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই বিপুল সংগ্রাম-শক্তি যদি নির্ভুল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হয় তবে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জয় অবশ্যম্ভাবী। ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের মহাসংগ্রাম হইতে ভারতের জনসাধারণ এই অমূল্য শিক্ষাই লাভ করিয়াছে।

তাই আশু পরিণতির দিক হইতে ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের মহাসংগ্রাম বার্থ হইলেও ইহা ভবিষ্যৎ-সংগ্রামের পক্ষে যে বিরাট শিক্ষা দান করিয়াছে সেই দিক হইতে এই সংগ্রাম ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করিয়াছে। (১)

১৯৩৫ খৃস্টাব্দের ভারত-শাসন আইন

নূতন ভারত-শাসন বিধি ১৯৩৫ খৃস্টাব্দের জুলাইমাসে ইংলণ্ডের রাজার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া আইনে পরিণত হয়। 'সাইমন-কমিশন' হইতে শুরু করিয়া গোলটেবিল-বৈঠক ও বহু আলাপ-আলোচনার পর এই নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই শাসনতন্ত্র দুইটি অংশে বিভক্ত ছিল—একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রীয় কেন্দ্রীয় অংশ, অপরটি প্রাদেশিক অংশ। প্রথম অংশটি হইল ভারতের সকল প্রদেশ লইয়া গঠিত একটি সর্ব-ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ও উহার কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা, আর দ্বিতীয় অংশটি হইল প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা।

এই শাসনতন্ত্রের মারফত শাসক-গোষ্ঠীর এক ষড়যন্ত্র মূলক পরিকল্পনা আত্ম-প্রকাশ করে। নূতন রাজনৈতিক চেতনা-সম্পন্ন ভারতীয় জনসাধারণের সংগ্রাম-শক্তি ও ঐক্য ধ্বংস করিয়া ভারতবর্ষের উপর বৃটিশ প্রভুত্ব চিরস্থায়ী করিয়া রাখাই ছিল এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। শাসকগণ তাহাদের এই মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায়করূপে দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিক্রিয়াশীল রাজন্যবর্গ ও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের সমর্থক গোষ্ঠীকে সংগ্রহ করে এবং জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিদের পরিবর্তে উহাদেরই কেন্দ্রীয় আইন-সভায় বেশী সংখ্যায় আসন দান করে। এই শাসনতন্ত্রে ভারতের বিপুল জন-সংখ্যার শতকরা মাত্র এগারজন লোক ভোটের অধিকার পায় এবং দেশীয় রাজ্যগুলির জনসাধারণের পরিবর্তে রাজন্যবর্গকেই প্রতিনিধি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। এই ভাবে রাজন্যবর্গ কেবল উহাদের শাসিত দেশ সমূহেরই নহে, কেন্দ্রীয় আইন-সভায় থাকিয়া এমন কি বৃটিশ-ভারতের জন-সাধারণের উপরেও কর্তৃত্ব করিবার অধিকার লাভ করে।

---

(১) R. P. Dutt : 'India to-day', P. 355,

এই শাসনতন্ত্র অনুসারে কেন্দ্রে আইন-সভা ও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া মন্ত্রীসভা গঠনের ব্যবস্থা থাকিলেও প্রকৃত রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা "বিশেষ ক্ষমতা" হিসাবে বড়লাটের হস্তেই সংরক্ষিত রাখা হয়। বড়লাটের এই সকল "বিশেষ ক্ষমতা" শাসনতন্ত্রে কমপক্ষে চৌরানব্বইটি ধারার মারফত ব্যাখ্যা ও সুরক্ষিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই শাসনতন্ত্র দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের নামে বৃটিশ-স্বেচ্ছাতন্ত্র ভারতবর্ষের উপর চাপাইয়া দিবার ব্যবস্থা হয়।

এই শাসনতন্ত্র অনুসারে যে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার পরিকল্পনা করা হয় তাহাও উপরোক্ত কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্রের অধীনে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ও স্বেচ্ছাতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। প্রাদেশিক গভর্ণরগণের হস্তেও বড়লাটের "বিশেষ ক্ষমতা"র অনুরূপ বহু ধরনের "বিশেষ ক্ষমতা" ন্যস্ত ছিল। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রে প্রদেশের জনগণের সেবা করিবার এবং স্বাধীনতার জন্য জনগণের আন্দোলন শক্তিশালী করিয়া তুলিবার সামান্য সুযোগ ছিল। সমগ্র ভারতের উপর বৃটিশের একছত্র প্রভুত্ব কোন ক্রমেই ক্ষুন্ন হইবার সম্ভবনা নাই বুঝিয়া শাসকগণ এই সামান্য সুযোগ প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুতরাং এই যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও দেশের সমগ্র জনসাধারণ রুখিয়া দাঁড়াইতে থাকে।

লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস

মনীষী রজনী পাম দত্ত মহাশয়ের কথায়: "১৯৩৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ-অধিবেশন হইতে জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়। এই অধিবেশন হইতেই বিভিন্ন দিকে দ্রুত অগ্রগতি আরম্ভ হয়।" (১)

১৯৩৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে যখন লাক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় তখনও কংগ্রেস ১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের ঐতিহাসিক সংগ্রামের শোচনীয় পরাজয়ের অবসাদ ও সরকারী দমননীতির ফল স্বরূপ দুর্বলতা কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কংগ্রেসের সভ্যসংখ্যা তখন মাত্র চারিলক্ষ সাতান্ন হাজার।

(১) R. P. Dutt: 'India To-day', P. 479.

জনসাধারণের মধ্যে নব জাগরণের লক্ষণ দেখা দিলেও সেই জাগরণকে তরান্বিত ও সংগঠিত করিয়া তুলিবার কোন চেষ্টা নাই এবং কংগ্রেসের সকল ক্রিয়া-কলাপ আইন-সভার নির্বাচন প্রভৃতির গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কেবল তাহাই নহে, ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে বোম্বাই-কংগ্রেসে গৃহীত কংগ্রেসের নূতন গঠনতন্ত্র দ্বারা কংগ্রেসের দরজা জনসাধারণের নিকট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক নব যুগের সূচনা করে। লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সভাপতির ভাষণে তরুণ নায়ক পণ্ডিত জহরলাল কংগ্রেসের এই শোচনীয় অবস্থার তীব্র সমালোচনা করিয়া ঘোষণা করেন: "আমরা জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ বহুলাংশে হারাইয়া ফেলিয়াছি।" (১) সুতরাং কংগ্রেসকে আবার জনসাধারণের মধ্যে লইয়া গিয়া ইহাকে জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের সংগঠনরূপে গড়িয়া তোলার আয়োজনের এবং জনসাধারণকে নূতন পথের সন্ধান দিবার ভার পড়ে লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস ও উহার সভাপতি পণ্ডিত জহরলালের উপর। লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেস ও উহার যোগ্য সভাপতি এই ঐতিহাসিক কর্তব্য পালন করিয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক নব যুগের সূচনা করেন।

পণ্ডিত জহরলাল তাঁহার সভাপতির ভাষণে সমাজবাদকেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার ফলে ভারতের জাতীয় সংগ্রামের ক্ষেত্রে সমাজবাদের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। সভাপতি তাঁহার ভাষণে বিশ্বের তৎকালীন ক্রমবর্ধমান ফাসিস্ট-আক্রমণ ও ফাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের সহিত ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা-সংগ্রামকে যুক্ত করেন এবং কংগ্রেসের মধ্যে সংগঠিত ভারতের শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী ও শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি সকল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির ঐক্যের ভিত্তিতে এক শক্তিশালী "জনগণের যুক্তফ্রণ্ট" গঠনের প্রস্তাব করেন। এই ঘোষণা ও প্রস্তাবের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে ভারতের দীর্ঘ স্বাধীনতা-সংগ্রাম বিশ্বব্যাপী জনগণের ফাসিস্ট-বিরোধী মুক্তি-

(১) Presidential Address at the Lucknow Congress.

সংগ্রামের এক বিশিষ্ট অংশে পরিণত হইবার পথ প্রস্তুত হয় এবং জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম এক নূতন আদর্শ ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করে।

পণ্ডিত জহরলাল তাঁহার পরিকল্পিত 'যুক্তফ্রণ্ট'কে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ক্ষেত্রে বাস্তবরূপ দান করিবার উদ্দেশ্যে লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে শ্রমিক-কৃষক সংগঠনগুলিকে কংগ্রেসের মধ্যে যৌথ-স্বীকৃতি (Collcctive affiliation) দানের প্রস্তাব তোলেন। এই প্রস্তাব পাশ না হইলেও ইহাকে ভবিষ্যতে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে একটি গণসংযোগ-কমিটি গঠিত হয়। ইহা ব্যতীত, বোম্বাই-কংগ্রেসে সূতাকাটা ও অস্পৃশ্যতা সম্পর্কে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা বাতিল করিয়া তাহার পরিবর্তে কৃষকদের প্রকৃত দাবি সম্পর্কে এক বিস্তৃত কর্মসূচী গৃহীত হয়।

লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের পর হইতে চারিদিকে একটা নব জাগরণ শুরু হইয়া যায়। কংগ্রেসের মধ্যে পণ্ডিত জহরলালের নেতৃত্ব সমাজবাদীদের শক্তি বৃদ্ধি করে। ১৯৩৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত ফৈজপুর-কংগ্রেসের সময় সমাজবাদীদের শক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, তাঁহারা নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির এক-তৃতীয়াংশ সভ্যপদ অধিকার করিতে সক্ষম হন। সমাজবাদীদের চেষ্টার ফলেই ফৈজপুর-কংগ্রেসে খাজনা মকুব বা হ্রাস, বেগার প্রথা ও অন্যান্য সামন্ত-তান্ত্রিক আদায়ের অবসান, কৃষি শ্রমিকের জন্য জীবন ধারণোপযোগী মজুরির ব্যবস্থা, য়ুনিয়ন গঠনের অধিকার প্রভৃতি কৃষকদের ষোল দফা দাবি সম্বলিত এক কর্মসূচী গৃহীত হয়।

কংগ্রেসের লাক্ষ্ণৌ-অধিবেশন হইতে সারা দেশের জনসাধারণ এক নূতন আশার আলো দেখিতে পায় এবং জনসাধারণের মধ্যে নূতন জাগরণ শুরু হয়। ১৯৩৬ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে লাক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসের সময় কংগ্রেসের সভ্য-সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৫৭ হাজার মাত্র, আর ঐ বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ফৈজপুর-কংগ্রেসের সময় সভ্য-সংখ্যা বাড়িয়া হয় ৬ লক্ষ ৩৬ হাজার। ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়লাভ ও প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর সভ্যসংখ্যা ৩০ লক্ষ ছাড়াইয়া যায়। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের শেষদিকে ৪০ লক্ষ লোক কংগ্রেসের

সভ্য হয় এবং ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ত্রিপুরী-কংগ্রেসের সময় সভ্য-সংখ্যা ৫০ লক্ষে পৌঁছে।

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

১৯৩৬ খৃস্টাব্দের শাসনতন্ত্র আইনে পরিণত হইবার পূর্বেই ১৯৩৪ খৃস্টাব্দে কংগ্রেস 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লি'র দাবী তুলিয়া উক্ত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মত জাহির করে। তথাপি লাক্ষ্ণৌ-কাংগ্রেসে নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে ১৯৩৭ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়

কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারে শাসকগণের পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র নাকচ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতাই একমাত্র জাতীয় লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত হয়। ইহা ব্যতীত এই ইস্তাহারে একটি আশু কর্মসূচীও স্থান লাভ করে। এই কর্মসূচীতে ব্যাপক নাগরিক স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার এবং অবিলম্বে জনসাধারণের আর্থিক দুর্দশা দূর করিবার জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন স্বীকার করা হয়।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দের নির্বাচনে একমাত্র কংগ্রেসই একটী সর্বভারতীয় সংগঠন হিসাবে অবতীর্ণ হয়। জনগণও এই সংগ্রামে সকল শক্তি লইয়া কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হয় এবং সকল শ্রেণীর জনগণের সমর্থনের ফলে কংগ্রেস ভারতের সকল শ্রেণীর জনগণের একটি প্রকৃত 'যুক্তফ্রন্ট' রূপে দেখা দেয়। কংগ্রেসও উহার নির্বাচনী ইস্তাহারে সকল শ্রেণীর আশু দাবি সম্বলিত একটি কর্মসূচী গ্রহণ করিয়া এই 'যুক্তফ্রন্টকে' স্পষ্টরূপ দান করে।

নির্বাচনে কংগ্রেস মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা প্রদেশের আইন-সভায় অন্য-নিরপেক্ষ সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে এবং আসাম ও বাংলা দেশের আইন-সভায় কংগ্রেসই হয় সংখ্যা-গরিষ্ঠ দল। প্রত্যেক প্রদেশে উদারপন্থীরা (লিবার্ল দল) দল হিসাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। এই নির্বাচনে কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশেই কংগ্রেসের পরাজয় ঘটে।

নির্বাচনের পর কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের প্রশ্ন লইয়া আলোচনা শুরু হয়।

১৯৩৭ খৃস্টাব্দে নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে বামপন্থী ও সমাজ-বাদীদের বিরোধিতা পরাস্ত করিয়া কয়েকটি শর্তে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের প্রস্তাব পাশ হইয়া যায়।

কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব

১৯৩৭ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে কংগ্রেস এগারটি প্রদেশের সাতটিতে মন্ত্রীসভা গঠন করে। ইহা দুই বৎসরকাল শাসনকার্য চালাইয়া যায় এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত মতবিরোধ দেখা দিলে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভাগুলি ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে পদত্যাগ করে। এই দুই বৎসরের কংগ্রেস-মন্ত্রীসভাগুলির ক্রিয়াকলাপে সমাজবাদী ও বামপন্থীদের পূর্বের আশঙ্কাই বহুলাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। নূতন শাসনতন্ত্র ধ্বংস করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব এই শাসনতন্ত্রকে এমন ভাবে কার্যকরী করিয়া তোলে যে, এমনকি ইংরেজ-শাসক-গণও কংগ্রেস-মন্ত্রীদের দক্ষতা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। অপর দিকে এই দুই বৎসরে বিভিন্ন প্রদেশে শ্রমিক ও কৃষকদের স্থানীয় সংগ্রাম ব্যতীত জাতীয় আন্দোলন একরূপ বন্ধই থাকে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য কাজ করে এবং তাহার ফলে ভবিষ্যৎ জাতীয় সংগ্রামের পথ প্রশস্ত হয়। ইহা হইল ব্যক্তি-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস-শাসিত প্রদেশগুলিতে ক্রমশঃ রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়। ইহার ফলে এমন কি ১৯২১ খৃস্টাব্দের মোপলা-বিদ্রোহের বন্দীরা এবং ১৯২২ খৃস্টাব্দের চৌরিচৌরার ঘটনায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত বন্দীরাও মুক্তিলাভ করে। ইহা ব্যতীত বহু সংগঠনের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লওয়া হয়, রাজনৈতিক কর্মীরা অবাধ গতিবিধির সুযোগ লাভ করে এবং সংবাদ ও সংবাদ-পত্রের স্বাধীনতা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশের উপর হইতে দমন মূলক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিবার ফলে অসংখ্য রাজনৈতিক সাহিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং তাহার ফলে দেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক

চেতনার বিকাশের সম্ভাবনা দেখা দেয়। বাংলাদেশে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত না হইলেও গান্ধীজীর চেষ্টায় বিপ্লবী রাজবন্দীরা মুক্তিলাভ করেন।

কিন্তু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ব্যতীত অন্য সকল ক্ষেত্রে কংগ্রেস-মন্ত্রিত্বের শোচনীয় ব্যর্থতার ফলে ইহাকে বিশেষ করিয়া কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে আজন্ম-শোষিত ও নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষকের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীরা শ্রমিক-কৃষকদের ন্যূনতম দাবিও স্বীকার না করায় তাহাদের সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা শূন্যে মিলাইয়া যায় এবং জমিদার-মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কৃষকের শ্রেণী-সংগ্রাম তীব্র হইয়া উঠে। ভারতের প্রায় সকল অংশে, বিশেষ করিয়া কংগ্রেস-শাসিত বিহার, উড়িষ্যা ও যুক্তপ্রদেশে কৃষক-সংগ্রাম ব্যাপক আকারে দেখা দেয়। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম নূতনভাবে শুরু হয় এবং সর্বত্র নূতন নূতন ট্রেডয়ুনিয়ন গড়িয়া উঠে। ১৯৩৪ হইতে ১৯৩৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিন বৎসরে যতগুলি শ্রমিক-ধর্মঘট হইাছিল, কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা গঠিত হইবার পর মাত্র এক বৎসরে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ধর্মঘট হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে (যেমন বোম্বাইয়ের সূতাকল-শ্রমিকদের ক্ষেত্রে) কংগ্রেস-মন্ত্রীসভা মিল-মালিকদের বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে, কিন্তু সাধারণভাবে প্রায় সর্বত্র শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড-য়ুনিয়নগুলিকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করা হয়। শ্রমিক-সংগ্রাম দমন করিবার জন্য বহু ক্ষেত্রে বৃটিশ-শাসকদের তৈরী ঘৃণিত ১৪৪ ধারা প্রয়োগ, এমন কি গুলিবর্ষণও করা হয়।

শ্রমিক-কৃষকের এই দাবির সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়া একদিকে যেমন জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন বৈশিষ্ট্য আনিয়া দেয়, তেমনি জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন দ্বন্দ্বও সৃষ্টি করে। ইহার মারফত জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নূতন স্বাধীন শক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং সমাজবাদী ও বামপন্থী শক্তি সমূহের প্রভাব বাড়িয়া যায়, আর কংগ্রেসের আপসপন্থী অংশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপসের দিকে

আরও বেশী ঝুঁকিয়া পড়ে। এই ভাবে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে যে শক্তি-দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় তাহাই কংগ্রেসের পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে চরমরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা

নূতন শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক অংশ প্রবর্তন করিতে সফল হইয়া এবার ইংরেজ-সরকার উহার কেন্দ্রীয় অংশও চালু করিবার আয়োজন শুরু করে। কংগ্রেস পূর্বেই এই নূতন শাসনতন্ত্রকে "দাস শাসনতন্ত্র" নামে অভিহিত করিয়া বিশেষ ভাবে উহার কেন্দ্রীয় অংশকে সকল শক্তি লইয়া বাধা দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছিল। এইবার ইংরেজ-সরকার কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করিবার উদ্যোগ শুরু করিলে ইহার বিরুদ্ধে সারা দেশের মধ্যে এক ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয়। কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী ও অন্যান্য বামপন্থীদের নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকগণ এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে পূর্বেই আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিল এবং সেই আন্দোলন ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। এই সময়, ১৯৩৮ খৃস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে, হরিপুরায় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র সরাসরি নাকচ করিয়া ইহাকে বাধা দিবার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহিত আপস-মীমাংসার কোন সুযোগ না থাকিলেও ইহার বিরুদ্ধে কোন কর্মপন্থা স্থির হইল না। প্রস্তাবের এই দুর্বলতা লক্ষ্য করিয়াই বৃটিশ-শাসকগণ ধরিয়া লয় যে, ইহা কংগ্রেসের একটা চাল মাত্র এবং কংগ্রেস প্রাদেশিক শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন প্রথমে বিরোধিতা করিয়াও শেষ পর্যন্ত উহা গ্রহণ করিয়াছে, ঠিক সেইরূপ যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেও কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত ইহা গ্রহণ করিবে।

বৃটিশ-শাসকদের এই ধারণা একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসপন্থী অংশ ইতিপূর্বেই শাসকদের সহিত আলাপ-আলোচনা শুরু করিয়া দিয়াছিলেন এবং চারিদিকে একটা আপস-মীমাংসার গুজব উঠিতেছিল।

অন্যদিকে বামপন্থীদের নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে একটা বিরাট গণ-আন্দোলন দ্রুত গড়িয়া উঠিতে থাকে। দেশব্যাপী খণ্ড খণ্ড শ্রমিক ও কৃষক-সংগ্রামগুলিই ছিল সেই আন্দোলনের ভিত্তি, আর ক্রমবর্ধমান শ্রমিক-কৃষক সংগ্রাম কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসপন্থী অংশকে ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে এবং আপসপন্থীরা ভয় পাইয়া সাম্রাজ্যবাদের সহিত সহযোগিতার দিকে আরও বেশী করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে থাকে।

জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরিক সংকট

পূর্ব হইতেই জাতীয় আন্দোলনে ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের যোগদানের ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার প্রভাব বাড়িয়া যাইতেছিল। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রাম বহুগুণ বৃদ্ধি পাইবার ফলে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বামপন্থী ভাবধারার প্রভাবও বিশেষ ভাবে বাড়িয়া যায় এবং জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এক গভীর দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। সাম্রাজ্যবাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনার বিরুদ্ধে জাতীয় সংগ্রাম যতই আসন্ন হয় ততই এই দ্বন্দ্ব প্রবল ভাবে দেখা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জনগণের সংগ্রাম পূর্ব হইতেই বিভিন্ন আকারে শুরু হইয়াছিল, আর এই জনগণই হইল কংগ্রেস-ঘোষিত যুক্তরাষ্ট্র-বিরোধী সংগ্রামের মূল ও প্রধান শক্তি। এই শক্তি ব্যতীত সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কোন সংগ্রামই সফল হইতে পারে না। কিন্তু কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসপন্থী অংশ শ্রমিক-কৃষকের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও সংগ্রামে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। আপসপন্থীরাই এখন জাতীয় আন্দোলনের কর্ণধার। কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপস-পন্থী অংশের সংগ্রাম-ভীতি ও সহযোগিতার মনোভাব যতই বাড়িয়া যাইতে থাকে ততই কংগ্রেসের বামপন্থী অংশের আপস-বিরোধীতা ও সংগ্রামের ধ্বনি প্রবল হইয়া উঠে। এই দ্বন্দ্বই জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষের রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে কংগ্রেসের সভাপতি-পদে সুভাসচন্দ্র বসুর পুনর্নির্বাচন উপলক্ষ করিয়াই সেই সংঘর্ষ দেখা দেয়।

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে সুভাসচন্দ্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কংগ্রেসের সভাপতি-পদে নির্বাচিত হন। ১৯৩৮ খৃস্টাব্দে গান্ধীজী প্রভৃতি প্রধান নেতৃত্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাসচন্দ্র পুনরায় সভাপতি-পদের নির্বাচনে অবতীর্ণ হইবার সিদ্ধান্ত করেন। এই সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয় যে, আসন্ন সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রাম আরম্ভ ও কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থী নেতৃত্বের আপসমূলক মনোভাবের বিরোধিতা করিবার জন্যই তিনি পুনরায় সভাপতি-পদের নির্বাচনে দাঁড়াইতেছেন। কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বের তরফ হইতে সুভাসচন্দ্রের বিরুদ্ধে ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়াকে দাঁড় করানো হয় এবং স্বয়ং গান্ধীজী তাঁহাকে সমর্থন করেন। কংগ্রেসের দীর্ঘ ইতিহাসে এই প্রথম সভাপতি-পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। ইতিমধ্যে সুভাসচন্দ্র কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান বামপন্থী শক্তিসমূহের মুখপাত্র হিসাবে বামপন্থী দলসমূহের পূর্ণ সমর্থন লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের নির্বাচন-দ্বন্দ্বে সাম্রাজ্যবাদের যুক্তরাষ্ট্র পরিকল্পনা ও কংগ্রেস-নেতৃত্বের আপসমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ধ্বনি লইয়া সমগ্র বামপন্থী শক্তি সুভাসচন্দ্রকে সমর্থন করে। এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বে সুভাসচন্দ্র ডাঃ পট্টভি সীতারামিয়ার বিরুদ্ধে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচন-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য বামপন্থী ভাবধারা ও আপসহীন সংগ্রামের সমর্থক, আর কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্ব আপসহীন সংগ্রামের বিরোধী।

কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বের বিরোধিতা সত্ত্বেও সুভাসচন্দ্রের জয়লাভের ফলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এক বিরাট সংকট সৃষ্টি হয়। গান্ধীজী সীতারামিয়ার পরাজয়কে নিজের পরাজয় বলিয়া ঘোষণা করেন। এক বিবৃতিতে কংগ্রেসকে "ভুয়া সভ্যদের" "দূষিত সংগঠন" নামে অভিহিত করিয়া তিনি এক সতর্কবাণী ঘোষণা করিয়া বলেন যে, যদি নির্বাচন-বিজয়ীদের নীতি ও কর্মপন্থা কংগ্রেসের প্রধান নেতৃত্বের সমর্থনযোগ্য না হয় তবে তাঁহারা কংগ্রেস ত্যাগ করিতেও পারেন। এই ঘোষণা অনুসারে কাজও শুরু হয়। নির্বাচনের পরেই নব-নির্বাচিত সভাপতি সুভাসচন্দ্রকে "স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ

দানের" জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির পনেরজন সদস্যের মধ্যে বারোজন পদত্যাগ করেন। এমন কি পণ্ডিত জহরলালও একটি পৃথক বিবৃতি দিয়া পদত্যাগ করেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি হইতে এই তেরজন সদস্যের পদত্যাগের ফলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের আভ্যন্তরিক সংকট চরম সীমায় উপনীত হয়।

১৯৩৯ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে ত্রিপুরী নামক স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ত্রিপুরী-অধিবেশনে কংগ্রেসের সাংগঠনিক ঐক্য বজায় থাকিলেও জাতীয় সংকটের কোন সমাধান হইল না। এই অধিবেশনেও প্রধান রাজনৈতিক প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের উপর জোর দেওয়া হয়। কিন্তু একটি সাংগঠনিক প্রস্তাবের ফলে কংগ্রেস-সংগঠনের মধ্যে ভাঙন অনিবার্য হইয়া উঠে। গান্ধীজীর সমর্থকগণ এই প্রস্তাবে তাঁহার নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করিয়া তাঁহার উপর ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বাচনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করেন। (১) এই প্রস্তাব বহু ভোটাধিক্যে পাশ হইয়া যায় এবং ইহার ফলে গান্ধীজী এমন কি কংগ্রেসের একজন সাধারণ সভ্য না হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই হস্তে কংগ্রেস-পরিচালনার সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

ত্রিপুরী-কংগ্রেসের পর কিছুদিন ধরিয়া ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য নির্বাচন সম্পর্কে গান্ধীজী ও কংগ্রেস-সভাপতি সুভাসচন্দ্রের মধ্যে আপসের আলোচনা চলে। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন আপস সম্ভব না হওয়ায় অবশেষে সুভাসচন্দ্র বাধ্য হইয়া কংগ্রেস-সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। সুভাসচন্দ্রের পদত্যাগের পর নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। আর সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার পর সুভাসচন্দ্র তাঁহার সমর্থক কংগ্রেস-সভ্যদের এবং "কংগ্রেসের চরমপন্থী ও সাম্রাজ্যবাদ-

(১) এত দিন নব-নির্বাচিত কংগ্রেস-সভাপতিই কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যদের নিযুক্ত করিতেন। এই প্রস্তাবের দ্বারা সভাপতি সুভাসচন্দ্রকে এই ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করা হয়।

বিরোধীদের একত্র করিবার উদ্দেশ্যে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংগঠন হইতে কংগ্রেস-নেতৃত্বের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করিবার আবেদন জানানো হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ও অন্যান্য বামপন্থীরা একত্রিত হইয়া পরস্পরের সহিত সংযোগ রক্ষা এবং খণ্ড খণ্ড ও ব্যাপক সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'বামপন্থী ঐক্য-কমিটি' (Left consolidation Committee) গঠন করেন।

এই সকল ঘটনার ফলে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের সংকট গভীরতম আকারে দেখা দেয়। 'ফরোয়ার্ড ব্লক' ও অন্যান্য বামপন্থীদের সংগ্রামের আহ্বানে শঙ্কিত হইয়া কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ নিখিল ভারত কংগ্রেস-কমিটির এক অধিবেশনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করেন। এই সকল প্রস্তাব দ্বারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে আরও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রবর্তন করা হয়; কংগ্রেস-মন্ত্রীদের সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটির অধিকার বিশেষভাবে খর্ব করা হয় এবং কংগ্রেসের উচ্চ নেতৃত্বের সম্মতি ব্যতীত কংগ্রেস-কর্মীদের শ্রমিক-কৃষকের আন্দোলন, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রভৃতি সংগ্রামে যোগদান নিষিদ্ধ করা হয়। শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের দৈনন্দিন সংগ্রাম বন্ধ করাই ছিল এই সকল প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। শেষোক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশের শ্রমিক, কৃষক ও জনসাধারণের মধ্যে প্রতিবাদের ঝড় উঠে এবং 'বামপন্থী ঐক্য-কমিটি'র আহ্বানে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৯ই জুলাই সর্বত্র এই প্রস্তাবের প্রতিবাদে সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান হয়। এই প্রতিবাদ-দিবসের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সুভাসচন্দ্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের তরফ হইতে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ উপস্থিত করিয়া শাস্তি হিসাবে তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য বাংলাদেশের কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি-পদ ও কংগ্রেসের কোন কর্মকর্তার পদের অনুপযুক্ত বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণের মুখে এই বিরোধ ও কংগ্রেস-সংগঠনের ভাঙনের ফলে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ফলে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতির পক্ষে যে সুবিধা-সুযোগ

দেখা দিয়াছিল তাহাও বিনষ্ট হইয়া যাইতে বসে। ঠিক এই অবস্থায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয় এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন সমস্যা সৃষ্টি হইয়া সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে এক নূতন সংঘর্ষের পথ প্রস্তুত করে।

* * * *

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও জাতীয় আন্দোলন

জার্মানির বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরে ভারতীয় প্রতিনিধিদের সহিত কোন প্রকার আলোচনা না করিয়াই বড়লাট ভারতের পক্ষ হইতে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ভাবে মহাযুদ্ধের শুরু হইতেই ভারতবর্ষকে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করা হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ-পার্লামেণ্টে 'সংশোধিত ভারত-শাসন আইন' নামে একটি জরুরী আইন পাশ করিয়া ভারতের সকল শাসনতান্ত্রিক অধিকার বাতিল ও বড়লাটের হস্তে সকল শাসন-ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। একটি নূতন 'ভারত-রক্ষা অর্ডিনান্স' দ্বারা ভারত-সরকার ভারতের নিরাপত্তা রক্ষা, "যুদ্ধ-প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা ও আভ্যন্তরিক শান্তি রক্ষার জন্য" প্রয়োজনীয় যে কোন অর্ডিনান্স জারি করিবার ক্ষমতা লাভ করে। যুদ্ধের অজুহাতে আবার ভারতের উপর ইংরেজ-শাসকদের স্বেচ্ছাচারী শাসন চাপিয়া বসে। সংক্ষেপে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ-শাসকগণ যেভাবে ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষন করিয়াছিল, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়েও তাহারা সেই ভাবেই ভারতবর্ষকে শাসন ও শোষণ করিবার আয়োজন করে।

কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের ভারতবর্ষ ও এই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ের ভারতবর্ষ এক নহে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গান্ধীজী, বালগঙ্গাধর তিলক প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্ব শাসন লাভের আশায় বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সমর্থন জানাইয়াছিলেন। কিন্তু তারপর কংগ্রেস বহুবার নিজেকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধী বলিয়া জাহির করিয়াছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হইবার একমাস পর, ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এক প্রস্তাবে ঘোষণা করা হয়ঃ

"যে যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যে যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য হইল ভারতবর্ষে ও অন্যত্র সাম্রাজ্যবাদের শক্তি সংহত করা, কংগ্রেস কমিটি সেই যুদ্ধের সহিত জড়িত হইতে অথবা সেই যুদ্ধে কোন প্রকারের সাহায্য দিতে পারে না।"

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবে ভারতের জাতীয় দাবি পুনরায় ঘোষণা করিয়া বলা হয়:

"ভারতের জনগণকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতেই হইবে। বাহিরের কোন শক্তির প্রভাব হইতে মুক্ত একটি 'কনস্টিটিউয়েন্ট এসেমব্লি'র মারফত তৈরী-করা একটি গঠনতন্ত্রের দ্বারা ভারতবাসীরা এই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করিবে, এবং তাহাদের নিজেদের নীতি তাহারা নিজেরাই স্থির করিবে।"

কংগ্রেসের এই দাবির উত্তরে বৃটিশ-সরকার যে ঘোষণা করে তাহাতে প্রকারান্তরে এই দাবি অস্বীকার করা হয়। বৃটিশ-সরকার এই ঘোষণায় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ের মত অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতে 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসন'-এর প্রতিশ্রুতি দিয়া আপাততঃ ভারত শাসন ও বৃটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার উদ্দেশ্যে বড়লাটকে সাহায্য করিবার জন্য ভারতের নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি 'পরামর্শ-সভা' গঠনের প্রস্তাব করে।

বৃটিশ-সরকারের এই ঔদ্ধত্য ভারতের জনসাধারণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে এবং একটা বিরাট গণ-সংগ্রাম আসন্ন হইয়া উঠে। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ যখন বড়লাট ও বৃটিশ-সরকারের সহিত এই সকল আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন, তখন অন্যদিকে ভারতের জনসাধারণের সংগ্রাম শুরু হইয়া যায়। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে ভারতের শ্রমিকশ্রেণী। ২রা অক্টোবর বোম্বাইয়ের ৯০ হাজার শ্রমিক একদিনের জন্য সাধারণ ধর্মঘট করিয়া সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও ভারতের বৃটিশ সরকারের বর্বরসুলভ দমননীতির প্রতিবাদ করে। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে সভা ও শোভাযাত্রা হইতে থাকে। এই ভাবে জাতীয় সংগ্রামের এক নূতন অধ্যায় শুরু হয়।

(১) Speeches & Resolutions of the Congress (G. A, Natessons & Co.)

এদিকে বড়লাট ও বৃটিশ-সরকার কংগ্রেসের দাবি অগ্রাহ্য করিলে ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসে কংগ্রেসের রামগড়-অধিবেশনের প্রস্তাবে গ্রেট বৃটেনের যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া উহার সহিত কোন প্রকারের সহযোগিতা না করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

প্রতীক সত্যাগ্রহ

১৯৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে য়ুরোপে জার্মান-বাহিনীর আক্রমণের ফলে য়ুরোপের যুদ্ধে বিশেষ সংকটজনক অবস্থা দেখা দেয়। এই সংকটের মুহূর্তে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল সাময়িক জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কয়েকটি শর্তে কংগ্রেস বৃটিশ-সরকারের নিকট সহযোগিতার প্রস্তাব করে। কিন্তু পূর্বের মত এবারেও কংগ্রেসের এই শর্তাধীন সহযোগিতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বৃটিশ-সরকার কয়েকটি মামুলি প্রতিশ্রুতি দিয়া কংগ্রেসের শর্তহীন আনুগত্যের পাল্টা প্রস্তাব দেয়। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া কংগ্রেস সংগ্রাম আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত করে।

এদিকে দেশের মধ্যে একটা বিরাট গণ-সংগ্রামের ঝড় উঠিতেছিল। কারণ, যুদ্ধ শুরু হইবার পর হইতেই সরকার প্রচণ্ড দমননীতি চালাইতেছিল, যুদ্ধ বিরোধী বক্তৃতা প্রভৃতির জন্য শত শত লোক গ্রেপ্তার হইতেছিল। ভারত-বাসীদের যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাবে ক্ষিপ্ত হইয়া ইংরেজ-সরকার ভারতবর্ষে এক বিভীষিকার রাজত্ব কায়েম করিয়াছিল। সরকারের এই দমননীতির বিরুদ্ধে সারা ভারতের জনসাধারণ সংগ্রামের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে। গান্ধীজী এই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করিয়া এক নূতন সংগ্রাম শুরু করিবার সিদ্ধান্ত করেন। ১৯৪০ খৃস্টাব্দের অক্টোবর মাসে গান্ধীজীর নেতৃত্বে এই নূতন সংগ্রাম শুরু হয়। গান্ধীজী এক নূতন পদ্ধতিতে সংগ্রাম শুরু করেন। স্বাধীনতা লাভ এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য ছিল না। ইহার উদ্দেশ্য ছিল "স্বাধীনভাবে বক্তৃতা করার অধিকার প্রতিষ্ঠা"। এই সংগ্রামের নাম দেওয়া হয় "প্রতীক সত্যাগ্রহ," অর্থাৎ জনসাধারণের নামে

কংগ্রেসের কয়েকজন নেতার সত্যাগ্রহ। ইহার নিয়ম অনুসারে প্রথমে সত্যাগ্রহীদের নাম গান্ধীজীর নিকট পেশ করিতে হইত। গান্ধীজী সেই নামগুলি পরীক্ষার পর অনুমোদন করিলে সত্যাগ্রহীরা তাঁহাদের সত্যাগ্রহের স্থান ও সময় পূর্বে পুলিশকে জানাইতেন এবং এইভাবে পুলিশকে সংবাদ দিয়া সত্যাগ্রহীরা নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে যাইয়া যুদ্ধ-বিরোধী ধ্বনি করিতেন। কিন্তু তখন এই সত্যাগ্রহীরাই কেবল গ্রেপ্তার হন নাই, সরকার এই সুযোগে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার শুরু করে। মাত্র ছয় মাসের মধ্যে ভারতের বিভিন্ন আইন-সভার ৩৯৮ জন সদস্য, ৩১ জন ভূতপূর্ব মন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইন-সভার ২২ জন সদস্যসহ ২০ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

ফাসিস্ট-বিরোধী বিশ্বযুদ্ধ

যখন ইংরেজ-সরকার ভারতবর্ষে দমননীতির বন্যা বহাইতেছিল, তখন অন্য দিকে মহাযুদ্ধ ক্রমশঃ নূতন চরিত্র গ্রহণ করিতে থাকে। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের জুন মাসে যুরোপ-বিজয়ী জার্মান-বাহিনী সোভিয়েৎ যুনিয়নের উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের সহিত সোভিয়েৎ যুনিয়নের মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আর একদিকে জাপানী সাম্রাজ্যবাদীরাও দূর-প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের উপর আক্রমণ শুরু করে। এই আক্রমণের ফলে মহাযুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হয় এবং য়ুরোপ ও এসিয়ার ফাসিস্ট-আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রেট বৃটেন, মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েৎ যুনিয়ন ও চীনের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মৈত্রীর মধ্য দিয়া ফাসিস্ট-আক্রমণে পদানত ও আক্রমণ-আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত পৃথিবীর জনগণের ফাসিস্ট-বিরোধী মৈত্রী গড়িয়া উঠে। সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লইয়া যে যুদ্ধ শুরু হইয়াছিল তাহা এই ভাবে ক্রমশঃ বিশ্বের জনসাধারণের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তরিত হয়। ভারতের জাতীয় নেতৃত্বের প্রধান অংশ মহাযুদ্ধের এই নূতন চরিত্রকে স্বীকার ও উহার তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে বিলম্ব করেন নাই। মহাযুদ্ধের এই নূতন চরিত্র স্বীকার করিয়া ও এই বিশ্ব-মৈত্রীর প্রতি অভিনন্দন জানাইয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ঘোষণা করেন ঃ

"রুশিয়া, বৃটেন, আমেরিকা ও চীনের প্রতিনিধিত্বে এবার বিশ্বের প্রগতিশীল শক্তিসমূহের মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হইল।"

কিন্তু ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, জাতীয় আন্দোলনের সকল অংশ মহাযুদ্ধের এই নূতন চরিত্র ও উহার বিরাট তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই। তাহার ফলে এই সম্পর্কে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখা দেয়। "একদল তখনও গান্ধীজীর অহিংস 'শান্তিবাদী' দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করিতে থাকে। একদল আশু সুবিধালাভের আশায় ফাসিস্ট ও ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধ-শিবিরের মধ্যস্থলে থাকিয়া দর কষাকষির পন্থা অনুসরণ করে।" স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে সুভাসচন্দ্র বৃটিশ-বিরোধী জার্মান ও জাপানীদের সহিত মিলিত হওয়ায় একদল গোপনে ফাসিস্টদের সহিত সহানুভূতিশীল হইয়া থাকে। ভারতের চিরশত্রু বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদও মিত্রশক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া একদল মিত্রশক্তিবর্গের সদিচ্ছা সম্পর্কেই সন্দিহান হইয়া থাকে। কিন্তু পণ্ডিত জহরলাল ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে কংগ্রেসের প্রধান অংশ মহাযুদ্ধের এই নূতন চরিত্র ও উহার তাৎপর্য উপলব্ধি করিয়া ফাসিস্ট-বিরোধী মিত্রশক্তিবর্গের সমমর্যাদাসম্পন্ন অংশীদার হিসাবে সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করে। ইহার ফলে ভারতবর্ষ এখন আর কেবল গ্রেট বৃটেনের নিজস্ব ব্যাপার হইয়া রহিল না, এখন ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে স্বাধীন ভারতের সহযোগিতা সকল মিত্রশক্তির পক্ষেই অপরিহার্য হইয়া উঠিল। ভারতের সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন মিত্রশক্তি বৃটেনের উপর চাপ দিতে থাকে। এই সময় যুদ্ধের পর সকল পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা দান করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। মার্কিন-প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও চিয়াং কাই-সেক বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিলের উপর চাপ দেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা রুজভেল্ট ও চিয়াং কাই-সেকের কথা গ্রাহ্যই করিল না। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল এক বক্তৃতায় সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন যে, 'আটলাণ্টিক সনদ'-এ ঘোষিত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি কেবলমাত্র য়ুরোপের ফাসিস্ট-অধিকৃত বিভিন্ন দেশ সম্পর্কেই প্রযোজ্য হইবে,—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ

প্রভৃতি বৃটিশ-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি সম্পর্কে ইহা প্রযোজ্য হইবে না। চার্চিলের এই সদম্ভ ঘোষণা বহু ভারতবাসীকে বৃটিশ-বিরোধী জার্মানী ও জাপানের সমর্থক করিয়া তোলে।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করিলেও বিশ্বের জনমতের চাপে বৃটিশ-সরকার ১৯৪১ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দকে কারাগার হইতে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। চার্চিলের উক্তিতে ভারতের সাধারণ মানুষ মিত্রশক্তিবর্গের বিরোধী হইলেও জহরলাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ প্রভৃতি কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দ কখনও মিত্রশক্তির ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের বিরোধিতার কথা কল্পনাও করেন নাই। ১৯৪১ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস-কমিটির বার্দৌলি-অধিবেশনের প্রস্তাবেও ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের সমর্থন ও উহার সহিত সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ঘোষণা করা হয়: ঐ

"ভারতবর্ষ সম্পর্কে বৃটিশ-নীতির কোন পরিবর্তন না হইলেও যুদ্ধের ফলে যে নূতন বিশ্ব-পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং যুদ্ধ যে ভারতবর্ষের নিকটবর্তী হইয়াছে তাহা কংগ্রেস-কমিটিকে অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। যাহারা আক্রান্ত হইয়া স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিতেছে, কংগ্রেসের সহানুভূতি অনিবার্যভাবেই তাহাদের দিকে। কিন্তু কেবল স্বাধীন ভারতবর্ষই জাতিগতভাবে দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম।"

এই প্রস্তাবে পুনরায় আপসের হস্ত প্রসারিত হইলেও উদ্ধত বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা তখনও ইহাতে ভ্রূক্ষেপ করিল না। কিন্তু শীঘ্রই এসিয়ার যুদ্ধ এক সংকটজনক মোড় ঘুরিবার ফলে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীদের টনক নড়িয়া উঠে।

'ক্রিপ্‌স্-মিশন'

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৮ই মার্চ জাপানী সৈন্যবাহিনী ব্রহ্মের রাজধানী রেঙ্গুন দখল করে। রেঙ্গুনের পতনের ফলে বৃটিশ-শাসকগণ আতঙ্কে দিশাহারা হইয়া ১১ই মার্চ ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ-মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্টাফোর্ড

ক্রিপ্‌স্‌কে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ক্রিপ্‌স্‌ সাহেব ভারতীয় সমস্যার সমাধানের জন্য বৃটিশ-সরকারের নিকট হইতে যে প্রস্তাব লইয়া আসেন তাহা ছিল দুই ভাগে বিভক্ত :—

(১) যুদ্ধের পরের ব্যবস্থা ও (২) যুদ্ধকালীন সাময়িক ব্যবস্থা। ইহাতে যুদ্ধের পর ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়া বলা হয় যে, যতদিন যুদ্ধ চলিবে ততদিন বৃটিশ-সরকারের হস্তেই ভারতের সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকিবে, আর ভারতীয় প্রতিনিধিরা কেবল পরামর্শ দিয়া সহযোগিতা করিবেন। (১)

বৃটিশ-সরকারের এই প্রস্তাব প্রকৃতপক্ষে বড়লাটের 'আগস্ট-প্রস্তাব'-এরই প্রতিধ্বনি মাত্র এবং সেই 'আগস্ট প্রস্তাব' কংগ্রেস পূর্বেই নাকচ করিয়াছিল। ইহাতে যে বৃটিশ-সরকারের পূর্ব-নীতির কোন পরিবর্তন সূচিত হইতেছে না তাহা সাম্রাজ্যবাদী অধ্যাপক কুপল্যাণ্ড সাহেবও স্বীকার করিয়া বলেন :

"এই খসড়া-ঘোষণা (ক্রিপ্‌স্‌-প্রস্তাব) কোন মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করিতেছে না.........নীতির দিক হইতে, প্রকৃতপক্ষে এই খসড়া-ঘোষণা 'আগস্ট-প্রস্তাব'-এর সীমা অতিক্রম করে নাই।" (২)

বলা বাহুল্য, কোন স্বাধীনতাকামী মানুষ এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে না, তথাপি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের পরের ব্যবস্থাটি মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় বৃটিশ-সরকারের হস্তেই সকল ক্ষমতা অর্পণ করায় এবং বৃটিশ-সরকার যুদ্ধকালীন জাতীয় সরকার গঠন করিতে সম্মত না হওয়ায় 'ক্রিপ্‌স্‌-মিশন' ব্যর্থ হয়। বিশ্বের এই মহাসংকটের সময় একটা সম্মানজনক আপসের জন্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ প্রাণপণে চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃটিশ-শাসকগণ যে আপসের জন্য প্রস্তুত ছিল না, তাহারা যে বিশ্বের জনমতের চাপে কেবল মুখ রক্ষা করিবার জন্যই 'ক্রিপ্‌স্‌ মিশন' পাঠাইয়াছিল তাহাও তাহারা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করে। বৃটিশ-শাসকদের এই ঔদ্ধত্য ও সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সারা ভারতবর্ষে ক্রোধের আগুন জ্বালিয়া দেয়। জনসাধারণ ক্রোধের বশে মহাযুদ্ধের নূতন গণ-চরিত্র ও

(১) Prof. R. Coupland : 'The Cripps Mission', P. 26—28.

(২) Same : Same P, 30.

গভীর তাৎপর্য ভুলিয়া গিয়া অবিলম্বে চরম শত্রু বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদকে চরম আঘাত দিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠে।

আগষ্ট-সংগ্রামের পটভূমিকা

১৯৪২ খৃষ্টাব্দ

"কংগ্রেস-লীগ যুক্তফ্রণ্ট"

'ক্রিপ্‌স্‌-মিশনের' ব্যর্থতার পর ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার সংকট দেখা দেয়। একদিকে "কংগ্রেস জনসমর্থহীন," "রাজনৈতিক বিভেদ," "ভারতবর্ষ স্বায়ত্ব শাসনের অযোগ্য" প্রভৃতি চির পুরাতন যুক্তি দ্বারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া বিশ্বের জনমতকে বিভ্রান্ত করিবার উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদীরা প্রাণপণে কুৎসা প্রচার করিতে থাকে। অপর দিকে ফাসিস্ট-এর আক্রমণের সংকট ও মহাযুদ্ধের নূতন চরিত্র বিচার করিয়া পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নেতৃত্বে আপসের মারফত জাতীয় দাবি আদায়ের যে চেষ্টা শুরু হইয়াছিল তাহা বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের ঔদ্ধত্য ও শঠতার ফলে সফল না হওয়ায় কংগ্রেসের মধ্যেও আপস-বিরোধী মনোভাব প্রবল হইয়া উঠে। এই সংকটের সময় কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নায়ক রাজা গোপালাচারিয়ার জাতীয় দাবি আদায়ের জন্য এক নূতন উপায় খুঁজিয়া বাহির করেন। জাপানী আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় সরকার গঠনের জন্য কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের "যুক্তফ্রণ্ট" গঠনই হইল এই নূতন উপায়। মুসলিম লীগ যাহাতে কংগ্রেসের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইতে সম্মত হয় তাহার জন্য যে সকল প্রদেশে মুসলমান-জনসংখ্যা অধিক সেই সকল প্রদেশকে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিবার প্রস্তাব করা হয়। কিন্তু মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রের-কমিটির অধিবেশনে এই প্রস্তাব ভোটে পরাজিত হয়। এই অধিবেশনের পর রাজাজী তাঁহার এই নীতি প্রচারের জন্য কংগ্রেস-সভ্যপদ ত্যাগ করেন।

পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের প্রচেষ্টা

ব্যর্থ হইলে গান্ধীজী পুনরায় জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে গান্ধীজী এই মত প্রচার করেন—(১) আক্রমণকারী জাপানকে অহিংস উপায়ে বাধা দান; (২) বৃটিশ-শাসকদের সহিত অসহযোগ, (৩) মিত্রশক্তির ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের প্রতি নৈতিক সমর্থন; (৪) ভারতবর্ষকে যুদ্ধ হইতে দূরে রাখা। পূর্বে জহরলাল নেহেরু জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ এবং "গোরিলা-যুদ্ধ" ও "পোড়ামাটির নীতি" অবলম্বনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন গান্ধীজী তাহার বিরোধিতা করেন। কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা গান্ধীজীর এই "শান্তিবাদ" সমর্থন করেন নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রায় সকলেই জাপানী আক্রমণ হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার জন্য এবং অবিলম্বে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র উপায় হিসাবে গান্ধীজীর অসহযোগের প্রস্তাব সমর্থন করেন। ১৪ই জুলাইয়ের কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাবও পাশ হইয়া যায়। এই প্রস্তাবের প্রথম অংশে ভারতের স্বাধীনতা লাভ এবং মিত্রশক্তিবর্গের ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধের সাফল্যের জন্য অবিলম্বে ভারতের বৃটিশ-শাসনের অবসান ও ফাসিস্ট-আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য ভারতের সকল পার্টি ও দলের সহযোগিতায় জাতীয় সরকার গঠনের দাবি উপস্থিত করা হয় এবং ফাসিস্ট-বিরোধী যুদ্ধে মিত্রশক্তিবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু প্রস্তাবের অপর অংশে বলা হয়:

"………অতএব ভারতের স্বাধীনতা ও মুক্তির জন্মগত অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কংগ্রেস-কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছে যে, এমন ব্যাপকভাবে গণ-সংগ্রাম আরম্ভ করা হইবে যে গত বাইশ বৎসরের শান্তিপূর্ণ সংগ্রামের মারফত দেশ যতখানি অহিংস শক্তি সংগ্রহ করিতে পারিয়াছে ততখানি শক্তি সমগ্রভাবেই ব্যবহৃত হইবে।

"এই সংগ্রামে গান্ধীজীকেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। কংগ্রেস-কমিটি গান্ধীজীকে এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র জাতিকে চালনা করিতে অনুরোধ করিতেছে।" গান্ধীজী পূর্ব হইতে "কুইট ইণ্ডিয়া" ধ্বনি তুলিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবে সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি করা হয়।

১৪ই জুলাই তারিখের কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে এই সংগ্রামের প্রস্তাব পাশ হইলেও কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ সংগ্রাম শুরু করিবার জন্য কোন আয়োজন করেন নাই। কারণ, তাঁহারা এই প্রস্তাবকে কেবল একটা হুমকি বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারা সংগ্রামের এই হুমকি দিয়া শাসকদের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন এবং তাঁহারা সম্ভবতঃ আশা করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ-সরকার নিশ্চয়ই এই হুমকিতে ভয় পাইয়া এই বিপদের সময় কংগ্রেসের সহিত একটা আপস করিয়া ফেলিবে।

কিন্তু বৃটিশ-শাসকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন মতলব লইয়া উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় দিন গণিতেছিল। কংগ্রেসের এই সংগ্রামের প্রস্তাব তাহাদের সেই সুযোগ আনিয়া দেয়। 'ক্রিপ্‌স্‌-মিশন'-এর ব্যর্থতার পর হইতেই বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা কংগ্রেসকে ফাসিস্ট-সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিত্ররাজ্য গুলিতে প্রাণপণে প্রচার চালাইতেছিল। সাম্রাজ্যবাদীরা বুঝিয়াছিল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেস বিশ্বের জনসাধারণের সমর্থন পাইবে, ততক্ষণ ইহাকে আঘাত করিয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করা সম্ভব হইবে না। তাই তাহারা পরিকল্পনা করিয়াছিল যে, কংগ্রেসকে ফাসিস্ট-সমর্থক বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার ফলে যখন কংগ্রেস বিশ্বের জনসাধারণের সমর্থন হারাইবে, তখনই তাহারা আকস্মিক আঘাতে কংগ্রেসকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিবে। সুতরাং কংগ্রেস-কমিটি আন্দোলন আরম্ভের প্রস্তাব গ্রহণ করিবামাত্র সাম্রাজ্যবাদীরা একদিকে মিত্ররাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আরও জোরে প্রচার আরম্ভ করে এবং অপরদিকে এই সুযোগে এক আকস্মিক আঘাতে কংগ্রেস ও ভারতের জাতীয় সংগ্রামকে চূর্ণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এই ভাবে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদীরা যখন কংগ্রেস ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিরুদ্ধে এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিতে ব্যস্ত, ঠিক তখনই ৮ই আগস্টের কংগ্রেস-কমিটির অধিবেশনে সংগ্রামের প্রস্তাব সংশোধিত আকারে পুনরায় পাশ করা হয়। এই সংশোধিত প্রস্তাবে বিশেষভাবে বলা হয় যে, এই সংগ্রামে অতি দ্রুত (বল্লভভাই প্যাটেলের মতে সাত দিনের মধ্যে) জয়লাভ

করিয়া স্বাধীন ভারতবর্ষ কার্যকরী ভাবে আক্রমণকারী জাপানকে বাধা দিতে পারিবে এবং সংগ্রাম আরম্ভ করিবার পূর্বে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ শেষবারের মত বড়লাটের সহিত আপসের আলোচনা চালাইবেন।

কিন্তু বৃটিশ-শাসকগণ ততক্ষণে শেষ আঘাত দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়াছে। এবার তাহারা অবিলম্বে আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়। এই প্রস্তাব গৃহীত হয় ৮ই আগস্ট, আর ৯ই আগস্ট কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সভ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই আকস্মিক আক্রমণে সমগ্র দেশ হতভম্ব হইয়া পড়ে। কিন্তু দেখিতে না দেখিতে সারা দেশে এক ভয়ংকর ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ক্রোধোন্মত্ত জনসাধারণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চারিদিকে পাল্টা আক্রমণ শুরু করে। চারিদিকে সভা ও শোভাযাত্রায় প্রতিবাদ ধ্বনিত হইতে থাকে, চারিদিকে জনসাধারণ ও পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হইয়া যায়। সারা দেশ এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়, উন্মত্ত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলি বর্ষণে প্রত্যেক প্রদেশে শত শত লোক নিহত ও আহত হয়, কয়েকটি অঞ্চলে জনসাধারণ সাময়িকভাবে বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই সংগ্রামই "১৯৪২ খৃস্টাব্দের আগস্ট-সংগ্রাম" নামে খ্যাত।

* * * *

আগষ্ট-সংগ্রাম*

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ

১৯৪২ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দ্বারা সংগ্রাম আরম্ভের প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর হইতেই সারা ভারতবর্ষে সংগ্রামের চাঞ্চল্য জাগিয়া উঠিতে থাকে। সারা দেশের জনসাধারণ গান্ধীজীর শেষ নির্দেশের জন্য

* "আগস্ট-সংগ্রাম"-এর তথ্য নিম্নোক্ত গ্রন্থ, পুস্তিকা ও প্রবন্ধ হইতে গৃহীত হইয়াছে:— (১) 'March of Events' (1942-45, Congress publication); (২) Twelve articles on "August Revolution" by Twelve writers in 'Independence -Number', Amritabazar Patrica; (৩) 'Aug. Revolution & Two years of National Govt'. by Satish Samanta and others; (4) 'Some facts About the Disturbances, 1942-43.' (Govt. Publication.)

উন্মুখ হইয়া উঠে। আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে বোম্বাই শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঐতিহাসিক অধিবেশন শুরু হইবামাত্র এই অধিবেশনের দিকে সারা ভারতের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। এই অধিবেশনে ৮ই আগস্ট তারিখে "জুলাই প্রস্তাব"ই সংশোধিত আকারে পাশ হয়। ৯ই আগস্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন।

সারা ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ সংবাদপত্রে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাঠ করিয়া বিস্ময়ে ও ক্রোধে হতবুদ্ধি হইয়া যায়। বৃটিশ-সরকার কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দও পথিমধ্যে গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন প্রদেশের কতিপয় সভ্য কোন প্রকারে গ্রেপ্তার এড়াইতে সক্ষম হন। তাঁহারা বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া বহু গোপন বৈঠকে কংগ্রেস-কর্মীদের নিকট বোম্বাই-অধিবেশনের ঘটনাবলী ও নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ দেন। এই সকল সংবাদ এইভাবে প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতবর্ষে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠে এবং বিভিন্ন প্রদেশের ছাত্র, কৃষক প্রভৃতি জনসাধারণ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিশোধ লইবার জন্য চারিদিকে আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়।

"কারাগারে আবদ্ধ করিবার পূর্বে নেতৃবৃন্দের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য বৃটিশ-সরকার সকল ব্যবস্থাই অবলম্বন করিয়াছিল। একদিকে সংবাদের প্রচার বন্ধ করিবার জন্য জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির উপর এক লৌহ-যবনিকা টানিয়া দেওয়া হয়, অপর দিকে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চার্চিল ও বৃটিশ-সংবাদপত্রগুলি তাহাদের এই ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপ সমর্থনের উদ্দেশ্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করিতে থাকে। কংগ্রেস সম্পূর্ণরূপে বেআইনী ঘোষিত হয় এবং সারা দেশের উপর এক বীভৎস সামরিক শাসন চাপিয়া বসে......এইরূপ সর্বব্যাপী টলমলায়মান অবস্থার মধ্যে নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন, আয়োজনহীন ও নিরস্ত্র অবস্থায় অসহায় জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে মরিয়া হইয়া পাল্টা আক্রমণ শুরু করে।"(১)

(১) Satyen Sen Gupta : '1942 Revolution in Bengal' (Amrita Bazar Patrika—Independence Number.)

আগষ্ট-সংগ্রামে বাংলাদেশ

কলিকাতা

৯ই আগস্ট নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর তিন দিন পর্যন্ত কলিকাতা মহানগরীতে এক ভয়ংকর স্তব্ধতা বিরাজ করিতে থাকে। অন্যদিকে এই তিন দিনে ভারতের অন্যান্য শহরের কংগ্রেস-কর্মীরা সরকারের উপর প্রাণপণে আক্রমণ শুরু করিয়া দেয়।

১০ই আগস্ট বাংলা-সরকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটি ও উহার সকল শাখা-কমিটি সমূহ বেআইনী ঘোষণা করে। ১২ই তারিখে বহু-সংখ্যক স্কুল-কলেজের ছাত্র ধর্মঘট করিয়া বাহির হয়। তাহারা শোভাযাত্রা করিয়া ধ্বনি সহকারে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করে এবং বিভিন্ন পার্কে সভা করিয়া গান্ধীজীর উক্তি বলিয়া কথিত "করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে" শপথ গ্রহণ করে। কলিকাতায় প্রথম রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয় ১৩ই আগস্ট হইতে। ঐদিন কলিকাতার প্রায় সকল স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করিয়া রাস্তায় বাহির হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া ওয়েলিংটন স্কোয়ারে সমবেত হয়। কিন্তু সভার কার্য শুরু হইবার পূর্বেই সশস্ত্র পুলিশের এক বিরাট দল জনতার উপর আক্রমণ শুরু করে। ঘটনাস্থলে কয়েকজন ছাত্র গ্রেপ্তার হয় এবং বহু সংখ্যক ছাত্র পুলিশের লাঠির আঘাতে আহত হয়। এই সংবাদ দ্রুত শহরে ছড়াইয়া পড়ে এবং সকল দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ঘটনার পর ঐদিন বিকাল বেলা বহু ছাত্র ও কংগ্রেস কর্মী ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া ট্রাম ও বাসের আরোহীদের ট্রাম ও বাসে না উঠিতে এবং গাড়ীর চালকদের গাড়ী না চালাইতে অনুরোধ করে। কর্ণোয়ালিশ স্ট্রীটের শ্রীমানী বাজারের সম্মুখে এইরূপ একটি দলের উপর পুলিশ গুলি চালায়। ইহার ফলে কয়েকজন গুরুতররূপে আহত হয় এবং এক যুবক নিহত হয়। ইহার ফলে সারা শহরে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া

উঠে। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, এমনকি স্কুলের অল্প বয়স্ক বালক-বালিকারাও পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সহিত রক্তাক্ত সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। কলিকাতার এই সংগ্রামের আগুন দ্রুত সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া যায়।

১৪ই আগস্ট বিডন স্ট্রীটে পুলিশের সহিত জনতার এক খণ্ড যুদ্ধ হয়। ঐ দিন কর্ণোওয়ালিশ স্ট্রীটের অবস্থা ভীষণ আকার ধারণ করে, রাস্তাটির একটি বৃহদংশ এক রক্তাক্ত রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। ক্রুদ্ধ জনতা রাস্তার পোস্ট-বাক্স, ইলেক্ট্রিক ফিউস-বাক্স, ফায়ার এলার্ম-এর বাক্স, ল্যাম্প-পোস্ট প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া ফেলে এবং তাহা দ্বারা 'ব্যারিকেড' রচনা করিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া দেয়। বৈকালে পুলিশ সেণ্ট্রাল এভিনিউ ও বিডন স্ট্রীটের সংযোগ-স্থলে জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে এবং তাহার ফলে আট ব্যক্তি গুরুতর রূপে আহত হয়। সন্ধ্যাকালে দক্ষিণ-কলিকাতার কয়েকটি অঞ্চলে পুলিশের সহিত জনতার খণ্ডযুদ্ধ হয়। জনতা ইষ্টকখণ্ডের সাহায্যে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া কয়েকটি স্থানে পুলিশকে হটাইয়া দিতে সক্ষম হয়। ঐ দিন বেলা তিনটার সময় সার্কুলার রোডের উপরেও পুলিশের সহিত জনতার খণ্ডযুদ্ধ চলে। এখানে পুলিশ কয়েকবার গুলিবর্ষণ করে এবং তাহার ফলে দুইজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। ঐদিন রাত্রিকালে অন্ধকারাচ্ছন্ন কলিকাতা নগরী এক পরিত্যক্ত ও শত্রু-অধিকৃত শহরের আকার ধারণ করে। দিনের অসংখ্য খণ্ডযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় উন্মত্ত হইয়া মিলিটারী ও সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সারা শহরে ঘুরিতে থাকে এবং নিরীহ পথচারীদের দেখিবামাত্র গুলি করে। নিরস্ত্র জনতা এই বর্বরতার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য বাড়ীর ছাদ ও অন্ধকার গলি হইতে পুলিশ ও মিলিটারী গাড়ীর উপর ইষ্টক বর্ষণ করে, উহাতে এবং ট্রাম-গাড়ীতে আগুন ধরাইয়া ভস্মীভূত করে এবং বহুস্থানে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও ভারত-সচীব আমেরি সাহেবের কুশ-পুত্তলিকা দাহ করে।

এইভাবে কয়েকদিন ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে থাকে, কলিকাতার স্বাভাবিক জীবন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হইয়া যায়; প্রায় সকল দোকান ও যানবাহন বন্ধ থাকে। এই কয়েকদিনের সংগ্রামে বহু ট্রামগাড়ী ভস্মীভূত হয়; বিভিন্ন রাস্তা 'ব্যারিকেড,

দ্বারা বন্ধ রাখা হয়; শহরের টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও ইলেকট্রিকের তার কাটিয়া ফেলায় ঐগুলি অকর্মণ্য হইয়া থাকে; রাস্তায় পুলিশ ও মিলিটারীর গাড়ী দেখিবামাত্র জনতা ইষ্টকখণ্ড দ্বারা আক্রমণ করিতে থাকে; ছাত্রগণ ধর্মঘট করিয়া থাকায় স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ থাকে। সমগ্র কলিকাতা একটা বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং নগরীর সকল ব্যবস্থা অচল হইয়া যায়। এই সময়ে কলিকাতার কোন স্থান হইতে গোপন-বেতারে চারিদিকে সংবাদ প্রচার করা হইত এবং কর্মীদেয় প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হইত। এই গোপন বেতারের সকল কর্মী গ্রেপ্তার হইলে বেতারটি বন্ধ হইয়া যায়। বৃটিশ সামরিক কর্তারা সংবাদপত্রে সংগ্রামের সংবাদ প্রকাশ বন্ধ করিয়া দিলে ইহার প্রতিবাদে ১৮ই আগস্ট হইতে সংবাদপত্রের প্রকাশ বন্ধ করা হয়।

এই সংগ্রামে কলিকাতায় ৪০টি পোস্টবক্স ও কয়েকটি পোস্ট অফিস ভস্মীভূত হয়। বাংলার তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ফজলুল হকের এক বিবৃতিতে কেবলমাত্র আগস্ট মাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিবর্ষণে ২০ জন নিহত ও ১৫২ জন আহত হইয়াছিল বলিয়া ঘোষণা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন হাসপাতালের হিসাবে আহতের সংখ্যা প্রায় এক হাজার। ইহা ব্যতীত, এই সংগ্রাম উপলক্ষে ৩৫০০ জন গ্রেপ্তার ও বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

"স্বাধীন" মেদিনীপুর

(১) তমলুকের সংগ্রাম

কলিকাতায় যখন উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ঘটিতেছিল, ঠিক তখনই বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে মেদিনীপুর জিলায় ইহা অপেক্ষা শতগুণ শক্তিশালী এক গণ-সংগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। এই জিলার বিদ্রোহী জনসাধারণ "অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বৃটিশ-ভারতের এই অঞ্চলে কয়েক বৎসরের জন্য বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইতে সক্ষম হইয়াছিল।" এই জিলা বহিঃশত্রুর (জাপানের) আসন্ন আক্রমণ ও আভ্যন্তরিক শত্রুর

(ইংরেজ-রাজের) দমননীতির মুখে একটি জাতীয় সরকার গঠন করিতেও সক্ষম হইয়াছিল……এই জন্যই মেদিনীপুর জিলা চিরদিন জাতির স্মৃতিপঠে বিরাজ করিবে।" (১)

সরকরী রিপোর্টে আগস্ট-সংগ্রামে মেদিনীপুরের বীরত্বপূর্ণ ক্রিয়াকলাপের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই স্থানের সংগ্রামের সংগঠন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে,

"বাংলাদেশের মেদিনীপুর জিলায় বিদ্রোহীদের সংগ্রাম-কৌশল হইতে যথেষ্ট সতর্কতা ও সংগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই স্থানে বিশেষ কার্যকরী সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উদ্ভাবন করা হইয়াছিল, যুদ্ধের প্রাথমিক কৌশলগত নীতিগুলিও মানিয়া চলা হইত, যেমন পূর্ব-নির্দিষ্ট সংকেত অনুসারে (শত্রুপক্ষকে) ঘেরাও করা ও উহাদের পাশ কাটাইয়া যাওয়া। যুদ্ধে আহতদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার জন্য বিদ্রোহী বাহিনীর সহিত ডাক্তার, নার্স ও আর্দালি রাখা হইত। ইহাদের গুপ্তচর-ব্যবস্থাও ছিল বিশেষ কার্যকরী।" (২)

মেদিনীপুরের জনসাধারণের স্বাধীনতা-স্পৃহার পশ্চাতে যুদ্ধকালীন অর্থনৈতিক বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হইয়া এই গণ-বিদ্রোহকে দুর্বার করিয়া তুলিয়াছিল। তমলুক ও কাঁথি এই দুইটি মহকুমার আয়তন মেদিনীপুর জিলার দুই-তৃতীয়াংশ। এই দুই মহকুমার লোক-সংখ্যা পনের লক্ষাধিক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম হইতেই এই দুইটি মহকুমার অধিবাসীদের উপর নানাবিধ করের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। জাপানী আক্রমণ শুরু হইবার পর ঐ করভারের সহিত সরকারের নূতন নূতন উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা যুক্ত হইয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীদের অসহনীয় অর্থনৈতিক দুর্দশার মুখে ঠেলিয়া দেয়, তাহাদের জীবিকা নির্বাহের সকল ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া ফেলে। যুদ্ধের অনিবার্য ফল হিসাবে দ্রব্যমূল্য বহুগুণ বাড়িয়া যায়; ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকল লোককে বলপ্রয়োগে সরকারের যুদ্ধ-বণ্ড ক্রয় করিতে এবং সরকারী যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা দিতে বাধ্য

---

(১) Satyan Sen Gupta: "1942 Revolution in Bengal," Independence Number, 'Amrita Bazar Patrika'.)

(২) "Some Facts about the disturbances, 1942-43" (Govt. publication).

করা হয়; সরকারের "ডিনায়াল পলিসি"র অংশ হিসাবে সকলের বাই-সাইকেল, নৌকা প্রভৃতি কাড়িয়া লওয়া হয়; তমলুক ও পাঁসকুড়া থানার অধিকাংশ অঞ্চল এবং সমগ্রভাবে নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, মহিষাদল ও ময়না গ্রাম সামরিক প্রয়োজনের অজুহাতে জনহীন করিয়া ফেলা হয়, এই সকল অঞ্চলের সকল চাষী ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ বাড়ীঘর ও জীবিকা হারাইয়া পথের ভিখারী হয়। সরকারের এই সকল উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থার ফলে এক ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ শুরু হইয়া যায়। সরকারী আদেশে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হওয়ায় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদেরও কোন উপায় ছিল না। এই সকল উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থাই মেদিনীপুরে বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, সমগ্র মেদিনীপুর একটা বিরাট বারুদের স্তূপে পরিণত হয়। গান্ধীজীর সংগ্রামের আহ্বান ও ৯ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের ফলে সারা মেদিনীপুরে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহের আগুণ জলিয়া উঠে।

প্রথমে গান্ধীজীর অহিংসা-মন্ত্রে দীক্ষিত মেদিনীপুর কংগ্রেসের উপর সরকারী আক্রমণ সত্ত্বেও অসীম ধৈর্যের সহিত কেবলমাত্র প্রতিবাদ-আন্দোলন চালাইয়া যায়। কিন্তু সরকারের উন্মত্ত দমননীতি ক্রমশঃ জনসাধারণকে বিদ্রোহের দিকে ঠেলিয়া দেয়। কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর সারা আগস্ট মাস ধরিয়া বড় বড় সভা ও শোভাযাত্রা চলিতে থাকে। এই সকল সভা ও শোভাযাত্রায় হাজার হাজার কৃষক ও মধ্যবিত্ত যোগ দেয় এবং শান্তিপূর্ণভাবে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি জানায়। কিন্তু সরকারী পুলিশ ও সৈন্যদল প্রথম হইতেই বলপ্রয়োগে জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিবার কৌশল অবলম্বন করে। এই দমননীতির ফলে জনসাধারণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং স্থানীয় নেতাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে থাকে। অবশেষে জনসাধারণের চাপে কংগ্রেস-নেতারা বাধ্য হইয়া এই গণ-বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের উদ্যোগে কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে লইয়া "জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী" গঠিত হয়। আগস্ট মাসের শেষ দিকে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে "যুদ্ধ" ঘোষণা করিয়া চারিদিকে

থানা ও সরকারী দপ্তর দখল করিবার নির্দেশ পাঠান হয়। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ২৯শে আগস্ট মহিষাদল শহরে সামরিক পোষাক পরিহিত জাতীয় স্বেচ্ছা-সৈন্যগণের পরিচালনায় প্রায় ২০ হাজার লোকের একটি শোভাযাত্রা মহিষাদল থানার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রীরা সেই স্থানে মেদিনীপুরের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে একটি সভা করে এবং মেদিনীপুর তথা বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া এক প্রস্তাব পাশ করে। ম্যাজিস্ট্রেট ক্রুদ্ধ হইয়া সভার বক্তাদের গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিলে সমবেত জনসাধারণ পুলিশকে বাধা দেয়। নেতাদের গ্রেপ্তার করিতে না পারিয়া জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং কনেস্টবলদের গুলি চালনার নির্দেশ দেন, কিন্তু কনেস্টবলগণ গুলি চালাইতে অস্বীকার করে। অতঃপর ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ভয় পাইয়া সদলবলে পলায়ন করেন।

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর মেদিনীপুরে প্রথম জনতার উপর গুলি বর্ষণ করা হয়। ঐ তারিখে সরকার তমলুকের কয়েকজন চাউল-কলের মালিকের সাহায্যে গোপনে জেলার বাহিরে চাউল পাচারের চেষ্টা করে। এই সংবাদ পাইবামাত্র প্রায় দুই হাজার কৃষক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া চাউল-কলের মালিকদের চাউল-পাচারে বাধা দেয়। উপস্থিত পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে এবং ইহাতে তিনজন নিহত ও বহু লোক আহত হয়। নিরস্ত্র জনতা পলাইয়া গিয়া কংগ্রেস-অফিসে সংবাদ দিলে প্রায় ৬ হাজার গ্রামবাসী কৃষকসহ স্বেচ্ছা-সৈন্যদের অধিনায়কগণ উপস্থিত হইয়া চাউল পাচার বন্ধ করিবার ও মৃতদেহগুলি ফেরৎ দিবার দাবি জানায়। পুলিশ মৃতদেহগুলি ফেরৎ দিতে অস্বীকার করিলে তাহাদের সহিত জনতার এক সংঘর্ষ হয়। পরের দিন একটি বিরাট সশস্ত্র পুলিশদলসহ জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছয়টি গ্রামে হানা দিয়া প্রায় দুই শত লোককে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু জনসাধারণ ইহাতে ভীত না হইয়া সরকারের সহিত সহযোগিতাকারী চাউলকল-মালিকদের আটক করে। তাহারা অবশেষে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ও দুই হাজার টাকা জরিমানা দিয়া মুক্তি পায়। এই ভাবে এই অঞ্চলের শাসন-ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে।

২৭শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দ তমলুকের কোন স্থানে এক গোপন সভায় মিলিত হইয়া তমলুক মহকুমার থানা, আদালত প্রভৃতি ধ্বংস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সিদ্ধান্ত কার্যকরী করিবার ভার গ্রহণ করে মেদিনীপুরের বিখ্যাত কংগ্রেস-নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় ও সুশীল ধারার নেতৃত্বে সামরিক পদ্ধতিতে গঠিত "বিদ্যুৎ বাহিনী"। "বিদ্যুৎ বাহিনী" এই অঞ্চলে সৈন্য ও পুলিশের চলাচল বন্ধ করিবার জন্য তমলুকের জনসাধারণের সাহায্যে বড় বড় গাছ কাটিয়া ও ৩২টি পুল উড়াইয়া দিয়া তমলুকের প্রধান দুইটি রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেয়। ইহা ব্যতীত এই অঞ্চলে মোট ২৭ মাইল লম্বা টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন কাটা হয় এবং ১৯৫টি টেলিগ্রাফ-পোস্ট উপড়াইয়া ফেলা হয়। ২৮শে ও ২৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে তমলুকের চারিটি থানা আক্রমণ ও ধ্বংস করিয়া ফেলা হয়। এই সকল আক্রমণে বহু সহস্র কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ অংশ গ্রহণ করে। বহু লোক পুলিশ ও সৈন্যদের লাঠি ও গুলিতে প্রাণ দেয় এবং শত শত লোক গুরুতররূপে আহত হয়। এই সকল ধ্বংসকার্যের পর পূর্ব ব্যবস্থা অনুসারে তমলুকের মহকুমা-শহরের উপর আক্রমণ চলে। নির্দিষ্ট দিনে একই সময়ে পাঁচটি পথ ধরিয়া প্রায় ২০ হাজার লোকের পাঁচটি বিরাট শোভাযাত্রা তমলুকের মহকুমা-শহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রীরা শহরের থানার নিকটবর্তী হইবামাত্র সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশের একটি বিরাট বাহিনী তাহাদের গতিরোধ করে এবং বৃষ্টিধারার মত গুলিবর্ষণ করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। এই গুলিবর্ষণের ফলে কয়েকজন নিহত ও বহু আহত হয়। তমলুকের মহকুমা-শহরের এই সংঘর্ষেই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া ৭৩ বয়স্কা বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা দেশবাসীর সম্মুখে অপূর্ব বীরত্ব ও সাহসের দৃষ্টান্ত রাখিয়া শহীদের মৃত্যু বরণ করেন।

মাতঙ্গিনী হাজরা

তমলুক শহরের উপর আক্রমণের দিন মাতঙ্গিনী একটি বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করিয়া লইয়া আসেন। তাঁহার পরিচালিত শোভাযাত্রাটি তমলুক থানার নিকটবর্তী হইবামাত্র একটি সৈন্যদল ইহার উপর গুলিবর্ষণ শুরু করে।

এই সময় লক্ষ্মীনারায়ণ দাস নামক একটি বালক গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া সৈন্যদের দিকে অগ্রসর হয় এবং একটি সৈন্যের হস্ত হইতে তাহার রাইফেল কাড়িয়া লয়। সৈন্যগণ লক্ষ্মীনারাণকে রাইফেলের বাট দিয়া উন্মত্তের মত প্রহার করিতে থাকে। এই অমানুষিক দৃশ্য দেখিয়া বীর মাতা মাতঙ্গিনীর মাতৃ হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে। তিনি একটি কংগ্রেস-পতাকা হস্তে লইয়া প্রহারকারী সৈন্যদের দিকে ধাবিত হন। মাতঙ্গিনীর বীর মূর্তি দেখিয়া সৈন্যেরা প্রথমে হতভম্ব হইয়া পিছাইয়া যায়। মাতঙ্গিনী ভারতীয় সৈন্যদের নিকট লক্ষ্মীনারায়ণকে প্রহার ও জনতার উপর গুলিবর্ষণ বন্ধ করিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদান করিবার আবেদন করেন। কয়েক মুহূর্ত পরেই তাহারা মরিয়া হইয়া মাতঙ্গিনীর উপর গুলি বর্ষণ করে। একটি গুলি মাতঙ্গিনীর কপালে লাগিবামাত্র বীর মাতা মাতঙ্গিনীর প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। এই গুলিবর্ষণে মাতঙ্গিনীর সহিত তের বৎসর বয়স্ক লক্ষ্মীনারায়ণ দাস, চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক পুরীমাধব প্রামানিক, নগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও জীবনচন্দ্র বেরা প্রাণ দেয়।

"বিদ্যুৎ বাহিনী"

২৯শে সেপ্টেম্বর মহিষাদল শহরের থানার উপর আক্রমণ হয়। এই আক্রমণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু সহস্র কৃষক যোগদান করে। কৃষকগণ বিভিন্ন দিক হইতে অসংখ্য শোভাযাত্রা করিয়া মহিষাদল শহরে আসিয়া এবং থানা অভিমুখে অগ্রসর হয়। বহু শত পুলিশ ও পাইক লইয়া থানার দারোগা ও স্থানীয় 'রাজা' আক্রমণকারী জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণে দুইজন নিহত ও ও বহু লোক আহত হয়। নিরস্ত্র জনতা সাময়িকভাবে পিছু হটিয়া যায়। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা ৫ হাজার হইতে ২৫ হাজারে উঠে। এবার এই ২৫ হাজার লোক একত্রে থানা আক্রমণ করে। পুলিশ ও 'রাজা'র অনুচরগণ প্রাণপণে গুলিবর্ষণ করিয়া বাধা দেয়। এই দ্বিতীয় বারের গুলিবর্ষণে ১৩ জন নিহত ও কয়েক শত লোক আহত হয় এবং জনতা আবার পিছু হটিতে

বাধ্য হয়। তমলুকের "বিদ্যুত বাহিনী"র নেতৃত্বেই এই সকল আক্রমণ সংগঠিত ও পরিচালিত হয়।

"বিদ্যুৎ বাহিনী" তমলুকের মহকুমা-থানা ও মহিষাদলের শহর-থানা দখল করিতে না পারিলেও তমলুক মহকুমার সুতাহাটা ও নন্দীগ্রাম থানা দখল করতে সক্ষম হয়। "বিদ্যুৎ বাহিনী" বহু সহস্র স্থানীয় কৃষকের সাহায্যে সশস্ত্র পুলিশের বন্দুকের গুলিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া এই দুইটি থানা দখল করে। থানা দুইটির রাইফেল ও বন্দুক এবং কাগজ-পত্র সব কিছুই বাজেয়াপ্ত করা হয়। তারপর থানার বাড়ী, খাসমহল-অফিস, য়ুনিয়ন বোর্ড-অফিস ও জমিদারদের কাছারী বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া ভস্মীভূত করা হয়। যে সকল সরকারী কর্মচারী "বিদ্যুৎ বাহিনী"র নিকট আত্মসমর্পণ করে তাহাদের ট্রেন-ভাড়া দিয়া বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

মেদিনীপুরের "স্বাধীন জাতীয় সরকার" "বিদ্যুৎ বাহিনী" ও জনসাধারণের দখল করা অঞ্চল-সমূহের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করে। "জাতীয় সরকার" এই সকল অঞ্চলে একটি সুগঠিত গণ-শাসন ব্যবস্থা চালু করে। এই শাসন-ব্যবস্থার নিরাপত্তার জন্য "বিদ্যুৎ বাহিনী"কে পুনর্গঠিত করিয়া একটি গণ-বাহিনীর রূপ দেওয়া হয় এবং গণ-বাহিনীকে সুশিক্ষিত করিয়া আসন্ন বৃটিশ ও জাপানী আক্রমণে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা হইতে থাকে। কিছুদিন পরে এই সংগ্রামের মধ্যেই যখন মেদিনীর জিলায় ভয়ংকর ঘূর্ণীবাত্যা ও বন্যা হয় তখন এই "বিদ্যুৎ বাহিনী" জনসেবার যে দৃষ্টান্ত দেখায় তাহা মেদিনীপুরের মানুষ কোন দিন বিস্মৃত হইবে না।

(২) কাঁথির সংগ্রাম

১৯৩০-৩৪ খৃস্টাব্দের অসহযোগ-সংগ্রামে কাঁথি মহকুমা যে নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছিল, যে অভূতপূর্ব বীরত্ব দেখাইয়াছিল, ১৯৪২ খৃস্টাব্দের গণ-সংগ্রামেও সেই সংগ্রামী ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। ৮ই আগস্ট গান্ধীজী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছিবামাত্র সমগ্র কাঁথী মহকুমাতেও চাঞ্চল্য দেখা

দেয়। নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ১৪ই ও ২০শে আগস্ট সমগ্র মহকুমায় ধর্মঘট করা হয়। স্থানীয় সরকার আতঙ্কে অস্থির হইয়া উঠে এবং ২১শে আগস্ট মহকুমা কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি নিকুঞ্জবিহারী মাইতি, সম্পাদক রাসবিহারী পাল, ঈশ্বরচন্দ্র মাল প্রভৃতি বিশিষ্ট কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার ও আটক করে। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে ২৩শে আগস্ট পুনরায় সমগ্র মহকুমায় হরতাল পালিত হয়। এই প্রতিবাদ-সংগ্রামে উন্মত্ত হইয়া সরকার চারিদিকে গ্রেপ্তার ও দমননীতি চালাইতে থাকে। কয়েকজন ছাত্র ও শিক্ষককে গ্রেপ্তার করিয়া নাম মাত্র বিচারের পর প্রত্যেককে দুই বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় এবং ২৮শে আগস্ট স্থানীয় পুলিশ মহকুমা-কংগ্রেস অফিসে হানা দিয়া বহু স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে।

এই সকল সরকারী আক্রমণের ফলে সমগ্র মহকুমায় সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠে। ছাত্ররা স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া "স্বাধীন জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠার জন্য জনসাধাণকে বিদ্রোহে যোগদান করিতে আহ্বান করে। সমগ্র মহকুমায় সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া "বেআইনী" সভা-শোভাযাত্রা চলিতে থাকে। ১৪ই সেপ্টেম্বর বেলা ৩ ঘটিকার সময় ১০ হাজার লোকের ২০টি শোভাযাত্রা কাঁথি শহরে প্রবেশ করে। শহরের সমগ্র জনসাধারণ অবিলম্বে শোভাযাত্রীদের সহিত মিলিত হয়। তারপর এই বিশাল জন-সমাবেশে নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানানো হয়। এই সংবাদ পাইবামাত্র শহরের সকল সরকারী কর্মচারী শহর ছাড়িয়া পলায়ন করে।

কাঁথি শহরের এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বাজার ও দোকানপাট অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হইয়া যায়, উকিল-মোক্তারগণ আদালত বয়কট করেন। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সমগ্র মহকুমার চৌকিদার ও দফাদারগণ সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দেয়। ২০শে সেপ্টেম্বর পুলিশ পিসাবনী নামক স্থানে ১১ জন স্বেচ্ছাসেবককে গ্রেপ্তার করে। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইবামাত্র স্থানীয় জনসাধারণ পুলিশদলকে ঘিরিয়া ধরিয়া তাহাদের কবল হইতে স্বেচ্ছাসেবকদের

ছিনাইয়া নেয়। ইহার পর পুলিশ ও সৈন্যদলের চলাচলে বাধা দিবার জন্য জনসাধারণ কাঁথি-রামনগরের প্রধান রাস্তাটির বিভিন্ন স্থান ধ্বংস করিয়া ফেলে। ২২শে সেপ্টেম্বর মহকুমা-অফিসার একদল সৈন্য ও পুলিশ লইয়া উক্ত স্থানে উপস্থিত হয় এবং বলপ্রয়োগে স্থানীয় গ্রামবাসীদের রাস্তা মেরামত করিতে বাধ্য করে। এই সংবাদ পাইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কয়েক সহস্র লোক আসিয়া বাধা দিলে সৈন্য ও পুলিশদল তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এই গুলিবর্ষণে ৬ জন নিহত ও প্রায় একশত লোক আহত হয়।

ইহার পর হইতে সরকারের দমননীতি পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। পুলিশ বিভিন্ন স্থানে বেপরোয়াভাবে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি ও লাঠি চালায়। জনসাধারণও সুযোগ মত এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ২৯শে সেপ্টেম্বর কয়েক সহস্র লোক একত্রে পটাশপুর থানা আক্রমণ করে। থানার দারোগা প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। জনতা কনেস্টবলদের বন্দী করিয়া তাহাদের রাইফেল কাড়িয়া লয় ও থানার কাগজপত্র আগুন দিয়া ভস্মীভূত করে। ইহার পর জনতা কেজুরি ও ভগবানপুরের থানা দুইটি আক্রমণ করে এবং থানার সকল সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। তারপর তাহারা উক্ত অঞ্চলের সকল সরকারী সম্পত্তি ও দপ্তর, জমিদারের কাছারি, খাসমহল-কাছারি প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাইয়া অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। পালাবানিয়া নামক স্থানের বড় পুলটি ধ্বংস করা হয়। কেজুরি ও ভগবানপুরের সার্কেল অফিসারকে এগার জন সশস্ত্র কনেস্টবল সহ বন্দী করিয়া সুন্দরবনে নির্বাসিত করা হয়। জনতা কনেস্টবলদের রাইফেলগুলি কাড়িয়া লয়।

এই সকল ঘটনার পর সরকার এই অঞ্চলের উপর উন্মত্তের মত আক্রমণ শুরু করে, জনসাধারণের উপর ক্ষিপ্ত মিলিটারী ও পুলিশদের লেলাইয়া দেয়। ১লা অক্টোবর পাঁচ শতাধিক সৈন্য আসিয়া এই অঞ্চলে ছাউনি ফেলে। সৈন্যগণ গ্রামে গ্রামে প্রবেশ করিয়া নির্বিচারে জনসাধারণের সম্পত্তি লুট, নারীধর্ষণ, গৃহদাহ প্রভৃতি বর্বরসুলভ উৎপীড়ন চালাইতে থাকে। তাহাদের দ্বারা বহু গ্রাম ভস্মীভূত হয়। জনসাধারণ এই অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য গ্রাম

ছাড়িয়া পলাইয়া যায়, এই ভাবে একটা বিরাট অঞ্চল সম্পূর্ণ জনমানবহীন হইয়া পড়ে। পরে হিসাব করিয়া দেখা যায় যে, কেবলমাত্র কাঁথি মহকুমাতেই সৈন্যদের দ্বারা ৭৬৬ গৃহ ভস্মীভূত, বহু লক্ষ টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত এবং ২২৮ জন স্ত্রীলোক ধর্ষিত হয়।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ ব্যতীত কেশপুর, ডেবরা, পিংলা, সবং, গড়বেতা, খড়্গপুর ও মেদিনীপুরে গণ-অভ্যুত্থান প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। অক্টোবর মাসে পুলিশ কেশপুর থানার কেতুয়া গ্রামের কয়েকজন কংগ্রেস-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। এই সংবাদ পাইবামাত্র কয়েক সহস্র গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া পুলিশ-দলকে ঘিরিয়া ফেলে এবং কংগ্রেস-কর্মীদের উদ্ধার করে। তারপর তাহারা পুলিশদের রাইফেল ও পোষাক কাড়িয়া লয়। ঐ মাসেই কেশপুর থানার আনন্দপুর নামক স্থানের সাবরেজিস্টারের অফিসটি জনতা কর্তৃক আক্রান্ত ও ভস্মীভূত হয়। ইহার পর এই অঞ্চলে প্রায় ২৫০ জন সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশের একটি একটি বাহিনী উপস্থিত হয় এবং বিদ্রোহী গ্রামগুলির উপর ভয়ংকর উৎপীড়ন চালাইতে থাকে। প্রথম দিনেই সৈন্য ও পুলিশের গুলিতে ৬ জন নিহত এবং একজন স্ত্রীলোক ও দুইটি বালকসহ ত্রিশজন আহত হয়। পুলিশ দেড়শত জনকে গ্রেপ্তার করে। জনতা মোহনপুর ও সবং থানা আক্রমণ করে। এই দুই স্থানেও কয়েকজন নিহত ও আহত হয়।

এইভাবে যখন একদিকে মেদিনীপুরের জনসাধারণ বিদেশী শাসনের উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন "জাতীয় সরকার" প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হইয়া সংগ্রাম চালাইতে থাকে এবং অপর দিকে ইংরেজ-রাজের সৈন্যবাহিনী ও পুলিশ এই গণ-বিদ্রোহ দমনের জন্য লুণ্ঠন, নারী-ধর্ষণ, গৃহদাহ, ব্যাপক হত্যা ও নির্বিচারে গ্রেপ্তার প্রভৃতি দ্বারা সমগ্র মেদিনীপুর জিলাটাকে ছারখার করিতে থাকে, তখনই এক অভাবনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমগ্র মেদিনীপুর সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়। এক প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যা ও প্লাবনে সমগ্র জিলা এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইংরেজ-সরকার মেদিনীপুরের এই গণ-বিদ্রোহ চূর্ণ করিবার জন্য এই ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সুযোগ গ্রহণ করে। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার সহিত বিদেশী

শাসকগোষ্ঠীর বর্বরসুলভ উৎপীড়ন মিলিত হইয়া বিদ্রোহী মেদিনীপুরবাসীদের চির-উন্নতশির অবনমিত করিবার প্রয়াস পায়। এই ভয়ংকর দুর্যোগে মেদিনীপুরের জনসাধারণ যাহাতে দেশবাসীর সাহায্য ও সহানুভূতি না পায় তার জন্যই প্রতিহিংসার বশে উন্মত্ত শাসকগোষ্ঠী এই সর্বধ্বংসী ঘূর্ণীবাত্যা ও প্লাবনের সংবাদ ষোল দিন পর্যন্ত চাপিয়া রাখে। এই ষোল দিন এবং তারপরেও এক পক্ষকাল পর্যন্ত মেদিনীপুরবাসীদের পক্ষ হইতে সাহায্যের আবেদন চরম অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়। মেদিনীপুরবাসীরা ভয়ংকর জল-প্লাবন হইতে স্ত্রীলোক ও শিশুদের উদ্ধারের জন্য যাহাতে কোন নৌকা না পায় তার জন্য শাসকগণ সকল নৌকা আটক করে। বাহির হইতে আগত বহু সাহায্যকারী দলকে গ্রেপ্তার ও খাদ্য-বস্ত্র প্রভৃতি প্রেরিত দ্রব্যসম্ভার বাজেয়াপ্ত করা হয়। এমনকি ইহার পরেও বহু গৃহদাহ ও লুণ্ঠনের সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু এই উৎপীড়ন এবং অভাবনীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগও চির-বিদ্রোহী মেদিনীপুরকে পরাজিত করিতে পারে নাই, চির-বিদ্রোহী মেদিনীপুরের চির-উন্নতশির কোন দিন অবনমিত হয় নাই।

বালুরঘাটের সংগ্রাম

গান্ধীজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের পর দিনাজপুর জিলার বালুরঘাট মহকুমার জনসাধারণের এক ব্যাপক বিদ্রোহ শুরু হয়। কংগ্রেস-কর্মীদের আহ্বানে ১৪ই সেপ্টেম্বর বালুরঘাট শহরে গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ হাজার কৃষক ও মধ্যশ্রেণীর জনসাধারণ আসিয়া সমবেত হয়। তাহারা ঐ দিন সকাল হইতে শহরের রাজপথে পতাকা ও ফেস্টুন সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবি জানায়। তারপর দ্বিপ্রহর হইতে শুরু হয় শহরের বিভিন্ন সরকারী দপ্তরের উপর আক্রমণ। শোভাযাত্রীরা শহরের পোস্ট অফিস, সিভিল কোর্ট, য়ুনিয়ন বোর্ডের কেন্দ্রীয় দপ্তর, দুইটি পাটের অফিস, আবগারী অফিস, রেল-কোম্পানির অফিস আক্রমণ করিয়া উহাদের কাগজপত্র ও সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলে। তারপর তাহারা সিভিল কোর্টের বাড়ী, সাব-রেজিস্টারের অফিস ও কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের বাড়ীতে আগুন ধরাইয়া দেয়।

জনতার এক অংশ টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া ফেলে। এই সকল ক্রিয়াকলাপে স্কুলের ছাত্ররাও যোগদান করে। পরের দিন, অর্থাৎ ১৫ই আগস্ট বহু সৈন্য ও পুলিশসহ দিনাজপুরের জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও সহকারী পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বালুরঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহারা শহরের বহু বাড়ী খানাতল্লাসী করিয়া বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। ইহার ফলে বিদ্রোহের ক্ষেত্র গ্রামাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয় এবং বিরাট অঞ্চল জুড়িয়া বিদ্রোহাত্মক ক্রিয়াকলাপ চলিতে থাকে। মোরাডাঙ্গা নামক স্থানে পুলিশ কয়েকজন কংগ্রেস-কর্মীকে গ্রেপ্তার করিলে পুলিশের সহিত জনতার এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে বহু লোক আহত হয়। শেষ পর্যন্ত পুলিশদল জনতার হস্তে বন্দী হয় এবং কংগ্রেসের প্রতিজ্ঞাপত্রে সাক্ষর দিয়া মুক্তিলাভ করে। এই গণ-বিদ্রোহের ফলে মহকুমার গ্রামাঞ্চলের এক বিরাট অংশে কিছু দিনের জন্য শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে।

বীরভূমের সংগ্রাম

কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদে বীরভূমের সাঁওতালদের মধ্যেও চাঞ্চল্য দেখা দেয়। সাঁওতালদের বিদ্রোহ দেখা দিবামাত্র তাহা অঙ্কুরে বিনষ্ট করিবার জন্য বহু সৈন্য ও সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া জিলার বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করে। এই সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও প্রথমে বীরভূম জিলার ছাত্রগণ নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে একদিন সাধারণ ধর্মঘট পালন করে এবং সর্বত্র বড় বড় শোভাযাত্রা বাহির করে। এইভাবে ক্রমশঃ উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং অবশেষে ২৯শে আগস্ট বীরভূমের সাঁওতাল, হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণের এক বিরাট অংশ একত্রে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা ঐ দিন বোলপুরের রেল-স্টেশন আক্রমণ করিয়া স্টেশনের যাবতীয় কাগজপত্র ও সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। এই সংবাদ পাইবামাত্র বর্ধমান হইতে একটি সশস্ত্র পুলিশদল বোলপুরে উপস্থিত হইলে তাহাদের সহিত জনতার রীতিমত যুদ্ধ হয়। পুলিশদল রাইফেল দ্বারা এবং সাঁওতালগণ তীর-ধনুকের দ্বারা কয়েক ঘণ্টা ধরিয়া যুদ্ধ করে। এই যুদ্ধে

৭ জন সাঁওতাল ও কয়েকজন পুলিশ গুরুতররূপে আহত হয়। অবশেষে জনতা পলায়ন করে এবং ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া বিভিন্ন স্থানে টেলিফোন ও টেলিগ্রামের তার কাটিয়া দেয় এবং বিভিন্ন উপায়ে রেল-চলাচল কয়েকদিনের জন্য বন্ধ করিতে সক্ষম হয়। এই ঘটনার পর পুলিশ তিন শতাধিক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। ১৪ই ডিসেম্বর এক বিরাট জনতা জাজিগ্রামের কংগ্রেস-অফিসে অবস্থিত পুলিশদলকে বিতাড়িত করিয়া অফিস পুনর্দখল করে।

অন্যান্য স্থানের সংগ্রাম

বর্ধমান জিলা :—১৭ই আগস্ট জিলার বিভিন্ন স্থানে হরতাল প্রতিপালিত হয়। জনসাধারণ কাশিয়ারা গ্রামের পোস্ট অফিস আক্রমণ করে। কালনার স্কুরকারী ডাক-বাংলো অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত ও সিভিল কোর্টের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়। কালনার রেল-স্টেশনটিতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ১৬ সেপ্টেম্বর জনসাধারণ শোভাযাত্রা করিয়া কালনার সিভিল কোর্টের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয় এবং কোর্টের দালানের শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। ইহা ব্যতীত বামনিয়া নামক স্থানের ক্যানাল-অফিস ভস্মীভূত হয়, জামালপুরের পোস্ট অফিস ও রেল-অফিস ভাঙ্গিয়া চুরমার করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী থানা আক্রমণ করিয়া উহার সম্পত্তি ও কাগজপত্র নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

পূর্ববঙ্গ :—১০ই আগস্ট ঢাকা শহরের সকল স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করিয়া বাহির হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত ধর্মঘট চালায়। ১৩ই আগস্ট এক বিরাট জনতা ঢাকার মুনসেফ-কোর্ট আক্রমণ করিয়া উহার কাগজপত্র অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। এই স্থানে পুলিশ আক্রমণকারী জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে এবং ইহার ফলে একজন নিহত হয়। ইহা ব্যতীত পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করিয়া শহরের কয়েকটি অঞ্চলের জনতা ছত্রভঙ্গ করে। শহরের প্রায় সর্বত্র টেলিফোনের তার কাটা হয়। ১৪ তারিখে শহরের বহু যুবক বিভিন্ন দলে ভাগ হইয়া নবাবপুর, উয়ারী, টিকাটুলী, লক্ষ্মীবাজার, ফরাসগঞ্জ ও ওয়ালটার রোডের পোস্ট অফিসগুলি আক্রমণ করিয়া সকল কাগজপত্র

পুড়াইয়া ফেলে। শহরের মধ্যে অবস্থিত ঢাকেশ্বরী কটন মিলস্, চিত্তরঞ্জন কটন মিলস্ ও লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলস্-এর শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে। ১৫ই আগাস্ট শহরের বহু স্থানে জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ হয় এবং পুলিশ বহু স্থানে গুলি বর্ষণ করে। জনতা গোণ্ডারিয়া রেল-স্টেশনটি আক্রমণ করিয়া আগুন ধরাইয়া দেয়। আর্মানিটোলার স্কুল, টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, ইডেন গার্লস্ কলেজ ও ইম্পিরিয়াল টুব্যাকো কোম্পানির অফিস আক্রান্ত হয়। ইহা ব্যতীত ১৮ই আগস্ট হইতে ৮ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে ক্রুদ্ধ জনতা বিক্রমপুরের মুড়াপাড়ার পোস্ট অফিস, মোহনগঞ্জের গাঁজা-আফিমের দোকান ও দেওভোগের সরকারী অফিস আক্রমণ করিয়া সকল জিনিসপত্র নষ্ট করিয়া ফেলে। মুন্সিগঞ্জ মহকুমা ও অন্যান্য স্থানে ব্যাপকভাবে টেলিগ্রাফের তার কাটা হয়। ১৪ই সেপ্টেম্বর মুন্সিগঞ্জের তালতলা নামক স্থানে জনতার উপর পুলিশের গুলি বর্ষণে তিন লোক নিহত হয়। ইহা ব্যতীত ঢাকার বিভিন্ন স্থানে আরও বহু বিক্ষিপ্ত ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়।

ফরিদপুর জিলা :—আগস্ট-সংগ্রামের ঢেউ ফরিদপুর জিলাকেও চঞ্চল করিয়া তোলে। সমগ্র জিলাব্যাপী এক বিরাট ধর্মঘট হইতে এই সংগ্রাম শুরু হইয়া যায়। জিলার সর্বত্র নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া ছাত্রগণ সভা ও শোভা-যাত্রা করে। এই জিলায় ভাঙ্গার ঘটনাটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পুলিশ ভাঙ্গা নামক স্থানের একটি বড় জনসমাবেশ বলপূর্বক ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে জনতা পুলিশদলের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। এই আক্রমণের ফলে ভাঙ্গা থানার একজন দারোগা নিহত ও একজন কনেস্টবল গুরুতররূপে আহত হয়। এই ঘটনার পর ভাঙ্গা ও অন্যান্য স্থানের জনসাধারণের উপর বহু টাকার জরিমানা ও বিভিন্ন প্রকারের উৎপীড়নমূলক ব্যবস্থা চাপানো হয়।

এই সকল জিলা ব্যতীত বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী, যশোহর, বগুড়া এবং আরও বহু জিলার জনসাধারণ আগস্ট-সংগ্রামে যোগদান করে।

আগস্ট সংগ্রামে আসাম প্রদেশ

(১) আসাম উপত্যকা

বোম্বাই শহরে গান্ধীজী প্রভৃতি কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই আসামের কংগ্রেস-নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। মৌলানা তায়েবুল্লা, বিষ্ণুরাম মেধি, এফ. এ. আমেদ, গোপীনাথ বড়দলৈ প্রভৃতি সর্বজনমান্য কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবামাত্র আসামের সর্বত্র থানার উপর আক্রমণ চলিতে থাকে। বৃটিশ-শাসনের যন্ত্র ও প্রতীক চিহ্নগুলি বিদ্রোহী জনসাধারণের আক্রমণে ধ্বংস হইয়া যায়। আসাম-উপত্যকার দরং নওগং প্রভৃতি জিলার সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দরং জিলার সংগ্রাম

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর কনকলতা বড়ুয়া নামে সতের বৎসরের একটি মেয়ের নেতৃত্বে এক বিরাট শোভাযাত্রা দরং জিলার সোহপুর থানার সম্মুখে উপস্থিত হয়। থানা দখল করিয়া উহার উপর কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করাই ছিল শোভাযাত্রীদের উদ্দেশ্য। থানার দারোগা শোভাযাত্রীদের আর এক পাও অগ্রসর না হইবার হুকুম দেয়। শোভাযাত্রার সম্মুখে ছিল কনকলতা। কনকলতা কয়েক পা অগ্রসর হইবামাত্র পুলিশ তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে। কনকলতার রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। ইঁহার সঙ্গে সঙ্গে মুকুন্দ কাকোতি নামক এক অল্প বয়সী যুবক কনকলতার হস্ত হইতে কংগ্রেস পতাকা লইয়া থানার দিকে অগ্রসর হয়। উন্মত্ত পুলিশ তাহাকেও গুলি করিয়া হত্যা করে। যখন থানার সম্মুখে এই সকল ঘটনা ঘটিতেছিল, ঠিক তখনই অপর দিকে শোভাযাত্রার একাংশ থানা ঘিরিয়া ফেলে এবং থানা-ভবনের শীর্ষদেশে কংগ্রেস-পতাকা উড্ডীন করে।

ঐ দিনই, অর্থাৎ ২০শে তারিখে অপর একটি সংগ্রাম চলে দরং জিলার ঢেকিয়াজুলি থানার সম্মুখে। এখানেও একটি বিরাট শোভাযাত্রা থানা-ভবনের

উপর কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করিবার জন্ম উপস্থিত হয়। শোভাযাত্রা থানার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র পুলিশ শোভাযাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। এই গুলি বর্ষণে একটি বারো বৎসরের বালিকাসহ ২০ জন লোক নিহত হয়। যখন এই গুলি বর্ষণ চলিতেছিল, তখন অল্প বয়সী একটি বালক থানা-ভবনের উপর কংগ্রেস-পতাকা উত্তোলন করে, পুলিশেরা এই বালকটিকে সঙ্গেই সঙ্গেই গুলি করিয়া হত্যা করে। কিছুক্ষণ পরেই একদল সৈন্ম ঘটনাস্থানে উপস্থিত হয় এবং বেপোরোয়া ভাবে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। এই গুলি বর্ষণের ফলে তিন জন স্ত্রীলোকসহ ১৬ জন নিহত ও প্রায় একশত লোক গুরুতররূপে আহত হয়।

নওগং জিলার সংগ্রাম

নওগং জিলায় ইংরেজ-রাজের বর্বরতা মানুষের কল্পনাকেও হার মানায়। এই জিলার জনসাধারণের মৃত্যুভয়হীন সংগ্রামে ক্ষিপ্ত হইয়া শাসকগণ জনসাধারণের উপর সৈন্যবাহিনীকে লেলাইয়া দেয়। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ২০শে আগস্ট সন্ধ্যাকালে বেবেজিয়া গ্রামের পুলটির নীচে একদল সৈন্ম লুকাইয়া থাকে। ঐ সময় কয়েকজন যুবক দল বাঁধিয়া ঐ পুলের উপর দিয়া যাইবার সময় সৈন্যগণ দুইজন যুবককে গুলি করিয়া হত্যা করে। পর দিন গৌহাটি শহরের ষাট মাইল দূরবর্তী রোহা নামক স্থানের পুলের উপর সন্ধ্যাকালে অপর একটি বালককেও গুলি করিয়া হত্যা করা হয়। পরদিন একদল সৈন্ম রাত্রিকালে বিদ্রোহী বেবেজিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া স্ত্রীলোক ও শিশুসহ সকল গ্রামবাসীর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার করে এবং বহু গৃহ লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগে ভস্মীভূত করে। পরদিন সকাল বেলা সৈন্যগণ ঐ গ্রামের বহু স্ত্রীলোক ও শিশুসহ চারিশত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যায়। পথে সৈন্যদের অত্যাচারে তিন দিনের একটি শিশুর মৃত্যু হয়। ইহার পর হইতে প্রত্যহ রাত্রিকালে সৈন্যগণ বেবেজিয়া গ্রামে প্রবেশ করিয়া অত্যাচার চালাইতে থাকে। একদিন রাত্রিকালে সৈন্যদল গ্রামে প্রবেশ করিয়া ৮ জন লোককে গুলি করিয়া হত্যা করে এবং তিনশত গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যায়।

১৫ই সেপ্টেম্বর বহরমপুর নামক স্থানে বহু লোক বন-ভোজনের উদ্দেশ্যে সমবেত হয়। নিকটবর্তী শহরের বহু গণ্যমান্য লোকও এই উৎসবে যোগদান করেন। নিকটে অবস্থিত একটি সৈন্যদল এই সংবাদ পাইবামাত্র ঐ স্থানে উপস্থিত হয় এবং সৈন্যদলের ইংরেজ-কম্যাণ্ডার একটি বালিকাকে পদাঘাতে ভূতলশায়ী করিয়া তাহার হস্ত হইতে একটি জাতীয় পতাকা কাড়িয়া লয়। ঐ বালিকার বৃদ্ধা মাতামহী ভোগেশ্বরী ফুকোনোনি এই বর্বর আচরণে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার হস্তধৃত পতাকার দণ্ডদ্বারা কম্যাণ্ডারের মুখের উপর আঘাত করে। কম্যাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গেই বৃদ্ধাকে গুলি করিয়া হত্যা করে। ইহার পর কম্যাণ্ডারের নির্দেশে সৈন্যগণ উপস্থিত স্ত্রীলোকদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। পুরুষগণ স্ত্রীলোকদের রক্ষা করিবার জন্য অগ্রসর হইবামাত্র সৈন্যগণ বেপরোয়া ভাবে গুলি বর্ষণ করিতে থাকে। গুলির আঘাতে তিন জন নিহত ও বহু আহত হয়।

কামরূপের সংগ্রাম

এই সকল অত্যাচার সত্ত্বেও জনগণের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিতে থাকে এবং গণ-সংগ্রাম যতই প্রবল আকার ধারণ করে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অত্যাচার ততই বাড়িয়া চলে। ২৫শে সেপ্টেম্বর জোলা নামক স্থানে একটি বিরাট জনসমাবেশ হয়। দুইটি স্কুলের ছাত্র যখন এই সভা হইতে ফিরিবার সময় জাতীয় সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল তখন স্থানীয় থানার দারোগা তাহাদের গুলি করিয়া হত্যা করে। একদল লোক এই সভা হইতে ফিরিবার সময় পথের উপর বিশ্রাম করিবার কালে পুলিশ ইহাদের উপর গুলি বর্ষণ করে এবং তাহার ফলে দুইজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনিয়া জনসাধারণ ক্ষিপ্ত হইয়া সরভোগের বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে। জনতা বিমানঘাটির বহু কুটির, কাঠ ও বাঁশ এবং তিনটি সামরিক লড়ি, বাংলো ও সামরিক কর্মচারীদের কোয়ার্টারে আগুন লাগাইয়া দেয়। ইহার ফলে সকল জিনিসপত্র ভস্মীভূত ও বিমানঘাঁটির অপূরনীয় ক্ষতি হয়। ইহার পর ক্রুদ্ধ জনতা নিকটবর্তী পাথশালা নামক স্থানের থানা আক্রমণ করে এবং উহা দুই দিন পর্য্যন্ত দখল করিয়া থাকে।

পূর্ব-আসামে : সংগ্রাম

আসামের অন্যান্য অংশের মত পূর্ব-আসামেও গণ-সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করে। এই অঞ্চলের সংগ্রামের একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই অঞ্চলের সকল জিলাগুলিতে প্রতিরোধমূলক ও গঠনমূলক—এই উভয় ধরনের সংগ্রামই চলে।

"এই জিলাগুলিতে সংগ্রামে গঠনমূলক ও প্রতিরোধমূলক—এই উভয় পন্থাই অনুসরণ করা হয়। প্রথমোক্ত পন্থা অনুসারে বহু গ্রাম স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই স্বাধীন গ্রামগুলিকে বলা হইত 'রাষ্ট্র'। এই গ্রাম্য সাধারণতন্ত্রে সর্বোপরি একজন 'রাষ্ট্রপতি' থাকিত এবং প্রতিনিধিদের মারফত গ্রামবাসীরা ইহার সক্রিয় সহযোগিতা করিত।

"শেষোক্ত পন্থা অনুসারে সৈন্যবাহিনীর জন্য খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রচার-কার্য চালানো হইত। প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল 'রাষ্ট্র' গুলির স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের কার্য্যসূচীর একটি অংশ। ইহার ফলে সৈন্যবাহিনী ও উহার দালালগণকে গরু, ছাগল, মুরগী, ডিম, ধান-চাউল প্রভৃতি সরবরাহ করা সম্পূর্ণ বন্ধ হয়। এই কার্যসূচী সফল করিবার জন্য অনিবার্য ভাবেই পুলিশ ও সৈন্যদের সহিত জনসাধারণের সংঘর্ষ বাঁধিত। ব্যাপকভাবে লাঠি, বেয়নেট ও গুলি চালনা এবং গ্রেপ্তার দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়।" (১)

পূর্ব-আসামের শিবসাগর জিলার সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও প্রবল আকার ধারণ করে। বহু পুলিশ ও সৈন্যের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও ৩০ সেপ্টেম্বর প্রায় ১৫ হাজার লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা শিবসাগর শহরে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন বৈপ্লবিক ধ্বনিসহকারে শহরের সকল রাস্তা ভ্রমণ করে। অবশেষে বহু পুলিশ ও সৈন্য লাঠি ও বন্দুক লইয়া শোভাযাত্রীদের উপর আক্রমণ চালায়। এই আক্রমণে কয়েক শত লোক গুরুতররূপে আহত হয় এবং ইহার পর সর্বত্র

---

(১) "1942 Revolution in Assam" By Hem Ch. Barua.

নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। ইহার ফলে সংগ্রাম গোপনে চলিতে শুরু করে। সরকারী দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গোপনে বহু ধ্বংসকারী দল গঠিত হয়। এই সকল দল সর্বত্র ধ্বংস-কার্য চালাইতে থাকে। জনসাধারণকে নির্দেশ দিবার জন্য বহু বৈপ্লবিক ইস্তাহার প্রচারিত হয়। এই সকল ইস্তাহারে রেল-লাইন, রাস্তাঘাট, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার এবং সরকারী অফিস প্রভৃতি ধ্বংস করিবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সকল ধ্বংসকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সর্বত্র "মৃত্যু-বাহিনী" গঠিত হয়। নভেম্বর মাসের পর হইতে জিলার সর্বত্র ধ্বংসকার্য চলিতে থাকে। পুলিশ-রিপোর্ট হইতে জানা যায় যে, আসামে মোট ছয়টি রেলগাড়ী লাইনচ্যুত করা হয় এবং ইহার দুইটিতে বহু প্রাণহানি ঘটে। ইহা ব্যতীত, বিদ্রোহীরা বহু বোমা তৈরী করিয়া উহা বিভিন্ন টেলিগ্রাফ-অফিস, কলেজ, রেলওয়ে প্লাটফর্মের উপর নিক্ষেপ করে। এই সকল বোমার বিস্ফোরণেও বহু লোক হতাহত হয়। জেল হইতে গান্ধীজী কর্তৃক বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রাবলী প্রকাশিত হইবার পর এই ধরনের ধ্বংসকার্য বন্ধ হয়। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই সকল পত্রে গান্ধীজী "আগস্ট-বিপ্লব" বলিয়া কথিত হিংসা ও ধ্বংসমূলক সংগ্রামের দায়িত্ব জোরের সহিত অস্বীকার করেন। বড়লাটের এই অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া তিনি দেখান যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সংগ্রাম আরম্ভ করে নাই এবং ইহা ইংরেজ-রাজের অসহনীয় অত্যাচার-উৎপীড়নের অনিবার্য ফল স্বরূপ নেতৃত্বহারা জনগণের স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ ব্যতীত অন্য কিছু নহে।

কোশল কানোয়ার ও কমলা মিরির ফাঁসী

আসামের আগস্ট-সংগ্রামে কোশল কানোয়ার ও কমলা মিরির আত্মদান অবিস্মরণীয়। কোশল ছিলেন অহোম আর কমলা ছিলেন মিরি উপজাতীয়। কোশল সারুপাথার নামক স্থানে ট্রেন লাইনচ্যুত করা সম্পর্কে একজন রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য অনুসারে গ্রেপ্তার হন। মামলার বিচারে তিনি ফাঁসীকাঠে প্রাণ বিসর্জন দেন। কমলা মিরিও এই ধরনের অপর একটি মামলা সম্পর্কে গ্রেপ্তার হইয়া বিচারে মৃত্যুদণ্ড লাভ করেন।

জরিমানা আদায়

আগস্ট-সংগ্রামের শাস্তি স্বরূপ সরকার আসামের বিভিন্ন জিলার উপর যে জরিমানা ধার্য করে তাহা সরকারী রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃত করা হইল :—

শ্রীহট্ট জিলা—২৯০০৲ টাকা, লখিমপুর জিলা—১০,০০০৲ টাকা, শিবসাগর জিলা—১,৪৩,২০০৲ টাকা, নওগং জিলা—৮৭,৫০০৲ টাকা, দরং জিলা—৮২,২০০৲ টাকা, কামরূপ জিলা—৭০,৫৮৭৲ টাকা ও গোয়ালপাড়া—১৫,০০০৲ টাকা।

(২) আগস্ট-সংগ্রামে সুরমা উপত্যকা

৮ই আগস্ট তারিখে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ পৌঁছিবামাত্র সুরমা উপত্যকার সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গেই আসাম-সরকার স্থানীয় কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তার করে। কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তার জনসাধারণের ক্রোধ শতগুণ বাড়াইয়া তোলে। কংগ্রেস-কর্মীরা একটি "সংগ্রাম-কাউন্সিল" গঠন করিয়া ও সরলাবালা দেবীকে প্রথম "ডিক্‌টেটর" নির্বাচিত করিয়া সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। ১১ই আগস্ট সরলা দেবীর নেতৃত্বে শ্রীহট্ট শহরে প্রায় দশ সহস্র কংগ্রেসকর্মী, ছাত্র ও জনসাধারণের এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। শিলচর ও অন্যান্য মহকুমা শহরেও এই সংগ্রামের ঢেউ বহিতে থাকে। নারী-স্বেচ্ছাসেবিকাগণ দল বাঁধিয়া কোর্ট-কাছারীতে পিকেটিং করিতে থাকে। ইহার ফলে উকিল-মোক্তারগণ পনের দিনের জন্য সকল কাজ বন্ধ করেন। কংগ্রেস-নেতারা ২০শে আগস্ট হইতে ২৬শে আগস্ট পর্যন্ত "ক্ষমতা দখল" সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৬শে আগস্ট একই দিনে শ্রীহট্ট জিলার সকল থানা দখলের নির্দেশ জারি করা হয়। এই নির্দেশ গোপনে প্রচার করা হইলেও পুলিশ ইহা কোনক্রমে জানিতে পারিয়া সকল স্থান সুরক্ষিত করে। ইহা সত্ত্বেও কয়েক সহস্র লোকের এক বিরাট শোভাযাত্রা শ্রীমঙ্গল থানা দখল করিতে গেলে পুলিশের সহিত এক

ভীষণ সংঘর্ষ হয় এবং কয়েক শত লোক গ্রেপ্তার হয়। শ্রীহট্ট শহরে এক নূতন সংগ্রাম শুরু হয়। পিকেটিংকারী নারী-স্বেচ্ছাসেবিকাগণ সুযোগ মত কোর্ট ও সরকারী দপ্তরে প্রবেশ করিয়া প্রধান সরকারী কর্মচারীদের অফিস ও আসন দখল করিয়া বসে। একদিন একজন নারী-স্বেচ্ছাসেবিকা জিলা-জজের কোর্টে প্রবেশ করিয়া জজ সাহেবের আসন দখল করে। এইভাবে দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগ্রাম চলিতে থাকে। একে একে পাঁচ জন "ডিক্‌টেটর" গ্রেপ্তার হইয়া জেলে আবদ্ধ হন। ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে পঞ্চম "ডিক্‌টেটর" গ্রেপ্তার হইবার পরই সুরমা উপত্যকার আগস্ট-সংগ্রামের অবসান হয়।

আগস্ট-সংগ্রামে বিহার প্রদেশ

"এই বিপ্লবের (আগস্ট-সংগ্রামের) সময় নিঃসন্দেহে বিহার ছিল সংগ্রামের পুরোভাগে। সরকার বিহার প্রদেশকে সর্বাপেক্ষা বেশী উপদ্রুত প্রদেশ বলিয়া মনে করিত এবং এই প্রদেশকে নিষ্ঠুরতম উপায়ে দমনের চেষ্টা করিয়াছিল। অন্যদিকে কোন পূর্ব-পরিকল্পিত ও সুগঠিত কর্মসূচী না থাকিলেও বিহারের জনসাধারণ অদম্য সাহস, অদ্ভুত কর্মশক্তি ও সংগঠন-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

"প্রদেশের সমগ্র শাসনব্যবস্থা এবং বিরাট পুলিশ ও সামরিক শক্তি হাতে থাকা সত্ত্বেও এই প্রদেশের গভর্ণর এই অপরিকল্পিত ও স্বতস্ফূর্ত বিদ্রোহ দমন করিতে না পারায় তাঁহাকে আহ্বান করিয়া পদত্যাগ করিতে বলা হয়।" (১)

৯ই আগস্ট বোম্বাই শহরে গান্ধীজী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাটনা শহরে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ও অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ গ্রেপ্তার হন। এই সংবাদে বিহারের জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত বিক্ষোভ ক্রমশঃ একটা ব্যাপক বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে।

৯ই আগস্ট পাটনায় পনের সহস্রাধিক ছাত্র ও জনসাধারণের এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে সেক্রেটারিয়েট-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিক্ষোভ

(১) "1942 Revolution in Bihar" by Jagat Narayan Lal,

প্রদর্শন করে এবং সকল স্কুল-কলেজে ধর্মঘট প্রতিপালিত হয়। ১০ই আগস্ট য়ুনিভার্সিটি-ময়দানে প্রায় পঞ্চাশ সহস্র লোকের এক বিরাট সভায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানানো হয়। ঐ দিন ছাত্রগণ সরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের উপর জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এবং বেলা দুই ঘটিকার সময় প্রায় চল্লিশ সহস্র জনতার এক বিরাট শোভাযাত্রা সেক্রেটারিয়েট-ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হয়। ছাত্রগণ সেক্রেটারিয়েট-ভবনে প্রবেশ করিয়া উহার শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিলে ঐ স্থানে অপেক্ষামান বিরাট পুলিশ বাহিনীর সহিত জনতার সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের সময় উন্মত্ত পুলিশ বাহিনী জনতার উপর বেপোরোয়াভাবে গুলি বর্ষণ করে। ইহার ফলে পাঁচ জন ছাত্র ঘটনাস্থলে ও দুইজন পরে হাসপাতালে মারা যায় এবং কয়েক শত লোক গুরুতররূপে আহত হয়। পুলিশের এই বর্বরতা পাটনা শহরে ও সমগ্র বিহারে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। ঐ দিনই শহীদদের মৃতদেহ লইয়া যে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহা পাটনা শহরে অভূতপূর্ব।

এই গুলি বর্ষণের পরের দিন পাটনার স্কুল-কলেজ ও দোকানপাট বন্ধ থাকে, শহরের ক্রুদ্ধ জনসাধারণ বহু সংখ্যক শোভাযাত্রার আকারে সারা দিন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কয়েকটি শোভাযাত্রা স্থানীয় পোস্ট অফিস ও জেলখানা আক্রমণ করিয়া উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। এই সকল ঘটনায় কয়েক শত লোক গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ যখন তাহাদের লড়িতে করিয়া জেলখানায় লইয়া যাইতেছিল, তখন ক্রুদ্ধ জনতা লড়ি আটক করিয়া তাহাদের মুক্ত করে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে কংগ্রেস-ময়দানে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জন-সমাবেশে ইংরেজ-রাজের বিরুদ্ধে অহিংস বিদ্রোহ ঘোষিত হয়। ১২ই আগস্ট হইতে রেল চলাচল বানচাল করিবার চেষ্টা শুরু হয়। বহু স্থানে রেলপথ বিধ্বস্ত এবং 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' ও 'বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের' বহু ট্রেন আটক করা হয়। ইহার ফলে ১০ই হইতে ১২ই আগস্ট পর্যন্ত ঐ দুই রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। দিনাপুরের সামরিক ঘাঁটি হইতে যাহাতে পাটনা শহরে সৈন্যবাহিনী আসিতে না পারে তাহার জন্য পাটনা-দিনাপুর রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন ও অবরুদ্ধ করা হয়।

১৩ই আগস্ট পাটনা শহরে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জনসাধারণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করে। শহরে নির্বিচারে হত্যা, গ্রেপ্তার ও শারীরিক উৎপীড়ন চলিতে থাকে। এমনকি শহরের কাদামকুয়ান অঞ্চলের উপর আকাশ হইতে বোমা বর্ষণেরও পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মধ্যে মত-বিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। পুলিশ উক্ত অঞ্চলের প্রায় দুই শত কংগ্রেস-কর্মীকে গ্রেপ্তার করে।

গ্রামাঞ্চলের সংগ্রাম

যখন পাটনা শহর ও শহরতলীতে এইভাবে সংগ্রাম চলিতেছিল, তখন গ্রামাঞ্চলেও পূর্ণোদ্যমে সংগ্রাম শুরু হইয়া যায়। "বিহারের প্রধান শহর পাটনা এবং বিভিন্ন জিলার সদর ঘাঁটি ও মহকুমা শহর হইতে গ্রামাঞ্চলে নানা রকমের গুজব ছড়াইয়া পড়ে। বিভিন্ন জিলার প্রধান শহর ও মহকুমা-শহরগুলিতে তখন স্কুল-কলেজ ও বাজারে হরতাল চলিতেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে থানা, কোর্ট ও সরকারী ভবনগুলির উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিবার জন্য ঐগুলির উপর আক্রমণ হইতেছিল। আর সর্বত্র রেলপথ, রাস্তা এবং টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন ও ধ্বংস করিয়া ফেলা হইতেছিল। এই সকল ক্রিয়া-কলাপের ফলে সমগ্র প্রদেশের অবস্থা একটা প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার ধারণ করে।" (১)

নওবৎপুরের জনসাধারণ উক্ত স্থানের থানার উপর জাতীয় পতাকা উড়াইবার চেষ্টা করিলে পুলিশ ও স্থানীয় চৌকিদারগণ রাইফেল ও বল্লম লইয়া জনতার উপর আক্রমণ করে। এই আক্রমণে প্রায় পঞ্চাশ জন লোক গুরুতররূপে আহত হয়। জনতার আক্রমণে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলপথ' ও 'পাটনা-গয়া রেলপথ' সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়ে। বিহারের অন্তবর্তী প্রায় সকল রেল-স্টেশন এবং বহু পোস্ট অফিস ভস্মীভূত হয়।

---

(১) "1942 Revolution in Behar" by Jagat Narayan Lal.

কানাডিয়ান সৈন্য হত্যা

তিনজন কানাডিয়ান সৈন্য এক ট্রেনে ভ্রমণ করিতেছিল। রেল-লাইন বিধ্বস্ত হইবার ফলে ট্রেনখানি ফতোয়া স্টেশনে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকে। জনতা ঐ সৈন্যদের বৃটিশ-সৈন্য বলিয়া ভুল করে এবং উহাদের রাইফেল কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করে। ইহাতে সৈন্যগণ ক্রুদ্ধ হইয়া জনতার উপর গুলি বর্ষণ করিতে উদ্যত হয়। জনতা ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্যদের আক্রমণ করিলে তিনজন সৈন্যই নিহত হয়।

এই ঘটনার পর সরকার স্থানীয় জনসাধারণের উপর পুলিশ ও মিলিটারী লেলাইয়া দেয়। কয়েকদিন পর্যন্ত ঐ অঞ্চলে অবাধ লুণ্ঠন, হত্যা, প্রহার ও গৃহদাহ চলিতে থাকে এবং কয়েক শত লোক গ্রেপ্তার হয়। ইহার পর কয়েকজন লোককে লইয়া ঐ সৈন্যদের হত্যার অভিযোগে এক মামলা শুরু হয়। মামলায় বিচারে সাত জনের ফাঁসীর আদেশ এবং কয়েক জনের তিন হইতে আট বৎসর পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। ফাঁসীর আদেশপ্রাপ্ত সাত জন কংগ্রেস-কর্মীর জীবন রক্ষার জন্য গান্ধীজী ও কংগ্রেস-সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আবেদন করিলে বড়লাট তাহাদের ফাঁসীর আদেশ মকুব করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দেন।

বিভিন্ন জিলার সংগ্রাম

সাহাবাদ জিলা :—১০ই আগস্ট প্রায় দশ হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা আরা শহরের সর্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিবাদ জানায়। ১২ই আগস্ট জনতা কুলহরা ও কলিহার রেল-স্টেশন আক্রমণ করিয়া স্টেশনের সকল কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলে এবং বিভিন্ন স্থানে রেল-লাইন ধ্বংস করে। জনতার অপর অংশ আরা শহরের ক্যানাল অফিস, সকল পোস্ট অফিস এবং রেল-অফিসের কাগজপত্র ও অন্যান্য সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলে। তাহারা একটি যাত্রীশূন্য ট্রেন দখল করিয়া এবং উহার ইঞ্জিনের উপর জাতীয় পতাকা উড়াইয়া রেল-লাইন বরাবর বিদ্রোহাত্মক প্রচারকার্য চালায়। ১৬ই তারিখে কাও নদীর উপরিস্থিত

রেল-ব্রিজের রেল লাইন তুলিয়া উক্ত রেল-লাইন অচল করিয়া দেওয়া হয়। ঐ দিন অপরাহ্নে এক বিরাট জনতা থানা আক্রমণ করিলে পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে চারি ব্যক্তি নিহত ও বহু লোক আহত হয়। ইহার পর জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া চারিদিকের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন কাটিয়া ফেলে এবং ডুমারী থানা আক্রমণ করে। থানার দারোগা জনতার হস্তে থানা ছাড়িয়া দিয়া পলায়ন করে এবং জনতা থানা দখল করিয়া থাকে। জনতার আক্রমণে সন্দেশ থানা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। ইহার পর শুরু হয় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অবর্ণনীয় অত্যাচার। আরা শহর ও জিলার সর্বত্র অবাধে লুটতরাজ, নরহত্যা, গৃহদাহ ও নারীধর্ষণ চলিতে থাকে।

১১ই আগস্ট বক্সারে পূর্ণ হরতাল পালন করিয়া জনসাধারণ সংগ্রাম আরম্ভ করে। এক বিরাট শোভাযাত্রা শহরের থানা, দেওয়ানী আদালত ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসের উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেটকে একটি জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলিতে বাধ্য করা হয়। জনতা মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্ট দখল করে এবং কয়েক দিন পর্যন্ত এক ব্যক্তি জনতা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া মহকুমা-ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে বিচারকার্য পরিচালনা করে। প্রায় দশ হাজার লোকের এক শোভাযাত্রা বক্সার সেণ্ট্রাল জেল আক্রমণ করিয়া উহার উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। সাসারাম এবং ভাবুয়া মহকুমাতেও এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হয়।

ভাগলপুর ও মুঙ্গের জিলা :—এই দুইটি জিলার সংগ্রাম যেমন তীব্র হয়, দমননীতিও সেইরূপ ভীষণ আকার ধারণ করে। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর অসহ্য অত্যাচারের ফলে প্রধান শহরের জনসাধারণ ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া সংগ্রাম বন্ধ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে কয়েক মাস ধরিয়া অব্যাহত গতিতে সংগ্রাম চলিতে থাকে। এই দুইটি জিলার গ্রামাঞ্চলে যে বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম চলে তাহা ইংরেজ-শাসকগণ দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়াও দমন করিতে পারে নাই।

ভাগলপুর জিলার জনসাধারণ প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া জিলার প্রায় সকল থানা দখল করে এবং ঐগুলি কয়েক মাস যাবৎ অধিকার করিয়া

থাকে। গ্রামাঞ্চলে "স্বাধীন সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কয়েক মাস যাবৎ এই সরকার টিঁকিয়া থাকে। ভাগলপুর জিলায় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলিতে মোট ২১৮ জন নিহত ও ২৮০ জন গুরুতররূপে আহত হয়। ইহা ব্যতীত জেলখানার মধ্যেও বন্দীদের উপর অত্যাচার চলে। এই অত্যাচারের ফলে জেলখানার মধ্যেই ১২৫ জন লোক নিহত ও বহু সংখ্যক আহত হয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর দ্বারা প্রায় ১৫০০টি গৃহ ভস্মীভূত ও প্রায় ২৫০০ গৃহ লুণ্ঠিত হয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মোট ৪০০০ লোককে গ্রেপ্তার করে। ইহাদের মধ্যে ১০৪ জনকে বিচারের পর আটক রাখা হয় এবং ১২০০ লোককে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। সরকার এই জিলা হইতে ২ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

মুঙ্গের জিলায় যুবসম্প্রদায়ের একাংশ সশস্ত্র সংগ্রামের আয়োজন করে। গেরিলাযুদ্ধ চালাইবার জন্য ইহারা বহু অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে এবং দল বাঁধিয়া পাহাড় অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইহারা জিলার বিভিন্ন স্থানে সরকারী সম্পত্তি লুণ্ঠন করে ও বহু ধ্বংসকার্য চালায়। ইহাদের দমন করিবার জন্য সৈন্যবাহিনী উড়োজাহাজ হইতেও বোমা বর্ষণ করে। ইহার ফলে ৪০ জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী বেগুসরাই, বারিয়ারপুর, খড়্গপুর, খাগাইরিয়া প্রভৃতি ষোলটি স্থানে বড় বড় জনসমাবেশের উপর গুলি চালায়। ইহার ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হয়। এই জিলায় মোট এক হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী মোট ১ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

উপরোক্ত জিলাগুলির মতই পূর্ণিয়া, দ্বারভাঙ্গা, গয়া, পালামৌ, রাঁচি, সিংভূম, হাজারিবাগ ও মজঃফরপুর জিলার সংগ্রামও ব্যাপক গণ-বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল। এই সকল জিলার জনসাধারণও কয়েক মাস যাবৎ ইংরেজ-শাসন অচল করিয়া রাখে এবং শেষ পর্যন্ত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর উন্মত্ত আক্রমণ, নির্বিচারে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি অত্যাচারের ফলে এই সংগ্রাম একদিন স্তব্ধ হইয়া যায়। এক অসম্পূর্ণ হিসাব অনুসারে উপরোক্ত সাতটি

জিলায় পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী ২৫০টি স্থানে গুলি চালায়, ইহার ফলে ৩ শতাধিক লোক নিহত ও ১৩ শতাধিক লোক আহত হয় ; ৯ সহস্রাধিক লোক গ্রেপ্তার হয় এবং প্রায় সাড়ে ১৩ সহস্র লোকের কারাদণ্ড হয় ; পুলিশ ও সৈন্য-বাহিনীর দ্বারা প্রায় আড়াই শত গ্রাম লুণ্ঠিত ও চারি সহস্রাধিক গৃহ ভস্মীভূত হয় ; এবং বলপূর্বক ১৫ লক্ষাধিক টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

আগস্ট-সংগ্রামে উড়িষ্যা প্রদেশ

পূর্ব হইতে "অনন্ত বুভুক্ষা-পীড়িত ও অসীম সম্ভাবনাপূর্ণ উড়িষ্যা স্বাধীনতা, প্রগতি ও জ্ঞান পিপাসায় অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। এই অস্থিরতা আসিল এবং সব কিছু গ্রাস করিয়া ফেলিতে লাগিল। উড়িষ্যার জনগণ একদিকে যেমন জীবিকার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, তেমনি অন্যদিকে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য। এক সর্বব্যাপী উদ্দীপনা এমন একটা বিপ্লবের জন্য জলন্ত প্রেরণা জাগাইয়া তুলিতেছিল যে বিপ্লবের আগুনে দগ্ধ হইয়া 'দারিদ্র্যের পরিবর্তে দেখা দেয় অভাবনীয় প্রাচুর্য, কাপুরুষতার রূপান্তর ঘটে দুঃসাহসে, দাসত্বের অন্ধকার দূর করিয়া জ্বলিয়া উঠে মুক্তির আলোকমালা। এই পটভূমিকায় জনগণের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক জাগরণ ১৯৪২ সালের আগস্ট-অভ্যুত্থানের আকারে সমগ্র প্রদেশে অভূতপূর্ব গণ-সংগ্রামের আগুন জ্বালাইয়া দেয়। জনগণ দৃঢ়তার সহিত সংকল্প গ্রহণ করে: হয় কর্তব্য সাধন, না হয় মৃত্যুবরণ'।" (১)

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৯ই আগস্ট বোম্বাই শহরে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উড়িষ্যায় গণ-সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে শাসকগণ জনসাধারণের উপর উন্মত্ত পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীকে লেলাইয়া দিয়া এই সংগ্রাম দমনের চেষ্টা করে। এই সংগ্রামে সমগ্র উড়িষ্যায় মোট ৪ হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়, আর তাহাদের মধ্যে কারাদণ্ড হয় ১৩ শত জনের

(1) "1942 Revolution in Orissa" by S. N. Dutta.

এবং একজন ফাঁসীকাষ্ঠে প্রাণ দেয়। পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর গুলি বর্ষণে নিহত হয় ৭২ জন এবং জেলখানায় বন্দীদের উপর নৃশংস অত্যাচারে মোট ৫১ জনের মৃত্যু ঘটে। সরকার জরিমানা আদায় করে বিশ সহস্রাধিক টাকা।

কটক জিলা

৯ই আগস্ট হরেকৃষ্ণ মহাতব প্রভৃতি উড়িষ্যার সর্বজনমান্য নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই কটক জিলায় সংগ্রাম শুরু হইয়া যায়। র‍্যাভেন্‌স কলেজের ছাত্রগণ এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। উক্ত কলেজ ও বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রগণ ১১ই আগস্ট ধর্মঘট করে। ঐ দিনই বিখ্যাত গৌরীশঙ্কর পার্কে এক বিরাট জনসমাবেশ হয়। ইহার পর ছাত্রগণ র‍্যাভেন্‌স কলেজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকল কাগজপত্র ও অফিস-ঘরটি আগুন দিয়া পোড়াইয়া দেয়। পরের দিন হইতে সর্বত্র আইন ভঙ্গ করিয়া সভা হয় এবং এক বিরাট জনতা বিভিন্ন স্থানে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন কাটিয়া ফেলে। জনতা একটি সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করিবারও চেষ্টা করে। এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কটকের একটি টুপির কারখানা সৈন্যবাহিনীর জন্য টুপি সরবরাহ করিত। জনতার আক্রমণে এই কারখানাটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়।

কটক জিলার তিরপল ও এরসামা থানায় সংগ্রাম সর্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করে। শেষোক্ত থানায় গৌরীশ্যাম নায়কের নেতৃত্বে জনতা থানার অফিস, স্থানীয় পোস্ট অফিস ও ডাকবাংলো অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। এই অঞ্চলে সরকার ৫৫০০৲ টাকা জরিমানা আদায় করে। এই অঞ্চলের নেতা গৌরীশঙ্কর নায়ক গ্রেপ্তার হইয়া পনের বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কটক জিলার বারি অঞ্চলের সংগ্রামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অত্যাবশ্যক দ্রব্য মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি, বলপূর্বক যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা আদায়, 'ভারত রক্ষা' আইন অনুসারে জনসাধারণের নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি আটকের ফলে এই অঞ্চলের জনসাধারণের বিক্ষোভ পূর্ব হইতে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার জনসাধারণের বিক্ষোভের আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিবামাত্র জনসাধারণ

সভা-শোভাযাত্রা করিয়া প্রতিবাদ জানায়, ছাত্রগণ ধর্মঘট করে। পুলিশ বহু লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েকটি কংগ্রেস-আশ্রম ও খাদি-কেন্দ্র বন্ধ করিয়া এবং কয়েকটি স্থানে গুলি ও লাঠি চালাইয়া বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করে। একটি স্থানে জনতা পুলিশের কবল হইতে কয়েকজন কংগ্রেস-কর্মীকে মুক্ত করিবার জন্য পুলিশদলকে আক্রমণ করে। এই আক্রমণে ডেপুটি পুলিশ-সুপারিণ্টেডেণ্ট আহত হইলে পুলিশ দুইজন লোককে বেয়নেট দ্বারা বিদ্ধ করিয়া হত্যা করে এবং আরও দুইজন গুলিবর্ষণে নিহত হয়। মহকুমা শহর জয়পুরের সংগ্রামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শহরে দশ হাজার লোকের এক জনতা স্থানীয় থানা ও পোস্ট অফিস ধ্বংস করে।

বালেশ্বর জিলার সংগ্রাম

বালেশ্বর জিলায় জাপানী আক্রমণের ভয়ে পূর্বেই নৌকা, সাইকেল প্রভৃতি আটক করিয়া সরকার জনসাধারণের বিক্ষোভ জাগাইয়া তোলে। ৯ই আগস্ট হইতে এই বিক্ষোভের ধূম অগ্নিশিখায় পরিণত হয়। গণ-সংগ্রাম দমন করিবার জন্য পুলিশ জনসাধারণের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার শুরু করে। এই অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া ভাদারীপোখারী থানার কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া পলাইতে বাধ্য হয়। ধামনগর থানার ঘটনাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই থানার কংগ্রেস-নেতা মুরলীধর পাণ্ডার গ্রেপ্তারের সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহাকে মুক্ত করিবার জন্য কয়েক হাজার লোক জড় হয় এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য দারোগাকে অনুরোধ করে। দারোগা এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলে জনতা পুলিশদলকে আক্রমণ করে। দারোগার নির্দেশে সশস্ত্র পুলিশ জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। এই গুলি বর্ষণে ১০ জন নিহত ও ৪০ জন লোক গুরুতররূপে আহত হয়। পুলিশ প্রায় ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে। ইহা ব্যতীত কররাদিহা, ভুদিগাদিয়া, চাতারা নামক স্থানে ও জলেশ্বর থানার একটি চাউল কলে গুলি চলে এবং ইহার ফলে ৪জন নিহত ও প্রায় ৬০ জন আহত হয়।

কোরাপুট জিলার সংগ্রাম

আগস্ট-সংগ্রামে কোরাপুট জিলায় মোট ১২৭০ জন লোক গ্রেপ্তার হয়। ইহাদের মধ্যে ৫৬০ জনের কারাদণ্ড হয় এবং ৩২ জন লোক যাবজ্জীবন কারাদণ্ড লাভ করে। এই জিলায় মোট ৪১ রাউণ্ড গুলি চলে এবং ইহার ফলে ২৮ জন নিহত ও ২১৪৭ জন আহত হয়। এই জিলার ক্রুদ্ধ জনতা তিনটি থানা সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহা ব্যতীত বিভিন্ন স্থানের টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন, রেল-লাইন, রেলওয়ে ব্রিজ জনতার আক্রমণে ধ্বংস হয়। একজন কংগ্রেস-কর্মী ফাঁসী কাঠে প্রাণ দেয়, জেলখানায় পুলিশের প্রহারের ফলে ৫০ জন বন্দীর মৃত্যু ঘটে।

এই জিলায় এক পয়সা "বাজার-তোলা" ("one pice bazar tax") উপলক্ষ করিয়া প্রথমে আন্দোলন শুরু হয়। বাজারে যে সকল লোক জিনিসপত্র বিক্রয় করিতে আসিত তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতেই জমিদারগণ প্রত্যহ এক পয়সা করিয়া ট্যাক্স আদায় করিত। বহু পূর্ব হইতেই ইহা জিলার সর্বত্র প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া চাষীরা এই ট্যাক্স বন্ধ করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে এবং ক্রমশঃ ইহা জিলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জমিদারগণ এই আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য সকল শক্তি নিয়োগ করে। পুলিশ ইহাদের সহিত যোগ দেয়। কিন্তু "অত্যাচার কখনই পুলিশ ও শাসকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। জমিদারী কর্মচারীদের বর্বর স্থূলভ অত্যাচার সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচারকে বহু গুণ ছাড়াইয়া যায়।"(১)

ঢেনকানল রাজ্যের সংগ্রাম

১৯৩৮ খৃস্টাব্দে ঢেনকানল রাজ্যের প্রজা-আন্দোলন এক নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছিল। আগস্ট-সংগ্রামেও এই রাজ্য পিছাইয়া থাকে নাই। সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে ঢেনকানল রাজ্যের প্রজা-মণ্ডলের সভাপতি ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। রাজ-দরবার প্রজামণ্ডলকে

---

(১) "1942 Revolution in Orissa" by S. N. Dutt.

বেআইনী ঘোষণা করে। প্রজামণ্ডলের নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ সংগ্রাম শুরু করিয়া দেয়। ২৬শে আগস্ট এক বিরাট জনতা মাধি থানা আক্রমণ করিয়া উহা দখল এবং থানার সকল অস্ত্র হস্তগত করে। জনতা নিকটবর্তী সরকারী শস্য-গোলা দখল করিয়া সকল শস্য গরীবদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেয়। জনতা স্টেটের অফিসার ও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের বাসস্থান দখল করিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দেয় এবং সকল কাগজ-পত্র ধ্বংস করিয়া ফেলে।

২৭শে আগস্ট মাধি গ্রামে প্রায় দশ সহস্র লোকের এক সমাবেশে ঢেনকানলে "জনগণের স্বাধীন সরকার" প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। এই দিন হইতে ৪ঠা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রায় সমগ্র ঢেনকানল রাজ্যে এই "স্বাধীন সরকার"-এর শাসন অব্যাহত থাকে। ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক দল সশস্ত্র জনতা পারজঙ্গ থানা আক্রমণ করিলে সশস্ত্র কনেস্টবলদের সহিত এক খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং এই খণ্ড যুদ্ধে জননায়ক বৈষ্ণব পট্টনায়কসহ বহু লোক গুরুতররূপে আহত হয়। এই সংঘর্ষের পর হইতে রাজ্য-সরকারের শক্তিশালী সশস্ত্র পুলিশবাহিনী সর্বত্র গ্রেপ্তার, গৃহদাহ, গুলিবর্ষণ প্রভৃতি অত্যাচার পূর্ণোদ্যমে আরম্ভ করে। প্রজামণ্ডলের বহু কর্মী গ্রেপ্তার হয় এবং বিচারে তাহাদের প্রায় প্রত্যেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হয়। তাহাদের কয়েকজন এমন কি চল্লিশ বৎসরের কারাদণ্ড লাভ করে।

তালচের রাজ্যে সংগ্রাম

তালচের রাজ্যের সংগ্রাম ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। ভারতের অন্যান্য অংশের মত এখানেও প্রথম হইতেই আগস্ট-সংগ্রাম আরম্ভ হয়। রাজ্যের প্রজামণ্ডলের সভাপতি পবিত্রমোহন প্রধান এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। সংগ্রাম প্রথমে বিক্ষিপ্ত আকারে আরম্ভ হইলেও অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উহা সভাপতি পবিত্রমোহনের নেতৃত্বে রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্রবদ্ধরূপে পরিচালিত হইতে থাকে। প্রজামণ্ডলের সিদ্ধান্ত অনুসারে রাজ্যের প্রধান শহর তালচের ব্যতীত সর্বত্র

"স্বাধীন সরকার" প্রতিষ্ঠিত হয়। উড়িয়া ভাষায় এই স্বাধীন সরকারের নাম দেওয়া হয় "চাষী-মুলিয়া রাজ"। ইহার ভিত্তি স্বরূপ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর ভোটাধিকারের নীতি গৃহীত হয় এবং পাড়ায়, গ্রামে, পরগণায়, মহকুমায় ও কেন্দ্রে এইভাবে "জনগণের সরকার" গঠিত হয়। তালচের শহর ব্যতীত সমগ্র রাজ্যে এই "স্বাধীন সরকার" কয়েক মাস যাবত অপ্রতিহত-ভাবে শাসনকার্য চালাইয়া যায়। তালচের শহরটি রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ, একটি বৃটিশ-সৈন্যদল ও বিমানবাহিনী দ্বারা সুরক্ষিত ছিল বলিয়া জনতার পক্ষে ইহা দখল করা সম্ভব হয় নাই। কয়েক সহস্র স্বেচ্ছাসেবক লইয়া গঠিত একটি "গণ-বাহিনী"র সাহায্যে "স্বাধীন সরকার" রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করিত।

প্রজামণ্ডলের সভাপতি পবিত্রমোহন প্রধান পলাতক অবস্থায় এই সংগ্রাম পরিচালনা করিতেন। ১লা সেপ্টেম্বর পবিত্রমোহন রাজ্যের পুলিশদের দ্বারা নিহত হইয়াছে বলিয়া গুজব রটিয়া যায়। এই গুজব ছড়াইয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট জনতা সুরক্ষিত তালচের শহর আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হয়। গণবাহিনীর নেতৃত্বে এই জনতা তালচের শহরের বাজারের নিকটবর্তী এক ময়দানে আসিয়া সমবেত হয়। অপর দিকে রাজ্যের সশস্ত্র পুলিশ ও বৃটিশ সৈন্যদল রাইফেল ও মেসিনগানসহ প্রস্তুত হয় এবং বিমানবাহিনী আক্রমণকারী জনতার মাথার উপর ঘুরিতে থাকে। কয়েকটি দাবি লইয়া কয়েকজন প্রতিনিধি রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তাহারা ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। ইহার পর জনতা শেষ চেষ্টা হিসাবে পুলিশ ও সৈন্যদলের বেড়াজাল ভেদ করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইবামাত্র পুলিশ ও সৈন্যদল সম্মুখ হইতে আর বিমানবাহিনী আকাশ হইতে রাইফেল ও মেসিনগানদ্বারা গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই গুলিবর্ষণে বহু লোক হতাহত হয় এবং জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে।(১)

---

(১) সরকারী মতে ৮ জন নিহত ও ১০০ জন আহত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রায় ৫০ জন নিহত ও ২০০ জন আহত হইয়াছিল।

পুলিশ ও সৈন্যেরা পলায়মান জনতার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উন্মত্তের মত গুলি চালায়। ইহার পর হইতে রাজ্যের সর্বত্র অবাধে নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও নারীধর্ষণ চলিতে থাকে। অসহায় গ্রামবাসীরা অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া বনে-জঙ্গলে পলায়ন করে। বহু গ্রাম সম্পূর্ণ জনশূন্য হইয়া যায়। প্রজামণ্ডল কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য হইতে জানা যায় যে, পুলিশ ও সৈন্যদের দ্বারা ১০ লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছিল। এইভাবে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরিয়া সংগ্রাম চলে।

আগস্ট-সংগ্রামে যুক্তপ্রদেশ

আগস্ট-সংগ্রামে যুক্তপ্রদেশের ভূমিকা অন্য কোন প্রদেশ অপেক্ষা হীন নহে। যুক্তপ্রদেশে এই সংগ্রামে বিদ্রোহী জনতা কর্তৃক ৪২টি থানা, ৮২টি সরকারী ভবন, ৭টি ছোট পাওয়ার-হাউস, ৮৪টি রাস্তা, ১০৮টি পোস্ট ও টেলিগ্রাফ-অফিস, ১০৭টি রেল-স্টেশন, ৪৪৫টি টেলিগ্রাফ-পোস্ট, ও বহু রেল-কামরাসহ ৩২৭টি সরকারী সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং ১৯টি ট্রেন লাইন-চ্যুত হয়। এই সকল ধ্বংস-কার্যের ফলে সরকারী ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫০৭০৬৯৲ টাকা। জনতার আক্রমণে ৩ জন সরকারী কর্মচারী নিহত ও ১৬২ জন আহত হয়। বিদ্রোহী জনতা ৭টি অঞ্চলে শাসন-ক্ষমতা দখল করে। পুলিশ ও মিলিটারী ১১৬টি স্থানে গুলিবর্ষণ করে এবং ইহাতে মোট ২২৩ জন নিহত ও ৭৯১ জন আহত হয়। মোট ২২,০৩২ লোক গ্রেপ্তার হয়, ইহাদের মধ্যে ১০,১৪৬ জন কারাদণ্ড ও ৫ জন মৃত্যুদণ্ড লাভ করে। ৫৭৯টি অঞ্চলের উপর মোট ৩১,৭৬,৯৭৩৲ টাকা পিটুনি-ট্যাক্স ধার্য হয়। সমগ্র যুক্তপ্রদেশে এই সংগ্রাম ছড়াইয়া পড়ে এবং ইহা একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারা সুপরিকল্পিতভাবে পরিচালিত হয়। এই প্রদেশের বালিয়া জিলার সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বালিয়া জিলা

বালিয়ার জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট "নেদারসোল হ্যালেটের (যুক্তপ্রদেশের গভর্ণর) নিকট 'বালিয়া পুনর্দখল'-এর সংবাদ দিয়া যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহা যুক্তপ্রদেশের জনসাধারণকে এক গৌরবময় অহিংস সংগ্রাম ও আত্মশক্তির উপর সেই সংগ্রামের অপূর্ব জয়ের কথা চিরদিন স্মরণ করাইয়া দিবে। এই সংগ্রামে বালিয়া জিলা শ্রেষ্ঠস্থান দাবি করিতে পারে।" (১)

বালিয়া জিলার নেতা চিত্তু পাণ্ডে বালিয়া জিলার ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন :—

"৯ই আগস্ট কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন এবং ইহার প্রতিবাদে আমরা হরতাল পালন করি। ঐ দিনই কয়েকজন স্থানীয় নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১০ই তারিখ আমরা জিলার কালেকটর মিঃ নিগমের নিকট গিয়া এই নেতাদের মুক্তি দাবি করি। তিনি একদিকে নানা অজুহাতে সময় কাটাইতে থাকেন এবং অপর দিকে বেনারসের কমিশনারের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠান। কিন্তু কোন সাহায্য না আসায় তিনি নেতাদের মুক্তি দিতে সম্মত হন, আর আমরাও শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিই। ইহার পর শাসন-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে এবং আমরা শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হই। আমরা সরকারী উকিলকে জিলা-ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করিয়া কাজ চালাই। আমরাই যান-বাহন নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকি, আমরাই ট্রেজারী পাহারা দিই, আমরাই বিচার-বিভাগের কাজ চালাই এবং অন্যান্য কর্তব্য সম্বন্ধে উচ্চতর কংগ্রেস-নেতৃত্বের নির্দেশ পালন করি। ......নয়দিন পর্যন্ত শহর ও সমগ্র জিলা জনগণের শাসনাধীন ছিল এবং তাহারা বেশ সুখেই ছিল।"(২)

নয়দিন পর পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী শহরে প্রবেশ করে এবং নির্বিচারে গৃহদাহ, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, লুণ্ঠন ও গুলি চালনা করিতে থাকে। গান্ধীটুপি

---

(১) "1942 Revolution in U. P." by Satyendra Nath Sanyal. (২) "1942 Revolution in U. P." নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

ও খদ্দরধারী কোন লোকই তাহাদের উৎপীড়ন হইতে নিস্তার পায় নাই। এই ভয়ংকর অত্যাচারের ফলে বালিয়া জিলার সংগ্রাম বন্ধ হইলেও সৈন্য ও পুলিশের উৎপীড়ন চলে ১৯৪৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। এই বৎসর কয়েকজন কংগ্রেস-নেতা বালিয়া পরিদর্শন করিয়া সকল সংবাদ প্রকাশ করিয়া দিবার পর এই উৎপীড়ন বন্ধ হয়।

আজমগড়ের মধুপুর থানার সংগ্রামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝিয়া জিলার কালেক্টর ও একজন সার্কেল ইনস্পেকটর থানার দারোগাদের সাহায্য করিতে আসেন। তাহারা ১২টি বন্দুক ও কয়েকটি রিভলভার লইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ঘটনার দিন পাঁচ সহস্রাধিক সশস্ত্র জনতা থানা আক্রমণ করে। কালেকটর ও পুলিশদল বেপরোয়াভাবে গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। প্রায় আড়াইঘণ্টা ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলে। এই যুদ্ধে পুলিশ-পক্ষে ৩০ জন নিহত ও প্রায় ৮০ জন আহত হয় এবং আক্রমণকারীদেরও বহু লোক হতাহত হয়। ইহার পর জনতা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। পরের দিন একটি সৈন্যদল আসিয়া পুলিশদলের সহযোগে অবর্ণনীয় অত্যাচারের দ্বারা সংগ্রাম নিস্তব্ধ করিয়া দেয়।

সাহাগঞ্জ-জৌনপুর অঞ্চলের সংগ্রামও ভীষণ আকার ধারণ করে। এই অঞ্চলে জনতার আক্রমণে সরকারী কর্মচারীরা পলায়ন করিতে বাধ্য হয় এবং জনতা শাসন-ব্যবস্থা দখল করে। সাহাগঞ্জের রেল-স্টেশনটি ধ্বংস ও একটি সৈন্যবাহী ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয় এবং জনতার আক্রমণে সকল যোগাযোগ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়। ইহা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বেনারস, মীরাট, ফৈজাবাদ, এটোয়া, মিরজাপুর, আগ্রা ও আলিগড় জিলায় সংগঠিতভাবে গণ-সংগ্রাম পরিচালিত হয়। ২১শে আগস্ট হইতে প্রদেশের সর্বত্র রেলপথ, ট্রেন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন-লাইন এবং থানার উপর আক্রমণ শুরু হয়। এই আক্রমণের ফলে কয়েকদিন পর্যন্ত ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, কেবলমাত্র কলিকাতা-কালকা মেল ট্রেনখানি সামরিক পাহারায় চলাচল করিত।

আগস্ট-সংগ্রামে মধ্যপ্রদেশ

"অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় মধ্যপ্রদেশকে পশ্চাৎপদ প্রদেশ বলিয়া গণ্য করা হয়। ১৯৪২ খৃস্টাব্দ মধ্যপ্রদেশে একটা বিরাট পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে মধ্যপ্রদেশ চিরদিন নিজের কর্ম-গৌরবে সমুজ্জ্বল হইয়া থাকিবে। মধ্যপ্রদেশের প্রত্যেকটি গ্রাম রোমাঞ্চকর ইতিহাস সৃষ্টি করিয়াছে। সর্বত্র জনসাধারণ সাহস ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছে। অপর দিকে সরকারের অত্যাচারও চরম সীমায় আরোহণ করিয়াছে।"(১)

মধ্যপ্রদেশের চিমুর, অস্তি, যাভেলী, বেতুল, রামটেক ও নাগপুরের সংগ্রাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চিমুর

চিমুর চান্দা জিলার একটি ছোট শহর। ১৬ই আগস্ট শহরের কংগ্রেস-নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইয়া এক বিরাট জনতা নেতাদের দেখিবার জন্য থানায় উপস্থিত হইলে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নির্দেশে পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালায় এবং কয়েকজন নেতৃস্থানীয় কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। ইহার পর নেতৃত্বহীন জনতা ছত্রভঙ্গ হয়। কিছুক্ষণ পরে জনতা আবার একত্র হইয়া থানার নিকট উপস্থিত হইলে পুলিশ তাহাদের উপর গুলিবর্ষণ করে। ইহার ফলে ৩ জন লোক নিহত ও বহু আহত হয়। এবার জনতা ছত্রভঙ্গ না হইয়া রুখিয়া দাঁড়ায় এবং জনতার রুদ্র মূর্তি দেখিয়া থানার অফিসারগণ প্রাণের ভয়ে পলায়ন করে। জনতা ইহার পর নিকটবর্তী ডাকবাংলোর মধ্যে প্রবেশ করে। ডাকবাংলোর সরকারী কর্মচারী বাধা দিতে গিয়া নিহত হয়। ইতিমধ্যে একদল পুলিশ ঘটনাস্থলের নিকটবর্তী হইলে একটি পুলের উপর জনতার সহিত পুলিশদলের প্রচণ্ড সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশের গুলিবর্ষণে ১২ জন লোক এবং জনতার আক্রমণে একজন দারোগা নিহত হয়।

---

(১) "1942 Revolution in C. P." by Dindayal Gupta.

জনতা পুলটি ও নিকটবর্তী সকল সরকারী অফিস ধ্বংস করিয়া ফেলে। ইহার পর জনতা এক সভা করিয়া একটি "স্বাধীন জাতীয় সরকার" গঠন করে।

১৭ই আগস্ট একদল সৈন্য আসিয়া শহর দখল করে এবং সৈন্য ও পুলিশ একত্রে মিলিয়া শহরবাসীদের উপর বর্বর সুলভ অত্যাচার শুরু করে। উন্মত্ত সৈন্য ও পুলিশ শত শত লোককে গ্রেপ্তার করে, তাহাদের আক্রমণে কয়েক জনলোক নিহত ও বহুলোক গুরুতররূপে আহত হয়। তাহাদের দ্বারা শহরের প্রায় সকল গৃহ লুণ্ঠিত ও প্রায় ৫০ জন স্ত্রীলোক ধর্ষিত হয়। সৈন্যগণ কয়েক শত লোককে গ্রেপ্তার করিয়া একটি অল্প পরিসর গৃহের মধ্যে কয়েক দিন পর্যন্ত আটক রাখে। ছয় দিন পর তাহাদের মধ্য হইতে দেড়শত লোককে বাছিয়া লইয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মামলা আরম্ভ করা হয়। মামলার বিচারে ২০ জনের প্রাণদণ্ড ও ৩৬ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়। ইহা ব্যতীত বহু লোক ২ বৎসর হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড লাভ করে। হাইকোর্টের আপিলে ২ জন ব্যতীত অপর সকলের প্রাণদণ্ড মকুব হয়। পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তক্ষেপের ফলে ঐ দুই জনেরও প্রাণ রক্ষা হয়। সৈন্য ও পুলিশ এই শহর হইতে মোট লক্ষ ৩০ হাজার টাকা পিটুনি-কর আদায় করে।

অস্তি

অস্তির সংগ্রামও চিমুরের মতই প্রবল আকার ধারণ করে। অস্তি থানার নেতারা শান্তিপূর্ণভাবে থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের নিকট জনসাধারণের হস্তে থানার ভার অর্পণ করিবার প্রস্তাব করেন। থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইহার জবাবে এই অঞ্চলের প্রধান নেতাকে গ্রেপ্তার করিলে জনসাধারণের মধ্যে 'প্রবল বিক্ষোভ দেখা দেয়। গ্রেপ্তারের পরদিন এক বিরাট জনতার শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা থানা দখল করিবার চেষ্টা করিবামাত্র পুলিশ জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে। ইহার ফলে কয়েকজন হতাহত হয়। কিন্তু তাহা সত্বেও জনতা শান্তিপূর্ণভাবে থানার মধ্যে প্রবেশ করিলে পুলিশদল ভয় পাইয়া পলায়ন করে।

ইহার পর হইতে সর্বত্র পুলিশের সহিত জনতার সংঘর্ষ চলিতে থাকে। জনতার আক্রমণে সরকারী অফিস-ভবনগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই সকল সংঘর্ষে ৩ জন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেস-কর্মী নিহত ও বহু লোক আহত হয়। কয়েক দিন পরে সামরিক পুলিশের একটি বড় দল এই অঞ্চলে উপস্থিত হইয়া ভয়ংকর অত্যাচার শুরু করে। এই অঞ্চলে মোট ১৬৩ জন লোককে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েকটি মামলা আরম্ভ করা হয়। এই সকল মামলায় ১০ জন নেতৃস্থানীয় কর্মী প্রাণদণ্ড ও ৫৫ জন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড লাভ করেন। ইহা ব্যতীত জেলখানায় বন্দীদের উপর পুলিশের অত্যাচারের ফলে আর ৭ জন কর্মীর মৃত্যু ঘটে। পুলিশ জনসাধারণের উপর অবর্ণনীয় উৎপীড়ন করিয়া এই অঞ্চল হইতে মোট ৫২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

রামটেক জিলা

গান্ধীজী প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই স্থানীয় কংগ্রেস-নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হয়। এই গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সর্বত্র বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে। জনতা পুলিশের হস্ত হইতে নেতাদের মুক্ত করিয়া আনে, তাহারা দীর্ঘ রেলপথ তুলিয়া ফেলে এবং রেল-স্টেশনটি ধূলিসাৎ করিয়া দেয়। জনতার আহ্বানে সরকারী কর্মচারীরাও খদ্দর পরিয়া শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। আদালত, পোস্ট-অফিস প্রভৃতি সরকারী ভবনগুলি ধূলিসাৎ করিয়া ফেলা হয়। জনতা ট্রেজারী লুণ্ঠন করিয়া তিন লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করে। ইহার পর এক বিশাল জনসমাবেশে "স্বাধীন জাতীয় সরকার" গঠিত হয়। "স্বাধীন সরকার" এই অঞ্চলের শাসন-ভার গ্রহণ করে। কয়েকদিন পরেই এই অঞ্চলে একদল সৈন্য আসিয়া চারিদিকে গ্রেপ্তার আরম্ভ করে। কয়েক শত লোক গ্রেপ্তার ও বহু লোক বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

যাভেলী

যাভেলী বেরারের অমরাবতী জিলার একটি শহর। ইংরেজ-রাজ কংগ্রেসের উপর আক্রমণ শুরু করিবামাত্র এই শহরের জনসাধারণ শহরের সরকারী দপ্তর

গুলি দখল করিয়া সকল কাগজপত্র ভস্মীভূত করে। জনতা বড় বড় গাছ কাটিয়া রাস্তাগুলি বন্ধ করিয়া দেয় এবং ইলেকট্রিক ও টেলিগ্রাফ-পোস্টগুলি উপড়াইয়া ফেলে। কয়েকদিনের মধ্যেই অমরাবতী হইতে একদল সৈন্ত আসিয়া উপস্থিত হয় এবং শহরের সর্বত্র গ্রেপ্তার, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ও গুলিবর্ষণ করিতে থাকে। সৈন্তদের গুলিবর্ষণে কয়েকজন স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা ও কর্মী নিহত ও বহুলোক আহত হয়। জনসাধারণ যথাসাধ্য সংগ্রাম চালাইতে থাকে। বিভাগীয় ডেপুটি কমিশনার ও জিলার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তিনবার জনসাধারণের হস্তে বন্দী হন, কিন্তু প্রত্যেকবারই তাঁহাদের অক্ষত দেহে মুক্তি দেওয়া হয়। এই ভাবে কিছুদিন সংগ্রাম চলিবার পর পুলিশ ও সৈন্তদলের বর্বর অত্যাচারে সংগ্রাম বন্ধ হইয়া যায়।

বেতুল জিলা

মহাকোশলের বেতুল জিলার সংগ্রামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জিলার জনসাধারণ কংগ্রেস-নেতা বিষ্ণু গোন্দ-এর নেতৃত্বে জিলার প্রায় সর্বত্র ইংরেজ-শাসনের উচ্ছেদ করিয়া "স্বাধীন জাতীয় সরকার"-এর শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। জনতা প্রায় সর্বত্র রেল-স্টেশনগুলি দখল ও অন্তান্ত সরকারী দপ্তরগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে। বহু স্থানে রেল-লাইন তুলিয়া ফেলা হয়। পরে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সৈন্ত ও পুলিশ-বাহিনীর সহিত জনতার সংগ্রাম চলে। এই সংগ্রামে বহু নেতা ও কর্মী নিহত এবং বহু লোক আহত হয়। প্রায় ৭ শত লোককে গ্রেপ্তার ও বহু লোককে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই বিদ্রোহের নায়ক বিষ্ণু গোন্দ গ্রেপ্তার হইয়া প্রাণদণ্ড লাভ করেন। কিন্তু হাইকোর্টের আপিলে প্রাণদণ্ড মকুব করিয়া তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

নাগপুর

মধ্যপ্রদেশের প্রধান শহর নাগপুর উহার দীর্ঘকালের সংগ্রামী ঐতিহ্য পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হয়। নাগপুরের বিরাট শ্রমিক সংখ্যার এক

বৃহৎ অংশ এই সংগ্রামে যোগদান করিয়া ইহাকে দুর্জয় করিয়া তোলে। শহরের বিদ্রোহী জনতা শহরের বৃটিশ-শাসনের অবসান ঘটাইয়া তিনদিন পর্যন্ত শহর দখলে রাখিতে এবং "স্বাধীন জাতীয় সরকার" চালাইতে সক্ষম হয়। এই তিন দিনের মধ্যে বৃটিশ-শাসনের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ শহরের সকল থানা জনতার আক্রমণে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। শহরের প্রকাণ্ড পোস্ট অফিসটি সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হয়। টেলিগ্রাফ ও ইলেকট্রিক-পোস্টগুলি উপড়াইয়া উহাদের দ্বারা প্রত্যেকটি রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করা হয়। তিনদিন পর একটি বড় সৈন্যদল আসিয়া কয়েকটি প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর শহর "পুনর্দখল" করে। ইহার পর শুরু হয় এক ভয়ংকর সন্ত্রাসের রাজত্ব। সাতদিন ধরিয়া শহরের সর্বত্র নির্বিচারে গুলিবর্ষণ, লাঠিচালনা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারীধর্ষণ ও গ্রেপ্তার চলে। প্রায় ১৫০ জন লোক পুলিশ ও সৈন্যদের গুলিতে প্রাণ হারায়, শত শত লোক আহত এবং প্রায় এক হাজার লোক গ্রেপ্তার হয়।

আগস্ট-সংগ্রামে মহারাষ্ট্র

কংগ্রেসের উপর ইংরেজ-রাজের আক্রমণ আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র মহারাষ্ট্রে এক ভীষণ সংগ্রামের আগুন জ্বলিয়া উঠে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে জনসাধারণ ইংরেজ-শাসনের পাশাপাশি "স্বাধীন জাতীয় সরকার" স্থাপন করে। এই "স্বাধীন সরকারই" দীর্ঘকাল পর্যন্ত সংগ্রাম চালাইয়া যায়। মহারাষ্ট্রে এই "স্বাধীন সরকার"কে বলা হইত "পত্রী-সরকার"। সাতারা জিলার "পত্রী-সরকার" ছিল মেদিনীপুরের "স্বাধীন জাতীয় সরকার"-এরই অনুরূপ এবং সাতাড়া জিলার সংগ্রামও মেদিনীপুরের মতই ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়াছে।

সাতারার "পত্রী-সরকার"

"সাতরার 'পত্রী-সরকার'-এর সহিত মেদিনীপুরের "স্বাধীন জাতীয় সরকার" -এর তুলনা করা চলে। এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য এই যে, এই উভয় স্থানেই

বৈপ্লবিক সংগ্রাম বৃটিশ-শাসনের উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করে নাই, উভয় ক্ষেত্রেই ইহা বৃটিশ-শাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী "স্বাধীন সরকার" প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।"(১)

কিন্তু মেদিনীপুর ও সাতারার "স্বাধীন জাতীয় সরকার" এই দুইয়ের মধ্যে সাদৃশ্য থাকিলেও অন্য সকল দিক হইতে সাতারার "পত্রী-সরকার"-এর চরিত্র ছিল মেদিনীপুর ও অন্যান্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত "স্বাধীন জাতীয় সরকার" হইতে ভিন্ন।

"১৯৪২ খৃস্টাব্দের বিপ্লবে সাতারার আন্দোলনের একটা নিজস্ব ইতিহাস আছে। এই সময়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে যে সকল অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল তাহার কোনটার সঙ্গেই সাতারার অভ্যুত্থানের তুলনা চলে না। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জিলায়, বিহারের ভাগলপুর জিলায়, অথবা যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জিলায় যে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠিত হইয়াছিল সেইগুলি ছিল খুবই আকস্মিক ঘটনা। কিন্তু গান্ধীজীর 'গ্রামরাজ্য' নামে প্রসিদ্ধ আত্ম-নির্ভরতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সাতারার 'পত্রী-সরকার' ভারতের ইতিহাসে চিরদিন একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইয়া থাকিবে। কোন অর্থনীতিবিশারদ অথবা জয়প্রকাশ নারায়ণ কিংবা অচ্যুৎ পটবর্ধনের মত কোন বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা এই পত্রী-সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ইহা গঠন করিয়াছিলেন একজন সাধারণ কৃষক—যিনি নিজ জিলার বাহিরে মোটেই পরিচিত ছিলেন না। তাঁর নাম নানা পাতিল। সাতারার বীর নানা পাতিল সমগ্র মহারাষ্ট্রে প্রত্যেকটি মানুষের নিকট বিশেষ পরিচিত।......তিনি জিলার প্রত্যেকটি চাষীকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া এক প্রচণ্ড সংগ্রামের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সেই সংগ্রামের জয় শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি তাঁহার গ্রামরাজ্য এমন ভাবে পরিচালিত করিয়াছিলেন যে, জিলার বহুস্থানে বৃটিশ-শাসন সম্পূর্ণ অচল হইয়া পড়িয়াছিল।"(২)

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৯ই আগস্ট বোম্বাই শহরে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সংবাদ পাইবামাত্র সাতারার নেতারাও আত্মগোপন করেন এবং সংগ্রাম আরম্ভ

(১) "1942 and Maharastra" by S. M. Joshi.

(২) "Satara Patri-Sarkar" by J. P. Deshmukh.

করিবার আয়োজন করিতে থাকেন। তাঁহাদের উদ্যোগে এক হাজার কৃষক যুবক লইয়া একটি "গেরিলা-বাহিনী" গঠিত হয়। এই গেরিলা-বাহিনী পাহাড়-অঞ্চলে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। গেরিলা-সৈন্যগণ স্থানীয় কৃষকদের সাহায্যে সর্বত্র সরকারী সম্পত্তি ধ্বংস করিতে থাকে। টেলিগ্রাফের পোস্টগুলি উপড়াইয়া এবং তার কাটিয়া ফেলা হয়। সংগঠিত জনতা সর্বত্র সরকারী ডাকবাংলো ভস্মীভূত করে। গেরিলা-সৈন্যগণ কৃষকদের সাহায্যে সশস্ত্র পুলিশদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাদের রাইফেলগুলি কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অস্ত্র-সমস্যার সমাধান করিতে থাকে। এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয় সরকারের সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী গড়িয়া তোলা হয়। ইহার পর সশস্ত্র গেরিলারা বহু সৈন্যবাহী ট্রেন ও ডাক-ট্রেন আক্রমণ করিয়া বহু অর্থ ও খাদ্য লুণ্ঠন করে। রেললাইন তুলিয়া ফেলিয়া কয়েকখানি ট্রেন লাইনচ্যুত করা হয়। ইংরেজ- রাজের সশস্ত্র পুলিশ এবং সৈন্যগণ গেরিলাদের দমন করিতে না পারায় তাহারাও ইহাদের বিরুদ্ধে গেরিলা ধরনের যুদ্ধ আরম্ভ করে। কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কোন ফল হইল না, কারণ গেরিলারা জঙ্গলে ও জনসাধারণের মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া থাকিত যে তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করা যাইত না। সংগ্রামের প্রথম এগার মাস এইভাবে গেরিলা যুদ্ধ চলিবার পর ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের জুন মাসে জিলার প্রবীণতম কংগ্রেস-নেতা নানা পাতিলের নেতৃত্বে পত্রী-সরকার নামে একটি "স্বাধীন জাতীয় সরকার" ও গেরিলাদের লইয়া একটি "সুশৃঙ্খল জাতীয় সৈন্যবাহিনী" গঠন করা হয়।

প্রায় সমগ্র সাতারা জিলা ও দাক্ষিণাত্যের দেশীয় রাজ্যগুলির দুই শতাধিক গ্রামের উপর "পত্রী-সরকার"-এর শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং এই সরকার প্রায় আড়াই বৎসর কাল বিশেষ দক্ষতার সহিত শাসনকার্য চালাইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে "স্বাধীন সরকার" পাহাড়-অঞ্চল হইতে দস্যু-ডাকাতদের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ করিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক গ্রামে একটি করিয়া আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মদ্য বর্জন আন্দোলন এমন সফলতা লাভ করে যে এই বাবদ ইংরেজ-সরকারের দেড় লক্ষ টাকা রাজস্ব হ্রাস পায়। "পত্রী-সরকার" আইন

করিয়া বিবাহে-যৌতুক-প্রথা লোপ করে। চোরা বাজার সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায় এবং গ্রামে গ্রামে লাইব্রেরী, স্কুল ও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়।"

আগস্ট-সংগ্রামে বোম্বাই প্রদেশ

"বোম্বাইতেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের সৈনিকদের বিরুদ্ধে প্রথম বৃটিশ আমলাতন্ত্রের আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। বোম্বাই কেবল সাহসের সহিত এই আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় নাই, সমগ্র ভারতবর্ষকে নির্দেশ, পরিচালনা, অর্থ ও অন্যান্য সাহায্যও দিয়াছিল। সেই অবস্থার মধ্যেও বোম্বাই হইতেই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কার্য পরিচালিত হইত।" (১)

কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের শ্রমিক, কৃষক ও সমগ্র জনসাধারণ ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করে। বোম্বাই শহর ও আমেদাবাদের সূতাকলের শ্রমিকগণ ধর্মঘট করে এবং তাহা বোম্বাই শহরে এক সপ্তাহ ও আমেদাবাদে তিন মাসেরও অধিক সময় অব্যাহত থাকে। আমেদাবাদ-মিউনিসিপ্যালিটির সকল কর্মচারী এবং ঝাড়ুদারগণও এই ধর্মঘটে যোগ দেয়। প্রদেশের ছাত্রগণও এই সংগ্রামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করে। বোম্বাই শহর ও গুজরাটের সকল স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ প্রায় চারি মাস যাবৎ ধর্মঘট করিয়া থাকে এবং শতকরা আশি জন ছাত্র সংগ্রামে যোগদান করে। চিক্‌নী নামক স্থানে একটি ছাত্র-শোভাযাত্রার উপর গুলি চলে এবং তাহার ফলে একটি ছাত্র নিহত হয়। আমেদাবাদ মিউনিসিপ্যাল স্কুল সমূহের শিক্ষকগণ ধর্মঘট করায় ১৬ শত শিক্ষককে বরখাস্ত করা হয়। ১৭ই আগস্ট ৫০ জন ছাত্রের একটি শোভাযাত্রা আদাস স্টেশনের নিকটবর্তী হইবামাত্র পুলিশ ছাত্রদের উপর গুলি চালায়। ইহার ফলে ৪ জন ছাত্র নিহত এবং অবশিষ্ট সকলে আহত হয়।

(১) "1942 Revolution in Bombay" by Usha Mehta.

বোম্বাই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষকগণও এই সংগ্রামে যোগদান করে। কংগ্রেস-কর্মীদের নির্দেশে কৃষকগণ তাহাদের উদ্বৃত্ত শস্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে। যাহাতে ক্ষেতের শস্য সরকারের হাতে না পড়ে তার জন্য কৃষকগণ রাতারাতি তাহাদের ক্ষেতের পাকা শস্য কাটিয়া লুকাইয়া ফেলে। পোরবন্দরের জেলেরা এক সরকারী গুদাম হইতে দেড় লক্ষ টাকা মূল্যের চাউল ও চিনি সরাইয়া ফেলিয়া দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দেয়। ব্রোচ্ জিলার কৃষকগণ জিলার কয়েকটি স্থানে প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার গঠন করিয়া কয়েক মাস পর্যন্ত উহা পরিচালনা করে। আমেদাবাদ জিলার ভিলাদা নামক স্থানে পুলিশ একটি নারী-শোভাযাত্রার উপর গুলি চালাইতে উদ্যত হইলে শোভাযাত্রীরা পুলিশ দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া লয় ও তাহাদের আটক করে। অবশেষে পুলিশগণ ক্ষমা চাহিয়া মুক্তি লাভ করে। আমেদাবাদে যুবকদের লইয়া "বানর-সেনা" নামে একটি সংগ্রামী বাহিনী গঠিত হয়। তাহারা দলবদ্ধভাবে পুলিশ-অফিসারদের বাড়ী ও বিভিন্ন থানা আক্রমণ করিয়া ঐ গুলির উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করে। বোম্বাই শহরে একটি গোপন রেডিও স্থাপিত হয়। এই গোপন রেডিও দ্বারা প্রত্যহ সারা ভারতবর্ষের সংগ্রামের সংবাদ প্রচার করা হইত।

আগস্ট-সংগ্রামে পাঞ্জাব প্রদেশ

"১৯৪২ খৃস্টাব্দের স্বাধীনতা-সংগ্রাম হইতে দূরে থাকিবার জন্য প্রায়ই পাঞ্জাবের সমালোচনা করা হয়। কিন্তু হয়ত অনেকের নিকটই ইহা একটা নূতন সংবাদ বলিয়া মনে হইবে যে, প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গ বলিয়া কথিত রাওয়ালপিণ্ডি বৈদেশিক দাসত্ব-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের সংগ্রামে ভারতের শহর অপেক্ষা পশ্চাতে ছিল না।"(১)

(১) "1942 Revolution in the Punjab" by R. L. Chadha.

রাওয়ালপিণ্ডি

১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৯ই আগস্ট কংগ্রেসের উপর ইংরেজ-রাজের আক্রমণ শুরু হইবা মাত্র রাওয়ালপিণ্ডির একদল যুবক সংগ্রাম আরম্ভ করে। এই সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করে 'কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি'। ইহারা "বলশেভিক" নামে একটি সাময়িক পত্র বিভিন্ন ভাষায় গোপনে ছাপাইয়া জনসাধারণ ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নিয়মিতভাবে প্রচার করিত। গোয়েন্দা-পুলিশ ইহার ছাপাখানা ও প্রকাশকদের কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে না পারিয়া কেবলমাত্র সন্দেহ বশে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে। ইহা ব্যতীত একদল বিপ্লবী যুবক আরও বহু রকমের বৈপ্লবিক সাহিত্য ছাপাইয়া ও সাইক্লোস্টাইল করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করে। এক বৎসর পরে ১৯৪৩ খৃস্টাব্দের ৮ই আগস্ট এই সম্পর্কে গোয়েন্দা-পুলিশ আটক জিলার একটি সৈন্য-ব্যারাক হইতে মেহার আউঝা নামক এক সামরিক অফিসারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ তাহার বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে বৈপ্লবিক সাহিত্য প্রচার ব্যতীত বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যে সৈন্য-ব্যারাক হইতে কতকগুলি পিস্তল ও টমিগান চুরির অভিযোগ আনিয়া এক মামলার আয়োজন করে। কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় তাহাকে মুক্তি দিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।

অন্যদিকে একদল যুবক সংগঠিতভাবে ধ্বংসকার্য চালাইতে থাকে। তাহারা বহু সরকারী ও আধা-সরকারী অফিস এবং বহু লক্ষ টাকার সামরিক দ্রব্যসহ বহু টাকার সম্পত্তি ধ্বংস করিয়া ফেলে। পাঞ্জাবের গোয়েন্দা-পুলিশ বহু চেষ্টা করিয়া এই সকল ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে জয়গোপাল, হরবংশলাল, বাচিত্তর সিং, জ্ঞান প্রকাশ প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তার করিতে সক্ষম হয়। ইহাদের মধ্যে বাচিত্তর সিং পুলিশের কবল হইতে পলায়ন করিয়া প্রায় তিন বৎসর পরে বহু বৈপ্লবিক সাহিত্য ও একটি রিভলভারসহ কলিকাতায় গ্রেপ্তার হন। হরবংশলাল ছিল এই যুবকদলের প্রধান নেতা। গ্রেপ্তারের পর পুলিশ তাহার

উপর দীর্ঘকাল ধরিয়া অসহনীয় শারীরিক উৎপীড়ন চালায়। সেই অমানুষিক উৎপীড়ন আর সহ্য করিতে না পারিয়া হরবংশলাল জেলের মধ্যেই বিষ পানে আত্মহত্যা করেন।

—

আগস্ট-সংগ্রামে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১৯৪২ খৃস্টাব্দের আগস্ট-সংগ্রাম পরিচালনা করেন স্বয়ং সীমান্ত-গান্ধী খাঁ আবদুল গফুর খাঁ (বাদশা খাঁ)। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রধান নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হইলেও সীমান্ত-গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হয় অনেক পরে। তাঁহারই চেষ্টায় সীমান্তের আগস্ট-সংগ্রাম বরাবর গান্ধীজী-নির্দিষ্ট অহিংসার পথেই পরিচালিত হয়।

আগস্ট-সংগ্রাম এইভাবে পরিচালিত করিয়া "বাদশা খাঁ ও তাঁহার বিখ্যাত ভ্রাতা ডাক্তার খাঁন সাহেব সীমান্তের ছোটলাট সাহেব ও সমগ্র বিশ্বের নিকট প্রমাণ করিয়াছেন যে, (কংগ্রেসের) আগস্ট প্রস্তাবে কংগ্রেস-কর্মীদের কোনরূপ হিংসামূলক ও ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবার নির্দেশ দেওয়া হয় নাই, বরং সেই প্রস্তাবে এই নূতন আন্দোলনের অহিংস চরিত্রের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল।" (১)

অন্যান্য প্রদেশে যেরূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইবামাত্র দমননীতি প্রয়োগ করা হয়, এই প্রদেশে প্রথম দিকে সেইরূপ করা হয় নাই। কয়েকটি বিশেষ রাজনৈতিক কারণে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সরকার গোড়ার দিকে দমননীতি প্রয়োগ করে নাই। সরকারের ধারণা ছিল যে, এই সংগ্রামের উপর কোন গুরুত্ব না দিয়া ইহাকে উপেক্ষা করিলে এবং কাহাকেও গ্রেপ্তার না করিলে আন্দোলন নিজ হইতেই নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। কিন্তু সরকারের এই ধারণা শীঘ্রই ভুল বলিয়া প্রমাণিত হয়। আন্দোলন ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিতেছে দেখিয়া সরকার দমননীতি প্রয়োগ করে। শত শত লোককে

(১) "1942 Revolution in N. W. E. P." by R. C.

গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখা হয়, নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও লাঠি চালনার ফলে বহু লোক নিহত ও আহত হয় এবং অবশেষে সীমান্তের পাঠানদের প্রিয়তম নেতা বাদশা খাঁকে গ্রেপ্তার করিয়া অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক রাখা হয়।

সীমান্তের আগস্ট-আন্দোলন সুপরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে গড়িয়া তোলা হয়। ইহা চারিটি স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। প্রথম স্তরে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশের জনসাধারণের সংগ্রামী চেতনা বাড়াইয়া তুলিবার জন্য কেবলমাত্র সভা ও শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ইহার ফলে সমগ্র প্রদেশে এক অভূতপূর্ব সংগ্রামী মনোভাব জাগিয়া উঠে। এই স্তরে সীমান্ত-সরকার সম্পূর্ণ নিক্রিয় হইয়া থাকে। দ্বিতীয় স্তরে কংগ্রেস-কর্মীরা (খুদাই খিদমৎগার) সমগ্র প্রদেশের মদের দোকানগুলিতে পিকেটিং আরম্ভ করে। এই স্তরেও সরকারের তরফ হইতে কোন প্রকার বাধা আসিল না। ১৯৪২ খৃস্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সীমান্ত প্রদেশের একটি চিরস্মরণীয় দিন। এই দিন সমগ্র প্রদেশে কংগ্রেস প্রকাশ্যভাবে বৃটিশ-প্রভুত্ব ও উহার আইন-কানুন মানিতে অস্বীকার করে এবং এইভাবে সংগ্রামের তৃতীয় স্তর আরম্ভ হয়।

খুদাই খিৎমদগারগণ ছোট ছোট দলে ভাগ হইয়া এই বিদ্রোহের সংবাদ ও পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি সহকারে গ্রামে গ্রামে ঘুরিতে থাকে। খুদাই খিদমৎ-গারের দলগুলি এই ধ্বনি লইয়া যেখানেই উপস্থিত হয় সেইখানের জনতা সংগ্রামের উৎসাহে জলিয়া উঠিয়া স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়। বাদশা খানের ভ্রাতা ডাক্তার খান সাহেব সীমান্ত-কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়া প্রদেশের সকল সরকারী অফিস ও দপ্তর দখল করিবার জন্য সীমান্তের পাঠানদের আহ্বান করেন। এইবার আরম্ভ হয় সংগ্রামের চতুর্থ ও শেষ স্তর।

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে সীমান্ত-গান্ধী বাদশা খান ও ডাক্তার খান সাহেবের নেতৃত্বে সুপরিকল্পিতভাবে একই সময়ে সকল জিলার আদালত, সরকারী অফিস ও সরকারী ভবন এবং থানাসমূহের উপর "আক্রমণ" আরম্ভ হয়। এতদিন সীমান্ত-সরকার যে নিক্রিয়তা ও উপেক্ষার ভান করিতেছিল তাহার বদলে এবার শাসকগণ রুদ্রমূর্তি ধারণ করে। সর্বত্র কংগ্রেস-কর্মী

'খুদাইখিদমৎগার' গণের উপর গুলি ও লাঠি চলিতে থাকে। শাসকগণ ভয় পাইয়া সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী পেশোয়ারের কোর্ট ১৫ দিনের জন্য বন্ধ করিয়া দেয়। ১০ই অক্টোবর কংগ্রেস-কর্মীরা মর্দানের কোর্ট আক্রমণ করিলে পুলিশ কংগ্রেস-কর্মীদের উপর গুলি বর্ষণ করে। ইহার ফলে ৮ জন নিহত ও ২০ জন গুরুতররূপে আহত হয়। ইহার পর হইতে সর্বত্র ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার আরম্ভ হয়। মর্দান শহরে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে মর্দান শহরে অবরোধের অবস্থা চলিতে থাকে। সীমান্তের কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ মর্দানেই ইংরেজ-শাসনের সহিত শেষ বোঝাপড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া ২৭ অক্টোবর ঐ স্থানে এক জন-সমাবেশ আহ্বান করেন। ঐ দিন বাদশা খাঁ স্বয়ং ৫ শত দৃঢ় প্রতিজ্ঞ অনুচরসহ মর্দানে প্রবেশ করিবামাত্র কয়েকশত পুলিশের একটি বিরাট দল লাঠি হস্তে শোভাযাত্রীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। লাঠির আঘাতে প্রায় ৩ শত লোক গুরুতররূপে এবং বাকী সকলে অল্প-বিস্তর আহত হয়। স্বয়ং বাদশা খাঁ লাঠির আঘাতে চেতনা হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়েন। তাঁহার দুইখানি পাঁজর ভাঙ্গিয়া যায়। অচেতন অবস্থাতেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া জেলখানায় লইয়া যাওয়া হয়।

উপরোক্ত ঘটনার পর সংগ্রাম আরও প্রবল আকার ধারণ করে এবং সরকারের দমননীতিও বিশেষ উগ্র হইয়া উঠে। সীমান্ত প্রদেশে মোট প্রায় ৬ হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাহাদের অর্ধেকেরও বেশী বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে।

আগস্ট-সংগ্রামে সিন্ধুপ্রদেশ (১)

প্রদেশের ৪৫ জন কংগ্রেস-কমিটির সভ্য বোম্বাই অধিবেশনে যোগদান করিয়া করাচী শহরে ফিরিয়া আসিবামাত্র গ্রেপ্তার হন। এই গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে করাচীর সকল স্কুল-কলেজের ছাত্রগণ ধর্মঘট করিয়া বাহির হয়। প্রায় তিন মাস

(১) "1942 Revolution in Sind" by Choitram Gidwani.

কাল এই ধর্মঘট অব্যাহত থাকে। করাচীর ছাত্র ও কংগ্রেস-কর্মীরা শহরের সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা করিয়া কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ জানাইতে থাকে। তাহারা শহরের বিভিন্ন অঞ্চলের টেলিফোনের তার কাটিয়া ফেলে। হিমু কালানি নামে সতের বা আঠার বৎসর বয়স্ক একটি ছাত্র রেল-লাইন ধ্বংস করিতে গিয়া পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। বিচারে তাহার ফাঁসীর আদেশ হয়। এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় উঠিলেও হিমুর ফাঁসী হইয়া যায়।

এই প্রদেশে আগস্ট-সংগ্রামে মোট ২৪ শত লোক গ্রেপ্তার হয়। ইহাদের মধ্যে ১৪ শত লোক বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড লাভ করে এবং ১ শত জনকে দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক রাখা হয়।

* * * *

আগস্ট-সংগ্রামের পর

১৯৪৩-৪৫ খৃস্টাব্দ

রাজনৈতিক অচল অবস্থা

সমগ্র দেশব্যাপী জনসাধারণের স্বতস্ফূর্ত আগস্ট-সংগ্রাম নেতৃত্ব ও প্রস্তুতির অভাবে ব্যর্থ হইলেও ইহা দেশের জনসাধারণের উপর যে গভীর প্রভাব রাখিয়া যায় তাহা সমগ্র ভারতবর্ষকে নূতন বিদ্রোহের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া তোলে। ব্যর্থ আগস্ট-সংগ্রাম নূতন ও ব্যাপক গণ-সংগ্রামের ভিত্তি রচনা করিয়া রাখে।

এদিকে কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার এবং স্বতস্ফূর্ত আগস্ট-সংগ্রামের ব্যর্থতার ফলে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামে এক অচল অবস্থা দেখা দেয়, ইংরেজ-সরকার আগস্ট-সংগ্রামের দায়িত্ব কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের উপর চাপাইবার চেষ্টা করে, আর কংগ্রেস-নেতৃত্বের পক্ষ হইতে গান্ধীজী ইহার সকল দায়িত্ব অস্বীকার করেন এবং কেবলমাত্র ইংরেজ-সরকারকেই ইহার জন্য দায়ী করেন। অন্যদিকে

জনসাধারণ আগস্ট-সংগ্রামের ব্যর্থতায় হতাশ না হইয়া রাজনৈতিক অচল অবস্থার অন্তরালে এক নূতন আপসহীন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

১৯৪৪ খৃস্টাব্দের ৬ই মে গান্ধীজী তাঁহার ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু সরকার ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সভ্যদের মুক্তি দিতে অস্বীকার করে। ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের মধ্যভাগে দেশের রাজনৈতিক অচল অবস্থা দূর করিবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে ভুলাভাই দেশাই ও মুসলিম লীগের পক্ষ হইতে লিয়াকৎ আলী খাঁ যুক্তভাবে ইংরেজ-সরকারের নিকট এক নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ও লীগের প্রত্যেকের শতকরা চল্লিশ ও অন্যান্য দলের একত্রে শতকরা কুড়ি ভাগ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে কেন্দ্রে একটি সাময়িক জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা পেশ করা হয়। কিন্তু ইংরেজ-সরকার গ্রহণের অযোগ্য একটি পাল্টা প্রস্তাব করিয়া উক্ত পরিকল্পনা নাকচ করে। সুতরাং রাজনৈতিক অচল অবস্থা চলিতেই থাকে।

১৯৪৬-এর বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থান

কিন্তু বাহিরের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যখন অচল অবস্থা চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে এক বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিতেছিল। এই পরিবর্তন ছিল এত ব্যাপক ও গভীর যে ইহার ফলে সমগ্র দেশ এক ভয়ংকর আগ্নেয়গিরির আকার ধারণ করে এবং সাম্রাজ্যবাদের সকল দুষ্ট পরিকল্পনা ব্যর্থ হইয়া যায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ সমগ্র বিশ্বের, বিশেষ করিয়া বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ার নবজাগরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সমগ্র ভারতবর্ষেও এক অভূতপূর্ব গণ-অভ্যুত্থান আসন্ন হইয়া উঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট-সংগ্রামের শিক্ষা হইতে লব্ধ উন্নত রাজনৈতিক চেতনা লইয়া ভারতের জনসাধারণ এবার আপসহীন শেষ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়।

রাজনৈতিক অচল অবস্থার অন্তরালে সমগ্র ভারতব্যাপী যে ভয়ংকর অগ্নিগর্ভ পর্বত সৃষ্টি হইয়াছিল, ১৯৪৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র

সৈন্যদের মুক্তির দাবি লইয়া উহার প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে। ইহার পর হইতে অসংখ্য প্রচণ্ড গণ-বিস্ফোরণে ভারতের ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িতে থাকে, এবং ইহার শেষ আঘাতে দুই শত বৎসরের পুরাতন ইংরেজ-প্রভুত্বের অবসান ঘটে।

১৯৪৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে সর্বপ্রথম কলিকাতার ছাত্র ও শ্রমিকগণ ইংরেজের বন্দী-শিবিরে আবদ্ধ 'আজাদ হিন্দ-বাহিনী'র মুক্তির দাবি লইয়া সংগ্রাম আরম্ভ করে। শাসকগণ এই সংগ্রামকে রক্তবন্যায় ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করিলে ইহা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে এবং লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী ইহাতে যোগ দান করিয়া ইহাকে দুর্বার করিয়া তোলে। ইংরেজ-শাসকগণ এই নূতন বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের রূপ দেখিয়া ১৯৪৬ খৃস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র বন্দীদের মুক্তি দান করিতে বাধ্য হয়। ইংরেজ-শাসক গোষ্ঠীর এই পরাজয় হইতেই ভারতের ইংরেজ-শাসনের অবসানের সূচনা হয়।

ভারতের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানকে শান্ত করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ-সরকার নানারূপ আশ্বাসবানী প্রচার করিতে থাকে। কিন্তু সেই সকল মিথ্যা আশ্বাসে বিভ্রান্ত না হইয়া জনসাধারণের অভূতপূর্ব সংগ্রাম অব্যাহতভাবে চলিতে থাকে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৃটিশ-সৈন্যদের উৎপীড়নের প্রতিবাদে ১০ই জানুয়ারী চট্টগ্রাম শহরে এক লক্ষাধিক মানুষ সমবেত হইয়া "বৃটিশ ভারত ছাড়" ধ্বনি তোলে। ইহার সহিত সমানভাবে চলে শ্রমিকের সংগ্রাম। ১২ই জানুয়ারী গোয়ালিয়র রাজ্যের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলি চালনার ফলে ১৭ জন নিহত ও ২ শত জন আহত হয়। ২৭শে জানুয়ারী কোলার স্বর্ণখনির ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট আরম্ভ হয়।

শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র ও অন্যান্য শ্রেণীর জনসাধারণের এই বৈপ্লবিক স্বাধীনতা সংগ্রামে অপর একটি শক্তি আসিয়া যোগদান করে। এই শক্তি হইল ইংরেজ-সরকারের বিমান-বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যদল, নৌ-সৈন্যদল ও সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী। দেশের এই বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে চঞ্চল হইয়া এবং নানা প্রকার দাবি লইয়া ইহারাও এই ঐতিহাসিক মহাসংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহা এই

জাতীয় সংগ্রামের শেষ স্তরের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। ৭ই ফেব্রুয়ারী, বোম্বাই শহরে অবস্থিত ভারতীয় বৈমানিকগণ ইংরেজ-পরিচালকদের উৎপীড়ন মূলক আচরণের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করে। 'আজাদ হিন্দ বাহিনী'র সেনাপতি ক্যাপ্টেন রসিদ আলির মুক্তির দাবি লইয়া ১৩ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতায় একলক্ষাধিক ছাত্র ও নাগরিকের শোভাযাত্রা বাহির হইলে ইংরেজ-সরকারের পুলিশ ইহার উপর গুলি চালায়। ইহার ফলে কয়েকজন হতাহত হয়। ভারতের প্রায় প্রত্যেক শহরে 'রসিদ আলি দিবস' প্রতিপালিত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারী 'রসিদ আলি দিবসে' পুলিশ মীরাটে শোভাযাত্রীদের উপর গুলি বর্ষণ করে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই শহরে ঐতিহাসিক 'নৌ-বিদ্রোহ' আরম্ভ হয়। এই সংবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া ইহার পরদিনই বৃটিশ-সরকার ভারতীয় সমস্যার "সমাধান"-এর উদ্দেশ্যে একটি' ক্যাবিনেট মিশন' প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ২১শে ফেব্রুয়ারী 'নৌ-বিদ্রোহ' কলিকাতা, করাচী ও বোম্বাই শহরে বিস্তার লাভ করে। বোম্বাই শহরে যখন নৌ-বিদ্রোহীদের ও ইংরেজ-বাহিনীর মধ্যে সশস্ত্র যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন নৌ-বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের ৩ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারী জাতীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশে বোম্বাইয়ের নৌ-বিদ্রোহীরা এই বলিয়া অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করে: "আমরা বিদেশী ইংরেজ-রাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিতেছি না, আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি ভারতবাসীদের নিকট।" পণ্ডিত জহরলাল এই নৌ-বিদ্রোহকে "এ যুগের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা" বলিয়া উল্লেখ করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী বিমান-বাহিনীর ভারতীয় সৈন্যগণ ধর্মঘট করে। ঐদিন কলিকাতায় প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক 'নৌ-বিদ্রোহের' সমর্থনে ধর্মঘট করে। ২৫শে তারিখে ত্রিচিনাপলির এক লক্ষ ও মাদ্রাজের ৫০ হাজার শ্রমিক নৌ-বিদ্রোহের সমর্থনে ধর্মঘট করে এবং বিভিন্ন শহরে দোকানপাট ও দৈনন্দিন কাজকর্ম বন্ধ থাকে।

মার্চ মাস হইতে বিভিন্ন স্থানে পুলিশ ও সশস্ত্র বাহিনীর ধর্মঘট ও বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। ১লা মার্চ জব্বলপুরে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বিভিন্ন দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। ৪ঠা মার্চ দিল্লীতে ইংরেজ-সরকার কর্তৃক ঘোষিত মহাযুদ্ধের

বিজয়োৎসবের বিরুদ্ধে জনসাধারণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করিলে পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে ১১ জন লোক নিহত ও বহু লোক আহত হয়। ১৮ই মার্চ দেরাদুনে গুর্খা-বাহিনী ইংরেজ-সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ১৯শে মার্চ এলাহাবাদের পুলিশ-বাহিনী রেশন বৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করে। ২২শে মার্চ দিল্লীর পুলিশ রেশন বৃদ্ধির দাবিতে অনশন-ধর্মঘট আরম্ভ করে। ২৩শে মার্চ 'বেঙ্গল-আসাম রেলপথ'-এর শ্রমিকগণ রেশন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করিয়া সমগ্র রেলপথ অচল করিয়া ফেলে। ৩রা এপ্রিল বিহারের ১০ হাজার পুলিশ বেতন বৃদ্ধির দাবি লইয়া ধর্মঘট করিলে বিহার-সরকার অচল হইয়া পড়ে। এই মাসেই বৃটিশ 'ক্যাবিনেট মিশনেব' পরিকল্পনার এক অংশ অনুসারে কংগ্রেস যুক্তপ্রদেশ, বিহার ও বোম্বাই প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গঠন করিয়া ঐ সকল প্রদেশের সরকারের পরিচালনাভার গ্রহণ করে এবং অপর দিকে মুসলিম লীগের সভাপতি মহম্মদ আলি জিন্না ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া এবং ৬টি মুসলমান-প্রধান অঞ্চল লইয়া স্বাধীন পাকিস্থান গঠনের দাবি তোলেন।

ইতিমধ্যেই বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদের "অপারেশন এ্যাসাইলাম" নামে কুখ্যাত ভারত-ভাগের পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য গোপনে ভারতব্যাপী এক অতি ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আয়োজন শেষ হইয়াছিল। এই সকল পরিকল্পনার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: (১) ভারতীয় জনসাধারণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ব্যর্থ করা এবং (২) হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ ও দাঙ্গা জিয়াইয়া রাখা এবং এই ভাবে ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব বজায় রাখা। সাম্রাজ্যবাদের এই পরিকল্পনা অনুসারে মে মাসের শেষ ভাগ হইতে বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হইয়া যায়। ২৭শে মে বিহার প্রদেশে, এলাহাবাদে ও বেরিলি শহরে দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

এদিকে 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা শেষ করেন। 'ক্যাবিনেট-মিশন'-এর সমগ্র পরিকল্পনার সার মর্ম ছিল 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসন' এবং ইহার ভিত্তি ছিল সাম্প্রদায়িকতা। কিন্তু তাহা সত্বেও মুসলিম লীগ 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর সকল প্রস্তাব গ্রহণ

করে। কিন্তু কংগ্রেস মিশনের পরিকল্পনার প্রথম অংশ (আশু ব্যবস্থা) বাদ দিয়া কেবল দ্বিতীয় অংশ (দীর্ঘ মেয়াদী ব্যবস্থা) গ্রহণ করে।

এদিকে উপরে আপসের আলোচনা চলিতে থাকিলেও জনসাধারণের সংগ্রাম অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল। ১১ই জুলাই সারা ভারতের এক লক্ষ ডাক ও তার কর্মচারী বিভিন্ন দাবি লইয়া ধর্মঘট আরম্ভ করে। ১৬ই জুলাই রতলম রাজ্যে ১০ হাজার কৃষকের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে ১০ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হয়। ২৩শে জুলাই বিভিন্ন শহরে ৪ লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করিয়া ডাক ও তার ধর্মঘটীদের প্রতি সহানুভূতি জানায়। ২৯শে জুলাই কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ১৬ লক্ষ শ্রমিকসহ প্রায় ৪০ লক্ষ লোক ধর্মঘট করে। ঐদিন কলিকাতা ময়দানে যে জন-সমাবেশ হয় তাহা ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কংগ্রেস 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর প্রস্তাব গ্রহণ করে। ১৩ই আগস্ট বড়লাট পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে কেন্দ্রে মন্ত্রী-সভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। ঐদিনই মাদ্রাজে ১০ হাজার কর্পোরেশন-শ্রমিক ধর্মঘট আরম্ভ করে এবং পরদিন—১৫ই আগস্ট—সারা ভারতের ৪৫ হাজার সামরিক একাউণ্ট অফিস-সমূহের কর্মচারী একদিনের জন্য ধর্মঘট করে। এদিকে সাম্রাজ্যবাদীদের ভারতব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাইবার পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিল। মুসলিম লীগের দ্বারা ঘোষিত ১৬ই আগস্টের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' সাম্রাজ্যবাদীদের সুযোগ আনিয়া দেয়। ১৬ই আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস' (Direct Action Day) উপলক্ষে যে দাঙ্গা হয় তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাস চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। এই দাঙ্গায় ৬ সহস্রাধিক হিন্দু-মুসলমান নিহত ও প্রায় ৩০ হাজার আহত হয়। ইহার পর হইতে নোয়াখালি, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ভয়ংকর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে থাকে। এই সকল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা যে বৃটিশ-শাসকদেরই পরিকল্পিত তাহা পূর্ব-ভারতের ভারপ্রাপ্ত বৃটিশ-সেনাপতি বুচার প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন। কিন্তু একথাও সত্য যে ভারতের কতিপয় মুসলমান

ও হিন্দু নেতার দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি ও ক্রিয়াকলাপ যে উগ্র সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়াই বৃটিশ-শাসকগণ এই দাঙ্গা বাধাইতে পারিয়াছিল।

২৬শে আগস্ট পণ্ডিত জহরলালের প্রধান মন্ত্রিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পরে মুসলিম লীগ ইহাতে যোগদান করে। এদিকে দাঙ্গা সত্ত্বেও জনগণের সংগ্রাম চলিতে থাকে। ২৬শে আগস্ট 'সাউথ ইণ্ডিয়া রেলপথ'-এর ৪০ হাজার শ্রমিক বিভিন্ন দাবি লইয়া ধর্মঘট আরম্ভ করে। আমলনারে ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালায়, ইহার ফলে কয়েকজন নিহত ও আহত হয়। ২৫শে সেপ্টেম্বর পাটনা ও বেগুসরাইতে সামরিক পুলিশ-বাহিনী ধর্মঘট করে। ৯ই অক্টোবর গিরিডির ১৬ হাজার কয়লা-খনি শ্রমিক ধর্মঘট করে। এদিকে কংগ্রেসের সহিত কোন মীমাংসা ব্যতীতই মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান করে।

৪ঠা নভেম্বর কোলার স্বর্ণখনির ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশ গুলি চালায় এবং তাহার ফলে ৪ জন নিহত ও ১২ জন আহত হয়। ৯ই তারিখে নাগপুরের ২২ হাজার সূতাকল শ্রমিক ধর্মঘট করে। ১১ই নভেম্বর ১৫ হাজার ওয়ার্লি শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রাম জয়লাভ করে। ১৬ই তারিখে হায়দরাবাদ রাজ্যে সামরিক আইন জারি হয়।

এই ভাবে দেশ ব্যাপী বিভিন্ন গণ-সংগ্রাম যখন অব্যাহত গতিতে চলিতেছিল তখনই একদিকে বৃটিশ-পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সারা দেশ ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল এবং অপর দিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মধ্যে কংগ্রেস ও লীগের মন্ত্রীদের মত-বিরোধের ফলে এক ভয়ংকর রাজনৈতিক অচল অবস্থা ভারতের বুকের উপর চাপিয়া বসিতেছিল। এই মতবিরোধ এবং অচল অবস্থাও যে বৃটিশ-শাসকদের চক্রান্তের ফল তাহা প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জহরলাল বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের নিকট লিখিত পত্রে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার আভ্যন্তরিক সংকট জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। বৃটিশ-মন্ত্রীসভার আহ্বানে বড়লাট এবং কংগ্রেস ও লীগের নেতৃবৃন্দ লণ্ডনে উপনীত হন। কিন্তু এই লণ্ডন সম্মেলনেও কোন ফল হইল না।

ভারতের মুক্তি

বৃটিশ-চক্রান্ত জনসাধারণের গোচরে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সারা ভারতব্যাপী গণ-সংগ্রামের ঢেউ উঠিতে থাকে। ইহার ফলে বৃটিশ-শাসকগণ শঙ্কিত হইয়া 'ক্যাবিনেট মিশন'-এর প্রস্তাব বাতিল করিয়া একটি নূতন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য লর্ড মাউণ্টব্যাটেনকে বড়লাট হিসাবে ভারতে প্রেরণ করা হয়। ভারতবর্ষকে পাকিস্তানে ও ভারতরাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া আপাততঃ দুইটি পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন প্রাপ্ত রাষ্ট্র স্থাপনই ছিল মাউণ্টব্যাটেন-পরিকল্পনার মূলকথা। এই পরিকল্পনায় বলা হয় যে, এই রাষ্ট্র দুইটি ইচ্ছা করিলে গ্রেট বৃটেনের সহিত সম্পর্ক ছেদ করিতেও পারিবে। ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা তখন এমন এক বিস্ফোরণের মুখে আসিয়াছিল যে, ইহা ব্যতীত বৃটিশ-শাসকদের সম্মুখে আর কোন পথ ছিল না। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

প্রথমে এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার দিন স্থির হইয়াছিল ১৯৪৮ খৃস্টাব্দের জুন মাসে। কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা তখন এমনই "বিপজ্জনক" হইয়া উঠিয়াছিল যে, ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিলে হয়ত "ভয়ংকর কিছু ঘটিয়া যাইবে"—এই ভয়ে বড়লাট ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসেই এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট 'ভারত-ডোমিনিয়ন' ও 'পাকিস্তান-ডোমিনিয়ন' জন্ম গ্রহণ করে। এইভাবে স্বাধীন ভারতের জন্মের পথ প্রস্তুত হয় এবং ভারত-রাষ্ট্র যে ভারতের সংগ্রামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়া অচিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্ব-সভায় আবির্ভূত হইবে তাহাও স্থির হইয়া যায়। এইভাবে পরাধীন ভারতের দুই শত বৎসরের সংগ্রাম, প্রায় ৬০ বৎসরের জাতীয় সংগ্রাম, ৩৫ বৎসরের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রাম, অসংখ্য মানুষের আত্মদান, দুঃখ-লাঞ্ছনা বরণ স্বার্থক হইয়া উঠে।

পরিশিষ্ট—(১)

ভারতের সাধারণতন্ত্রীবাহিনীর (চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনকারীদের) ঘোষণা-পত্র

"বৃটিশ-শাসকগণ ত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে চিরদিন দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে এবং ভারতবাসীর জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জাতীয়তাবাদের শেষ চিহ্ন পর্যন্ত মুছিয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠুরতম নীতি হিসাবে যুগ যুগান্তর কাল ধরিয়া যে অত্যাচার, উৎপীড়ন চালাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে আজ এতদ্দ্বারা ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম-শাখা রুখিয়া দাঁড়াইবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিতেছে। ভারতবাসীরাই ভারতবর্ষের প্রভু, কেবল ভারতবাসীরাই ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের অধিকারী। ভারতবাসীরা একটা বিদেশী সরকারের দ্বারা সেই অধিকার হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ বঞ্চিত থাকিলেও সেই অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই, কোন দিন তাহা হইবেও না। ভারতের সাধারণতন্ত্রী বাহিনী অস্ত্রশক্তির দ্বারা বিশ্বের সম্মুখে সেই অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পই আজ ঘোষণা করিতেছে এবং এইভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস দ্বারা ঘোষিত স্বাধীনতার আদর্শ কার্যকরী করিতে যাইতেছে। স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য, বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে মাতৃভূমিকে মহিমামণ্ডিত করিবার জন্য সাধারণতন্ত্রী বাহিনীর প্রত্যেকটি সভ্য তাহার জীবন উৎসর্গ করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছে। আজ সাধারণতন্ত্রী বাহিনী দুঃখ ভারাক্রান্ত ও ক্রোধকম্পিত চিত্তে ভারতভূমিকে বৃটিশ-শাসকদের দ্বারা ভারত-বাসীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যার কথা, ভারতীয় নারীদের কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার কথা, ভারতীয় যুবকদের নির্বিচারে ফাঁসী ও সুপরিকল্পিত হত্যার কথা, নিষ্ঠুর বৃটিশের বুটের তলায় ভারতীয় শিশুদের পিষিয়া মারিবার কথা, ভারতের শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পূর্ণ ধ্বংস করিবার কথা স্মরণ করিতেছে এবং ভারতের নিহত সন্তানদের হত্যার প্রতিশোধের জন্য শপথ গ্রহণ করিতেছে। সাধারণতন্ত্রী বাহিনী ভারতের প্রত্যেকটি মানুষের সমর্থন পাইবার অধিকারী বলিয়াই জাতীয় আদর্শ ও সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এতদ্দ্বারা প্রত্যেকটি

ভারতবাসীর সমর্থন দাবি করিতেছে এবং আশা করে যে, কোন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীই নিষ্ক্রিয়তা, কাপুরুষতা ও মনুষ্যত্বহীনতা দ্বারা এই মহান আদর্শের অবমাননা করিবে না। আজিকার এই চরম মুহূর্তে চট্টগ্রামবাসীরা এই আহ্বানে অবশ্যই সাড়া দিবে এবং তাহাদের সাহস, দেশভক্তি ও তাহাদের সন্তানদের আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার এই মহান কর্তব্য সম্পাদনে যোগ্যতার প্রমাণ দিবে।"

(এই ঘোষণা-পত্রটি চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের দিন সন্ধ্যাকালে চট্টগ্রাম শহরে প্রচারিত হয়)

পরিশিষ্ট—(২)

ঢাকার 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' (বি. ভি.) ও 'শ্রীসংঘ' দলের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

"স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ যুগস্রষ্টাদের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একটি তরুণ ঢাকা শহরে এসে একটি নূতন বিপ্লবীদলের পত্তন করেন। এই তরুণ নেতা শ্রীযুত হেমচন্দ্র ঘোষ। এ দলের তেমন কোন নামকরণ প্রথমে হয়নি, হবার প্রয়োজনও ছিল না। হেমচন্দ্রের জন্মভূমি বরিশাল জিলায় হলেও প্রধান কর্মস্থল ছিল তাঁর ঢাকায়।" (১)

সম্ভবতঃ এই নূতন দলটির সৃষ্টি হয় ১৯১৪ খৃস্টাব্দে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হইবার দুই বৎসর পূর্বে—১৯১২ খৃস্টাব্দে। হেমচন্দ্র প্রথমে কয়েকটি অল্প বয়সী তরুণ লইয়া এই নূতন দলটি গঠন করেন। প্রথমে ক্ষুদ্র থাকিলেও এই দল সঙ্ঘশক্তিতে বাড়িয়া উঠিয়া ১৯১৪ খৃস্টাব্দের পূর্বেই বাংলা দেশে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

মহাযুদ্ধের সময় হেমচন্দ্র 'তিন আইনে' আবদ্ধ এবং হরিদাস দত্ত প্রমুখ নেতৃবৃন্দ সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। যুদ্ধ সমাপ্তির পর হেমচন্দ্র ও তাঁহার সহকর্মীরা মুক্তি লাভ করেন। তাঁহারা যখন বাহিরে আসেন তখন দলটি প্রায়

(১) ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়: 'বিপ্লব-তীর্থে, পৃঃ ১৮৩।

নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। হেমচন্দ্র আবার দল গঠনের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়ে খগেন দাস, সুরেন বর্ধন, কৃষ্ণ অধিকারী প্রভৃতি বিপ্লবীরা তাঁহাকে এই কার্যে সাহায্য করেন। এই সময়ে গোপনতার আড়ালে দলটিকে সুগঠিত করিবার জন্য তাঁহারা কয়েকটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯২১-১৯২২ খৃস্টাব্দের মধ্যে 'সোসাল ওয়েলফেয়ার লীগ', 'শ্রীসংঘ' ও 'ধ্রুব সংঘ' নামে সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলি গঠিত হয়। ঢাকা শহরের বহু যুবক এইগুলির সভ্য হয় এবং এই প্রতিষ্ঠানগুলির অধীনে পাড়ায় পাড়ায় বহু ডন-কুস্তি, লাঠি ও ছোরাখেলার আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল শহরের নারীদের মধ্যেও কাজ করে এবং লীলা নাগ (বর্তমানে 'রায়') প্রভৃতি পরবর্তী কালের নারী কর্মীরা এই দলের সভ্য হন। এই দলের উদ্যোগে 'বেণু' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা-খানি প্রকাশিত হয়। ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায়, রেবতী বর্মণ প্রভৃতি বিখ্যাত বিপ্লবীরা এই পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। সেই সময়ে বাংলার কিশোরদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচারে 'বেণু'র দান অতি বিরাট।

ভারতের দ্বিতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার সময় (১৯২৩-২৮) এই দল শক্তি সঞ্চয়ের নীতি গ্রহণ করে। ইহার ফলে এই যুগে এই দলের দ্বারা কোন বৈপ্লবিক ক্রিয়া-কলাপ অনুষ্ঠিত হয় নাই। তৃতীয় বিপ্লব-প্রচেষ্টার পূর্বে পুরাতন দলগুলির মধ্যে যখন নবীন-প্রবীনে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় এবং নবীন দল মূল দলের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বাহির হয়, তখন এই দলের মধ্যেও ভাগাভাগি দেখা দেয়। অনিল রায় ও লীলা নাগের নেতৃত্বে কিছু কর্মী আলাদা হইয়া 'শ্রীসংঘ' নামেই ভিন্ন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন। 'শ্রীসংঘের' নেতাদের মধ্যে অনিল ঘোষ, অনিল দাস, শৈলেশ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই ভাবে 'শ্রীসংঘ' দলের সৃষ্টি হয়। পরে সরকারী রিপোর্টে মূল দলটিকে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' (বি. ভি.) নামে অভিহিত করা হয়। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' নামে যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠিত হয় তাহার অন্যতম সংগঠক ছিলেন এই দলের সত্য গুপ্ত (মেজর)। সম্ভবতঃ ইহা হইতেই এই নামকরণ হইয়াছে।

এই সময়ে হেমচন্দ্র ঘোষই 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' বা 'বি. ভি' দলে সর্বময়

নেতা থাকিলেও কার্যতঃ এই দলের উপর কাহারও ব্যক্তিগত নেতৃত্ব ছিল না। প্রধান কর্মীরা সমবেত ভাবেই দল পরিচালনা করিতেন। হেমচন্দ্র ব্যতীত হরিদাস দত্ত, জ্যোতিষ জোয়ার্দার, সুপতি রায়, সত্যরঞ্জন বক্সী, সত্য গুপ্ত, মীরা দত্তগুপ্তা প্রভৃতি নেতারা দলের পরিচালক-কমিটিতে ছিলেন। ইহাদের নেতৃত্বে বাংলাদেশের বিভিন্ন জিলায় শাখা-প্রশাখা গড়িয়া উঠে। ইহাদের মধ্যে বি. 'ভি'র মেদিনীপুর শাখাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বি. ভি.' দলের বিশিষ্ট কর্মী ও 'রাইটার্স বিল্ডিংস' আক্রমণকারীদের অন্যতম দীনেশ গুপ্ত মেদিনীপুর শাখাটি প্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯৩০-৩৫ খৃস্টাব্দের বিপ্লব-প্রচেষ্টায় এই দলের শহীদ হন বিনয় বসু (লোম্যান হত্যা ও 'রাইটার্স বিল্ডিংস' আক্রমণ), সুধীর গুপ্ত (রাইটার্স বিল্ডিংস আক্রমণ), দীনেশ গুপ্ত (ঐ), নৃপেন দত্ত, বীরেন রায়চৌধুরী, প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (ডগলাস হত্যা), অনাথ পাঞ্জা (বার্জ হত্যা), মৃগেন দত্ত (ঐ), ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (ঐ), রামকৃষ্ণ রায় (ঐ), নির্মলজীবন ঘোষ (ঐ), নবজীবন ঘোষ (পুলিশ নির্যাতনে নিহত), মতি মল্লিক (ভিলেজ-গার্ড হত্যা), ভবানী ভট্টাচায (লেবংএ গভর্ণর হত্যার চেষ্টা), অসিত ভট্টাচার্য, জ্যোতির্ময় ভৌমিক ও গোপাল সেন।

এই সময় এই দলের বহু কর্মী রাজবন্দী হয় ও বহুকর্মী কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আন্দামানে ও বাংলাদেশের জেলখানায় আবদ্ধ থাকে। "জেলে আবদ্ধ থাকাকালেই ইহার নেতারা পরামর্শ করিয়া 'বি. ভি.' দল ভাঙ্গিয়া দেন। (১৯৩৭'এ খৃস্টাব্দে) শ্রীহেমচন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বক্সা ক্যাম্পেই 'বি. ভি.'র সভ্যবৃন্দ সমবেত হয়ে তাঁদের 'বি. ভি.' দলকে ভেঙ্গে দিলেন এবং তাদের প্রত্যেকে ব্যক্তিগত ভাবে (সুভাষচন্দ্র বসুর) 'ফরোয়ার্ড ব্লক' পার্টির আনুগত্য স্বীকার করে উক্ত পার্টির মত-চুম্বক এবং শপথ গ্রহণ করলেন।"(২)

এই ভাবে 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার' বা 'বি. ভি.' দলের অবসান ঘটে।

---

(২) ভূপেন্দ্র কিশোর রক্ষিত-রায় : বিপ্লব-তীর্থে, পৃঃ ২০৪।

যে সকল গ্রন্থ, পুস্তক-পুস্তিকা, রিপোর্ট ও প্রবন্ধ হইতে সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার তালিকা :—

English

(1) S. Upadhyay : 'Growth of Industries in India'.

(2) D. E. Watcha : 'A Financial Chapter in the History of Bombay'.

(3) 'Gazetteer of Bombay City and Island.'

(4) Reginald Reynolds : 'White Shahibs in India'.

(5) D. H. Buchanan : 'The Development of Capitalist Enterprise in India'.

(6) Joan Beauchamp : 'British Imperialism in India'.

(7) Lester Hutchinson : 'Empire of the Nabobs'.

(8) Vereney Lovett : 'History of the Indian National Movement'.

(9) Ambika Charan Mazumder : 'Indian National Evolution'.

(10) C. E. Buckland : 'Bengal Under Lieut. Governors', Vols. I & II.

(11) Hirendra Nath Mukherjee : 'India Struggles For Freedom'.

(12) Sir. William Wedderburn : 'Alan Octavian Hume, Father of Indian National Congress'.

(13) C. F. Andrews and Girija Mukherjee : 'Rise and Growth of the Congress in India'.

(14) Rajani Palm Dutt : 'India To-day'.

(15) Thomson and Garrat : 'Rise and Fulfilment of British Rule in India'.

(16) J. N. Farquhar : 'Modern Religious Movements in India.'

(17) Vivekananda's Works—Part IV—Mayavati Memorial Edition.

(18) H. F. Zacheria : 'Renascent India.'
(19) Frost : 'Secret Societies of European Revolutions, 1776–1876'.
(20) Swami Vivekananda : 'From Colombo to Almora'.
(21) Ronaldshay : 'Life of Lord Curzon,' Vol. I & II.
(22) B. Pattavi Sitaramiya : 'History of Indian National Congress'.
(23) C. Y. Chintamoni : 'Indian Politics Since the Mutiny'.
(24) Congress Presidential Speeches & Resolutions (Compiled by G. A. Natesan & Co.).
(25) C. F. Andrews : 'The Renaissance in India'.
(26) L. S. S. O' Mally : 'History of Bengal, Behar and Orissa Under British Rule'.
(27) Valentine Chirol : 'India Old and New'.
(28) W. C. Smith : 'Modern Islam in India.'
(29) Subhas Chandra Bose : 'The Indian Struggle'.
(30) C. Gopalan Nayar : 'Mopla Rebellion'.
(31) M. K. Gandhi : Speeches and Writings (Compiled by G. A. Natesan & Co.).
(32) H. N. Brailsford : 'Rebel India.'
(33) K. S. Shelvankar : 'The Problem of India'.
(34) R. G. Pradhan : 'India's Struggle for Swaraj.'
(35) Pandit Jaharlall Nehru : 'Where are we.'
(36) Pandit Jaharlall Nehru : 'Discovery of India.'
(37) Annie Bessant : 'How India Wrought for her Freedom.'
(38) S. C. Sirker : 'The Notable Indian Trials'.
(39) 'Amrita Bazar Patrika : 'Independence Number (Aug. 15, 1947).
(40) Prof. R. Coupland : 'The Cripps Mission.'
(41) Congress Publication : March of Events—1942-45.
(42) Satish Samanta and others : 'August Revolution and Two Years of National Govt.'

বাংলা পুস্তক ও পুস্তিকা

(১) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আনন্দমঠ (গ্রন্থাবলী সংস্করণ)।

(২) ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রাম,
ঐ অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড)।

(৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'আত্মপরিচয়'।

(৪) সুকুমার রায় : ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাস।

(৫) যোগেশচন্দ্র বাগল : মুক্তির সন্ধানে ভারত।

(৬) ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত : ভারতের বিপ্লব-কাহিনী।

(৭) ব্রজবিহারী বর্মণ : কানাইলাল।

(৮) ঐ : ক্ষুদিরাম।

(৯) ঐ : ফাঁসীর সত্যেন

(১০) ঐ : তরুণ বাঙ্গালী

(১১) ঐ : বাঙ্গালী বীর যতীন দাস।

(১২) ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় : বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ।

(১৩) সতীশ পাকড়াশী : অগ্নিদিনের কথা।

(১৪) শচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল : বন্দীজীবন, ১ম ও ২য় খণ্ড।

(১৫) সুপ্রকাশ রায় : বিদ্রোহী ভারত।

(১৪) মণীন্দ্রনারায়ণ রায় : কাকোরী ষড়যন্ত্র।

(১৬) নলিনীকিশোর গুহ : বাংলায় বিপ্লববাদ।

(১৭) বারীন্দ্রকুমার ঘোষ : বারীন্দ্রের আত্মকাহিনী।

(১৮) ঐ : আত্মজীবনী।

(১৯) হেমচন্দ্র কানুনগো : বাংলায় বিপ্লব-প্রচেষ্টা।

(২০) মতিলাল রায় : শতবর্ষের বাংলা।

(২১) ঐ : কানাইলাল।

(২২) বাঘা যতীন (চন্দননগরের 'বিপ্রভাণ্ডার হইতে প্রকাশিত)।

(২৩) অরবিন্দ ঘোষ : কারাকাহিনী।

(২৪) উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : নির্বাসিতের আত্মকথা।

(২৫) মদন ভৌমিক : আন্দামানে দশ বৎসর।

(২৬) রাখাল ঘোষ : বিপ্লবী অবনী মুখার্জি।

(২৭) হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ : কংগ্রেস।

(২৮) ভূপেন্দ্রকুমার রক্ষিত : বিপ্লব তীর্থে।

(২৯) পদ্মনাভ : বিপ্লবের সপ্তশিখা।

(৩০) চারুবিকাশ দত্ত : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
(৩১) আনন্দ গুপ্ত : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন।
(৩২) সখারাম গণেশ দেউস্কর : তিলকের মোকদ্দমা ও সংক্ষিপ্ত জীবনী।
(৩৩) অমৃতবাজার পত্রিকা—স্বাধীনতা সংখ্যা।
(৩৪) অজয়কুমার ঘোষ : ভগৎ সিং তাঁর সহকর্মীরা (অনুবাদ)

Official Reports & Documents

(1) House of Commons Fourth Report.
(2) Sedition Committee Report.
(3) Annual Report of the Director of Public Instructioı Bengal, 1915-1(
(4) Punjab Provincial Record. 1907.
(5) Govt. of India Records, 1907.
(6) Judgment of Lahore Conspiracy Case.
(7) Proceedings of the Lahore Conspiracy Case.
(8) Judgment of the Beneras Conspiracy case.
(9) Hunter Committee Report.
(10) Joint Committee Report on Indian Constitutional Refoı 1933-34, vol. II, Appendix A, Memorandum on Terrois.
(11) Annual Report on the Indian Newspaper.
(12) Official publications :
—India in 1919
—India in 1920
—India in 1921
—India in 1922
—India in 1923
—India in 1924
—India in 1925
—India in 1926
—India in 1927
—India in 1928
—India in 1929
—India in 1930
—India in 1931
—India in 1932
—India in 1933
—India in 1934

13. Bengal Govt. Publication—'Some facts about the Disturbances, 1942-4